ভারতী

মাসিক পত্রিকা

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীসরলা দেবী—সম্পাদিত।

ভারতী

মাসিক পত্রিকা

শ্রীহিরণ্ময়ী দেবী ও শ্রীসরলা দেবী—সম্পাদিত।

ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্ধ।

(এফ্-দু-বোয়াগোবে-রচিত ফরাসী গল্প হইতে)

(সত্য ইতিহাস)

যে সময়ে সরকারী স্ফূর্ত্তিখেলা প্রচলিত ছিল—আজকালে যুবকবৃন্দ সেই সুখের দিন দেখে নাই। বড় বড় শাদা তাস্-কাগজের উপর স্ফূর্ত্তির সংখ্যাগুলা প্রকাণ্ড অক্ষরে লেখা; স্ফূর্ত্তির টিকিট্ টানিবার পূর্ব্বরাত্রে টিকিট্ বিক্রেতার হাঁকডাক্ চীৎকার; যাহাদের ভাগ্যে ঠিক্ টিকিট উঠিয়াছে, তাহাদের গৃহের সম্মুখে লোকদিগের বেণু-বীণার সঙ্গীতালাপ;—অর্দ্ধ শতাব্দি পূর্ব্বেকার এই সমস্ত দৃশ্য আমাদের মনে পড়ে।

১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে সরকারী জুয়া-খেলার সহিত স্ফূর্ত্তিখেলাও তিরোহিত হয়। কিন্তু ১৮০৫ সালে, ফ্রান্সের সমস্ত প্রধান প্রধান নগরে স্ফূর্ত্তিখেলাটা খুব প্রচলিত ছিল। প্যারিস-নগরীতে স্ফূর্ত্তিখেলার একটি বিশেষ কার্য্যালয়ও ছিল। সেখানে প্রতি মাসের ৫ই, ১৫ই ও ২৫শে তারিখে, এই প্রকার কৌতুকাবহ দৃশ্য প্রায়ই দেখা যাইত।

যে বৎসরের শেষভাগে প্রসিদ্ধ অষ্টর্লিট্স্-যুদ্ধ সংঘটিত হয়, সেই বৎসরের ১৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে,—যে হোটেলে স্ফূর্ত্তির টিকিট্ টানা হইতেছিল, তাহার দ্বারদেশে লোকের বিপুল জনতা। ঘড়ীতে ১২টা বাজিয়াছে। যাহারা দেখিতে আসিয়াছে তাহারা প্রবেশ করিতে না পাইয়া, ভাগ্যফল জানিবার জন্য, অধীর ঔৎসুক্যের সহিত রাস্তায় দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। সওয়া-বারোটার সময় দরজা খুলিল। একটি অবোধ শিশু স্ফূর্ত্তি-টিকিটের কলস হইতে

মাঙ্গলিক।

আনি প্রথম নিদাঘ-প্রভাত-তপন চরণে,
করি ভূষিত নবীন-বরষ-দিবস কিরণে,
মহা রুদ্র মূরতি
প্রতিভা শকতি
জাগাও ভারতি, বঙ্গে।

মধু সুরভি-গরবভরা মধু-ঋতু গিয়াছে!
তার বিলাস-আলস-লুলিত পবনে কি আছে?
নাহি চাহি সে তৃপ্তি।
বীরের দীপ্তি—
জ্বলুক অঙ্গে অঙ্গে।

জ্বালিয়া বহ্নি নিদাঘ-রৌদ্রে,
নব হোমে আজি দ্বিজ ও শূদ্রে
দেহ দীক্ষা।

তপের বর্ম্মে আবরি শরীর,
দেহ বল, দেবি, সিংহ করীর,—
এই ভিক্ষা।

যে সংখ্যাগুলা টানিয়া তুলিতেছে, তাহাই ঘোষকেরা চীৎকার করিয়া সকলকে শুনাইতেছে। এইবার উঠিয়াছে :—৫৯—৮৬—৪৪—৫৫—১১। খেলড়েরদল, এই সব সংখ্যা শুনিবামাত্র, কেহ খানিকটা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া,—কেহবা একটু শিস্ দিয়া অন্তরের দারুণ নৈরাশ্য প্রকাশ করিল। কেননা, এই সব গরিবলোকদিগের মধ্যে কাহারও ভাগ্যে ঠিক্ সংখ্যা উঠে নাই। কিছুকাল ধরিয়া একটা ভীষণ কোলাহল হইতে লাগিল। তাহার পরেই জনতার লোক আশ্‌পাশের রাস্তা দিয়া কে কোথায় সরিয়া পড়িল। আবার সেই স্থানটী পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল।

এই স্ফূর্ত্তিখেলায় যাহারা ব্যর্থমনোরথ হইয়াছে তাহাদের মধ্যে একটি রমণীও ছিল। পরিচ্ছদাদি দেখিয়া মনে হয়, ইঁহার বেশ সচ্ছল অবস্থা; এবং মুখশ্রী দেখিয়া মনে হয়, ইনি হীন-কুলোদ্ভবা নহেন। ইঁহার এক হাতে একটা ছোট বেতের ঝুড়ি; আর একহাতে প্রকাণ্ড একটা ছাতা। লম্বা লম্বা পা ফেলিতে ফেলিতে এবং বদ্ধ-ছাতাটা ঘুরাইতে ঘুরাইতে আপন-মনে উচ্চৈঃস্বরে কি বলিতেছেন। পরে ডাহিনে ফিরিয়া, "প্যালে-রয়্যালে"র সোপান দিয়া নীচে নামিলেন; এবং উদ্যানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া, একটা বেঞ্চির উপর বসিয়া পড়িলেন।—"অন্ধটা ভারি জুয়াচোর! পাজি ভিক্ষুক কোথাকার! সে আমার কাছে অঙ্গীকার কর্‌লে,—১৫ সংখ্যাটা আমার ভাগ্যে নিশ্চয়ই উঠ্‌বে। কিন্তু প্রতিবারেই ১৫ সংখ্যার কাছাকাছি সংখ্যাগুলি উঠ্‌তে লাগ্‌ল"—রমণী এইরূপ গনগন্ করিয়া আপনমনে বকিয়া যাইতেছেন।

এইরূপ মনের ঝাল ঝাড়িয়া রমণী যেন একটু শান্ত হইলেন এবং তাঁহার ঝুড়ি হইতে একটা কেতাব বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। হল্‌দে মলাটের উপর এই চিত্তহারী নামটি লেখা :—

"ফ্রান্সের রাজকীয় স্ফূর্ত্তির প্রকৃত চাবির তালা ;—বার্ষিক ৪২০০০ টাকা দিলেই স্ফূর্ত্তির ঠিক্ সংখ্যা নিশ্চয়ই পাওয়া যাইবে"।

স্ফূর্ত্তি-ব্যসনাসক্ত রমণী যে সময়ে এই চিত্তাকর্ষক গ্রন্থপাঠে নিমগ্না —একটি বৃদ্ধ—দেখিতে বেশ ফিট্‌ফাট্—সেই বেঞ্চেই আসিয়া বসিল। প্রাচীন রাজত্বের আমলে, এই বৃদ্ধটি রাজার একজন উচ্চপদস্থ পরিচারক ছিল। পার্শ্বোপবিষ্টা রমণীকে সে আড়চোখে দেখতে লাগিল এবং কোন কু-মৎলবে একটু মুচ্‌কি-মুচ্‌কি হাসিতে লাগিল। পরে একটু গলাখাঁকানি দিয়া তাহার সান্নিধ্য জানাইয়া দেওয়ায়, রমণী অমনি উঠিবার উদ্যোগ করিল। কিন্তু বৃদ্ধ তাঁহাকে ভদ্রভাবে বসিতে ইঙ্গিত করিয়া অতীব মধুরস্বরে এইরূপ বলিল :— —"বিনা-পরিচয়ে আমি যে শ্রীমতীর সহিত কথা কইতে সাহস করচি, তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করবেন। আর, এখন আপনি যে গ্রন্থখানা পাঠ করচেন—যদি জান্‌তে পারেন আমিই এই গ্রন্থের রচয়িতা, তাহলে আমার ধৃষ্টতা বোধ হয় অন্যো মার্জ্জনায় বল্যে' মনে হবে।"

—"কি! তুমি এই গ্রন্থের—"

—"হাঁ, আমার নাম মার্সেই-পেয়ার—আমি গণিৎবেত্তা—ভাগ্যগণনার আচার্য্য ; ভান্‌রি-চৌরাস্তায়, ৫১ নম্বর বাড়ীর দোতালায় আমি থাকি। আমার বহুদিনের অভিজ্ঞতার ফল যদি শ্রীমতীর কোন কাজে আসে তাহলে আমি কৃতার্থ হ'ব।"

রমণী বলিলেন :—"আচ্ছা যত ইচ্ছা তোমার অভিজ্ঞতার বড়াই কর, তাতে কিছু আসে যায় না! তোমার গ্রন্থখানি চমৎকার! এই গ্রন্থ পড়েই ত, স্ফূর্ত্তি-টিকিটের সংখ্যা সম্বন্ধে অন্ধকে জিজ্ঞাসা করবার কথা আমার মাথায় আসে ; আর দেখ, সেই পাজি বেলাঁজে আমায় যে সংখ্যাগুলা দিয়েছিল, এই তিন বৎসর ধরে সেগুলা আমি সযত্নে ধরে রেখেছি ;— "সাঁজ্" সেতুর ধারে যে অন্ধলোকটা থাকে, তাকে

তুমি বোধ হয় জান ;—তার একটা গাড়ী আছে—একটা কুকুর আছে। আমার সংখ্যা উঠ্‌ল,—আজ পর্য্যন্ত ত আমি চক্ষে দেখলেম না। আর লোকে তাকে বলে কি না,—"ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্ধ"!

ভাগ্যগণনার অধ্যাপক, যাহাতে রমণীর হৃদ্বোধ হয় এইরূপ স্বরে বলিলেন :—"এ কথা সত্য, আমার পুস্তকের ১২৫ পৃষ্ঠায়, অন্ধদের জিজ্ঞাসা করতে আমি পরামর্শ দিয়েছি ; কিন্তু ২১৩ পৃষ্ঠায়, আর এক শ্রেণীর লোকের কথাও উল্লেখ করেছি যাদের মুখের কথা আরো অব্যর্থ।"

"—আহা কি চমৎকার শ্রেণীর কথাই বলেছ! সেইসব লোক—যাদের প্রাণদণ্ডের হুকুম হয়েছে! তাদের এখন আমি কোথায় পাই বল দেখি? তাদের সঙ্গে কি আমার পরিচয় আছে?"

মার্সেই-পেয়ার কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া উত্তর করিল :—"কিন্তু শ্রীমতি, এমন কি ঘট্‌তে পারে না, যে ব্যক্তি * গিলোটিনের আসামী, তার কাছ থেকেই হয়ত আপনি সংখ্যাগুলা পেয়েছেন। এরূপ ত প্রায়ই ঘটে থাকে—আর এইরূপ স্থলেই আমার গণনা-পদ্ধতি অব্যর্থ। প্রাণদণ্ড হবার পরদিন যে স্ফূর্ত্তিখেলা হয়, তাতেই এই ঠিক্-সংখ্যাগুলা ওঠে।" রুষ্টা রমণী, এইসব কথায় পূর্ব্বেই একটু নর্ম্মিয়া আসিয়াছিলেন, এক্ষণে গুনগুনস্বরে বলিলেন :—
—'হুঁ! তাও যদি বুঝিতাম নিশ্চিত। কিন্তু আমার ভাগ্যে তা কখনই ঘট্‌বে না। পাজি বেলাঁজেটা কখনই গিলোটিন্-মঞ্চে উঠ্‌বে না। ও যে অন্ধ! অন্ধকে গিলোটিন্-মঞ্চে উঠ্‌তে কেউ কখন দেখেছে?"

---

* ফ্রান্‌সে, গিলোটিন্-যন্ত্রে বধ্যদিগের মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়। আমাদের যেরূপ

—"সম্ভাবনাটা কম বটে ;—এই যা দুঃখের বিষয়। কিন্তু যদি কখন আপনার ওরূপ ঘটে, তাহলে জান্‌বেন আমার কথা অব্যর্থ। অন্যত্র আপনি এ বিষয়ের খোঁজ নিতে পারেন। বুধ্যা-লোক দুর্লভ নয়, উপযুক্ত রক্ষক সঙ্গে করে', ''বিসেত্রে"র জেল্‌খানায় অনায়াসে যাওয়া যেতে পারে"।

—''তা যেন হল, কিন্তু যে সংখ্যাগুলা এতকাল আমি পুষে রেখেছি এবং যা-থেকে এককোটি টাকা পাবার কথা—সে সমস্তই ত এখন জলাঞ্জলি দিতে হয়! সেই অব্যর্থ—সংখ্যাগুলি এই :— ১৩—৮৭—৮৮... দেড়বৎসর হয়ে গেল এই ৮৮ সংখ্যাটা একবারও উঠ্‌ল না। না,—আমার শেষ কড়িটি থাক্‌তে আমি কিছুতেই ছাড়ব না। যেন কেউ বল্‌তে না পারে,—মোল্‌দেনের রাণী শেষকালে পিছপাও হলেন।"

এইরূপ আস্ফালন করিয়া, রমণী ঝুড়ির ভিতর বইখানা ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। ছাতাটা খপ্‌ করিয়া ধরিয়া উঠিয়া পড়িলেন, এবং গণৎকারকে বিদায়-সম্ভাষণ না করিয়াই হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

এরূপ কথোপকথন, ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে খুবই স্বাভাবিক। ঐ সময়ে তাসের জুয়াখেলার বদলে স্ফূর্ত্তিখেলার খুব চলন হয়। তখনকার স্ফূর্ত্তিখেলুড়ের জীবন্ত নমুনা—এই মোল্‌দেনের রাণী। এবং এই মার্সেই-পেয়ার-ধরণের ভাগ্যাচার্য্য এখনও ফ্রান্সে লোপ পায় নাই—ঐ ছাঁচের লোক, "মোনাকো"র জুয়ার আড্ডায় এখনও দেখা যায়। কিন্তু সে সময়ে, প্যারিস নগরেই এইসব লোকের আড্ডা ছিল।

মোল্‌দেনের রাণী, যে অঙ্কের উদ্দেশে গালিগালাজ করিতেছিলেন, তাহাকে লইয়াই সেই সময়ে একটা মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। আশা করি, সেরূপ ধরণের মোকদ্দমা আর যেন কখন দেখিতে না হয়।

১৫ই ফেব্রুয়ারীর পরে, "লেণ্ট্" নামক উপবাসপর্ব্বের পূর্ব্বমঙ্গলবারে, এই গরিব-বেচারা, রাত্রির প্রারম্ভে, নিজের বুঁচ্‌কিটি বাঁধিয়া, কাঁাজ্-ভ্যাঁ-অন্ধাশ্রমে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। সে ২০ বৎসরের অধিককাল, "চাঁজ" সেতুর ধারে একটা স্থান অধিকার করিয়া ছিল; কালক্রমে সেই স্থানটিতে তাহার কতকটা স্বত্ব জন্মিয়া যায়—অন্ততঃ সে এইরূপ ভাবিত।

লোকটার বয়স ৫০।৬০; এখনো বেশ সিধা ও শক্তসমর্থ, কিন্তু জন্মান্ধ। প্রথমে সে রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষা করিয়া জীবন আরম্ভ করে; পরে কাঁাজ-ভ্যাঁ-আশ্রমে কোন প্রকারে প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হয়। এক্ষণে ম্যুনিসিপ্যালিটির কৃপায়, "চাঁজ্" সেতুর ধারে একটু স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। প্রতিদিন প্রাতে এইখানে আসিয়া আড্ডা করে এবং সন্ধ্যা হইলেই অন্ধাশ্রমে ফিরিয়া যায়।

প্রসিদ্ধ ফরাসা-বিপ্লবের সময়েও তাহার এই অভ্যাসের বদল হয় নাই। কত দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতেছে, কতলোকের প্রাণদণ্ড হইতেছে—কিন্তু সে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন। সেই ভীষণ ১৭৯৩.৯৪ সালে,—তাহার বসিবার টুলটি হইতে দশ-পা অন্তর দিয়া রক্ষিগণ প্রতিদিন গাড়ী বোঝাই করিয়া প্রাণদণ্ডের আসামীদিগকে লইয়া যাইত। সেই সময়ে চাকার ঘর্ঘড়ানি, সৈনিকদিগের চীৎকার, জনতার কোলাহলও তাহার চিত্তকে বিচলিত করিতে পারে নাই;—সে তাহার তীক্ষ্ণস্বর ক্ল্যারিওনেট্ বাঁশীটি সমান বাজাইয়া যাইত। চাক্ষুষ দর্শনে মনে যে আবেগ জন্মিবার কথা, অবশ্য তাহার পক্ষে সে সম্ভাবনা ছিল না; কিন্তু সেই সব ভীষণ কোলাহল তাহার শ্রুতিগোচর হইত সন্দেহ নাই।

অন্ধ বেচারাকে প্যারিসের সকল লোকেই জানিত। ইহার নাম ফিলিপ বের্ট্যাঁ। কালক্রমে ইহার অবস্থা বেশ একটু সচ্ছল হইয়া

কাফি পান করিত ; কখন কখন দুইএক পাত্র ক্ল্যারেট্‌ও তাহার পেটে পড়িত। ভিক্ষাই তাহার একমাত্র সম্বল ছিল না। দুইটা লাভের ব্যবসায় সে একসঙ্গে চালাইত। প্রথমত সে কাঠের কাজে খুব নিপুণ ছিল ; ছোট ছোট কাঠের সামগ্রী তৈয়ারি করিয়া রাস্তার লোকদিগকে বিক্রয় করিত। কিন্তু আর একটা ব্যবসায় হইতে তাহার বেশী লাভ হইত। যুত্তিখেলার অব্যর্থ-সংখ্যাগুলা বলিয়া দিবার দৈবশক্তি তাহার আছে—এইরূপ সে লোকের কাছে জাহির করিত। সেকালের খেলুড়েদেরও এইরূপ একটা সংস্কার ছিল যে অন্ধেরা দৈবশক্তি-সম্পন্ন। এই সংস্কারের মূল কি ?—কোথা হইতে আসিল ? একটা পৌরাণিক কথা আছে যে, ভাগ্যলক্ষ্মী অন্ধ ; এই কথার সহিত সংস্কারটির কি কোন সংস্রব আছে ? সে যাহা হউক, যুত্তিখেলার কতকগুলি সংখ্যা অব্যর্থ বলিয়া সেই অন্ধ, লোকের নিকট ক্রমাগত বিক্রয় করিতে লাগিল। দৈবক্রমে দুই তিন বার তাহার কথা খাটিয়া যাওয়ায় তাহার খুব পসার জমিয়া গেল। ১৮০৫ সালে এই "ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্ধ" (এই নামে সবাই তাহাকে ডাকিত) তাহার সমব্যবসায়িদের ঈর্ষাস্থল হইয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু অন্ধের এই সুখের জীবনে, একটা গভীর দুঃখের বীজ নিহিত ছিল। সে তাহার অন্তরে কোন ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি একটা বিদ্বেষ পোষণ করিত ; এই বিদ্বেষভাবটা এত তীব্র যে হিংসা ও ঘৃণার সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

অন্ধ-বেলাঁজের উন্নতির প্রথম অবস্থায়, ক্যাপুলে নামক একটি বিধবা তাহার পথ-প্রদর্শকের কাজ করিত এবং প্যাঁসোঁ নামক একটি পূর্ণবয়স্ক যুবক, অন্ধের স্বহস্তকৃত খেলনা-সামগ্রীবোঝাই গাড়ীটি টানিয়া লইয়া যাইত। এই বিধবা ও যুবক—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে

পাঁচবৎসর কাল অন্ধের সেবাশুশ্রূষা করিয়া, তাহার পর অন্ধকে পরিত্যাগ করিয়া তাহারা নিজের ঘরকন্না আরম্ভ করিল। এখন কুকুরটীই অন্ধের একমাত্র সঙ্গী; কাজেই তাহার আয় খুব কমিয়া গেল। কিন্তু ইহার দরুণ অন্ধ তাহাদের প্রতি কোন বিদ্বেষ, কাজে প্রকাশ না করিয়া, নির্ব্বন্ধতাসহকারে মনে মনে পোষণ করিতে লাগিল। অন্ধ, প্যাসোঁর গৃহে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিত; কিন্তু তাহার মনের আগুন কিছুতেই নিবিল না।

১৮০৫ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী, সন্ধ্যার সময়, অন্ধ বেলাঁজে, স্যাঁতাঁ-তোয়ান্-সহরতলীর দিকে যাত্রা করিল। এইখানেই তাহার সেই পুরাতন ভৃত্যদিগের আবাস-গৃহ। সে দিন সে বেশ দশ টাকা রোজগার করিয়াছিল; কেননা সেদিন "লেণ্টের" পূর্ব্বমঙ্গলবার—একটা পরবের দিন। সে দিন সে যথেষ্ট ভিক্ষা পায় এবং গুত্তির সংখ্যা সম্বন্ধে পরামর্শ লইবার জন্য তাহার নিকট বিস্তর লোক আসে। মোল্‌দেনের রাণী অন্ধকে ভৎসনা করিবার জন্য মধ্যেমধ্যে যেরূপ আসিতেন, সেদিনও তাহার নিকট আসিয়াছিলেন। এবারকার গুত্তিতেও রাণীর ভাগ্যে কিছুই উঠিল না। আবার তিনি অন্ধের উপর ঝাল ঝাড়িলেন। অন্ধের দৈবশক্তিতে এবার তাঁহার বিশ্বাস টলিল। অন্ধের সংখ্যাগুলি কোন কাজের নহে—এইরূপ তিনি বলিতে সুরু করিলেন।

বেলাঁজে এইসব ভৎসনা-বাক্যে অভ্যস্ত ছিল, সুতরাং তাহাতে সে ভ্রূক্ষেপ করিল না। মুদ্রাগুলি জেবের মধ্যে পূরিয়া আবার সে পথ ধরিয়া চলিতে লাগিল এবং প্যাসোঁ-দম্পতীর গৃহে ঠিক অসিয়া পৌছিল। —"আমি বন্ধুদের সঙ্গে একত্র সুরাপান করে' একটু গরম হয়ে বলে' এখানে এলেম" এই কথা বলিয়া অন্ধ ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার বিশাল কোর্ত্তার পকেট হইতে নানা প্রকার জিনিস্ বাহির করিয়া উনানের নিকটস্থ তক্তার উপর রাখিয়া দিল। তন্মধ্যে এক বোতল

ব্রাণ্ডিও ছিল। মিঠা-চাপাটি বানাইবার জন্য গৃহিণী আগুন জ্বালিল। অন্ধ, আহারে যোগ দিতে অসম্মত হইল এবং ছোট একটী পাত্রে দুই তিন বার সুরা ঢালিয়া, পরস্পরের সহিত পাত্র ঠেকাঠেকি করিয়া,— গলাধঃকরণ করিল। তাহার পর বুঁচ্‌কিটা আবার বাঁধিয়া প্রস্থান করিল। বলিল বড় ব্যস্ত।

অন্ধ চলিয়া গেলে, প্যাঁসোঁ-পত্নী, উনানের নিকট চালাকাঠের যে একটা টুক্‌রা ছিল তাহা লইয়া আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ করিতে গিয়া দেখে সেই কাঠের টুক্‌রা হইতে কালো গুঁড়া ঝরিয়া পড়িতেছে। তাহার সন্দেহ হইল। তাহার স্বামী আরও কাছে আসিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে পাইল—সেই কাঠে একটা গর্ত্ত আছে; সেই গর্ত্তটা বারুদে ভরা এবং একটা মোটা গোঁজের দ্বারা গর্ত্তের মুখ বেমালুম করিয়া বন্ধ করা। ভয়ে আতঙ্কে দম্পতী চীৎকার করিয়া উঠিল। সেই চীৎকার শব্দে প্রতিবাসীরা আসিয়া পড়িল। সকলে মিলিয়া স্থির করিল, অন্ধই কাঠের টুক্‌রাটা আনিয়াছে;—ইহা তাহারই কাজ। তাহাকে দুচক্ষে কেহ দেখিতে পারিত না। সুতরাং কোন দ্বিধা না করিয়া, সহর-কোতোয়ালের নিকট অবিলম্বে তাহার নামে নালীস্ দায়ের করিয়া দিল। বেলাঁজে নিজের ঘরটিতে বেশ আরামে নিদ্রা যাইতেছিল;—ঘণ্টাখানেকের পরেই পুলিসের লোক তাহাকে গেরেপ্‌তার করিয়া একটা ঠিকা গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া, থানায় লইয়া চলিল এবং গুপ্তহত্যার অপরাধ তাহার প্রতি আরোপ করিল। এই অপরাধে প্রাণদণ্ডই ব্যবস্থা। ইতি মধ্যে, রাণীর হাতে মুক্তি-সংখ্যার যে রেস্ত ছিল, তাহার মধ্যে দুই চারিটা সফল হইল।

দুইমাস হইয়া গেল, "ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্ধ" এখনও জেল্‌খানায়। এখন তাহাকে দায়রায় সোপর্দ্দ করিবার উদ্যোগ চলিতেছে। "ভাগ্য-লক্ষ্মীর অন্ধ" এই ডাক্‌নামটা, সকলের মুখেই এখন পরিহাসের বিষয়

হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিচারক হাকিম, অনর্থক কতকগুলা খুঁটিনাটি, জেরা করিয়া বাহির করিতে লাগিলেন। ইহা তাঁহার আন্তরিক বিদ্বেষের নিদর্শন সন্দেহ নাই। যে কারণে অন্ধ, প্যাঁসোঁর উপর প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা পাইয়াছিল, বিচারক তাহা দেখাইয়া দিলেন। অন্ধ কাঠের কাজ করিত; উপবাস-পরবের পূর্ব্বমঙ্গলবারে প্যাঁসোঁর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া ব্যস্ততার ওজর করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসে;—এই সমস্ত, অপরাধের যথেষ্ট প্রমাণ বলিয়া বিচারে সাব্যস্ত হইল।

অন্ধ আপনাকে সাফাই করিল না,—স্বপক্ষ সমর্থনের নিমিত্ত কোন কথাই বলিল না। কেবল ইহাই সে বারম্বার বলিতে লাগিল—এরূপ কার্য্য তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাছাড়া, অন্ধ নিজের অদৃষ্ট সম্বন্ধে একপ্রকার বে-পরোয়া ছিল;—তাই সে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হয় নাই। "ফোর্স" নামক জেলখানার নিয়মাদি, আশ্রমের নিয়মাদিরই অনুরূপ। যে ব্যক্তি চক্ষে কিছুই দেখে না, তাহার পক্ষে আশ্রম ও কারাগার দুই সমান। কারাগারে গিয়াও সে স্তুতি-সংখ্যার কারবার ছাড়িল না; উহার দ্বারা বেশ দশ টাকা রোজগার করিতে লাগিল। সেখানে তাহার সুখস্বচ্ছন্দ তার কোন অভাব হইল না। প্যারিসে তাহার এই ঘটনা লইয়া বেশ একটু তোলপাড় হইতেছিল, কিন্তু পরিণামে উহা যে এতদূর গড়াইবে তাহা কেহ মনেও করে নাই। এমন কি, কেহ কেহ এরূপ ভাবিয়াছিল,—অন্ধ আসলে কোন অপরাধ করে নাই,—উৎসবের সময়, বন্ধুদের লইয়া একটা মর্ম্মান্তিক রঙ্গ তামাসা করিবে ইহাই তাহার মৎলব ছিল। ১৮০৫ সালে, ১০ই মে তারিখে জুরির সমক্ষে অন্ধের পুনর্ব্বিচার হইল। এই মোকদ্দমা দেখিবার জন্য অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি আসিয়া উপস্থিত হইল; অন্ধের মক্কেলরাও

বিশেষ-রক্ষিত আসনের প্রথম পংক্তিতে মোল্‌দেনের রাণীও আদালতে বিরাজ করিতেছেন, দেখা গেল।

প্যালে-রয়্যালের উদ্যানে ভাগ্যাচার্য্য মার্সেই-পেয়ারের সহিত কথাবার্ত্তা হইবার পর, মোল্‌দেনের রাণীর মাথায় নানাপ্রকার অসম্ভব কল্পনা চলাফেরা করিতেছিল; কি উপায়ে এই স্ফূর্ত্তি-খেলায় তিনি সফল হইতে পারেন, সেই বিষয়ে মনে মনে নানাপ্রকার মৎলব আঁটিতেছিলেন—এমন সময় শুনিতে পাইলেন, অন্ধ-বেলাঁজে গেরেপ্‌তার হইয়াছে। তখন তাঁহার চিত্ত আরো বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িল। অন্ধের প্রাণদণ্ড ত সচরাচর দেখা যায় না, এই দুর্লভ অবসরটি তাই হাতছাড়া করিবেন না স্থির করিলেন।

আসামী, কৌঁশুলীর সহিত যথাসময়ে আদালতে হাজির হইল। কৌঁশুলীর নাম লেবোঁ—সেই সময়কার একজন খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার। বহির্বস্তুর দর্শনে লোকের মন স্বভাবতই যেরূপ বিচলিত হয়, বেলাঁজের মুখে সেরূপ কোন ভাবান্তর পরিলক্ষিত হইল না। তাঁহার মনে কি হইতেছে তাহা তাহার মুখের ভাবে কিছুই জানিবার জো নাই;—যেন তাহার মুখ একটা দুষ্প্রবেশ্য মুখসে ঢাকা। অনেক বড়লোক-স্ফূর্ত্তিখেলুড়ের সহিত তাহার সংসর্গ হওয়ায় তাহার ধরনধারণ কতকটা বিশিষ্ট লোকের অনুরূপ।

তাহার অপরাধ সাব্যস্ত হইবার পক্ষে প্রচুর প্রমাণ না পাওয়ায় কিছুই স্থির-নিশ্চয় হইল না। বিনা-আলোকে এমন-একটা জটিল ধরণের কল-কৌশল প্রস্তুত করা কি সম্ভব? অন্ধ, বারুদই বা কোথা হইতে পাইল? কেহই তাহা বলিতে পারে না। বারুদ-পোরা কাষ্ঠ-পট্টিকার এতই কি জোর যে তাহার আঘাতে প্যাঁসোঁদের মৃত্যু ঘটিতে পারে?

দুর্ভাগ্যক্রমে, একজন বিশেষজ্ঞ কারিকর খুব বুক ফুলাইয়া সদর্পে

সাক্ষ্য দিল, যে, কাঠের টুক্‌রার মধ্যে এমন একটা জিনিস ছিল যাহা, সমস্ত অঞ্চলটা উড়াইয়া দিতে পারে। এই সাক্ষ্যের ভয়ানক ফল হইল। "স্যাঁ-নিসেস্"-রাস্তায় সেই "নারকী যন্ত্রের" কথাটা তাহাদের মনে পড়িয়া গেল। তাই, এইজাতীয় মারাত্মক যন্ত্রাদির সম্বন্ধে প্রশ্রয় দেওয়া কিছুতেই উচিত নহে, এইরূপ জুরির মনে হইল। সরকারী উকিল মহাশয়ও পূর্ব্বেকার ঘটনাটি বিচারককে স্মরণ করাইয়া দিলেন। এবং বলিলেন, এই বেলাঁজে দ্বিতীয় স্যাঁ-রেজাঁ। এমন কি, তিনি ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ "বারুদ-ষড়যন্ত্রের" সহিতও ইহার তুলনা দিলেন।

এই সব তুলনা অতীব হাস্যজনক হইলেও, জুরির মনে একটা ধ্রুববিশ্বাস জন্মিয়া গেল। কৌঁশুলি খুব জোরের সহিত বলিলেন— মনে কর সত্যই যদি তাঁহার মক্কেল একটা কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যে বারুদ পুরিয়া থাকে, তাহাতেই বা কি ?—তাহাকে ত অপরাধ-কার্য্য সম্পাদনের আরম্ভ বলা যাইতে পারে না। কিন্তু জুরিরা রায় দিলেন,—হাঁ, বলা যাইতে পারে।

যখন অন্ধকে দণ্ডাজ্ঞা শুনান হইল, তাহার মুখ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল; কিন্তু তবু সে খাড়া হইয়া রহিল; এবং তাহার ধবলনেত্র বিচারপতির দিকে ফিরাইয়া জিজ্ঞাসা করিল :

—"আমার কৌঁশুলি কোথায় ?"

কৌঁশুলির বাহুতে তাহার হস্ত স্পর্শ করাইয়া দেওয়া হইল। তখন অন্ধ খুব সজোরে বলিল :—

—"আপনি আমার ধন্যবাদ গ্রহণ করুন; আপনি আমাকে বাঁচাতে পার্‌লেন না, তাতে কিছু যায়-আসে না। কিন্তু আমি নির্দ্দোষী।"

এই সময়ে পুলিস্-সিপাহীরা আসিয়া তাহাকে লইয়া গেল; এবং সেই রাত্রেই বিসেত্রের জেলখানায় তাহাকে চালান দিল। এই জেলখানায়

বধ্যদিগকে হাজতে রাখা হয়। কিন্তু অন্ধ এখানে আসিয়াও কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইল না। বরং এখন তাহার কারবার আরো গুলজার হইয়া উঠিল। সে তাহার কারাকক্ষ হইতে স্ফূর্ত্তির সংখ্যাগুলা শত সহস্র লোককে বিতরণ করিতে লাগিল। নানা প্রকারের লোক আসিয়া তাহার দ্বারে জমা হইতে লাগিল;—পুলিস-সিপাহী, জেল্‌-দারোগা, এমন কি বিচারপতিদিগের মধ্যেও কেহ কেহ আসিয়া, এই হতভাগ্য ব্যক্তির নিকটে অব্যর্থ-সংখ্যাগুলা চাহিতে লাগিলেন।

রাণীর হাতে এখন আর কোন রেন্ত নাই। রাণী অন্ধকে অনেক দ্রব্য উপহার দিয়া, তাহার সহিত পত্র ব্যবহার সুরু করিয়া দিয়াছেন। গণিৎবেত্তা মার্সেই-পেয়ারেরও সহিত তাঁহার অনেকক্ষণ ধরিয়া পরামর্শাদি চলিতেছে। প্রত্যেক স্ফূর্ত্তিখেলার দিনে, রাণী তাঁহার রেন্ত-সংখ্যাগুলি বাঁধা রাখিয়া টাকা ধার করেন।—তাঁহার স্বল্প রাজবৃত্তি মাত্র ভরসা,—আর কোন সম্বল ছিল না। এইরূপে ক্রমে তিনি ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন; কিন্তু তাহাতে তাঁহার কিছু যায়-আসে না। নিজ অদৃষ্টের উপর এখনো তাঁর খুব বিশ্বাস।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব দিনের ন্যায়, ১৫ই ও ২৫শে মের স্ফূর্ত্তিখেলাতেও তিনি ভাল ফল পাইলেন না। ৫ই জুনের খেলায় তাঁহার ভাগ্যে খুবই খারাপ ফল হইল। কিন্তু সময় ফুরাইয়া আসিতেছে, অন্ধের প্রাণদণ্ডের আর বড় বিলম্ব নাই। এখন, "রাজকীয় স্ফূর্ত্তির তালা"—গ্রন্থখানায় বলিতেছে, প্রাণদণ্ডের পরে যে স্ফূর্ত্তিখেলা হইবে তাহাতেই তাঁহার সংখ্যাগুলা উঠিবে। বৈলাঞ্জে আপীল দায়ের করিয়াছিল—৭ই জুনে আপীল অগ্রাহ্য হইল। রাণী ১৫ই তারিখের স্ফূর্ত্তিখেলার দিনে, তাঁহার সংখ্যাগুলা তিনগুণ পণে আবার বন্ধক রাখিলেন।

১০ই জুনে, প্রাতঃকাল হইতে আরম্ভ করিয়া, তখনকার দস্তুর মত

লাগিল :—"ফিলিপ্-বের্লাঞ্জে নামক প্যারিসের কোন সুপরিচিত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে—আজ অমুক স্থানে তাহার প্রাণ-দণ্ড হইবে,—ইত্যাদি।"

আজ বেলা চারিটার সময় এই ভীষণ ব্যাপারটা সম্পন্ন হইবে।

বধ্যব্যক্তি ইহারই মধ্যে প্রধান জেল্খানায় আনীত হইয়াছে। আজ তাহাকে অন্তিম-দিনের দারুণ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। তখনকার কালে বধ্যব্যক্তিকে ১২ ঘণ্টাকাল এইরূপ মরণের প্রতীক্ষায় থাকিতে হইত। বধ্যভূমি লোকে লোকারণ্য। "ন্যায়-ধ্বজা" খাড়া করা হইল। এদিকে জেলখানায় অন্ধ বিলাপ-ক্রন্দন করিতেছে এবং পাদ্রি মঁতের অন্তিম প্রশ্নের উত্তর দিতেছে।

—"বাবা! আমি নির্দ্দোষী।"

অন্ধের মুখ বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে, একটা গভীর আতঙ্ক তাহার চিত্তকে অধিকার করিয়াছে।

আসন্ন মৃত্যুদণ্ডে, একজন অন্ধের মনের ভাব কিরূপ হয় তাহা একবার কল্পনা করিয়া দেখ। সে জানে, গিলোটিন্-নামক একটা যন্ত্র আছে; এবং ঐ যন্ত্রের উপর তাহাকে উঠিতে হইবে; তাহার হস্ত-পদের বন্ধনরজ্জু সে অনুভব করিবে;—গাড়ীর ঝাঁকানি অনুভব করিবে; জনতার গুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইবে; ভার-যন্ত্রের সংস্পর্শে শিহরিয়া উঠিবে; কিন্তু যে ছুরিকা তাহার মাংসের মধ্যে প্রবেশ করিবে সে ছুরিকা সে দেখিতে পাইবে না; যখন ঐ ছুরি সজোরে আসিয়া তাহার স্কন্ধে পতিত হইবে, তখন আর কিছুই হইবে না;—একটা রাত্রির পরিবর্ত্তে অন্ধের নিকট আর একটা রাত্রি আসিবে এই মাত্র।

বেচারা অন্ধ মরণভয়ে অভিভূত হইল; এই সময়ে উহার যন্ত্রণা দেখিয়া, কতকগুলি সহৃদয়লোকের হৃদয় বিগলিত হইল। সেই

বিপ্লবের সময়ে, নির্দোষীর রক্তে কলঙ্কিত কত লোমহর্ষণ কাণ্ড সঙ্ঘটিত হইত ;—এই সব ব্যাপারে লোকেরা অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু যাহারা দয়ার অযোগ্য সেই সব বদ্‌মায়েস কিংবা ষড়যন্ত্রী ছাড়া এপর্য্যন্ত আর কাহারও প্রাণদণ্ড হয় নাই। তাই, অন্ধের এইরূপ শোচনীয় দশা দেখিয়া প্যারিস্‌-নাগরিকদিগের সুপ্ত দয়া জাগিয়া উঠিল। তাই তাহার পক্ষসমর্থনকারী মোসিও-লেবোঁ, ও মোসিও-কোলাঁ্যা, আদালতের নিকট একটু সময় লইবার চেষ্টা করিবেন এইরূপ স্থির করিলেন। মার্জ্জনা করিবার ক্ষমতা একমাত্র সম্রাটের হাতে, কিন্তু সম্রাট্‌ এখানে নাই ; দুই মাস হইল, ইটালীর রাজাকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্য, সাম্রাজ্ঞীর সহিত তিনি মিলানে চলিয়া গিয়াছেন। তবে তাঁহার অবিদ্যমানে রাজ্যের প্রধান-বিচারপতি কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখিতে পারেন ;—সে ক্ষমতা তাঁহার আছে। একজন প্রাচীন অভিনেতা এই দুর্লভদর্শন মহোচ্চপদস্থ ব্যক্তির কখন কখন দর্শন পাইত ; সে এই বিষয়ের ভার গ্রহণ করিল। দুইজন কৌঁশুলীর স্বাক্ষরে একটা দরখাস্ত প্রধান বিচারপতির নিকট পাঠান হইল। মাননীয় প্রধান বিচারপতি এই দরখাস্ত সম্রাটের নিকট পেষ করিবেন বলিয়া স্বীকৃত হইলেন।

সময় হইয়াছে। ঘড়ীতে সেওয়া-তিনটা বাজিয়াছে। বধ্য-ব্যক্তিকে দস্তুরমত সাজসজ্জায় সজ্জিত করা হইয়াছে। বৃদ্ধ জল্লাদ, তাহার সহকারীগণকে ইঙ্গিত করিবামাত্র, অন্ধকে বধ্যভূমিতে লইয়া যাইবার উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময়ে প্রাণদণ্ড স্থগিত রাখিবার হুকুম জেলখানায় আসিয়া পৌঁছিল। এই সংবাদ শুনিবামাত্র অন্ধ আনন্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। তাহার সহৃদয় বন্ধুগণ তাড়াতাড়ি তাহার নিকট আসিল ; তাহাদের হস্তের উপর সে কেবলি অজস্র অশ্রুবারি বর্ষণ করিতে লাগিল। এই সময়ে রক্ষিরা আসিয়া তাহাকে

আবার জেলখানায় লইয়া গেল। বধ্যমঞ্চটা নামাইয়া লওয়া হইয়াছে দেখিয়া জনতার লোক ইতস্ততঃ সরিয়া পড়িল।

কিন্তু এই সংবাদে মোলদেনের রাণী, ক্রোধের আবেশে অধীর হইয়া পড়িলেন। তিনি তখনি গণিৎবেত্তা মার্সেই-পেয়ারের নিকট গিয়া তাঁহার উপস্থিত বিপদের কথা জানাইলেন এবং সেই অন্ধ তাঁহার মক্কেলদিগকে ঠকাইয়াছে এই বলিয়া তাহার নামে গালিগালাজ করিতে লাগিলেন। অন্ধের মাথা বাঁচিল, কিন্তু রাণী দেউলিয়া হইলেন।

১৫ই জুলাইয়ের স্থুর্ত্তিখেলায় তাঁহার স্থুবিধা না হওয়ায় জুয়া-পাগলা-রাণী তেলে-বেগুনে আরও জ্বলিয়া উঠিলেন। পরিশেষে তিনি একপ্রকার ক্ষয়-রোগে আক্রান্ত হইলেন; আহার পরিত্যাগ করিলেন; সর্ব্বদাই স্তব্ধ হইয়া থাকিতেন। এমন কি, স্থুর্ত্তিখেলায় আর কখন হাত দিবেন না, এরূপ কথাও তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইল। তাঁহার ঘনিষ্ঠবন্ধু ও পরামর্শদাতা সেই ভাগ্যাচার্য্য যথাসাধ্য তাঁহাকে সান্ত্বনা করিল; কিন্তু তাঁহার বিশ্বাসে কোন পরিবর্ত্তণ আনিতে পারিল না।

১৫ দিনের মধ্যে মিলান হইতে উত্তর আসিবার কথা। এতদিন যখন দণ্ডটা স্থগিত রহিয়াছে—তবে নিশ্চয়ই সম্রাটের নিকট হইতে মার্জ্জনার আদেশ আসিয়াছে; এইরূপ জনসাধারণের ধারণা হওয়ায় লোকে অন্ধের কথা লইয়া আর বড়-একটা আলোচনা করিত না অন্ধ বিসেত্রের কারাগারে পুনর্ব্বার প্রবেশ করিয়া আবার তাহার নিত্যনিয়মিত কাজকর্ম্ম আরম্ভ করিয়া দিল। এখন সে বেশ নিশ্চিন্ত।

তাহার কথা যে কেহ বড়-একটা ভাবিত না, তাহার প্রমাণ;—২৮শে জুনের রাত্রে, আবার যখন গিলোটিন-যন্ত্রটা বধ্য-ভূমিতে খাড়া করা হইল, তখন রাস্তায় লোকেরা বলাবলি করিতে লাগিল—না জানি আবার কাহার প্রাণদণ্ড হইবে। কিন্তু আসল কথাটা প্রকাশ হইতে বেশী বিলম্ব হইল না। কয়েক-মিনিট কম ৯টার সময়, আবার সেই শ্মশান-যাত্রার ভীষণ ঠাট্ বধ্য ভূমিতে আসিয়া

মিলিত হইল। দ্রুতচালে গাড়ীটা আসিয়া পৌছিল ; এখনি জনতার মধ্য হইতে এই গুঞ্জন শুনা যাইতে লাগিল :—"ওরে ! এ যে সেই অন্ধ !—সেই বেলাঁজে !"

বাস্তবিকই সেই অন্ধ। মিলানে মার্জ্জনার দরখাস্ত মঞ্জুর হয় নাই ; এবং দণ্ড স্থগিত রাখায়, প্রধান-বিচারপতি একটু তিরস্কৃতও হইয়াছেন। সুতরাং বিচারপতি যতশীঘ্র পারেন কাজটা শেষ করিবেন বলিয়া স্থির করিলেন।

আবার বধ্য-মঞ্চটা বধ্য-ভূমিতে তাড়াতাড়ি উঠান হইল। প্রত্যুষে রক্ষিগণ কারা-কক্ষ হইতে অন্ধকে টানিয়া বাহির করিয়া আবার তাহাকে প্রধান জেলখানায় লইয়া গেল ; আবার তাহাকে সেইসব অন্তিম সাজসজ্জার দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল।

কিন্তু এইবার তাহার সকল যন্ত্রণার শেষ হইবে। এবার সে পদব্রজে মঞ্চের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। অন্ধেরা যেরূপ ইতস্ততভাবে গুরুপদক্ষেপে চলিয়া থাকে, সেইরূপ চালে যখন সে মঞ্চের ধাপ দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল, তখন জনতার লোকেরা শিহরিয়া উঠিল। যখন গিলোটিনের ভার-যন্ত্রটা দ্রুত নামিয়া আসিল তখন মুহূর্ত্তমাত্র অন্ধের সেই পাণ্ডুবর্ণ মুখ ও ধবল নেত্র ভার-যন্ত্রের উপরিভাগে দেখা গিয়াছিল। এখন কেবল একটা চীৎকার এবং একটা চাপা-ধরণের আওয়াজ শোনা গেল। সব শেষ হইয়া গিয়াছে।

এইরূপে "ভাগ্যলক্ষ্মীর অন্ধ" ভবযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইল। এই অপূর্ব্ব ইতিহাসের বিশেষত্ব এই—এই শোচনীয় ঘটনায় কাহারও অনুকম্পা হয় নাই। সেইসময়কার সংবাদপত্রাদিতে দেখা যায়, সকলেই একবাক্যে এই প্রাণদণ্ডের অনুমোদন করিয়াছিল।

বোধ হয়, যে সকল খেলুড়ে তাহার সংখ্যাগুলা ক্রয় করিয়া ব্যর্থ-মনোরথ হয়, অন্ধের প্রতি তাহাদেরই বিশেষ আক্রোশ ছিল।

যাহা হউক এইটুক নিশ্চয় করিয়া বলা যায়, মোলদেলের জুয়া

হইয়া পড়েন। তিনি একমাসকাল শয্যাশায়ী ছিলেন, এবং সেই অবস্থাতেই অঙ্কের বিরুদ্ধে ও ঘুর্ত্তিখেলার বিরুদ্ধে আপনার মনের ঝাল ঝাড়িতেন। তিনি ঘুর্ত্তিখেলার সরকারী ফর্দ্দ ছাড়া আর কিছুই পাঠ করিতেন না; সুতরাং বেলাঁজের মৃত্যুর কথা তিনি জানিতে পারেন নাই।

৫ই জুলাই, রাত্রি একটার সময়, কে-একজন আসিয়া সজোরে তাঁহার দরজায় ঘা মারিতে লাগিল। এই শব্দে আজ এই-প্রথম তিনি শয্যা হইতে উঠিলেন। গণিৎবেত্তা মার্সেই-পেয়ার চীৎকার করিয়া উঠিল;—রাণী চমকিয়া উঠিলেন।

—"রাণীর জয়! আপনার আর ধনের অভাব নাই। আমি ত আপনাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছিলাম। প্রাণদণ্ডের পরেই যে ঘুর্ত্তিখেল হয় তাহাতে আপনার সংখ্যাগুলা উঠিয়াছে। রাণী আনন্দে দিশাহারা হইলেন। আচার্য্য, একটা ছাপান-কাগজ তাঁহাকে দেখাইল; তাহাতে এই সংখ্যাগুলা লেখা আছে:—

৫৩—১৩—৮১—৮৭—৮৮।

—"আমি কি হতভাগ্য!—আমি কি হতভাগ্য! আমার বাঁধা-ধরওয়া সংখ্যাগুলি আমি যথাসময়ে উদ্ধার করিতে ভুলিয়া গিয়াছি"—রাণী বিহ্বল হইয়া এই কথাগুলি বলিলেন।

আজ তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইতেন। রাণী হস্ত প্রসারিত করিয়া এই সংখ্যাগুলি কেবল আবৃত্তি করিতে লাগিলেন:—১৩—৮৭—৪৪,—তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আড়ষ্ট হইয়া আসিল—মুখ নীলবর্ণ হইয়া গেল। তাঁহাকে ধরিবার জন্য ভাগ্যাচার্য্য অগ্রসর হইল,—রাণী ভূমিতলে উল্টাইয়া পড়িলেন। রাণীর প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইল। এই অব্যর্থ-সংখ্যাগুলিই তাঁহার মৃত্যুর কারণ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রতি-বিলাপ।

ভাঙ্গিয়া মুরছা-ঘোর বিবশা সে সতী,
জাগি তবে অনুভবে কামবধূ রতি
আহা! নব বৈধব্যের অসহ বেদনা—
দারুণ বিধির হাতে—এ কি বিড়ম্বনা! ১

লভিয়া ক্ষণেক পরে চেতনা তখন
চারি দিকে চাহি দেখে মেলিয়া নয়ন,
জানিবারে হারানিধি আছে কোন্ ঠাঁই—
অতৃপ্ত ফিরায় আঁখি—কোন চিহ্ন নাই! ২

"কোথা গেলে প্রাণনাথ, আছ কি বাঁচিয়া!"
বলিতে বলিতে বালা উঠে শিহরিয়া,
সমুখে পুরুষাকৃতি হেরি অকস্মাৎ—
হর-কোপানলে দহি রহে ভস্মসাৎ! ৩

রতি বিলাপো নাম চতুর্থঃ সর্গঃ।

অথ মোহপরায়ণা সতী
বিবশা কামবধূর্বিবোধিতা।
বিধিনা প্রতিপাদয়িষ্যতা
নববৈধব্যমসহ্যবেদনং॥ ১

অবধানপরে চকার সা
প্রলয়ান্তোন্মিষিতে বিলোচনে
ন বিবেদ তয়োরতৃপ্তয়োঃ
প্রিয়মত্যন্তবিলুপ্তদর্শনং। ২

অয়ি জীবিতনাথ জীবসী—
ত্যভিধায়োত্থিতয়া তয়া পুরঃ
দদৃশে পুরুষাকৃতিঃ ক্ষিতৌ

হেরিয়া বিভলা বালা ভূমিতলে পড়ি
ধূলায় ধূসর স্তনে যায় গড়াগড়ি।
আলুথালু কেশপাশ কাঁদে উন্মাদিনী
আপন দুখের দুখী করিয়া মেদিনী। ৪

"ভুবন-মোহিনী কান্তি, সর্ব্বাঙ্গ-সুষমা,
আছিল যা একমাত্র বিলাসী-উপমা,
তার এই দশা হায়!—তবু যায় দিন—
কে বলে অবলা—বজ্রসম সে কঠিণ! ৫

"অকূল পাথারে ফেলি পলাইলে কি রে,
ভাঙ্গিয়ে প্রণয়-বাঁধ দলি অধীনিরে!
সেতুবন্ধ ভাঙ্গি যথা, মহা বেগে আসি,
নলিনী উপাড়ি ল'য়ে যায় জলরাশি। ৬

অথ সা পুনরেব বিহ্বলা
বসুধালিঙ্গণধূসরস্তনী
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা
সমদুঃখামিব কুর্ব্বতী স্থলীং। ৪

উপমানমভূদ্বিলাসিনাং
করণং যৎ তব কান্তিমত্তয়া
তদিদং গতমীদৃশীং দশাং
ন বিদীর্য্যে কঠিণাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ। ৫

ক্ব নু মাং ত্বদধীনজীবিতাং
বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনঃ

"কর নি আমার কোন অপ্রিয় মদন,
প্রতিকূল আমিও না করি আচরণ,
তবে কেন অকারণ, নির্ম্মম পরাণ,
শোকাতুরা রতি হতে ফিরালে বয়ান ? ৭

'হৃদয়ে জাগিছ প্রিয়ে' মোরে তুষিবারে
বলিতে যে কথাগুলি তুমি বারে বারে—
সে শুধু ভুলানো কথা বুঝিনু এখন—
নহিলে রতি কি বাঁচে মরিলে মদন ? ৮

"হ'লে পরলোকবাসী, আমার কি ক্ষতি ?
মিলিব ত পতি সনে হয়ে আমি সতী।
লোকেরে হানিল বিধি খর শরধারা—
হারায়ে তোমায় তারা সর্ব্বসুখ-হারা ! ১০

কৃতবানসি বিপ্রিয়ং ন মে
প্রতিকূলং ন চ তে ময়াকৃতং
কিমকারণমেব দর্শনং
বিলপন্ত্যৈ রতয়ে ন দীয়তে। ৭

হৃদয়ে বসসীতি মৎপ্রিয়ং
যদবোচ স্তদবৈমি কৈতবং
উপচারপদং ন চেদিদং,
ত্বমনঙ্গঃ কথমক্ষতা রতিঃ। ৯

পরলোক নব প্রবাসিনঃ
প্রতিপৎস্যে পদবীমহং তব
বিধিনা জন এষ বঞ্চিতঃ
ত্বদধীনং খলু দেহিনাং সুখং। ১০

"অনলে পতঙ্গ সম দেহ ঢালি, কাম,
তোমার কোলেতে পুন লভিব বিশ্রাম।
স্বর্গের অপ্সরাগণ পাতি মায়াজাল
তোমাধনে হরে পাছে—না হরিব কাল। ২০

"যদিও জ্বলন্ত চিতা করি' আলিঙ্গন
হই তব অনুগামী, হৃদয়-রমণ,
পতি বিনা জিয়ে রতি ক্ষণমাত্র তবু—
এ কলঙ্ক ত্রিজগতে ঘুচিবে না কভু! ২১

"কোন্ লোকে গেলে চলে না ব'লে আমায়,
কিছুই না জানি আমি লুকালে কোথায়?
প্রাণ-সহ দেহে হ'লে অদৃশ্য মদন,
কেমনে করি গো তব অন্তিম মণ্ডন? ২২

অহমেত্য পতঙ্গ বর্ত্মনা
　পুনরঙ্কাশ্রয়িণী ভবামি তে
চতুরৈঃ সুরকামিনীজনৈঃ
　প্রিয় যাবন্ন বিলোভ্যসে দিবি। ২০

মদনেন বিনাকৃতা রতিঃ
　ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে
বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতং
　রমণ ত্বামনুযামি যদ্যপি। ২১

ক্রিয়তাং কথমন্ত্যমণ্ডনং
　পরলোকান্তরিতস্য তে ময়া,
সমমেব গতোঽস্যতর্কিতাং

"কোলে রাখি ধনু খানি, ঋজু করি শর,
তুমি যবে মধু সাথে আলাপে তৎপর,
হাসি হাসি কথাগুলি বসন্তের সনে—
আড় চোখে চাহনি ও সদা পড়ে মনে। ২৩

"মধু যে পরাণ বঁধু তোমার দোসর,
ফুলে ফুলে সাজাইত তব ফুলশর,
সে বা কোথা গেল চলে—হর-কোপানলে
সুহৃদের দশা বুঝি তারো ভাগ্যে ফলে।" ২৪

শুনিয়া সখীর হেন কাতর ক্রন্দন
শরাঘাতে বেঁধে যেন বসন্তের মন;
দেখা দিলা ঋতুরাজ আসিয়া সমুখে,
ঢালিতে সান্ত্বনা বারি বিধবার দুখে। ২৫

ঋজুতাং নয়তঃ স্মরামি তে
শরমুৎসঙ্গনিষণ্ণধন্বনঃ
মধুনা সহ সস্মিতাং কথাং
নয়নোপান্তবিলোকিতঞ্চ যৎ। ২৩

ক্ব নু তে হৃদয়ঙ্গমঃ সখা
কুসুমাযোজিতকার্ম্মুকো মধুঃ
ন খলূগ্ররুষা পিনাকিনা
গমিতঃ সোঽপি সুহৃদ্গতাং গতিং। ২৪

অথ তৈঃ পরিদেবিতাক্ষরৈঃ
হৃদয়ে দিগ্ধশরৈরিবাহতঃ
রতিমভ্যুপপত্তুমাতুরাং

দেখে তারে দুখ-উৎস শতগুণ ছুটে,
দুই হাতে বক্ষাঘাতে স্তন তার টুটে;
স্বজন আসিলে কাছে শোক-অশ্রুনীর
উথলিয়া উঠে যেন অতিক্রমি তীর। ২৬

শোকে তাপে জর জর বলে তার কাছে,
'দেখ হে সখার দেখ শেষ যাহা আছে।
দেহ খানি কিছু নাই অনল দহনে—
কপোত-কর্বুর ভস্ম উড়ায় পবনে।' ২৭

"এস ওহে প্রাণনাথ, দেও দরশন,
আকুল তোমার লাগি বসন্ত যখন।
দয়িতার পরে যদি হয় বা চঞ্চল
পুরুষের মন—সে ত সুহৃদে অটল।" ২৮

তমবেক্ষ্য রুরোদ সা ভৃশং
　স্তনসম্বাধমুরো জঘান চ
স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতঃ
　বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে। ২৬

ইতি চৈনমুবাচ দুঃখিতা
　সুহৃদঃ পশ্য বসন্ত কিং স্থিতং
তদিদং কণশো বিকীর্য্যতে
　পবনৈর্ভস্ম কপোতকর্বুরং। ২৭

অয়ি সম্প্রতি দেহি দর্শনং
　স্মর পর্য্যুৎসুক এষ মাধবঃ
দয়িতাস্বনবস্থিতং নৃণাং

"ভঙ্গুর মৃণালতন্তু ধনুগুণ যার,
সুকোমল্ ফুলশর শস্ত্র যে তোমার,
প্রচারে আদেশ তব সুরাসুর মাঝে
যেই পার্শ্বচর, সে যে সম্মুখে বিরাজে।" ২৯

'নিবিয়াছে দীপসম সখা সে তোমার,
গেছে চিরদিন তরে ফিরিবে না আর ;
বর্ত্তিকার মত হেথা পড়ে আছি শেষ,
অসহ যন্ত্রণা দাহে ধূম-অবশেষ।' ৩০

'মদনে বধিয়া বিধি ছাড়িয়ে আমায়
অৰ্দ্ধনাশে সৰ্ব্বনাশ করিল সে হায় !
দৃঢ়কায় তরুবরে উপাড়িয়া করী
ধরাশায়ী করে তার আশ্রিত বল্লরী।' ৩১

অমুনা ননু পার্শ্ববর্ত্তিনা
জগদাজ্ঞাং সসুরাসুরং তব
বিসতন্তুগুণস্য কারিতং
ধনুষঃ পেলবপুষ্পপত্রিণঃ। ২৯

গত এব ন তে নিবর্ত্ততে
স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ
অহমস্য * দশেব পশ্য মাং
অবিসহ্য ব্যসনেন ধূমিতাং। ৩০

বিধিনা কৃতমৰ্দ্ধবৈশসং
ননু মাং কামবধে বিমুঞ্চতা
† অনপায়িনি সংশ্রয়দ্রুমে
গজভগ্নে পতনায় বল্লরী। ৩১

* দশা—বর্ত্তিং † অনপায়ী—[illegible]

'আসি তবে ত্বরা করি সাধ' বন্ধুকর্ম্ম,
লভ পুণ্য পালিয়ে অন্তিম তব ধর্ম্ম।
অগ্নিকুণ্ডে দেহ ঢালি জ্বালি চিতানল,
শীঘ্র মোরে পতির নিকটে লয়ে চল।' ৩২

'কৌমুদী শশির সাথী শশিতে মিশায়,
গেলে মেঘ সৌদামিনী সঙ্গে চ'লে যায়।
পতি অনুগামী সতী বিধির বিধান
অচেতন জগতে ও দেখ সপ্রমাণ।' ৩৩

'শুন তবে মনে যাহা করিয়াছি স্থির—
কাম-অঙ্গ-ভস্মলেপে রঞ্জিত শরীর,
অচিরে পশিব সখা, রচি চিতানল,
নবীন পল্লব শয্যা হেন সুকোমল!' ৩৪

তদিদং ক্রিয়তামনন্তরং
ভবতা বন্ধুজন প্রয়োজনং
বিধুরাং জ্বলনাতিসর্জনাৎ
ননু মাং প্রাপয় পত্যুরন্তিকং। ৩২

শশিনা সহ যাতি কৌমুদী
সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে
প্রমদাঃ পতিবর্ত্মগা ইতি
প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি। ৩৩

অমুনৈব কষায়িতস্তনী
সুভগেন প্রিয়গাত্রভস্মনা
নবপল্লবসংস্তরে যথা

'আমাদের শয্যা আগে, ওহে ঋতুরাজ,
আদরে সাজাতে তুমি আনি ফুলসাজ :
চিতাটি সাজায়ে দেও—রাখ এ মিনতি,
কৃতাঞ্জলি করপুটে যাচে তোমা রতি।' ৩৫

'সজোরে দক্ষিণ বায় করিয়া ব্যজন,
জাগায়ে তুলিবে তবে দীপ্ত হুতাশন।
জান ত তুমি হে সখা, রতির বিরহে
মদনে উৎসাহ বল ক্ষণেক না রহে।' ৩৬

'বন্ধুকৃত্য সমাপিয়ে দিও তার পরে
একই সলিলাঞ্জলি দুজনার তরে।
আমি আর সখা তব দোঁহে এক প্রাণ,
একত্রে দুটিতে মিলি করিব হে পান।' ৩৭

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কুসুমাস্তরণে সহায়তাং
বহুশঃ সৌম্য গতস্ত্বমাবয়োঃ
কুরু সম্প্রতি তাবদাশু মে
প্রণিপাতাঞ্জলিযাচিতশ্চিতাং। ৩৫

তদনু জ্বলনং মদর্পিতং
ত্বরয়ের্দক্ষিণবাত বীজনৈঃ
বিদিতং খলু তে যথা স্মরঃ
ক্ষণমপ্যুৎসহতে ন মাং বিনা। ৩৬

ইতি চাপি বিধায় দীয়তাং
সলিলস্যাঞ্জলিরেক এব নৌ,
অবিভজ্য পরত্র তং ময়া

নওলাখী।

শ্বেতদ্বীপের সুপ্রসিদ্ধ আচার্য্য এচ্, এচ্, উইলসন সাহেব ভারতবাসীর আন্তরিক শ্রদ্ধা ও চিরকৃতজ্ঞতার সুযোগ্য পাত্র। এই অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন সুপণ্ডিত মহাশয় হিন্দুজাতির প্রাচীন ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং সমাজ সম্বন্ধে যে সকল মহা-গুরুতর ও অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়ে উপাদেয় প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন, যে সকল সুন্দর গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন, যে সকল ঐতিহাসিক সারতত্ত্ব সংগ্রহ করিয়া আমাদের পরমোপকার সাধন করিয়াছেন এবং যে সকল গ্রন্থ বিরচন করিয়া হিন্দু সমাজের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, তাহা সুশিক্ষিত ভারতবাসীমাত্রেই অবগত আছেন। প্রত্নতত্ত্বালোচক, ঐতিহাসিক, আভিধানিক, সাহিত্যজীবি এবং ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধায়ীদিগের পক্ষে উইলসন সাহেবের গ্রন্থসমূহ ও প্রবন্ধাবলী বিশেষ সহায় স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষীয় হিন্দু-জাতির মধ্যে প্রচলিত শতাধিক সংখ্যক উপাসনা প্রণালী এবং অগণ্য উপাসক সম্প্রদায় সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় তিনি যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও প্রসিদ্ধ গ্রন্থ বিরচন করিয়া অমর হইয়া গিয়াছেন, সেই বিপুলাকার গ্রন্থ প্রচারের পূর্ব্বে এ সম্বন্ধে আর কেহ কখন কোন পুস্তক প্রণয়ন বা প্রচার করেন নাই, এই প্রখ্যাত গ্রন্থের নাম "Religious Sects of the Hindoos," সুবিখ্যাত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়া "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" নাম দিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই যে, এই উভয় গ্রন্থে নওলাখী নামক হিন্দু উপাসক সম্প্রদায়ের নাম বা গন্ধ নাই; উইলসন বা দত্ত মহাশয় ইহাদের নামোল্লেখ না করায় আমি আশ্চর্য্য হই নাই, কারণ এই

সম্প্রদায় এমন গুপ্ত এবং ইহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও অনেকে সন্দিহান হইতে পারেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে নওলাখীদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়া পাঠকদিগের কৌতূহলবৃত্তি কথঞ্চিৎ পরিমাণে তৃপ্ত করিতে আকাঙ্খা করি।

"নওলাখী" নামের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে কাটিয়াবাড় প্রদেশের একজন নওলাখীকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম; সে ব্যক্তি কহিয়াছিল "আমাদের সংখ্যা নবলক্ষ (নয়লাখ্) এজন্য আমরা নওলাখী"। আর একজনকে জিজ্ঞাসা করায় সে বলিয়াছিল "ভগবান যে দিন মর্ত্তধামে অবতার হইয়া আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন সেই দিন একবারে নবলক্ষ নরনারী আমাদের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, এই জন্য আমরা নওলাখী বলিয়া আখ্যাত।" বলা বাহুল্য এই উভয় মতই ভ্রান্ত। ভারতবর্ষের সেন্সস্ রিপোর্টে নওলাখী-দিগের নাম বা সংখ্যা নাই, সুতরাং নয়লক্ষ লোকের সংখ্যা গণনা করার কথা ভুল। একদিনে নবলক্ষ মানুষের দীক্ষাগ্রহণের কথাও ইহাদের পুস্তকে লিখিত নাই, ইহা বাইবেলের "আকট্স্" পুস্ত-কোল্লিখিত পেণ্টেকষ্ট্ পর্ব্বের অনুকরণে একটা উপকথা মাত্র, সুতরাং ইহাও ভ্রমাত্মক। প্রকৃত কথা এই, নও অর্থে নয় (৯) এবং লাখী শব্দ "লক্ষ্য" শব্দের অনুপযুক্ত অপভ্রংশ। লক্ষ্য শব্দ বিশেষ্য, অপভ্রংশে বিশেষণে লাখ্ হইতে লাখী হইয়াছে, অর্থাৎ যাহাদিগকে নয়টি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া চলিতে হয় ও ধর্ম্ম পালন করিতে হয়, তাহারা নওলাখী। ঐ নয়টি লক্ষ্য বা বিষয়ের নাম এই :—শিক্ষা, দীক্ষা, উপেক্ষা, পরীক্ষা, রক্ষা, ঈক্ষা, তিতিক্ষা, মুমুক্ষা। এই সকল শব্দের ভিতরে যে গূঢ় অর্থ আছে যথাস্থানে অতঃপর লিখিয়া দিব।

হিন্দুধর্ম্মাবলম্বীগণের মধ্যে যাঁহারা তান্ত্রিক, তাঁহাদিগের মধ্যে

অথবা যোগীশক্তি কিম্বা অঘোরী সম্প্রদায় ভুক্ত, তাঁহাদের উপাসনা-প্রণালী ও গতিবিধির প্রথা যেমন গুপ্ত থাকে, নওলাখী সম্প্রদায়ের প্রত্যেক বিষয়ই সেইরূপ সাধারণ সমীপে অত্যন্ত গোপনীয়। "ফ্রি-মেশনের" লোকেরা যেমন তাহাদের রীতি, নীতি, শিক্ষা, দীক্ষা ও মূলমন্ত্র সহজে কাহারও নিকট প্রকাশ করে না, নওলাখীগণও সেইরূপ তাহাদের কোন বিষয় প্রকাশ বা প্রচার করিতে সম্মত হয় না। এই জন্য এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচারক, উপদেশক, বক্তা, কথক প্রভৃতির প্রয়োজন হয় না। গুরুগণ ইহাঁদের উপদেশক ও "ভাইয়া"বৃন্দ ইহাঁদের মন্ত্রণাদাতা। বয়োজ্যেষ্ঠ অথচ জ্ঞানী, স্বমতনিষ্ঠ, গুরু কর্ত্তৃক নিযুক্ত এবং বিবাহিত ও গুণবান পুরুষকে "ভাইয়া" বলে। নওলাখীরা অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত, এক এক দল হইতে দুই বা তিন জন ভাইয়া নির্ব্বাচিত হয়, গুরু তাহাদের নির্ব্বাচন অনুমোদন করিলে উহারা গুরু কর্ত্তৃক নিযুক্ত (consecrated) হয়েন। খৃষ্টীয় সমাজের elders এবং হিন্দুর পল্লীসমাজের "মণ্ডল" গণ প্রায় ভাইয়ার সমতুল্য। গুরু যখন কোন ব্যক্তিকে ভাইয়া নিযুক্ত করেন তখন নিয়োগ প্রথা এইরূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে—গুরু-সম্মুখে তিনজন নওলাখী এবং নির্ব্বাচিত ব্যক্তি দণ্ডায়মান হইলে পর, এইরূপ কথোপকথন হয়।

গুরু—তোমার বয়স ৩৫ বৎসরাপেক্ষা অধিক ?

নির্ব্বাচিতব্যক্তি—হাঁ।

গুরু (তিনজন নওলাখী সাক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া)—তোমরা কি জান, ইহার বয়স ৩৫ বৎসরাপেক্ষা অধিক ?

সাক্ষীগণ—হাঁ।

গুরু—ইহার কোন অপবাদ আছে ?

সাক্ষীগণ—না।

সাক্ষীগণ—হঁা।

গুরু (নির্ব্বাচিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করিয়া)—আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিলাম।

নির্ব্বাচিতব্যক্তি—শিরোধার্য্য।

সাক্ষীগণ—শ্রীআদেশ, শ্রীআদেশ, শ্রীআদেশ।

গুরু—ভাইয়ার কাজ তুমি করিতে সম্মত আছ?

নি—আছি।

গুরু—ভাইয়ার কাজ করিতে পারিবে?

নি—পারিব।

গু—ভাইয়াদের সম্মান রক্ষা করিতে পারিবে?

নি—আপনার আশীর্ব্বাদ থাকিলে, পারিব।

সাক্ষীগণ—শ্রীআদেশ, শ্রীআদেশ, শ্রীআদেশ।

গুরু—হে ভাইয়া! আমি এই সকল লোকের সম্মুখে এবং চন্দ্র, নক্ষত্র, গ্রহমণ্ডল, অগ্নি ও মহাগুরুকে সাক্ষী করিয়া অদ্যকার এই মুহূর্ত্তে তোমাকে ভাইয়া পদে অভিষিক্ত করিলাম।

নি—মহাগুরুর জয় হউক।

গুরু—মহাগুরু সহায় হউন; সমস্ত নওলাখী সহায় হউন; সমস্ত নরনারী তোমার ভাই ভগ্নী হউন; তুমি জল, স্থল ও আকাশকে ভেদ কর; তুমি সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্প প্রভৃতির উপর রাজত্ব কর; তুমি তীর ও ধনুর প্রভু হও।

সাক্ষীগণ—শ্রীআদেশ, শ্রীআদেশ, শ্রীআদেশ।

গুরু—সকল প্রকার ধাতু তোমার দাস হউক; তুমি অজেয় ও অমর হও।

নি—প্রণত হই।

গুরু—তোমরা গোহত্যা নিবারণের জন্য প্রাণ দাও। ভাইয়ার ইহা প্রধান ধর্ম্ম।

সাক্ষীগণ—শ্রীআদেশ, শ্রীআদেশ, শ্রীআদেশ।

এই উৎসব রাত্রিকাল ভিন্ন দিবসে সম্পন্ন হয় না। এই উৎসবের পরে প্রীতিভোজন ও স্তোত্রাবৃত্তি এবং "ভজন" (সঙ্কীর্ত্তন) হইয়া থাকে।

থিয়সফিষ্ট বা ফ্রি-মেশন সম্প্রদায়ের লোকদিগের মধ্যে, বিশেষতঃ কয়েক শ্রেণীর তান্ত্রিক সাধকের মধ্যে, যে প্রকার কতকগুলি গোপনীয় চিহ্ন বা ইঙ্গিত আছে, নওলাখীদিগের মধ্যেও সেইরূপ কতিপয় গুপ্ত (signs) চিহ্ন ও ইঙ্গিত থাকে। কেহ যদি মিথ্যাকথা বলে "আমি নওলাখী" তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সে ধরা পড়ে, কারণ "তুমি কি নওলাখী" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার সময় প্রশ্নকর্ত্তা যেমন কতকগুলি ইঙ্গিত দেখাইতে বাধ্য, উত্তরদাতাও তদ্রূপ কতকগুলি চিহ্ন দেখাইতে বাধ্য ; প্রশ্নকর্ত্তা বা উত্তরদাতার মধ্যে যে ব্যক্তি প্রকৃত-চিহ্ন দেখাইতে না পারে সে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী বলিয়া প্রমানিত হয়। নওলাখী ভিন্ন এই ইঙ্গিত বা চিহ্ন কেহ জানিতে পারে না। কাহারও নিকটে প্রকাশ করিবার বিধি নাই। ইহাদের চিহ্ন, ইঙ্গিত, উপাসনা-প্রণালী ও অন্যান্য গোপনীয় বিষয় যদি নওলাখীদের মধ্যে কেহ অ-নওলাখীকে প্রকাশ করিয়া দেয়, তাহা হইলে অন্যান্য নওলাখীরা মিলিয়া তাহার প্রাণহত্যা করিয়া প্রতিহিংসা লইতে বিরত হয় না। প্রকাশকারীর সর্ব্ববিষয়ে অনিষ্ট করা ইহাদের ধর্ম্মপুস্তকের অঙ্গীভূত নিয়ম।

নওলাখীদের মধ্যে ভিক্ষুক নাই। কেহ দরিদ্র বা নিঃস্ব হইলে "ভাইয়া" তাহাকে যে কোন প্রকারে হউক অর্থসাহায্য করিবে, ভিক্ষা করিতে দিবে না। যদি ভিক্ষা করা ভিন্ন জীবিকানির্ব্বাহের

অন্য উপায় না থাকে তাহা হইলে নওলাথীদের ঘরে ভিন্ন অন্যত্র ভিক্ষা করিতে পায় না, কিন্তু এরূপ ভিক্ষুকের সংখ্যাও অতি অল্প, এবং এই অল্পসংখ্যক ভিক্ষুক কেবল অল্পকালের জন্য ভিক্ষা করে। ভাইয়ারা অপর কিছু বন্দোবস্ত করিয়া দিলে ইহারা ভিক্ষা-বৃত্তি ছাড়িয়া দেয়। নওলাথীগণ কখন নীচ কর্ম্ম করে না। চামার, মুচী, কশাই, ধোবা, মজুর, ধীবর প্রভৃতির বৃত্তি নওলাথীদের মধ্যে নাই। এইজন্য এই সকল লোক নওলাথী-সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পায় না। নওলাথীদের মধ্যে বেশ্যা নাই, স্ত্রীলোকের মধ্যে কেহ বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিলে তাহাকে গোপনে ও কৌশলে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়া ফেলে। ভাইয়াগণের মধ্যে যাহারা গৈরিক বসন পরিধান করে তাহারা রজককে স্পর্শ করে না এবং রজকের গৃহে বস্ত্রাদি ধৌত করিতে পাঠায় না। ভৃত্য বা শিষ্যদ্বারা বস্ত্রাদি ধৌত হইয়া থাকে। ইহাদের গুরুগণ অবিবাহিত থাকেন, অবিবাহিত না হইলে গুরু হয় না, গুরুরা নাপিত ও স্ত্রীলোক স্পর্শ করিতে পারে না। ভাইয়াগণ গুরুপদে বরিত হয় না। একজন ভাইয়া আর একজন ভাইয়াকে অথবা একজন নওলাথী আর একজন নওলাথীকে অভ্যর্থনা ও বিদায়ের সময় "শ্রীআদেশ" শব্দ উচ্চারণ করিয়া থাকে। যাহারা কন্‌কটু, নাথ বা গোরক্ষনাথী সন্ন্যাসী তাহারাও পরস্পরে "আদেশ" শব্দ উচ্চারণ করে, কিন্তু "শ্রীআদেশ" বলে না। গোরক্ষ-নাথী সম্প্রদায় হইতে নওলাথীদিগকে এই কারণে সহজে প্রভেদ করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

রোমান-কাথলিকদিগের মধ্যে "কন্‌ফেশন্" (Confession) নামে এক অদ্ভুত প্রথা আছে। এই প্রথানুসারে এক মাসের মধ্যে, ছয় মাসের মধ্যে অথবা একবর্ষকাল মধ্যে প্রত্যেক রোমান-কাথলিক

স্বীকার করে, অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে সে কত পাপ করিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। নওলাখীদিগের মধ্যে এবম্প্রকার প্রথা বিগুমান আছে। পাপ স্বীকার জন্য গুরুর নিকট নওলাখী উপস্থিত হইলে কিরূপ কথোপকথন হইয়া থাকে নিম্নে তাহার একটু সংক্ষিপ্ত নমুনা দিলাম।

গুরু—তুমি কত দিন আইস নাই?

নওলাখী—দুই মাস আসি নাই।

গুরু—এই দুই মাসে কি কি পাপ করিয়াছ?

ন—হরগোবিন্দ ঠাকুরের মোকর্দ্দমায় মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছিলাম।

গুরু—তাহার পর?

ন—জোয়ালাপ্রসাদের একটা পোষা পায়রা চুরি করিয়াছিলাম।

গুরু—তাহার পর?

ন—আমার মাতাকে গালি দিয়াছিলাম।

গুরু—তাহার পর?

ন—আর কোন বৃহৎ পাপ করি নাই।

গুরু—কি কি ক্ষুদ্র পাপ করিয়াছ?

ন—নিদ্রাবস্থায় স্বপ্নকালে গ্রামের জমিদারকে হত্যা করিতে গিয়াছিলাম।

গুরু—তাহার পর?

ন—আর কিছু না।

গুরু—আচ্ছা, আমার সহিত "ভজন" (কীর্ত্তন) কর।

ভজন সমাপন হইলে গুরু কহেন—"তিন টাকা দশ আনা দিয়া পাপ হইতে মুক্ত হও।" শিষ্য যদি পারিল তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহা দিয়া গেল নতুবা কিস্তিবন্দী করিতে বাধ্য হইল। ক্রমে ক্রমে

দিতে হয়। পাপমুক্তির মূল্য গুরুর ইচ্ছা এবং শিষ্যের সামর্থ্য অনুসারে ধার্য্য হইয়া থাকে। শুনা গিয়াছে, গুজরাট প্রদেশের একজন নওলাখী গভীর রাত্রে একটা আগরওয়ালা বেণের ঘরে প্রবেশ করিয়া অতি গোপনে তাহাকে হত্যা করিয়া পলাইয়া গিয়াছিল। পুলিশ অপরাধীকে ধৃত করিতে না পারায় গবর্ণমেণ্ট বাহাদুর হত্যাকারীর অনুসন্ধান জন্য এক সহস্র টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছিলেন। এই পাপী নওলাখী তাহার গুরুর নিকট যথারীতি এই পাপ স্বীকার করিয়াছিল, কিন্তু গুরুগণ এমন বিশ্বস্ত যে একথা কখন প্রকাশ করে নাই।

যাহারা দুইবারাধিক বিবাহ করিয়াছে অথবা যে ব্যক্তি নপুংসক, অন্ধ, খঞ্জ, কাণা, বধির, বিকলাঙ্গ, চর্ম্মরোগগ্রস্ত, দুশ্চিকিৎস্য পীড়ায় জর্জ্জরিত কিম্বা অপবাদগ্রস্থ এবং ৩৫ বৎসরের কম বয়স্ক তাহারা ভাইয়া পদে নিযুক্ত হইতে পারে না। ভাইয়াগণ গৈরিকবসন ধারণ করিলে নিরামিষ আহার করিতে বাধ্য, গৈরিকবসন না পরিলে মদ্য, মাংস ও মৎস্য খাইতে পারে। নওলাখীদের এক স্ত্রী বর্ত্তমানে দ্বিতীয়বার বিবাহ হয় না। গুরুর মৃতদেহ দাহ হয় না, মৃত্তিকায় সমাধিস্থ হয়। অন্যান্য ব্যক্তির মৃতদেহ দাহ হইয়া থাকে। নওলাখীদের মধ্যে মদ্য, মাংস, ডিম্ব ও মৎস্য অপ্রচলিত নাই। কেবল গুরুগণ ইহা স্পর্শ করে না। ইচ্ছামতে কেহ নিরামিষাশী হইলে নিন্দিত হয় না।

সিন্ধুপ্রদেশ, কাটিয়াবাড়, গুজরাট, মধ্যভারত, রাজপুতানার কিয়দংশে এবং পঞ্জাবের রাওলপিণ্ডী ও ধর্ম্মশালা জেলায় নওলাখী দেখিতে পাওয়া যায়। আমি আমার জীবনে ১৬ কি ১৭ জনের অধিক নওলাখী দেখি নাই। ইহাদের মধ্যে শিক্ষিত, উচ্চপদস্থ বা উচ্চজাতির লোক খুব কম, কিন্তু তথাপি ইহারা সকলেই হিন্দু এবং

ভিতর অনেকে আছেন, একথা শুনিয়াছি। গো, শূকর বা নিষিদ্ধ দ্রব্য ইহারা ভোজন করে না। হিন্দুর দেব, দেবী, শাস্ত্র, আচার প্রভৃতিকে ইহারা মান্য করে। গো, গঙ্গা, ব্রাহ্মণ এবং দেবমন্দির ইহাদের নিকট অতি পবিত্র। সর্ব্বপ্রকারেই ইহারা হিন্দু। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির হাতের অন্ন ইহারা ভক্ষণ করে না এবং গুরু ও ভাইয়া ভিন্ন কাহারও উচ্ছিষ্ট স্পর্শ করে না। মাতা, পিতা, জ্যেষ্ঠ সহোদর প্রভৃতির উচ্ছিষ্ট খায়। ইহারা গলদেশে "মালা" ব্যবহার করে না। মালা ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

সম্ভবতঃ খৃষ্টিয় ১৭৫১ অব্দে ছান্দুলাল নামে এক ব্যক্তি নওলাখী-মতের প্রবর্ত্তন করেন। ইহাঁর অপর নাম রামচরণ, পিতার নাম কিষণ্‌গোবিন্দ (কৃষ্ণগোবিন্দ), মাতার নাম লছমন-পেয়ারী। ইহাঁর বিরচিত গীত, কবিতা ও প্রবাদবাক্যে বুঝা যায় হিন্দুস্থানী ইহাঁর মাতৃভাষা ছিল। বাসস্থান সম্বন্ধে বিশেষ সমাচার পাই নাই। আদি গদির কোন পরিচয় কেহ দেয় নাই। তিনি মহাগুরু নামে খ্যাত। নওলাখীরা তাঁহাকে ভগবানের অবতার ভাবিয়া থাকে।

প্রবন্ধের প্রথমে যে নয়টি লক্ষ্যের কথা লিখিয়াছি, অর্থাৎ যে কয়েকটি বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া নওলাখীকে ধর্ম্মানুসরণ ও নিয়মরক্ষা করিতে হয়, তাহা এস্থলে ব্যাখ্যা করিয়া দিলাম। তদ্যথা—শিক্ষা, দীক্ষা, অপেক্ষা, উপেক্ষা, পরীক্ষা, রক্ষা, ঈক্ষা, তিতিক্ষা ও মুমুক্ষা। গুরু বা ভাইয়ার নিকটে সাম্প্রদায়িক রীতিনীতি শিখার নাম শিক্ষা; দীক্ষার নাম গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ; অপেক্ষা অর্থে ধৈর্য্য, উপেক্ষা অর্থে বৈরাগ্য, পরীক্ষা অর্থে পাপের প্রলোভন হইতে জয়লাভ, রক্ষা অর্থে ধর্ম্মরক্ষা করা, ঈক্ষা অর্থে সেবা, তিতিক্ষা অর্থে সহিষ্ণুতা, মুমুক্ষা অর্থে মোক্ষলাভের নিয়ত চেষ্টা।

বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয়, নতুবা (ইহাদের মতে) মহাগুরুর নিকট মহাপরাধী হইতে হয়ঃ—

১ম। অন্নদান ও জলদান।

২য়। পিতামাতার ও গুরুর আজ্ঞা পালন।

৩য়। স্ত্রীলোকের সতীত্ব রক্ষা।

নওলাখীদিগের সম্বন্ধে অতি যত্নে ও কৌশলে যাহা কিঞ্চিৎ জানিতে পারিয়াছি তাহাই এস্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। ১৮৭০ অব্দ হইতে ভারতের লোক-সংখ্যা গৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। প্রতি দশ বৎসর অন্তর সেন্সস গৃহীত হইয়া থাকে। কোন রিপোর্টেই নওলাখীদিগের উল্লেখ নাই। প্রধান কারণ, সেন্সসের কর্ত্তাগণ ইহাদিগকে মোটের উপর হিন্দুর মধ্যেই গণ্য করিয়া লইয়াছেন। ইহারা হিন্দু বটে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাবে স্বতন্ত্র উল্লেখ করা সেন্সস রিপোর্টের কর্ত্তাদের কর্ত্তব্য ছিল। নওলাখীরাও বোধ হয় কোন কারণ বশতঃ আত্মগোপন করিয়া থাকিবে।

কয়েক বৎসর হইতে আলাহাবাদে "রাধাস্বামী" নামে এইরূপ এক নুতন মত ও নুতন সম্প্রদায় হইয়াছে। পশ্চিমোত্তর প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব পোষ্ট-মাষ্টার-জেনেরল (আগ্রা নিবাসী) শ্রীযুক্ত লালা সালিগ্রাম সিং রায় বাহাদুর এবং কলিকাতার "ইণ্ডিয়ান নেশন" পত্রের সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক শ্রীযুক্ত এন, এন, ঘোষ (বারিষ্টার) প্রভৃতি মহাশয়গণ এই মতে দীক্ষিত। রাধাস্বামীর লোকেরাও তাঁহাদের মতকে গোপনে রাখিয়া দেন, প্রকাশ করিতে সম্মত হয়েন না। সম্প্রতি উক্ত স্বামী-সমিতির সম্পাদক আমার পত্রের উত্তরে আমাকে লিখিয়াছিলেন—"আমাদের মত আমরা সহজে প্রকাশ করি না।" গুজরাট প্রদেশে "স্বামী নারায়ণী" নামে এক প্রসিদ্ধ সম্প্রদায় আছে। বঙ্গভাষায় ইহাদের বিবরণ প্রকাশিত হয় নাই। বারান্তরে ইহাদের

পঞ্চকন্যা।

মূলগ্রন্থপাঠের অভাবে, ও ভাষাগ্রন্থে কবির স্বচ্ছন্দ-কল্পনার প্রভাবে, এবং অনেকস্থলে জনশ্রুতিজনিত অবশ্যম্ভাবী বিকৃতি জন্য, মূলগ্রন্থের অনেক বিষয় অতীব বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া জনসমাজে প্রচলিত হইয়া আছে। রামায়ণ ও মহাভারতোক্ত অনেক ব্যাপার এইরূপে যারপরনাই বিকৃতভাবে জনসাধারণে প্রচলিত রহিয়াছে। আমাদের দেশে এবং ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানে রামায়ণী-কথার মূল ভগবান্‌বাল্মীকির রামায়ণ নহে। অধ্যাত্ম রামায়ণ তাহার মূল। এই অধ্যাত্ম রামায়ণ ঋষি প্রণীত গ্রন্থ নহে। ইহা একজন ভক্তের লেখা বলিয়া ভবিষ্যপুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে। ভগবান্ বাল্মীকি রামাদির দেবভাব গোপন করিয়া মনুষ্য-বিগ্রহে যে দেব-চরিত্রের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন সে চিত্রের তুলনা নাই। তাহা যেমন মধুর তেমনি হৃদয়গ্রাহী; তাহা যেমন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও স্বাভাবিক তেমনি কবিতা-মাধুর্য্যে ভরা। তাহার প্রতিবর্ণে মধু ক্ষরে, ভক্তি ও আনন্দের নিস্যন্দন হয়। অধ্যাত্ম-রামায়ণের ভক্ত লেখক ভগবান রামচন্দ্রের দেবভাব,—পরব্রহ্মস্বরূপত্ব-প্রকটীকৃত করিয়াছেন। তাঁহার তপস্যা ও ভক্তিতে পরিতুষ্ট মহাদেবের বরে ইহা পুরাণান্তর্গত হইয়াছে এবং ইহার মাহাত্ম্য চিরপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভক্তপ্রবর তুলসী ইহারই পদানুসরণ করিয়াছেন। আমাদের দেশের ভাষারামায়ণ রচয়িতারা এতদুভয়েরই পদবী অবলম্বন করিয়াছেন; তবে বঙ্গদেশের কল্পনাবাহুল্যে তাহা স্থানে স্থানে অতিরঞ্জিত হইয়াছে। মহাভারত সম্বন্ধেও যে ভাষাগ্রন্থ আছে তাহারও অনেক স্থলে মূলের সহিত সাদৃশ্য লক্ষিত হয় না।

পূর্ব্বোক্ত কারণেই পঞ্চকন্যা সম্বন্ধে সাধারণের মনে বিশেষ সন্দেহ এমন কি অনাস্থা লক্ষিত হয়।

"অহল্যা দ্রৌপদী কুন্তি তারা মন্দোদরী তথা।
পঞ্চকন্যাঃ স্মরেন্নিত্যম্ মহাপাতকনাশনম্॥"

এই শ্লোক চির-প্রসিদ্ধ এবং হিন্দুমাত্রেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। সমস্ত দিবস সুখে যাইবে বলিয়া লোকে প্রাতঃকালে এই শ্লোক উচ্চারণ করিয়া থাকে। রঘুনন্দনের আহ্নিকতত্ত্বে এ শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায় না। তথাপি ইহা সর্ব্বত্র ব্যবহৃত ও সম্মানিত। কিন্তু যাঁহারা ইহা উচ্চারণ করেন তাঁহাদের প্রায় সকলেরই মনে এই পঞ্চমনস্বিনী সম্বন্ধে অতি বিকৃত ধারণা আছে। তাঁহাদের যদি জিজ্ঞাসা করা যায় এরূপ বিকৃতধারণা সত্বেও তাঁহারা পবিত্রজ্ঞানে এই সকল নাম উচ্চারণ করেন কেন? তাহার উত্তরে কেহ বলেন—"চিরকাল হইতে পবিত্রজ্ঞানে এইরূপ উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে তাই এখনও তদ্রূপ করা হয়।" কেহ বা এখনও বলেন "দেবতার বেলা লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা।" এই বিকৃত ধারণা-বিশেষ নৈতিক অবনতির কারণ হওয়াই সম্ভব। যাঁহারা পুণ্যশ্লোক ও পবিত্র বলিয়া নির্দ্দিষ্টা হইয়াছেন, তাঁহারাই যদি কলঙ্কিত ও অপবিত্র ভাবে দূষিত হন, তবেই মহা অনর্থ উপস্থিত হইল। তবেই ত পবিত্রতার ও মহত্বের আদর্শ হীন হইয়া আসিল। জন-সাধারণের এই পঞ্চকন্যা সম্বন্ধে এইরূপ ধারণা আছে:—অহল্যা ভ্রষ্টা ও কুলটা। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী। কুন্তি পরপুরুষগামিনী। তারা বালির মৃত্যুর পর সুগ্রীবের এবং মন্দোদরী রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণের স্ত্রী হইয়া সুখে সচ্ছন্দে কাল কাটাইয়াছিলেন। অতএব তাঁহারা অপবিত্র, এমন কি সাধারণ স্ত্রী অপেক্ষাও হেয়। ভাষাগ্রন্থ,

এই ধারণার কারণ। যাঁহারা জনসাধারণের ধর্ম্মশিক্ষক, তাঁহারা মূলগ্রন্থ দেখাইয়া লোকের এই ভ্রমাপনোদনে কখনও যত্নবান হয়েন নাই। সুতরাং এই ভ্রম আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে। এমন কি বঙ্গের কোন প্রসিদ্ধ লেখক এই ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়াই বোধ হয়।

"অদি বুদি মুনির্মাতা ভৈরবী রাধা বৈষ্ণবী।
পঞ্চকন্যা স্মরেন্নিত্যং মহাপাতকনাশনম্॥"

এইরূপ ব্যঙ্গ-কবিতা লিখিয়া পূর্ব্বোক্ত শ্লোকের পরিহাস করিয়াছেন।

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে বাস্তবিকই কি পাঁচজন অসতী স্ত্রীলোককে সতী বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে এবং সর্ব্বোচ্চ পবিত্র স্থান প্রদান করা হইয়াছে? বাস্তবিকই কি হিন্দুসমাজের এতই অবনতি হইয়াছিল যে তাহার সতীত্বের ও পবিত্রতার আদর্শ এত হীন? এই প্রশ্নদ্বয়ের উত্তরে যাহাতে মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারা যায় যে এই পঞ্চ-মনস্বিনী প্রকৃত নির্ম্মল, পবিত্র, আদর্শ এবং নির্দ্দিষ্ট উচ্চপদের যথার্থ উপযোগী তাহার জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য—তাঁহাদের শক্তিই লেখককে এই প্রচলিত ভ্রমাপনোদনে সাহায্য করুন।

যে মহাপুরুষ এই শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন তাঁহার বিচক্ষণতা অতীব প্রশংসনীয়। অনেকে বলিয়া থাকেন যে সীতা, লোপা মুদ্রা, অরুন্ধতি, অনসূয়া প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় নাম থাকিতে এ পঞ্চকন্যার প্রাধান্য দিবার কারণ কি? কারণ অবশ্যই আছে।

এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখা প্রয়োজন। বাল্মীকির রামায়ণের এবং ব্যাসের মহাভারতের প্রাচীনত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। রামায়ণ ও মহাভারতের প্রক্ষিপ্ততা দোষে দুষিত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত রামায়ণে সে দোষ তত অধিক লক্ষিত হয় না। অন্যান্য পুরাণ অপেক্ষা এই দুই গ্রন্থের প্রমাণই বিশেষ

শ্লোকের প্রথমেই অহল্যা ও দ্রৌপদী, তাহার পর কুন্তি, তাহার পর তারা, তাহার পর মন্দোদরী।—অহল্যা ও দ্রৌপদী উভয়েই অযোনিজা। অহল্যা দেবী হইয়াও, ব্রহ্মার মানসকন্যা হইয়াও, মানবের পত্নী ছিলেন। দ্রৌপদী শক্তিচ্ছায়া, অযোনিজা এবং মানবীরূপে অবতীর্ণা। কুন্তি সম্পূর্ণ মানবী, আদর্শ ভার্য্যা ও আদর্শ জননী। তারা বানরী, মন্দোদরী রাক্ষসী। সৃষ্টির উচ্চতম স্তর হইতে নিম্নতম স্তর পর্য্যন্ত প্রতি স্তর হইতে এক একটি আদর্শ রমণীকে বাছিয়া লওয়া হইয়াছে। দেবীসত্ত্ববিশিষ্টা গৌতম-ভার্য্যা অহল্যার কথা রামায়ণে আছে। অহল্যা সর্ব্ববিষয়ে অনিন্দনীয়া সৌন্দর্য্যমূর্ত্তি আদিরমণী বলিয়া বর্ণিতা হইয়াছেন। বাইবেলে যেমন ইভ্ ('Eve) আদি-রমণী, পুরাণেও অহল্যা সেইরূপ আদিরমণী। বাইবেলের ইভ্ স্বেচ্ছায় পতিতা হইয়া পতি আদমকে আপন পতনস্রোতে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু অহল্যা বলপূর্ব্বক পাতিতা হইয়াও পতির কৃপায় এবং আপনার অমানুষিক শক্তিবলে পুনরুত্থিতা ও কষিত কাঞ্চনবৎ জাজ্বল্যমানা। দ্রৌপদী পরমরহস্যময়ী, মহাশক্তিশালিনী, পঞ্চপাণ্ডবের ভার্য্যা। তাঁহার কথা মহাভারতে আছে। কুন্তি সম্পূর্ণ মানুষী হইয়াও সম্পূর্ণ অমানুষিক শক্তিসম্পন্না ও পঞ্চপাণ্ডব-জননী। ইঁহার কথাও মহাভারতে আছে। বানরী তারা ও রাক্ষসী মন্দোদরীর কথা রামায়ণে আছে। প্রথমতঃ মনুষ্যকে দেবপ্রকৃতি বিশিষ্ট, অর্দ্ধ দেবপ্রকৃতিক ও পূর্ণ মনুষ্যপ্রকৃতিক এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক স্তর হইতে এক একটি রমণীকে লওয়া হইয়াছে। মনুষ্যের নিম্নস্তর বানর, তন্নিস্তর রাক্ষস :—এই দুই স্তর হইতেও দুইটি আদর্শ রমণী বাছিয়া লইয়া সমাপ্তি করা হইয়াছে ; কেননা তাহার পরের স্তর ইতর প্রাণী।

সাধারণতঃ অবিবাহিতা স্ত্রী অর্থেই অধিক ব্যবহৃত হয়। এস্থলে কন্যা শব্দ সাধারণ স্ত্রীবাচী নহে; কারণ তাহা হইলে এই পঞ্চজনের কোনও বিশেষত্বই থাকে না। অবিবাহিতা অর্থেও ইহা ব্যবহৃত হয় নাই। এস্থলে কন্যা শব্দের অর্থ—তেজস্বিনী অপূর্ব্ব শক্তি-সম্পন্না রমণী। তৈত্তিরীয় আরন্যকের নিবম অনুবাকে দুর্গা-গায়ত্রীতে যে কন্যা কুমারী শব্দ আছে শায়নাচার্য্য সেই কন্যা শব্দের অর্থ করিয়াছেন দীপ্যমানা কন্যা শব্দের এই অর্থই এখানে সমীচীন বলিয়া বোধ হয় (কন্-দিপ্তৌ)

এক্ষণে দেখা যাইতেছে যে শ্লোকোক্ত পঞ্চরমণীদিগকে কন্যা, দীপ্যমানা অর্থাৎ তেজস্বিনী বা অপূর্ব্বশক্তিশালিনী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই শক্তিমত্তাই তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের হেতু। সেই শক্তিমত্তা সতীত্ব জন্যও হইতে পারে অন্য কারণেও হইতে পারে। যে মনস্বিনীগণের নাম উচ্চারণ করিলে মহাপাতক দূর হয় বলিয়া বিশ্বাস, অহল্যার নাম তাঁহাদের নামাবলির সর্ব্বাগ্রে উচ্চারিত হয়, অথচ অহল্যা সম্বন্ধে যে আখ্যায়িকা প্রচলিত আছে তাহাতে অনেকে তাঁহাকে এ সম্মানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্তা মনে করিয়া থাকেন। এক্ষণে অহল্যা ঘটিত বৃত্তান্তের বিচার করিয়া দেখা যাউক যে তিনি এই সম্মানের বাস্তবিকই অধিকারিণী কিনা।

অহল্যা।

অহল্যার বৃত্তান্ত অন্যান্য পুরাণে থাকিলেও রামায়ণে লিখিত অহল্যাবৃত্তান্তই প্রমাণিক। আর ভগবান্ বাল্মীকি রামায়ণে ব্যাপার সকল যেরূপ স্বাভাবিকভাবে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কাহার কোন বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিবার নাই। অতি প্রাচীনগ্রন্থ রামায়ণে বর্ণিত অনেক ব্যাপার কালক্রমে লোকমুখে ভাবান্তরিত হইয়া পড়িয়াছে। ভগবান্ বাল্মীকির গ্রন্থ যে এত মধুর, এত হৃদয়গ্রাহী তাহার

করিয়াছেন তাহাতে ইহাকে বেদের ন্যায় অপৌরষেয় বলিতে হয়। অন্য পুরাণে সুস্পষ্ট অপৌরষেয় ভাব লক্ষিত হয় না। রামায়ণ পাঠে ইহাই বোধ হয় যে, সকল ব্যাপারগুলিই যথাযথরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ভগবান্ ব্রহ্মার কৃপায় মহর্ষির অন্তর্দৃষ্টি সম্যক্ বিস্ফারিত হওয়ায় তাঁহার কোন বিষয়ই অবিদিত ছিলনা, তাই তাঁহার রচিত গ্রন্থে এত মধুরতা ও এত আনন্দ লক্ষিত হয়।

অহল্যাবৃত্তান্ত সম্বন্ধে বাল্মীকি ও অধ্যাত্ম-রামায়ণে ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায় না, অথচ অধ্যাত্মবর্ণিত ব্যাপারই আমাদের দেশে প্রচলিত।

আবার বাল্মীকি রচিত রামায়ণের দুই স্থলে অহল্যার দুইটী বিভিন্ন বৃত্তান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম আদিকাণ্ডে ৪৮ সর্গে—এখানে ভগবান্ বিশ্বামিত্র বক্তা, এবং উত্তর কাণ্ডে ৩৫ সর্গে—এখানে ভগবান্ অগস্ত্য বক্তা। অগস্ত্য স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মা বর্ণিত ব্যাপারই বলিয়াছেন। অর্থাৎ তিনি বক্তা হইলেও কথাগুলি তাঁহার নহে, ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত। রাবণ-পুত্র ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়া বন্দী করিয়া লইয়া যান। ব্রহ্মা ইন্দ্রজিৎকে বরদানে তুষ্ট করিয়া ইন্দ্রের মুক্তিসাধন করেন। ভগবান্ ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বলেন যে অহল্যা সম্বন্ধে তিনি কামবশতঃ যে কুকর্ম্ম করিয়াছেন তাহাই তাঁহার অধঃপতনের কারণ। এই প্রসঙ্গে ভগবান্ প্রজাপতি অহল্যার জন্মবিবরণ কহিয়াছিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন যাবতীয় সৃষ্ট জীবের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গের সৌন্দর্য্য একত্রীকৃত করিয়া তিনি অহল্যা নাম্নী কন্যারত্নের সৃজন করেন। অহল্যা শব্দের অর্থ ই অনিন্দনীয়া। এই অপূর্ব্ব কন্যারত্ন সৃজন করিয়া ভগবান্ প্রজাপতি প্রথমে তাঁহাকে দেবরাজ ইন্দ্রকেই প্রদান করিবেন স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা না করিয়া তিনি অহল্যাকে গৌতমের নিকট

রক্ষা করেন। পরে ভগবান্ তাঁহার ব্রহ্মচর্য্যে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকেই অহল্যাকে সম্প্রদান করেন। দেবরাজ মর্ম্মাহত হইয়া গৌতমবেশে অহল্যার ধর্ম্মনষ্ট করেন।—

ত্বং ক্রুদ্ধস্ত্বিহ কামাত্মা গত্বা তস্যাশ্রমং মুনেঃ।
দৃষ্টবাংশ্চ তদা তাং স্ত্রীং দীপ্তামগ্নিশিখামিব॥
সা ত্বয়া ধর্ষিতা শক্র কামার্ত্তেন সমন্যুনা।

[প্রজাপতি বলিলেন, "তুমি ক্রুদ্ধ হইয়া কামপরতন্ত্র হওয়ায় সেই মুনির আশ্রমে গমন করিয়া প্রদীপ্ত অগ্নি শিখার ন্যায় তেজস্বিনী সেই স্ত্রীকে দেখিলে এবং কামার্ত্ত হইয়া ও ক্রোধ বশতঃ তাহার প্রতি বলাৎকার করিলে।]

অহল্যা গৌতমকে প্রসন্ন করিবার জন্য বলিতেছেন :—

অজ্ঞানাৎ ধর্ষিতা বিপ্র তদ্রূপেন দিবৌকসা।
ন কামকারাদ্বিপ্রর্ষে প্রসাদং কর্ত্তু মর্হসি॥

[বিপ্রর্ষে, দেবরাজ আপনার রূপ ধারণ করিয়া আমায় ধর্ষণা করিয়াছে, আমি কিছুই বুঝিতে পারি নাই, আমি কাম বশে এ কার্য করি নাই, অতএব আপনি আমার উপর প্রসন্ন হউন।]

ইহাই উত্তর কাণ্ডে ভগবান্ অগস্ত্যকথিত অহল্যা-বৃত্তান্ত। আদিকাণ্ডের ৪৮ সর্গে গৌতমাশ্রমে ভগবান্ বিশ্বামিত্র শ্রীরামচন্দ্রকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহা এই।—মুনি বেশধারী ইন্দ্র অহল্যাকে আপনার অভিপ্রায় জানাইলেন।—

মুনিবেশং সহস্রাক্ষং বিজ্ঞায় রঘুনন্দন।
মতিঞ্চকার দুর্মেধা দেবরাজকুতূহলাৎ॥
অথাব্রবীৎ সুরশ্রেষ্ঠং কৃতার্থেনান্তরাত্মনা
কৃতার্থাস্মি সুরশ্রেষ্ঠ গচ্ছ শীঘ্রমিতঃ প্রভো।

[হে রঘুনন্দন, মুনিবেশধারী ইন্দ্রকে ইন্দ্র বলিয়া জনিয়া, দেবরাজ এই কুতুহলে দুর্ব্বুদ্ধি সম্মতি দিল। অনন্তর আপনাকে কৃতার্থ মনে করিয়া দেবরাজকে বলিল "আমি কৃতার্থ হইয়াছি, প্রভো এস্থান হইতে শীঘ্র গমন করুন, দেখিবেন আপনি যেমন আপনাকে গৌতম হইতে বাঁচাইবেন সেইরূপ আমাকেও সর্ব্বথা বাঁচাইবেন।]—এত একটা পুরা কুলটার কথা।

ভগবান ব্রহ্মা বা অগস্ত্য বলিলেন (এখন হইতে আমরা ইহা অগস্ত্যেরই কথা বলিব) 'অহল্যা নিরপরাধিনী, ইন্দ্র বলপূর্ব্বক তাহার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছেন আর ভগবান বিশ্বামিত্র বলিতেছেন, না. অহল্যা জানিয়া শুনিয়াই স্ত্রীসুলভ দুর্ব্বলতাবশতঃ আত্মসমর্পণ করিয়াছে।

এক্ষণে এই দুই মতের বিচার করিতে হইলে অতিশয় গোলোযোগে পড়িতে হয়। কাহাকে বিশ্বাস করা যায়? ভগবান অগস্ত্যের কথা কোন মতেই অমান্য করা যাইতে পারে না। কেন না তাহা স্বয়ং ব্রহ্মার উক্তি। আবার ভগবান বিশ্বামিত্রের কথাও অবিশ্বাস করা যায় না। এক্ষণে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, অহল্যা সম্বন্ধে দুইটি বিভিন্ন মত প্রচলিত ছিল। এক মতে তিনি নির্দ্দোষিনী, ইন্দ্রই বলপূর্ব্বক তাঁহার ধর্ম্ম নষ্ট করেন। অপর মতে, তিনি স্বেচ্ছায় আত্ম সমর্পন করিয়া কুলটার ন্যায় আচরণ করিয়াছেন। বিচার করিয়া দেখা যাউক যে এই দুই মতের মধ্যে কোনটি বিশেষ যুক্তিসঙ্গত বা প্রামাণিক।

প্রথম মত ভগবান ব্রহ্মার অথবা অগস্ত্যাদির মত। অগস্ত্য ব্রাহ্মণ ও মহা তপোবলসম্পন্ন মহর্ষি। সাক্ষাৎ পবিত্রতা ও পাতিব্রত্যের মূর্ত্তি লোপামুদ্রা তাঁহার সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তিনি যে প্রদীপ্ত অগ্নি-শিখাসম পতিব্রতা মূর্ত্তি নিয়ত চতুর্দ্দিকে দেখিতেন, অহল্যাকেও ঠিক সেইরূপ প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার

করিয়া নির্ম্মাণ করেন, তখন ইন্দ্র ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি দেবরাজ, সুতরাং সেই অমূল্য রত্ন তাঁহারই ভোগ্য হইবে। তাই ইন্দ্র সেই রত্নে বঞ্চিত হইয়া মর্ম্মাহত হয়েন এবং লোভ, কাম, ঈর্ষা ও ক্রোধের বশবর্ত্তী হইয়া এই কুৎসিৎ কর্ম্ম করেন। ইহা অতীব স্বাভাবিক। ইন্দ্র দেবরাজ হইলেও রাজা অর্থাৎ সম্পুর্ণ রজোগুণ প্রধান, ভোগই তাঁহার প্রধান লক্ষ্য, সুতরাং তাঁহার এরূপ কার্য্য সমিচীন। অন্যদিকে বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়, বহুদিন রাজত্ব করিয়া রাজভোগে কালাতিপাত করিয়াছেন, সাধারণ নারীচরিত্র ও স্ত্রীসুলভ দুর্ব্বলতা তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। তপস্যাকালেও তাঁহাকে স্ত্রীঘটিত অনেক বিভ্রাটে পতিত হইতে হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার মতে এ ব্যাপারে উভয়েই সমান দোষী। তাঁহার মতে ইন্দ্র যেমন আশা করিয়াছিলেন যে অহল্যা তাঁহার ভোগ্যা হইবেন, অহল্যাও সেইরূপ আশা করিয়াছিলেন যে, তিনি দেবরাজের প্রিয়া হইয়া সর্ব্বোচ্চ স্থান প্রাপ্ত হইবেন। গৌতমের পত্নী হইয়া অহল্যা অবশ্যই সন্তুষ্ট হৃদয়ে পাতিব্রত্য পালন করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে যে বাসনা বীজ রহিয়া গিয়াছিল, ইন্দ্রের অবসর মত উপস্থিতিতে ও প্রার্থনায় সেই বাসনা জীবন্ত ও প্রবল হইয়া তাঁহাকে আত্মহারা করে। ইহা নারী চরিত্রের এক গূঢ় রহস্য। অহল্যা প্রকৃত প্রস্তাবেই অনিন্দনীয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, ব্রহ্মার বিশেষ সৃষ্টি। রূপগর্ব্বিতা রমণীগণ সর্ব্বোচ্চ পুরুষের প্রশংসনীয়া ও আদরনীয়া হইলে আপনাকে প্রকৃত প্রস্তাবে কৃতার্থ মনে করিয়া থাকেন, তদভাবে একপ্রকার মনকে বুঝাইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করেন। ভগবান বিশ্বামিত্রের মতে এরূপ ব্যাপারে কেবল পুরুষ দোষী নহে, স্ত্রী ও সমান দোষী।

তাহার পর ইন্দ্রের গৌতমের বেশ ধারণ করা সম্বন্ধে কোন মত

গৌতম-ভার্য্যাকে ছলনা করাই যে তাঁহার উদ্দেশ্য সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। দেবরাজ স্ববেশে উপস্থিত হইয়া তাহার সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য বিস্তার করিলেও অহল্যাকে প্রলোভিত আকৃষ্ট করিতে পারিতেন না। ইন্দ্র জানিতেন যে, সতী অহল্যা তাঁহাকে রূপে এরূপ গর্হিত প্রস্তাব করিতে শুনিলে ক্রোধে অভিসম্পাত দিবেন, তাই মুনি বেশে তাঁহাকে ছলনা করিয়া আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিবার যত্ন পাইয়াছিলেন। অগস্ত্যের মতে অহল্যা তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারেন নাই। মুগ্ধা রমণী পতিভ্রমে এই গর্হিত কার্য্য করিয়াছেন। বিশ্বামিত্র বলেন যে, অহল্যা গৌতমবেশধারী হইলেও ইন্দ্রকে ইন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। তবে এ ছদ্মবেশের আবশ্যকতা কিরূপে সিদ্ধ হয়? পতি দেবতা, সাধ্বীর এ বিষয়ে অতি তীক্ষ্ম দৃষ্টি থাকে। শঙ্খচূড় বধকালে ভগবান বিষ্ণু শঙ্খচূড়ের বেশ ধারণ করিয়া বৃন্দাকে ছলনা করিতে গিয়া ধরা পড়েন ও অভিসপ্ত হয়েন, সুতরা ছদ্মবেশে থাকিলেও ইন্দ্রকে না চিনিতে পারিলে পাতিব্রত্যে দোষ আসে, ইন্দ্রকে চিনিতে পারায় বাস্তবিকই অহল্যার পাতিব্রত সুপ্রমানিত হইতেছে। আর ইহাও হইতে পারে যে, ইন্দ্র অহল্যাকে যে সকল কথা বলিয়াছিলেন তাহা মহা সংযমী জিতেন্দ্রিয় মহাপুরুষ গৌতমের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত তাহাতেই সন্দিহান হইয়া, এবং ইন্দ্র ভিন্ন অন্য কাহারও এপ্রকার কার্য্যে এরূপ সাহস হওয়া সম্ভব নহে, এই বিচার করিয়াই তিনি তাঁহাকে ইন্দ্র বলিয়া চিনিতে পারেন এবং স্ত্রীসুলভ দুর্ব্বলতা বশতঃ ক্ষণিক মোহে সমাচ্ছন্ন হইয়া এই গর্হিত কার্য্যে সম্মতি দান করেন। ইহাই বিশ্বামিত্রের মত।

ভগবান অগস্ত্যের মতে পতিব্রতা সাধ্বীগণ অবিচারিত ভাবে পতিআজ্ঞা পালন করেন, পতির আজ্ঞা পালনে বিচার করা দোষ ও

হইয়াছিল। মূর্তি

মতই শিরে স্পর্শে তুমি পবিত্রা হইবে, তিনি ভিন্ন অ

চরিত্রের র নাশ করিতে পারিবে না। তিনি আসিলে ৎ

তাহার পর করিয়া যখন তুমি আমার নিকটে আসিবে

চিনিতে প গ্রহণ করিব।"

নয়, অহল্যা তাহ বলিতেছেন—

করিবার মানসে দৃষ্ট্বা চৈব শক্রং ভার্য্যামপি চ সপ্তবান।

না, কারণ ইহ বর্ষ সহস্রানি বহুনি নিবসিষ্যসি॥

সম্ভাবনা। বাতভক্ষ্যা নিরাহারা তপস্তী ভস্মশায়িনী।

কথা বলিয়া অদৃশ্যা সর্ব্বভূতানামাশ্রমেঽস্মিন বসিষ্যসি

জ্ঞানকৃত ক তদবস্থ দেখিয়া ভার্য্যাকে অভিসম্প

করিতেন। ম বহু সহস্র বৎসর, নিরাহার, বায়ুভক্ষ্য, ভ

—দৃশ্যা হইয়া অনুতাপকরতঃ বাস করিবে।"]

ভগবান অগস্ত্যের বৃত্তান্তে শাপ শব্দই ব্যবহৃত হয় নাই, ৬।২।৪ বর্ণিত ব্যাপারে গৌতমপ্রদত্ত অহল্যার শাস্তি উপযুক্তই হইয়াছে। বিশ্বামিত্র শাপ কথায় উল্লেখ করিয়াছেন এবং ভগবান গৌতম অহল্যার যে প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা শাপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। দেখিতে গেলে বিশ্বামিত্রের বৃত্তান্ত অতিরঞ্জিত বলিয়াই বোধ হয়। তিনি বলিয়াছেন যে, গৌতমের শাপে ইন্দ্র নির্বিষাণ হয়েন, পরে দেবতাগণের চেষ্টায় অগ্নির বাহন মেষের বৃষাণ হইয়া সবৃষাণ হন। তবে আর ঋষিবাক্য সত্য হইল কৈ? আর ব্যাপারটাও বিশেষ অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়। এদিকে অগস্ত্যবৃত্তান্তে বক্তার উক্তি এই:—গৌতম বলিলেন, "ইন্দ্র, তুমি আমার স্ত্রীর ধর্ম্মনষ্ট করিয়াছ, তোমার দেবধর্ম্ম নষ্ট হইবে এবং তোমাকে শত্রু-হস্তগত হইতে হইবে। তুমি ইহলোকে যে ভাব প্রচলিত করিলে তোমার দোষে মনুষ্যলোকেও সেই জারভাব প্রবর্ত্তিত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। "যে ব্যক্তি জারকর্ম্ম করিবে তাহার পাপের অর্দ্ধ অংশ তোমাতে স্পর্শিবে, আর তোমার স্থান স্থির থাকিবে না, যিনিই দেব-

ুমতী-পাতিব্রত্য লোপমুদ্রার পতি ভগবান অগস্ত্যের
র্য্য করিতে হয়, কেননা ভগবান বিশ্বামিত্র, সাধ্বী রমণী-
। ভগবান অগস্ত্যের ন্যায় অভিজ্ঞ বলিয়া বোধ
গবান গৌতম ত্রিকালদর্শী, তিনি দেখিবামাত্র ইন্দ্রকে
ছিলেন, তাঁহার নিকট কোন বিষয় গোপন করা সহজ
। ভালরূপ জানিতেন। অহল্যা জানিয়া শুনিয়া প্রসন্ন
মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করিতে কখনই সাহসী হইতেন
তে গৌতমের ক্রোধাগ্নি আরও প্রদীপ্ত হইবার
ং স্বামীকে প্রসন্ন করিবার জন্য অহল্যা যে সকল
াও সম্পূর্ণ সত্য। ভগবান গৌতম অহল্যাকে কোন
বে অপরাধী জানিলে অবশ্যই কঠোর শাস্তির বিধান
াভাগ অগস্ত্য তাঁহার বর্ণিত বৃত্তান্তে বলিয়াছেন :—

তাং তু ভার্য্যাং সুনির্ভৎস্য সোঽব্রবীৎ সুমহাতপা।
দুর্ব্বিনীতে বিনিধ্বংস মমাশ্রম সমীপতঃ ॥
রূপযৌবনসম্পন্না যস্মাত্ত্বমনবস্থিতা।
তস্মাৎ রূপবতী লোকে ন ত্বমেকা ভবিষ্যসি ॥
রূপঞ্চ তে প্রজাঃ সর্ব্বাঃ গমিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ।
যত্তদিদং সমাশ্রিত্য বিভ্রমোয়মুপস্থিত ॥

[সেই সুমহাতপা গৌতম, ভার্য্যাকে যারপরনাই তিরস্কার করিয়া বলিলেন—"দুর্ব্বিনীতে, আমার আশ্রমের নিকট তুমি সৌন্দর্য্যবিহীনা হইয়া থাক, তুমি রূপবতী ও গুণবতী বলিয়া গর্ব্বে অস্থির হইয়াছ ; এত দিন তুমিই লোকে একাকিনী সুন্দরী ছিলে, কিন্তু এখন আর তাহা হইবে না। তোমার রূপরাশি দেখিয়াই ইন্দ্রের মতিভ্রংশ ঘটিয়াছে, সুতরাং তোমার রূপ প্রজামাত্রেই পাইবে।"]

তাহার পর যখন অহল্যা তাঁহাকে বলিলেন যে, তিনি কামবশতঃ একার্য্য করেন নাই, তখন তিনি তাহাকে বলিলেন যে,—"মানবরূপ-ধারী ভগবান বিষ্ণু রামরূপে বিশ্বামিত্রসহ আমার আশ্রমে আসিবেন,

গণের রাজা হইবেন তাঁহারই স্থান স্থির থাকিবে না।" (উত্তর কাণ্ড—৩৫ম অঃ—১৭)।

ভগবান বাল্মীকি এই দুই মত যথাযথ বর্ণনা করিয়াছেন। এই দুই মতের তুলনা করিয়া দেখিলে অগস্ত্যের বৃত্তান্তই প্রকৃত বলিয়া বোধ হয়। বিশ্বামিত্রের বৃত্তান্ত, প্রকৃত ঘটনা লোকমুখে বিকৃতি প্রাপ্ত হইলে যে ভাব ধারণ করে, তাহাই বলিয়া বোধ হয়। সাধারণে ভগবান অগস্ত্যের বৃত্তান্তই প্রকৃত বলিয়া স্বীকারপূর্ব্বক অহল্যাকে এই উচ্চ-স্থান প্রদান করিয়াছেন। সেরূপ করিবার আরও অন্য কারণ আছে।

স্ত্রীসুলভ দুর্ব্বলতাবশতঃই হউক আর অজ্ঞানকৃতই হউক কৃত-অপরাধের জন্য অহল্যা যে কর্ম্মের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন তাহাতে আর মতদ্বৈধ নাই। স্ত্রীলোকের একবার পদস্খলন হইলে পুনশ্চ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হওয়া অতীব কঠিন। পূর্ব্ববৎ রূপবতী থাকিলে পাছে সেই রূপই পুনশ্চ তাহার প্রায়শ্চিত্তের অন্তরায় হয়, এই ভাবিয়া পরম কারুণিক গৌতম তাঁহাকে কুরূপা করিয়া রাখিয়াছিলেন। যখন ভগবান রামচন্দ্র বিশ্বামিত্রসহ গৌতমের আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন বিশ্বামিত্র বলিলেন—

তদাগচ্ছ মহাতেজ আশ্রমং পুণ্য কর্ম্মণঃ।
তারয়ৈনাং মহাভাগাং অহল্যাং দেবরূপিনীম্॥

[অতএব হে মহাতেজস্বিন্, সেই পুণ্যকর্ম্মা গৌতমের আশ্রমে চল এবং দেবরূপিণী মহাভাগা অহল্যাকে তরাও।]

দদর্শ চ মহাভাগাং তপসা দ্যোতিতপ্রভাম্।

রাম সেই মহাভাগা অহল্যাকে দেখিতে পাইলেন ; তপস্যা করিয়া তাঁহার প্রভা যারপরনাই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

শ্রীরামদর্শনে পাপমুক্তা হইয়া যখন অহল্যা তাঁহাদের সম্মুখে দণ্ডায়-মান হইলেন, তখন "রাঘবৌ তৌ তদা তস্যাঃ পাদৌ জগৃহতুর্মুদা।" রাম-লক্ষণ আনন্দে তাঁহার পায়ে প্রণাম করিলেন। সাক্ষাৎ ভগবান যাঁহার এতদুর সম্মান করিলেন লোকে যে তাঁহার সম্মান

করিবে তার আর আশ্চর্য্য কি? তপোবনে ধূতকথষা অহল্যা ভগবান রামচন্দ্রের দর্শন পাইয়া কৃতার্থ হইলেন। এরূপ মহাভাগা দেবরূপিণীর নাম লইলে যে পাপ দূর হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি! অহল্যা গৌতমবাক্য স্মরণ করিয়া শ্রীরাম-লক্ষণের পদে প্রণাম-পূর্ব্বক তাঁহাদের যথাবিধি অতিথিসৎকার কারলেন। তখন—

পুষ্প বৃষ্টি র্মহত্যাসীৎ দেব দুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসাং চৈব মহানাসীৎ সমুৎসবঃ॥
সাধু সাধ্বিতি দেবাস্তামহল্যাং সমপূজয়ন্।
তপোবল বিশুদ্ধাঙ্গীং গৌতমস্য বশানুগাম্॥
গৌতমোঽপি মহাতেজা অহল্যা সহিতোসুখী।
রামং সম্পূজ্য বিধিবৎ তপস্তেপে মহাতপা॥

[চারিদিকে পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, দেবদুন্দুভি বাজিয়া উঠিল, অপ্সরা ও গন্ধর্ব্বরা মহা উৎসব করিতে লাগিলেন, দেবগণ 'সাধু সাধু' বলিয়া গৌতমের বশীভূতা অনুগামিনী পত্নী তপোবল-বিশুদ্ধাঙ্গী অহল্যার সম্মান করিলেন। মহাতেজা গৌতমও অহল্যাকে গ্রহণ করিয়া, শ্রীরামচন্দ্রের যথাযথ পূজা করিয়া মহাসুখে তপস্যা করিতে লাগিলেন।] এটুকু ভগবান্ বাল্মীকির কথা। ভগবান অহল্যাকে 'গৌতমস্য বশানুগাম্' বলিয়া অহল্যাসম্বন্ধে আপনার মত প্রকাশ করিয়াছেন এবং সে মত ভগবান অগস্ত্যেরই মতের সমর্থন করিতেছে। ভগবান অগস্ত্য যাহা বলিয়াছেন তাহা সাক্ষাৎ প্রজাপতির কথা সুতরাং বেদবৎ মান্য।

পুরুষ পর-স্ত্রীর আস্বাদ এবং স্ত্রী পরপুরুষের আস্বাদ প্রাপ্ত হইলে, মনুষ্য রক্তের আস্বাদপ্রাপ্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় অতিশয় উন্মার্গগামী হইয়া পড়ে। বিবেক, অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা মনুষ্য-চিত্তের সে মলিনত্ব দূর হইয়া পুনশ্চ নির্ম্মলতা সাধন হইতে পারে। তাহাও কঠোর সাধনার ফল। পুরুষের পক্ষে তাহা সম্ভব হইলেও স্ত্রীর পক্ষে অনেক সময় তাহা একেবারেই অসম্ভব বলিয়াই বোধ হয়। দেবী অহল্যা এই

কঠোর সাধনায় কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার কন্যাত্ব-তেজস্বিনীত্ব নিষ্পাদিত হইয়াছে। তপস্যান্তে, প্রায়শ্চিত্তের অবসানে স্বয়ং ভগবান রামচন্দ্রকৃত সম্মান ও পূজা এবং দেবগণের ও যক্ষ-রক্ষ-কিন্নরগণের পূজা এবং পরিণামে গৌতমের অহল্যাকে পুনর্গ্রহণ অহল্যার তপঃসিদ্ধি ও প্রায়শ্চিত্তসিদ্ধি সপ্রমাণিত করিতেছে, ও তাঁহার কন্যাত্ব সপ্রমাণিত ও দেদীপ্যমান করিয়াছে। এক কটাহ-পূর্ণ দুগ্ধে এক বিন্দু গোমুত্র পড়িলে সমস্ত দুগ্ধটুকু নষ্ট ও অব্যবহার্য্য হইয়া যায়। দেবী অহল্যা সেই নষ্ট ও অব্যবহার্য্য বস্তুকে আপন মহতী শক্তিবলে পুনশ্চ বিশুদ্ধ ও ব্যবহার্য্য ও মাননীয়া করিয়া এই কন্যাত্ব লাভ করিয়াছেন।

গৌতমশাপে অহল্যার সর্ব্বাঙ্গ বিকৃতি ও পাষাণী হওয়া ও শ্রীরাম-চন্দ্রের পাদস্পর্শে পুনশ্চ তাঁহার মানবীরূপ প্রাপ্তির কথা মুল রামায়ণে নাই, অধ্যাত্মে আছে।

এক্ষণে দেখা গেল যে, মহাভাগা অহল্যাসম্বন্ধে দুইটী মত প্রবর্ত্তিত। বিশ্বামিত্র প্রথম, ও অগস্ত্য দ্বিতীয় মত প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান ব্রহ্মা অহল্যাসম্বন্ধে ইন্দ্রকে যাহা বলিয়াছিলেন অগস্ত্য তাহাই বলিয়াছেন। বেদকর্ত্তা ব্রহ্মার মুখ-নিঃসৃত অগস্ত্যের ন্যায় ঋষি-প্রবরের দ্বারা অনুমোদিত মতই গ্রাহ্য। এই মতে অহল্যা নিরপরাধিনী, ইন্দ্র তাঁহার ভর্ত্তার বেশ ধারণপূর্ব্বক ছলনা করিয়া তাঁহার ধর্ম্মনষ্ট করেন। ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, জ্ঞানকৃত হউক, অজ্ঞানকৃত হউক স্ত্রীলোকের এরূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে লোকসমাজে আর তাঁহার স্থান হয় না। কিন্তু ভগবান গৌতম ভার্য্যাকে নিরপরাধিনী জানিয়া পরপুরুষসংস্পর্শজনিত দোষ ক্ষালনার্থ অহল্যার কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করেন, এবং অহল্যাও সানন্দচিত্তে সেই প্রায়শ্চিত্ত সম্পন্ন করিয়া নির্ধূতপাপা ও পূর্ব্ববৎ তেজস্বিনী হইয়া উঠেন; তখন ভগবান

রামচন্দ্রের প্রণম্যা এবং দেবগণের পূজনীয়া হয়েন, এবং গৌতম ও তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করেন। এই কঠোর প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা আপনার অজ্ঞানকৃত পাপের ক্ষালনই অহল্যাকে কন্যা, দীপ্যমানা, অপূর্ব্ব-শক্তিশালিনী করিয়াছে। বিশ্বামিত্রকথিত মত প্রকৃত ভাবের বিকৃতি মাত্র, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই, কারণ এরূপ ব্যাপার সংসারে নিত্যই দেখিতে পাওয়া যায়।

ত্রিভুবন-সুন্দরী অহল্যার ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষে অতীব সর্ব্বনাশের কথা। ভগবান গৌতমের কৃপায় ও আপনার অপূর্ব্ব শক্তিবলে তিনি আপনার পূর্ব্বগৌরব পুনঃপ্রাপ্ত হন। এরূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্ত সাধনের শক্তি কয় জনের থাকে? কয় জনই বা এরূপ ঘোর সর্ব্বনাশ হইতে পুনশ্চ অহল্যার ন্যায় পূর্ব্বগৌরবে গৌরবান্বিত হইতে সক্ষম হয়েন? সম্পূর্ণ নিষ্পাপ না হইলে গৌতম কখনই তাঁহাকে পুনর্গ্রহণ করিতেন না, রামচন্দ্রও তাঁহাকে প্রণাম করিতেন না এবং দেবগণও তাঁহার পূজা করিতেন না। নারীগণের অতুলরূপরাশিই তাহাদের সর্ব্বনাশের মূল, সম্পূর্ণ সতর্ক ও সুরক্ষিত হইলেও ইহা তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করে, ভগবান গৌতম তাহা স্পষ্টই বলিয়াছেন। তাই ভগবান গৌতম-স্ত্রীকে আর অলোকসামান্যা না রাখিয়া তাঁহার সৌন্দর্য্য জনসাধারণে বিভাগ করিয়া দেন। এই জারকর্ম্মের সূত্রপাত। ইন্দ্র ও তৎপরবর্ত্তী তৎপদস্থ সকলকেই গৌতম-শাপে লাঞ্ছিত হইয়া আসিতে হইয়াছে, কিন্তু নিরপরাধিনী অহল্যা তপস্যাবলে পাপনির্মুক্তা হইয়া স্বগৌরবে গৌরবান্বিতা হন।

বারান্তরে দ্রৌপদী, কুন্তি, তারা ও মন্দোদরীর বিষয় আলোচনা করিব।

শ্রীভুতনাথ ভাদুড়ী।

লামা-কুমারী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাস পড়িতে না পড়িতেই কলিকাতায় অসহ্য গ্রীষ্ম আরম্ভ হইল। রৌদ্রের যেমন উত্তাপ, তেমনি তাহার ঔজ্জ্বল্য; দ্বিপ্রহরের সময়, জানালা খুলিয়া বাহিরে দৃষ্টিপাত করিলে, চক্ষু ঝলসিয়া যায়। হাত-পাখার দাম দুই পয়সার স্থানে চারি পয়সা হইয়াছে; বরফের মূল্যও পরিবর্দ্ধিত; যাঁহাদের বাড়ীতে টানাপাখা আছে, তাঁহারা পাখাকুলি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। মধ্যাহ্নে রাজপথে বাহির হইলে দেখা যায়, স্থানে স্থানে ঠিকা-গাড়ীর ঘোড়া, ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে, মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌-ফট্‌ করিতেছে। সমস্ত দিন এমন গুমট্‌, যে বৃক্ষের পাতাটিও নড়ে না। সন্ধ্যার পর, আটটা কি নয়টা বাজিলে, তখন একটু বাতাস বহিতে আরম্ভ হয়; লোকে ছাদের উপর, মাদুর পাতিয়া শয়ন করিয়া বলে—আঃ, বাঁচিলাম।

এইরূপ একটি গ্রীষ্মের প্রভাতে, ভবানীপুরে একটি অট্টালিকা-মধ্যস্থ, একটি সুসজ্জিত কক্ষে বসিয়া, দুইজন যুবক কথোপকথন করিতেছিলেন। তখন মাত্র আটটা বাজিয়াছে। যুবক দুইজন একটি টেবিলের সম্মুখে উপবিষ্ট, দুইটি চায়ের পেয়ালাও সেই টেবিলে শোভা পাইতেছে।

যুবক দুইটির মধ্যে, একটির বয়স ত্রিংশৎ বর্ষ হইবে। তাঁহাকেই গৃহস্বামী বলিয়া মনে হয়। ইংরাজি-ধরণের রাত্রি-বসনের উপর, একটি সুচিত্রিত জাপানী কিমোনো তাঁহার অঙ্গোপরি বিরাজ করিতেছে। তাঁহার তৃণনির্ম্মিত অর্দ্ধ-পাদুকাযুগলও, কিমোনোর ন্যায় জাপানী চিত্রে পরিশোভিত। টেবিলের উপর, ইজিপ্সিয়ান সিগারেটের একটি বাক্স রহিয়াছে। চা পান শেষ হইবার পূর্ব্বে, তিনি একটি সিগারেট

দ্বিতীয় যুবকটি আগন্তুক। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চবিংশতি বর্ষের অধিক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়না। তাঁহার গাত্রে বাঙ্গালী পোষাক। সূক্ষ্ম দেশীয় ধূতির উপর একটি রেশমী পাঞ্জাবী কামিজ। একটি রেশমী উত্তরীয় বসন তাঁহার স্কন্ধ হইতে লম্বিত। লোকটি গৌরকান্তি। মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। চক্ষু দুইটি বৃহৎ ও উজ্জ্বল। ভাবভঙ্গী দেখিলে, তাঁহাকে বঙ্গীয় কবি বলিয়া সন্দেহ হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা।

প্রথম যুবকটির নাম হেমচন্দ্র, দ্বিতীয়টির নাম কিশোরীমোহন। হেমচন্দ্র ধনীসন্তান, বহু সহস্র মুদ্রা ডিপজিট দিয়া, কলিকাতার কোনও প্রসিদ্ধ সওদাগরি আফিসের কেশিয়ারি কর্ম্ম করেন। কিশোরী-মোহন মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান,—বিশেষ কিছু করেন না—বক্তৃতা করেন। মধ্যে মধ্যে মাসিকপত্রে কবিতাও লেখেন।

চা পান শেষ করিয়া, অত্যন্ত গরম বোধ হইল, তাই হেমচন্দ্র জাপানী কিমোনোটি খুলিয়া ফেলিলেন। পাখা-কুলিকে সজোরে পাখা টানিতে আদেশ দিয়া, বলিলেন—"আর ত কল্‌কাতায় তিষ্ঠান যায় না।"

কিশোরী বাবু বলিলেন—"ছুটির দরখাস্ত করেছিলে তার কি হল?"

"ছুটি পাব। বোধ হয় আগামী শনিবার থেকেই ছুটি পাব। এই চার পাঁচ দিনই বা কাটে কি করে?"

"আচ্ছা দার্জ্জিলিঙে এখন কেমন শীত?"

মুখ হইতে সিগারেটের ধূম উদ্গীর্ণ করিতে করিতে হেমচন্দ্র বলিলেন—"শীত—অর্থাৎ—এখানে পৌষ মাঘ মাসে যেমন হয়, সেই রকম আর কি।"

"রাত্রে লেপ গায়ে দিতে হয়?"

হেমচন্দ্র হাস্য করিয়া বলিলেন—"বেশ দিতে হয়। দুখানা কম্বল সহ্য হয়।"

"দূরে—মাঝে মাঝে দেখা যায় বৈকি।—তা, তোমার কবিতা লেখবার খুব সুযোগ হবে। কবিতার উপকরণ সেখানে যথেষ্ট পাবে।"

আগ্রহের সহিত কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—"কি রকম?"

"এই ধর—চারিদিকে শৈল শ্রেণী—'উত্তুঙ্গ' মানে কি হে?"

ঈষৎ হাস্য করিয়া কিশোরী বলিল—"'উত্তুঙ্গ' মানে উঁচু।"

"তা হলে ঠিকই বলেছিলাম। চারিদিকে উত্তুঙ্গ শৈলশ্রেণী। পরিষ্কার দিনের আলোতে তাদের গা—বেশ সবুজ। না, ঠিক হল না;—Emerald যাকে বলে তার বাঙ্গলা কি?"

"মরকত।"

"মরকত? বা, বা, বা—সুন্দর কথাটি। পরিষ্কার দিনের আলোতে, তাদের অঙ্গ মরকতবৎ কান্তি ধারণ করে। যখন আবার মেঘ ওঠে, তখন তাদের দেহবর্ণ শ্যামায়মান। 'শ্যামায়মান' কথাটা ঠিক হল ত? ব্যাকরণ ভুল হচ্চে না?"

"বলে যাও।"

"যখন সূর্য্যোদয় হয়নি—তখন তাদের বর্ণ ধূসর,—যেন যোগীবর ধ্যানস্থ। কেমন বলছি?"

"বেশ বলছ।"

"এইত গেল প্রাকৃতিক শোভা। তারপর, সেখানে মাঝে মাঝে পার্ব্বতীয় সুন্দরীর মুখপদ্ম বিকসিত হয়ে ওঠে। আমি এক একটা রং দেখেছি,—য়ুরোপীয়দের মত পরিষ্কার; অথচ ওদের মত ফ্যাকাসে নয়, বেশ গোলাপী রং। কেমন, কাব্যকলা চর্চ্চা করবার উপযুক্ত স্থান নয়?"

কিশোরীমোহন বলিল—"তাই ত মনে হচ্চে। অনেকদিন থেকে ইচ্ছে, একবার দার্জ্জিলিঙটে বেড়িয়ে আসা। তা আর হয়ে ওঠে না। উপযুক্ত সঙ্গীর অভাবেই হয় নি! এবার বেশ আমোদে থাকা যাবে।"

"তোমার কাপড় চোপড় সব তৈরি হল?"

"কি কি তৈরি করালে ?"

"একটা কাশ্মীরা সুট, দুটো ফ্ল্যানেলের সুট, আর দুই প্রস্থ রাত-কাপড়।"

"দুই প্রস্থ রাত-কাপড় মাত্র ? তাতে ত হবে না।"

কিশোরী একটু লজ্জিত হইয়া বলিল—"কিছু ধুতি টুতিও সঙ্গে নিয়ে যাব কিনা।"

হেমচন্দ্র যদিও বিলাত-প্রত্যাগত সাহেব নহেন, তথাপি তাঁহার একটি সিবিলিয়ান জাটতুতো ভাই আছে। সেই সুবাদে ইনি সাহেব। ধুতি পরার অত্যন্ত বিরোধী। তাই বলিলেন—"আরে না, না। দার্জ্জিলিঙে আর ধুতি টুতি নিয়ে গিয়ে কায নেই।"

কিশোরীমোহন একটু সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—"আচ্ছা—তবে আরও দুটো রাত-কাপড়ের সুট তৈরি করতে দিই, না হয়।"

"তাই দাও।"

কিশোরীমোহন লোকটা যতদূর সৌখীন, তাহার আর্থিক অবস্থা ততটা স্বচ্ছল নহে। তাহার পিতা সামান্য কিছু বিষয়সম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহারই আয় হইতে তাহার কলিকাতার ব্যয় নির্ব্বাহ হয়। সে নিজে অবিবাহিত। তাহার বড়দাদা পশ্চিমে ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট্‌,—মা সেইখানেই থাকেন। তাহার স্কন্ধ সংসারভার শূন্য।

"তাই দাও।" বলিয়া, পাখাওয়ালাকে হেমচন্দ্র বলিল "সবুর।" পাখা থামিলে, সে নিজে একটি সিগারেট ধরাইল এবং কিশোরীকে একটি দিল। আবার পাখা চলিতে লাগিল।

কিশোরী বলিল—"কলার নেকটাই গুলো, হ্যাট্‌ ট্যাট্‌ এগুলো কেনবার সময়, তুমি সঙ্গে থাকলেই ভাল হয়।"

"আচ্ছা,—তা আমি সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে কিনে দেব এখন।"

কিশোরীমোহনের অপর বন্ধুবান্ধব কেহ এ সময় উপস্থিত থাকিলে হাস্য করিত। তাহারা এ পর্য্যন্ত কেহই জানে না যে কিশোরীকে

বেশধারী বাঙ্গালীকে সে কত না বিদ্রূপ করিয়াছে—তাহাদিগকে স্বজাতিদ্রোহী পর্য্যন্ত বলিতে সে কুণ্ঠিত হয় নাই। এ সম্বন্ধে তাহার ব্যঙ্গপূর্ণ কয়েকটা কবিতাও আছে। সেই কিশোরীমোহন এই প্রথম দার্জ্জিলিঙে যাত্রা করিবার প্রাক্কালে "মিষ্টার" হইবার ষড়যন্ত্র করিতেছে। আহারাদি সম্বন্ধে তাঁহার "হিঁদুয়ানি" পূর্ব্ব হইতেই ছিল না। আজ বৎসরখানেক হেমচন্দ্রের সঙ্গে জুটিয়া, ছুরি-কাঁটা ধারণ বিলক্ষণ অভ্যাস করিয়া লইয়াছে। কিন্তু সে গৃহাভ্যন্তরে—সুতরাং অপেক্ষাকৃত নির্ঝঞ্ঝাট। বিদ্রূপের আশঙ্কায় সে এ পর্য্যন্ত সাহেবী পোষাকে দেহাবৃত করিতে সক্ষম হয় নাই। এবার তাহা করিবে।

তাহার আর একটা বাসনা আছে—তাহাও চরিতার্থ করিবার সুযোগ উপস্থিত হইবে। তাহার মনে মনে অনেক দিন হইতে সাধ, বিলাত-ফেরৎ সমাজে একটু মেলা-মেশা করে। পোড়া ধুতি ও চাদরের শৃঙ্খল এতদিন কাটিয়া উঠিতে পারে নাই বলিয়াই সে সুযোগ লাভ হইতে বঞ্চিত আছে। এ সব বিষয়ে অনেক পূর্ব্ব হইতেই হেমচন্দ্রের সহিত তাহার পরামর্শ স্থির হইয়া আছে।

বেহারা একখানি পত্র আনিয়া এই সময় হেমচন্দ্রের হস্তে দিল। পত্র পাঠ করিয়া হেমচন্দ্র বলিল—"ভালই হল। ঘোষেরাও যাচ্ছেন।"

"মিষ্টার ঘোষ?"

"না, মিষ্টার ঘোষ হাইকোর্ট বন্ধ না হলে কি করে যাবেন? মিসেস্ ঘোষ আর তাঁর মেয়ে দুটি। আমাকে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন, আমি কবে যাব, তাহলে তাঁরাও আমার সঙ্গে যেতে পারেন।"

"সে ত ভালই হয়।"

"খুব ভাল হয়। সেখানে গিয়ে, ক্রমশঃ মিসেস্ ঘোষের বড় মেয়েটির সঙ্গে আমি প্রেমে পড়ব এখন, ছোট মেয়েটির সঙ্গে তুমি

এই মেয়ে দুইটি প্রসিদ্ধা সুন্দরী। কিশোরীমোহন ইহাদিগকে দূর হইতে দেখিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে,—আলাপ হইবে,—ইহা মনে করিতে কিশোরীমোহনের ললাট ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিল। দেখিয়া, হেমচন্দ্র হাসিয়া বলিল—"আর তা যদি না পছন্দ হয়,—তুমিই না হয় বড়টিকে বিয়ে কোরো—আমি ছোটটিকে নেব।"

কিশোরী রুমালে ঘাম মুছিয়া বলিল—"তোমার ত কেবল মুখই সার। প্রেমে পড় কৈ? তোমার মত সুযোগ পেলে আমরা এতদিন কোন কালে বিয়ে থাওয়া করে ভদ্রলোক হয়ে পড়তাম। তোমার হৃদয়টি পাষাণের মত কঠিন। কন্দর্পের বাণ ওতে ঠেকে, ভোঁতা হয়ে ফিরে যায়।"

হেমচন্দ্র তখন ব্যঙ্গ করিয়া, নিরাশ প্রণয়ীর ন্যায় বক্ষে হাত দিয়া, করুণার স্বরে কহিল—

"ভাই,—আমার হৃদয় কঠোর? আমার হৃদয়ে ঠেকে কন্দর্পের বাণ ভোঁতা হয়ে ফিরে যায়? তা নয়, তা নয়। আমার হৃদয় মাখনের মত কোমল। কন্দর্পের চারটি পাঁচটি বাণ এতে বিঁধে রয়েছে।"

"অর্থাৎ?"

"অর্থাৎ আমি এমনিই মূঢ় যে একেবারে চার পাঁচটি মেয়েকে ভালবেসে ফেলেছি। কোন্‌টিকে বিয়ে করব কিছুই ঠিক করতে পারিনে,—তাই এতদিনেও আমার আইবুড়ো নাম ঘুচ্‌ল না।"

এইরূপ কিয়ৎক্ষণ হাস্য-পরিহাস চলিল। ক্রমে নয়টা বাজিল। রৌদ্র-তেজ প্রবল হইতেছে দেখিয়া, সেদিনকার মত কিশোরীমোহন বিদায় গ্রহণ করিল। আগামী রবিবার দিবস দার্জ্জিলিঙ যাত্রাই স্থির।

(ক্রমশঃ)

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

চিত্রকলা।

কিছুদিন গত হইল, জনৈক প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় চিত্রকর আফ্রিকায় কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন করিতেছিলেন, একজন অসভ্য আফ্রিকাবাসী সেই সময় তাঁহার পশ্চাৎভাগ হইতে বলিয়া উঠিল,— "উহা আবার আঁকিতেছ কেন, ঐ সকল গাছ, পাতা, ফুল ত এই খানেই আছে ?"

চিত্রকর তখন এই কথায় কর্ণপাত করেন নাই, কিন্তু বাটীতে ফিরিয়া আসার পর অসভ্য-উচ্চারিত প্রশ্নটী বারংবার তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল,—"যাহা আছে, তাহা আঁকিবার প্রয়োজন কি ? স্বভাবের প্রতিলিপি গ্রহণই কি চিত্র-বিদ্যার চরম সফলতা ও মুখ্য উদ্দেশ্য ? ইহা হইতে মহত্তর লক্ষ্যে চিত্রকরের তুলি নিযুক্ত হইতে পারে না ?"

বর্ত্তমান যুগে চিত্রকলা প্রকৃতির নিকট দাসখৎ লিখিয়া দিয়াছে, ভানুমতীর তিলটি বাদ্ পড়িবার উপায় নাই, তাহা হইলে চিত্র-শ্রম পণ্ড হইয়া পড়ে, লোকের এই ধারণা।

প্রাচীনকালে চিত্রবিদ্যা, প্রকৃতির শাসন অমান্য করিয়া, রাজ্ঞীর ন্যায় স্বীয় পন্থায় অবাধে চলিত, দেবদেবী কল্পনায় উহা দেহতত্ত্বের সর্ব্ব প্রকার নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া নিজের যথেচ্ছাচারে প্রীত হইত। এমন কি র‍্যাফেল যখন ম্যাডনা-চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন তখনও কলা-বিদ্যা প্রকৃতির সখী বা পরিচারিকা বলিয়া নিজের পরিচয় দেয় নাই। ম্যাডনা-মূর্ত্তিকে এখনকার দেহতত্ত্বের সূক্ষ্ম বিচারাধীন করিলে তাহা সর্ব্বাঙ্গ-শুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইবে কিনা সন্দেহ। এখনকার সামান্য বিলাতী ছবিরও আকার, গঠন প্রভৃতি নিখুঁৎ ; তাহা ফটোগ্রাফ ও

মডেল সাম্‌নে রাখিয়া অঙ্কিত হইয়া থাকে। এনাটমি শাস্ত্র আধুনিক চিত্রের বেদ—উহার আদেশ অমান্য করিলে চিত্র সর্ব্বথা নিন্দিত হইয়া থাকে।

কিন্তু সেই প্রাচীন চিত্রগুলি যে সৌন্দর্য্য ও মহত্বকে জীবন্ত করিয়া দেখাইত, এখনকার ছবি সমস্ত অঙ্গশুদ্ধির গৌরব লইয়াও তাহার আভাষমাত্র প্রদান করিলেই কৃতার্থ হইতে পারে। রূল টানিয়া সরল রেখা রচনা করা যায়, রাসায়নিক পুস্তক পড়িয়া বর্ণবৈচিত্র্য সংঘটন করাও সহজ—এ সকল গিল্টি করার উপাদান, ভাবের খাঁটি সোণা না দিতে পারিলে র‍্যাফেল কি মাইকেল এঞ্জলোর চিত্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অসম্ভব।

এখনকার চিত্রে যে জীবন নাই, একথা বলা হইতেছে না—বরং ক্ষণিক সুখ, দুঃখ, বিরক্তি, ক্রোধ, হর্ষ প্রভৃতি সামান্য সামান্য মনোবৃত্তির লীলাখেলা য়ুরোপীয় প্রতিচিত্রেই সুস্পষ্ট—কিন্তু জীবনের নিম্নস্তর, অতি ক্ষণিক দিক্‌টাই এখন চিত্রকরের লক্ষ্য হইয়া থাকে। চিত্রের এখন সে উচ্চ আদর্শ নাই, যে চিত্র একবার দেখামাত্র ভাবরসে হৃদয় উন্মাদিত হইয়া পড়িত, কোন অপূর্ব্ব জগতের স্বপ্নের ন্যায় যাহা হৃদয়ের নিকট অশ্রুতপূর্ব্ব পুণ্যের বার্ত্তা বহন করিত,—যে চিত্র-দর্শন, বাল্মীকি বা হোমারের কাব্য পাঠের ন্যায় হৃদয়কে গৌরবমণ্ডিত করিয়া তুলিত—আধুনিক দেহতত্ত্বজ্ঞ, রসায়নশাস্ত্রজ্ঞ, সুপণ্ডিত চিত্রকর জগতকে আর সেরূপ চিত্র উপহার দিতে সমর্থ নহেন। চিত্রবিদ্যা সেই উচ্চ লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়াছে, উহা এখন প্রকৃতির পরিচারিকা-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে, চিত্রকরের তুলি মাথার কঙ্কাল হইতে নাকের ডগা পর্য্যন্ত সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ পরিমাণ করার জন্য গজ-কাটিতে পরিণত হইয়াছে। যে ভাবের অমৃত পান করিলে মানুষ অমর হয়, পূর্ব্বকার চিত্রকর ও ভাস্করগণ তাঁহাদের রচিত মূর্ত্তিতে সেই

চালিয়া দিতেন, এজন্য চিত্র ও মূর্ত্তিগুলি অমর হইত। আর যেরূপ দৈনন্দিন জাগতিক হর্ষ, ক্রোধ, হিংসা বা সুখের অভিনয়-স্বপ্ন দিনান্তেই নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়, এখনকার চিত্রও সেইরূপ দুদণ্ডের কৌতূহল উদ্রেকপূর্ব্বক অচিরে বিস্মৃতি ও উপেক্ষার সমাধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইটালির জগৎ-প্রসিদ্ধ চিত্রকলাকে বৈজ্ঞানিক-যুগ শুদ্ধ করিতে যাইয়া নষ্ট করিয়াছে—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এলিফাণ্টা গুহায়, উড়িষ্যার নীলগিরিতে ও কণায়ক মন্দিরে, সমুদ্রের দূরপ্রান্তে সুপ্রসিদ্ধ বরোবোদর মঠে হিন্দুর যে সকল চিত্র ও ভাস্কর-কর্ম্মের নিদর্শন আছে তাহাতেও হৃদয়ে উচ্চভাব জাগাইবার চেষ্টা দৃষ্ট হইয়া থাকে,—সেই সকল আলেখ্যও পার্থিব-লক্ষ্যের ধূলিমলিন নহে। এখনকার দেহ-বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম পরীক্ষায় তাহারা বিশুদ্ধ বলিয়া গৃহীত হইবে না—কিন্তু তথাপি তাহাদের একটা স্থান আছে, তাহা কলা-বিদ্যার নিজের স্থান, প্রকৃতি সে স্থানে ঢুকিয়া তাহার গর্ব্বিত আদেশ প্রচার করিতে সাহসী নহেন, সেখানে কলা-বিদ্যাই রাজ্ঞী—প্রকৃতি সহচরী মাত্র।

ধর্ম্মভাবই কলা-বিদ্যাকে পূর্ণ উৎকর্ষ প্রদান করিতে সমর্থ। জড়-বিজ্ঞান "চাল চিত্র" করিবার উপকরণ প্রদান করিতে পারে, কিন্তু উচ্চ ধর্ম্মভাবই চিত্রকরকে চিত্রের দেবতার চরণপ্রান্তে পৌঁছাইতে সমর্থ।

ওই ধর্ম্মভাব আমাদের দেশে এখনও মৃত নহে,—সুতরাং এদেশীয় চিত্রকর যেন য়ুরোপীয় চিত্র-শালায় শিক্ষালাভ করিয়া জড়-বিজ্ঞানের কুহকে একান্ত মুগ্ধ না হন,—চিত্রের আদর্শস্থান যে স্বর্গ, তাহা উপেক্ষা করিয়া এনাটমির প্রতি অতিরিক্ত অনুরাগ প্রদর্শন না করেন,—ইহাই বাঞ্ছনীয়।

আমাদের দেশে চিত্র-বিদ্যার এখন একরূপ মৃতাবস্থা—এই সময়েও চিত্রে প্রাচীন ভাবের লক্ষণ আবিষ্কার করা অসম্ভব নহে। চট্টগ্রাম,

ব্রহ্মদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া ইরাণ, তুরাণ প্রভৃতি এসিয়ার নানাপ্রদেশ হইতে বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়া মিউজিয়ামে রক্ষিত হইয়াছে, এখনও ভারতের অনেক স্থানে বুদ্ধ-মূর্ত্তি প্রস্তুত ও অঙ্কিত হইয়া থাকে,—এই সকল মূর্ত্তি অনেক স্থানেই বিশ্রী। কোথায়ও মঙ্গোলিয়ান জাতি, বুদ্ধের স্থূল অধর, কুটিল চক্ষু, বিসদৃশ গণ্ড রচনা করিয়াছে, অন্যত্র তাঁহার শ্রুতিদ্বয় অমানুষিক ভাবে দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে—কিন্তু প্রত্যেক মূর্ত্তিরই একটা বিশেষত্ব এই যে, উহা প্রশান্ত ভাবটিকে মূর্ত্তিময় করিয়া দেখাইতেছে। কামনা নির্ব্বাপিত হইলে, ইন্দ্রিয় নিশ্চল হইলে, যে শান্তি দেদীপ্যমান হয়—প্রত্যেক বুদ্ধমূর্ত্তিতেই সেই ভাবটি দৃষ্ট হইয়া থাকে ;—সমস্ত য়ুরোপীয় চিত্রশালায় এইরূপ একটি মূর্ত্তি দৃষ্ট হইবে না। আমাদের দেশের একটি সামান্য চিত্রকর, যাহার কলা-বিদ্যার জ্ঞান উপহাস-যোগ্য, সেও তাহার স্থূল তুলির এক আঁচড়ে এই শান্তির ভাবটি আদায় করিতে পারিবে, অথচ য়ুরোপীয় চিত্রকরগণ এই ভাবটি যতই না কেন চিত্রে অঙ্কন করিতে চেষ্টা করুন, নির্ব্বিকার সমাধির ভাব তাঁহাদের তুলিতে আনয়ন তত সহজ নহে। অঙ্কিত মুখে একটা পার্থিব ভাবের রেখা (Expression) থাকিয়া যাইবে।

জাতীয় তপস্যা, জাতীয় সমস্ত উদ্যমকে অনুপ্রাণিত করে—সেই উদ্যম সাহিত্য, বিজ্ঞান, বা কলা-বিদ্যা যে আকারেই ব্যক্ত হউক না কেন—তাহাতে আসে যায় না ; অধ্যাপক জগদীশ বাবু বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া বেদান্তের সূত্র প্রতিপন্ন করিতেছেন, আমাদের দেশের লোক যে বিষয়েই চর্চ্চা করুন না কেন, যদি তিনি উৎকৃষ্ট সফলতা লাভ করিতে চান, তবে তাঁহাকে আমাদের জাতীয় আদর্শের মধ্য দিয়া ধরা দিতে হইবে। সুতরাং যখন দেখিতে পাই, কোন দেশীয় সুপ্রসিদ্ধ চিত্রকর গঙ্গার উৎপত্তি বিষয়ক ছবি আঁকিতে যাইয়া দেখাইয়াছেন

রুদ্রকে ঠিক একটি সাহেবের মত রচনা করিয়াছেন, শিব পদদ্বয় দু'ফাঁক করিয়া কটিতে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া এমনই ভাবে চাহিয়া আছেন, যেন চুরুটটি এই মাত্র তাঁহার মুখচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে—তাহার গোঁফ দুইটি ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া অধুনাতন ফরাসী ভাবে সুকুঞ্চিত। কিংবা যখন অপর একটি চিত্রকরের অঙ্কিত শকুন্তলার চিত্রে কণ্বমুনি ঠিক পাদ্রীর মত পরিচ্ছদ পরিয়া পাদ্রীর মত দুবাহু উত্তোলনপূর্ব্বক বিচিত্র বস্ত্র ও বডিস-মণ্ডিতা বিবির ভঙ্গীতে দণ্ডায়মানা শকুন্তলাকে আশীষ করিতেছেন, মুনিবরের শিষ্য এবং শকুন্তলার সখীদিগের মুখে ও ভঙ্গীতে বিলাতী নকল আরও স্পষ্টতর হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে, তখন বিস্ময়ের সহিত আমাদের মনে এই দুঃখের ভাব উপস্থিত হয়—যে সকল ভাব ভারতের নিজস্ব, তাহা খুঁজিতেও কি আমরা য়ুরোপে যাত্রা করিব? ধ্যানপরায়ণ দেবাদিদেবের মূর্ত্তির যদি কোন আভাষ থাকে, তাহা ভারতবর্ষেই আছে, মহাদেবত্ব ঘুচাইয়া সেস্থানে সাহেবত্ব প্রদান করিলে চিত্রকরের কি উদ্দেশ্য সাধিত হইবে, তাহা নির্ণয় করা শক্ত। নিরীহা তপোবনবাসিনীদের চিত্র বরং পল্লীবাসিনীদিগের মূর্ত্তি হইতে সঙ্কলন করা সম্ভব, বিবির সহিত তাহাদের কোন সাদৃশ্য থাকিতে পারে না এবং এ দেশে এখনও শত শত সন্ন্যাসী থাকিতে গির্জ্জাঘরে ঢুকিয়া কণ্বমুনির আদর্শ পাদ্রী হইতে সংগ্রহ করায় অথবা শার্ঙ্গরব ও শারদ্বতের মুখে য়ুরোপীয় মধ্যযুগের নাইটদিগের ভাব ফলাইলে চিত্রের কোন উৎকর্ষ হইবে, এ কথা আমরা মোটেই স্বীকার করিতে পারি না। পূর্ব্বোক্ত চিত্রকরদ্বয় পৌরাণিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া দেশের রুচি অনেকটা সংশোধিত করিয়াছেন, বহু চিত্রে তাঁহাদের অনন্য-সাধারণ দক্ষতা আমরা স্বীকার করিতে বাধ্য, যে ত্রুটির বিষয় উল্লিখিত হইল তাহা অনায়াসে বর্জ্জিত হইতে পারে। গঙ্গার উৎপত্তি সম্বন্ধীয় চিত্রটিতে গঙ্গা-মূর্ত্তি দেশীয় আদর্শ রক্ষা করিয়া

লাবণ্যময়ী হইয়া উঠিয়াছে—শিবকে বিদেশীয় আদর্শে বিকৃত না করিলে এই চিত্রটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারিত। পরবর্ত্তী চিত্রকরগণ জাতীয় চিত্রশালায় জাতীয় আদর্শ প্রদান করিবেন, আশা করা যাইতে পারে।

দেশের লোকজন চতুর্দ্দিকে, দেশীয় ভঙ্গী, দেশীয় আচার ব্যবহার বায়ুর স্তরের ন্যায় আমাদিগকে চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া আছে, অথচ কি আশ্চর্য্য, ছবি আঁাকবার সময় আমরা বিদেশীয় চিত্রগুলিকেই আদর্শ করিয়া থাকি, জীবন্ত মডেলগুলির প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করি। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকৃত বুদ্ধ ও সুজাতার ছবি সম্বন্ধে বন্ধুমণ্ডলীর মধ্যে একটা তর্ক উঠিয়াছিল, এই ছবিখানি বিলাতি আর্ট ষ্টুডিও পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল,—ছবি খানিতে বুদ্ধের কর্ণ সুদীর্ঘ, অঙ্গুলীগুলি একটু সরু, হয়ত দেহতত্ত্বের পরিমাণ সর্ব্ব বিষয়ে বুদ্ধমূর্ত্তি রক্ষা করে নাই, এই সব উল্লেখ করিয়া জনৈক বন্ধু চিত্রটার নিন্দা করিতেছিলেন। কিন্তু অপর একটা বন্ধু তাঁহাকে বলিলেন—আপনি ভাল করিয়া দেখুন, এই ছবিতে বুদ্ধমূর্ত্তি প্রশান্ত নির্ব্বিকার মহাপুরুষের আদর্শ রক্ষা করিয়াছে কি না, বুদ্ধমূর্ত্তি একটি পরম শান্তির ভাবে স্বর্গীয় শ্রীমণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে কি না, সুজাতার ভক্তি-নম্র বিনয় এবং পরম শ্রদ্ধার নীরব অভিব্যক্তি নেত্র-প্রীতিকর হইয়াছে কি না এবং সুজাতার উপহার দেব-কল্প মহাত্মার শ্রীচরণে উৎসর্গীকৃত সামগ্রীর মত দেখাইতেছে কি না, এই ভাব যদি চিত্রে সুব্যক্ত হইয়া থাকে, তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাপ খুব বিশুদ্ধ নাই বা হইল। সমালোচকটি কিছু কাল ছবি খানি দেখিয়া এই ভাবটি ধারণা করিতে সহজেই সমর্থ হইলেন কারণ চিত্রে তাহা জীবন্ত হইয়া রহিয়াছে।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশুদ্ধি সহজেই চিত্রকরের তুলির আয়ত্ত হইতে পারে,

প্রাগুক্ত চিত্রে দেশীয় ভক্তের চিরাগত সংস্কারের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চিত্রকর অঙ্গ-বিশুদ্ধির নিয়মের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন নাই। দেব-মন্দিরের পবিত্রতার উপর হস্তক্ষেপ করা চিত্রকরের পক্ষেও অনুচিত। গণেশ আঁকিতে যাইয়া সুন্দর নরমুখ প্রদান করিলে—দেবতা আর মন্দিরে স্থান পাইবেন না, মুষিকের পক্ষে একটি বিপুল দেব-দেহের ভার বহন করা জড়-জগতের নিয়মানুসারে অসাধ্য হইলেও চিত্রকর গণেশ ঠাকুরকে হস্তীপৃষ্ঠে আরূঢ় করিয়া আঁকিতে পারেন না। সমস্ত বৌদ্ধ-জগৎ বুদ্ধদেবের কর্ণ অস্বাভাবিক ভাবে সুদীর্ঘ কল্পনা করিয়াছেন,—এখন কোন চিত্রকর তাঁহাকে ঠিক সাধারণ মানুষের মত আঁকিলে ভক্তমণ্ডলী সেই মূর্ত্তি গ্রহণ করিবেন না।

নবজলধর বর্ণ, নবদূর্ব্বাদলশ্যামরূপ, এগুলি লইয়া বর্ত্তমান ভারতীয় আর্ট-স্কুলের ছাত্রগণ একটু গোলমালে পড়েন।

আমরা যাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করি—কিংবা সাধারণ মানুষ অপেক্ষা অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ কল্পনা করি, তাঁহার রূপে কোন অপার্থিবত্ব প্রদান করিলে, বরং তাহা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়,—এবং সেই অপার্থিবত্বটুকু যদি আমাদের দেশের চিরাগত সংস্কার ও ভক্তি-বারিতে অভিষিক্ত হয়, তবে তাহার অন্যথা করিলে, চিত্র কখনই সাধারণের নিকট গৃহীত হইবে না;—চিত্রকর শুধু বর্ণসমাবেশ ও রেখাপাত শিক্ষা করিয়াই ক্ষান্ত থাকিবেন না, তাঁহাকে ভক্ত ও প্রেমিকের মনের ভিতর প্রবেশ করিতে হইবে। চিত্রকর যদি কালা-পাহাড়ের মূর্ত্তিতে দেবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া বাহুল্য বোধে ঠাকুর-দেবতাদির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্ত্তন আরম্ভ করেন, এবং অতিরিক্ত বিবেচনা করিয়া কোন গাঢ় বর্ণ মুছিয়া তরল করিতে প্রয়াসী হন, তবে তিনি দেবমন্দিরে প্রবেশের যোগ্য নহেন বলিয়াই আমরা মনে করিব,—

সন্দিহান হইব, কারণ চিত্র-শালার সর্ব্বোচ্চ শিখরদেশ—ভক্তি ও প্রেমেরই লীলাভূমি, সে স্থানে প্রকৃতির দোহাই দিয়া চিত্রকর খড়্গ-হস্তে প্রবেশ করিতে পারে না। তবে নরত্ব ও দেবত্বের একটি সংযোগ-স্থল আছে, সেই সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নহে। কোন্ বর্ণে সেই সীমার মর্য্যাদা রক্ষিত হয়, কোন্ টানে দেবতা রাক্ষস হইয়া যান্, কিম্বা কোন্ সূক্ষ্ম রেখা ও বর্ণ মিলনে মানুষের মুখে দেবত্ব বিকাশ পাইয়া উঠে, তাহা প্রেমিক চিত্রকর জাতীয় জীবনের অন্তঃস্থলে সন্ধান করিয়া স্বীয় ভক্তিবিহ্বল হৃদয়ে আবিষ্কার করিয়া লইবেন। নীলনীরদবর্ণের মাধুর্য্য, নব-দুর্ব্বাদলের সরসতা তাঁহার তুলি কখনই উপেক্ষা করিবে না; বহু হস্ত, বহু মুখ,—তাঁহার অঙ্কন-নিপুণতায় বিরাট দেবতার মহাভাব উদ্রেক করিবে, বর্ব্বর চিত্রকর তাহা কীট পতঙ্গেরই যোগ্য বলিয়া অনাদর করিতে পারেন, কিন্তু মহাভাব উদ্রেক করিতে হইলে, কবি ও চিত্রকরকে স্বর্গ-মর্ত্ত্যের সমস্ত শক্তির শুভ সংযোগের জন্য প্রয়াসী হইতে হইবে সেই মহতী কল্পনা মানুষের দেহতত্ত্বে সীমাবদ্ধ থাকে না, যাহা অসম্ভব, অশ্রুতপূর্ব্ব তাহার সমাবেশ করিয়া সুন্দর ও ভীষণ রূপ গঠিত হইয়া থাকে—এই অবাধ কল্পণাই—কাব্য ও চিত্রের প্রাণ। এইরূপ কল্পনায়ই মিল্টনের লুসিফার কোন সময় এট্‌লাস শৃঙ্গের মত গগনস্পর্শ করিয়া দাঁড়াইতেছেন, কখনও বা ভেকের রূপ ধারণ করিয়া ইভের কর্ণমূলে স্বপ্ন-বাণী উচ্চারণ করিতেছেন।

পৌরাণিক ছবির ভাব আমাদিগের জাতীয় জীবনের বহু তপস্যা, বহু কৃচ্ছ্রসাধন, বহু উপবাস, বহু মানৎ ও বহু সম্ভ্রমের সঙ্গে বিজড়িত, সুতরাং এ ক্ষেত্রে দর্শকের চক্ষু কবির ভাবে, পূজকের ভাবে পূর্ব্ব হইতেই সুপ্রস্তুত আছে;—জাতীয় সমাদর লাভ করিতে হইলে

এস্থলে তাঁহার সামান্য গুণপনাও সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে রঞ্জিত হইয়া উঠিবে, এবং বহু ত্রুটি উপেক্ষিত হইবে।

জাতীয় সাধনা যেখানে, সেই পরম পীঠস্থানের নিম্নে বসিয়া বিনীত ভাবে এতদ্দেশীয় চিত্রকরকে চিত্রাঙ্কন শিক্ষা করিতে হইবে। সর্ব্বত্রই দেশীয় জীবনের প্রতি লক্ষ্য স্থির রাখিতে হইবে, কারণ যেখানে নিত্য-প্রত্যক্ষ দৃশ্য, সেই মহা উৎসের অনুসন্ধান না করিয়া বিদেশের ছবি হইতে কল্পনার উদ্বোধন প্রত্যাশা করিলে চিত্রকর ও চিত্রের বিড়ম্বনার একশেষ হইবে। ছবির প্রতিলিপি লইয়া কোন ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ চিত্র-করের মর্য্যাদা প্রাপ্ত হন নাই।

বিদেশী চিত্রকলা ধর্ম্মবন্ধনবিচ্যুত হইয়া অধুনা যে বিকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে, আমরা সেই আদর্শকে যেন পরিহার করিতে পারি। ভারত-বর্ষে, ধর্ম্মের কথা কখনও ব্যর্থ হয় নাই। এ দেশের শত শত ধর্ম্ম-উপাখ্যানের মধ্যে, কাব্য ও চিত্রের অফুরন্ত আদর্শ রহিয়াছে, সেই পুণ্য-কাহিনীর গৌরবমণ্ডিত হইয়া নব চিত্রশালা হইতে প্রতিভাবান্ চিত্রকরগণ চিত্রপট উপহার প্রদান করুন;—এদেশের লোকজন, এদেশের সাহিত্য-নাটক প্রভৃতির প্রতি যেন চিত্রকরের অনুসন্ধিৎসু সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আবদ্ধ থাকে। তিনি যদি রঙের বাক্স, আই-গ্লাস, তুলি ও ড্রয়িং কাগজ বিলাতী দোকান হইতে ক্রয় করেন, তবে আমরা মাথার দিব্য দিয়া তাহা নিষেধ করিব না। কিন্তু তিনি যদি মাতৃমূর্ত্তি আঁকিতে যাইয়া মেমসাহেব অঙ্কন করেন, শিবের গ্রীবাভঙ্গীতে জনবুলের ককুদের আভাষ প্রদান করেন, তাপসকুমারীতে বল্-নৃত্যপরায়ণা বিবির প্রগল্ভতার সৃষ্টি করেন, তবে তাহা অমার্জ্জনীয়, তাহা অমার্জ্জনীয়।

শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন।

আবেদন ও আন্দোলন।

আবেদনের মূলে সর্ব্বত্রই দুইটী ভাব লুকাইয়া থাকে। এক,—আপনার শক্তিসাধ্যে ঐকান্তিক অবিশ্বাস; অপর,—যাহার নিকটে আবেদন উপস্থিত করা যায়, তাহার শক্তি ও সদিচ্ছার উপরে অচলা আস্থা। আত্মশক্তিতে অবিশ্বাস ধর্ম্ম-রাজ্যে অমূল্য বস্তু। এই অবিশ্বাস হইতেই ক্রমে ভগবদ্ভক্তি জাগ্রত হইয়া জীবের ভববন্ধন মোচন করিয়া দেয়। কিন্তু রাজনীতি-ক্ষেত্রে প্রজার আত্মশক্তির উপরে এরূপ ঐকান্তিক অনাস্থা অতিশয় সাংঘাতিক বস্তু। ইহাতে অবস্থাবিশেষে রাজভক্তি জাগ্রত হইতে পারে, কিন্তু রাজ-বন্ধন কদাপি শিথিল হয় না।

কারণ, রাজনীতি মাত্রেই রাজসিক। আত্মবিলোপ নহে—আত্মপ্রতিষ্ঠাই ইহার মৌলিক ধর্ম্ম। রাজনীতি মাত্রেই নিরবচ্ছিন্ন শক্তিসংঘর্ষ ও শক্তিবন্ধ হইতে উৎপন্ন হয়। এ ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করিতে হইলে আত্মশক্তিকে জাগ্রত করিতে হয়, আত্ম-স্বত্বকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়, সর্ব্বস্ব পণ করিয়া আত্মস্বাধীনতাকে রক্ষা করিতে হয়। আজি পর্য্যন্ত রাজনীতি কেবল শক্তির খেলা ও বুদ্ধির খেলার উপরেই চলিতেছে। এখনো এ রাজ্যে প্রেমলীলা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, কখনো হইবে কিনা কে জানে?

আত্মপ্রতিষ্ঠা যেখানে লক্ষ্য, আত্মচেষ্টা সেখানে একমাত্র ধর্ম্ম। আত্মনিবেদনে প্রকৃত আত্মচেষ্টার মূল বিনষ্ট করিয়া ফেলে; এইজন্য রাজনীতি ক্ষেত্রে আবেদন-নিবেদন কদাপি মোক্ষহেতু হইতে পারে না।

ভারতে রাজনীতির মূলে প্রজার আত্মশক্তি এখনো প্রতিষ্ঠালাভ করে নাই। বহুকাল হইতে ভারতীয় রাজনীতি প্রজা-শক্তি বিহীন

কি বা কতটা ইহা আমরা জানিতাম না বলিয়াই,—ইংরেজ এক অদ্ভুত ইন্দ্রজাল প্রভাবে, অতি সামান্য শক্তির দ্বারা, এই বিশাল ভারত-সাম্রাজ্য অধিকার করিতে পারিয়াছে। সে এখন যতই বড়াই করুক না কেন, এদেশে ব্রিটীশ-রাজ্য গোরার সঙ্গীনে নয়, কিন্তু সিপাহীর তরবারির দ্বারাই যে মুখ্যতঃ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, ইতিহাস শতকণ্ঠে ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। ইংরেজ ভারতের রাজা—সত্য; কিন্তু প্রকৃত বিজেতা নহে। ইংরেজের যুদ্ধে ভারতবাসীই সর্ব্বদা ভারত-বাসীকে পরাভূত করিয়াছে। যে ক্ষাত্র-বীর্য্যের উপরে এদেশে ব্রিটীশ-প্রভুশক্তি আজিও এমন অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া রহিয়াছে, সে ক্ষাত্র-বীর্য্য ইংরেজের নহে, কিন্তু ভারতের হিন্দু-মুসলমানের। আমাদের শিখ, আমাদের জাট, আমাদের পাঠান, আমাদের পুরবীয়া, আমাদের গুরখা, আমাদের তামিল-তৈলঙ্গী—ইহারাই আপনাদের শক্তি-শোণিত-দানে ভারতে ব্রিটীশ-প্রভুশক্তিকে রক্ষা করিতেছে। ইহাদের শৌর্য্য-বীর্য্যই বিদেশেও ব্রিটীশের প্রতাপ-প্রতিপত্তির আশ্রয় হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজ, চক্ষের ইঙ্গিতে লক্ষ সিপাহী আশিয়া বা আফ্রিকার যেখানে-সেখানে সমবেত করিতে পারে বলিয়াই, এই দুই মহাপ্রদেশে তার এমন অখণ্ডপ্রতাপ প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

কিন্তু আমরা কদাপি আপনাদের এই বিপুল শক্তিশালিত্ব প্রত্যক্ষ করিতে চাহি নাই। নিত্য-মুক্ত-স্বভাবসম্পন্ন জীব যেমন সংসার-মোহে নিপতিত হইয়া, নিয়ত আপনাকে বদ্ধ বলিয়া মনে করে, এবং এই ভ্রান্তিনিবন্ধনই অকারণে অশেষ দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, রাজনীতি ক্ষেত্রে ভারতের ঊর্দ্ধত্রিংশ কোটী প্রজাবৃন্দের সেই দশাই ঘটিয়াছে। অজ্ঞানতা হইতেই জীবের ভববন্ধন ও আমাদের রাজ-বন্ধন উভয়ের উৎপত্তি। এই মোহেতেই তাহার স্থিতি। আর এই

কিছু চেষ্টা করিয়াছি, তৎসমুদায়ই এই মহা মোহপ্রণোদিত, সমুদায়ই—অবিদ্যাবদ্ধিপ্সণি। মোহাচ্ছন্ন জীব মুক্তির আশায় যে সকল যাগ-যজ্ঞাদি কর্ম্মে লিপ্ত হয়, তাহাতে তাহার বন্ধন ঘোচে না, বরং কাম্য-ভাবে আরো বাড়িয়াই যায়, সেইরূপ আমাদের প্রায় সর্ব্ববিধ রাজ-নৈতিক আন্দোলন ও আবেদনে, মূল বন্ধন শিথিল না হইয়া বরং আরো শক্ত, আরো বিস্তৃত, আরো জটিল হইয়াই পড়িতেছে।

এই মূল বন্ধন, বাহিরে নয়, ভিতরে। ব্রিটীশের রাষ্ট্রনীতিতে নহে, আমাদের অজ্ঞানতা ও শক্তি-সংযোগ-হীনতাতেই স্থিতি করিতেছে। আমরা যদি জ্ঞানবান হই, আমরা যদি শক্তিশালী হইয়া উঠি, আমরা যদি সংযোগক্ষম হইতে পারি,—তবে নিমেষের মধ্যে ব্রিটীশ-রাষ্ট্রনীতির প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতে পারে। আমরা যতদিন অজ্ঞ, অশক্ত, বিচ্ছিন্ন, ও আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিব, ততদিন ব্রিটীশ-নীতি স্বেচ্ছাতন্ত্র হইয়া চলিবে, ইহা অনিবার্য্য।

কারণ, এ জগতের সর্ব্বত্রই যেমন প্রজা তেমনি রাজা হয়। প্রজার প্রকৃতি রাজপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া থাকে, প্রজা যেখানে প্রবল, রাজশক্তি সেখানে আত্মপ্রয়োজনেই প্রজার বশ্যতা স্বীকার করিয়া, একান্তমনে প্রজার হিতকামনায় ও তাহার মনস্তুষ্টি সাধনে নিযুক্ত হয়। প্রজা যেখানে দুর্ব্বল, বিচ্ছিন্ন, আপনাদের মধ্যে কোনো প্রকারের সংযোগসাধনে অক্ষম, সুতরাং রাজশক্তির অনিষ্টোৎপাদনে সম্পূর্ণ অপারগ, রাজশক্তি সেখানে প্রকৃতি গুণেই যথেচ্ছাচারী ও প্রজারঞ্জন-বিমুখ হইয়া উঠে। রাজা অত্যাচারী বা অবিচারী হইলে, দোষ রাজার নহে, কিন্তু প্রজারই।

আমরা যেরূপ প্রজা—আমাদের রাজাও সেইরূপ। আমাদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন না ঘটিলে, এদেশের রাজশক্তির ব্যবহার ও রীতি-

ইংরেজ বিদেশী, তাই একদিকে এখনো আমাদের মধ্যে স্বল্পবিস্তর পরিমাণে ন্যায়বিচার ও সুশাসন প্রতিষ্ঠিত আছে। বিদেশী বলিয়াই সে কদাপি নিরাতঙ্ক হইতে পারে না। মুষ্টিমেয় ইংরেজ আপনার রাজদণ্ডকে ধারণ করিয়া, বিশাল সাগরোপম ভারতীয় প্রকৃতিপুঞ্জের মধ্যে, সতত সন্তর্পণে বাস করিতেছে। একদিন তাহাদের প্রজাভীতি অনেক বেশী ছিল। সে কালে ইংরেজরাজনীতিও দৃষ্টতঃ অত্যন্ত উদার ছিল। সে সময়েই ইংরেজ সেই সকল উদার প্রতিজ্ঞা প্রচার করিয়াছিল, যাহার উপরে আমাদের বর্ত্তমান আবেদন-আন্দোলনাদি সকলই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে।

ইংরেজ প্রথমাবধিই ভারতের সুশাসনের জন্য ব্যস্ত হইয়াছিল এই জন্য যে, সে জানিত যে প্রজার চিত্তহরণ না করিয়া কদাপি সে আপনার সামান্য শক্তিদ্বারা এত বড় দেশকে স্বাধিকারে রাখিতে পারিবে না। প্রজার আনুকূল্যেই সে মোগল-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রজার আনুকূল্যেই সে রাজদণ্ডচালনে সক্ষম হইতেছে। এই আনুকূল্য লোভেই তখন সে প্রজাবর্গকে বিবিধ প্রকারের সত্ত্বস্বাধীনতা প্রদান করিবার ইচ্ছা সতত প্রকাশ করিত।

এই আনুকূল্য লাভের আকাঙ্ক্ষার মূলে ইংরেজের প্রাণে প্রজাভীতি বিদ্যমান ছিল। যে যাহাকে ভয় করেন, যাহার প্রতিকূলতা হইতে কোনো অনিষ্টের আশঙ্কা থাকে না,—মানুষ কখনো তাহার আনুকূল্য লাভের জন্য ব্যস্ত হয় না। যখন আমাদের প্রতিকূলতা হইতে ইংরেজ আপনার গুরুতর বিপদ-আশঙ্কা করিত, তখন আত্ম-প্রয়োজনে ও স্বার্থের সন্ধানেই সে উদার, ন্যায়পরায়ণ ও প্রজারঞ্জনতৎপর হইতে চেষ্টা করিত।

ইংরেজের উদারতা যে সর্ব্বদাই প্রজাভীতি হইতে উৎপন্ন হইয়াছে,

শেষ শোণিত-তরঙ্গ তখনো একেবারে শুষ্ক হইয়া যায় নাই। সত্য হউক, মিথ্যা হউক, পুরুষ-রমণী বালক-বালিকা নির্ব্বিশেষে ইংরেজের উপরে সিপাহীদের অনুষ্ঠিত যে সকল নির্ম্মম অত্যাচারকাহিনী ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছে, সে সকল তখনো ইংরেজের প্রাণের গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে জ্বলিতে ছিল। ইংরেজ-সাধারণে, বিপ্লবাবসানে শোণিতলোলুপ নেকড়িয়াযূথের ন্যায় ভারতবাসীর শোণিত পানের জন্য চারিদিকে তখনো বিকট চীৎকার করিতেছিল। সে সময়ে, অমন নৃশংস অত্যাচারের স্মৃতি প্রাণে উজ্জ্বল থাকিতে, মানুষ তো দূরের কথা দেবতাও উদার, সুপ্রসন্ন, ও অনাবিল মৈত্রীভাবাপন্ন হইতে পারেন কিনা, সন্দেহ। কিন্তু ইংরেজ-রাজপুরুষ ক্যানিং ও ব্রিটীশ-সাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া এরূপ প্রতিকূল অবস্থাতেও যে এতটা উদার হইয়াছিলেন, ইহার মূলে দয়া ছিল না, দাক্ষিণ্য ছিল না, নরহিতৈষা ছিল কি না জানি না, কিন্তু প্রজাভীতি ছিল, ইহা সুনিশ্চিত।

ক্যানিং স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, সিপাহী-বিপ্লবে ভারতে ব্রিটীশের প্রভুশক্তিকে রাখিয়াছিল, গোরার সঙ্গীন নয়, কিন্তু ভারতের প্রজাসাধারণের আন্তরিক শুভ ইচ্ছা ও আনুকূল্য। সে বিপ্লবে ইংরেজের বেতনভোগী সিপাহীরাই তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিল,—প্রজাসাধারণে বাহ্যতঃ নিরপেক্ষ থাকিয়া, ভিতরে ভিতরে ইংরেজের সপক্ষতাই করিয়াছিল। প্রজাসাধারণে বিন্দু পরিমাণে যদি বিমুখ হইয়া দাঁড়াইত, তবে বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর ভারতেতিহাস অন্যরূপে চিত্রিত হইত। ক্যানিং এ সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

ভিক্টোরিয়াও আপনার প্রতিভাবলে দূর হইতে এ তত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনিও বিপ্লবাবসানে প্রজার আনুকূল্যের উপরে যাহাতে আপনার সিংহাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তারই উদ্দেশে,

তদবধি ইংরেজ প্রজার স্বত্বস্বাধীনতা বৃদ্ধির জন্য যখন যাহা কিছু করিয়াছে, তৎসমুদায়ের মূলেই সূক্ষ্মানুসন্ধানে, প্রজাভীতি লক্ষ্য করিতে পারা যায়। ইংরেজের শিক্ষাদীক্ষা, তন্ত্রমন্ত্র, সকলের মূলে ঐ বস্তু আছে। বিলাতী ছাঁচে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূলে এই প্রজাভীতি রহিয়াছে। ইংরেজি শিক্ষা পাইয়াছি বলিয়া আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ হই, ইংরেজ বন্ধুরা ইহা সর্ব্বদাই ইচ্ছা করেন। কটন-ওয়েডারবরণ প্রভৃতি ভারতহিতৈষীগণও এ সকলের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়া থাকেন। এতদিন এ সকলের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া, বা তাহার প্রতিবাদ করা অনাবশ্যক ছিল। কিন্তু ক্রমশঃই এই কৃতজ্ঞতার অজুহাতে যখন আমাদের বন্ধনরজ্জুকে আরো দৃঢ় করিবার চেষ্টা হইতেছে, তখন এ সকল মায়াজাল ছেদন করাও অত্যাবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ইংরেজীশিক্ষা কিরূপে এদেশে প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়, তাহার ইতিবৃত্ত আলোচনা করিলে, ইহার মূলে ইংরেজের পরার্থপরতা অপেক্ষা স্বার্থানুসন্ধিৎসাই বেশী পরিমাণে দৃষ্ট হইবে। এই বাংলাদেশে পাদ্রি কেরি সর্ব্বপ্রথমে ইংরেজিশিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করেন। কেরি লোকহিতৈষী ছিলেন। লোকহিতৈষা প্রণোদিত হইয়াই, তিনি তাঁহার মত ও বিশ্বাসানুযায়ী, ভারতের লোকের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত হন। এদেশের লোকের জ্ঞানবৃদ্ধির আশায়ই তিনি সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মতলায় একটী ইংরেজি-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কোম্পানীর অধীনস্থ রাজপুরুষেরা এই বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া, কেরিকে নির্ব্বাসিত করেন। ইংরেজিশিক্ষা প্রাপ্ত হইলে, লোকে বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে,—ইংরেজিশিক্ষা দিতে গেলে, কি জানি প্রজাবর্গ ধর্ম্মহানীর আশঙ্কায় উত্তেজিত হইয়া উঠে,—এই সকল কারণেই তদানিন্তন

কেরির স্কুল উঠিয়া যায়। পরে যখন কেরি এদেশের লোকের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার করিবার জন্য লালায়িত হন, তখন তাঁহাকে আপনার ঈপ্সিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য, ইংরেজের অধিকারের বাহিরে, দিনামাররাজ্যভুক্ত শ্রীরামপুরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। বাংলার সর্ব্ব প্রথম উচ্চশ্রেণীর ইংরেজি-বিদ্যালয় কোম্পানীর অধিকারে স্থান পাইল না,—এই সামান্য ঘটনাতেই ব্রিটীশের শিক্ষানীতির প্রকৃত স্বরূপের বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।

তারপর যখন ইংরেজ রাজপদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া, প্রজাবর্গের শিক্ষাবিধানে মনোনিবেশ করিতে লাগিল, তখন এ বিষয়ে যে তুমুল আন্দোলন ও আলোচনা হয়, তাহাতেও ইংরেজের শিক্ষানীতির কথঞ্চিৎ সন্ধান পাওয়া যায়। সে সময়ে এদেশে, এই বিষয়ে, ইংরেজ-কর্ম্মচারিগণের মধ্যে দুইটী বিরোধী দলের উৎপত্তি হয়। একদল এদেশের প্রচলিত ভাষার সাহায্যে এদেশেরই প্রাচীন শাস্ত্রসাহিত্য শিক্ষা দিবার প্রস্তাব করেন, আর একদল ইংরেজি ভাষার সাহায্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানাদি প্রচারের ব্যবস্থা করিতে চাহেন। কিছুকাল ধরিয়া এই দুই দলে যে বাক্‌বিতণ্ডা হইয়াছিল, তাহার আলোচনা করিলেই উভয় দলেরই নিগূঢ় উদ্দেশ্য যে প্রধানতঃ ও মুখ্যতঃ ব্রিটীশ-প্রভুশক্তির স্থায়িত্ব সাধন ও ব্রিটীশের শাসন-কার্য্যের সুবিধা করা, এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকে না। মেকলের যে কথা লইয়া আমরা সর্ব্বদা এত নাড়াচাড়া করি, যাহা উদ্ধার করিয়া আমরা ইংরেজের শিক্ষানীতির ও ইংরেজের শাসননীতির অলৌকিক ঔদার্য্য প্রমাণ করিতে চাই,—তাহাও মেকলের নিজের মূল লক্ষ্যকে ঠিক নির্দ্দেশ করে না; কিন্তু বিপক্ষীয়-দলের আপত্তি খণ্ডনের জন্যই যে উচ্চারিত হইয়াছিল, এবিষয়ে আর কোনো সন্দেহ থাকে না।

বাসার নূতন শিক্ষাকে আবদ্ধ রাখিতে চাহিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রধান যুক্তি ছিল এই যে, এতদ্বারা প্রজাকুল নির্ব্বিবাদে রাজশক্তির অধীন হইয়া বাস করিবে। যে শক্তিতে ইংরেজ ভারতে স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, বেদবেদান্তে, ন্যায়ে, দর্শনে, পুরাণস্মৃতিতে, কাব্যে, জ্যোতিষে, তাহার সন্ধান নাই। দেশের পুরাতন সাধনা ও সভ্যতার মধ্যে তাহার বর্ত্তমান শক্তিহীনতার মূল রহিয়াছে। বিদেশী রাজার, আত্মরক্ষার জন্য, সে শক্তিহীনতাকে পোষণই করিতে হয়। যে মোহে লোকপুঞ্জ এতকাল আচ্ছন্ন রহিয়াছে, যে অজ্ঞানতা ও নিশ্চেষ্টতা-নিবন্ধন মুষ্টিমেয় বিদেশী সামান্য বণিকবেশে এদেশে আসিয়া, অগণিত প্রজাপুঞ্জকে আত্মবশে আনিয়াছে, জ্ঞানের নামে সেই অজ্ঞানতাকেই প্রচার কর, তাহাতেই আত্মরক্ষা হইবে;—একদলের নীতি ইহাই ছিল।

যাঁহারা বিপক্ষদলভুক্ত ছিলেন, তাঁহাদেরও উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটীশ-প্রভুশক্তিকে বদ্ধমূল করা। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন যে, এদেশে ব্রিটীশের একতন্ত্রতা প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে, দেশীয়দিগের মধ্যেই একটা প্রবল দলকে আশ্রয় করিতে হইবে। এরূপ একটা নির্ভর-স্থল ও সহায়সম্বল না পাইলে, স্বেচ্ছাতন্ত্র-রাজশক্তি কুত্রাপি আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও আত্মরক্ষা করিতে পারে না। তুরস্কের স্বেচ্ছাতন্ত্র-রাজশক্তি, এফেন্দদের আনুকূল্য ও সাহায্যের দ্বারা চিরদিন রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে। রুষের স্বেচ্ছাতন্ত্র সেইরূপ রাজবংশীয় ও রাজকুটুম্ব-দল-সম্বলিত একটা বিরাট ও শক্তিশালী আভিজাত সম্প্রদায়ের আনুকূল্য ও সাহায্যের উপরেই প্রতিষ্ঠিত। ব্রিটীশের স্বেচ্ছাতন্ত্র প্রভুশক্তিকে ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে, প্রজাসাধারণের উপরে যাহাদের প্রভূত আধিপত্য আছে, এমন এক আভিজাত দল গঠিত করিতে হইবে। মেকলে-প্রমুখ বুদ্ধিমান ইংরেজেরা ইহা বুঝিয়াছিলেন। দেশের প্রাচীন রাজন্য-বর্গের দ্বারা, তখন এ কার্য্য সাধন করা অসম্ভব ছিল। তাঁহারা তখনো

আপন আপন রাজ্যসম্পদের কথা একেবারে ভুলিয়া যান নাই। সে ঘা তখনো শুকায় নাই। তবে আর কাহারা ইংরেজের সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে দণ্ডায়মান হইয়া, ইংরেজের গৌরবে আপনি গৌরবান্বিত, ইংরেজের শাসন-কার্য্যে তাহার সহচর অনুচর হইয়া, আত্মশক্তি ও আপনাদের আধিপত্যদ্বারা এই বিদেশী-প্রভুশক্তিকে রক্ষা করিবে?—এ কার্য্যের জন্য নূতন দলের সৃষ্টি করিতে হইবে, অভিনব এক আভিজাত্যের প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। মেকলে-প্রমুখ উদারমতি ইংরেজেরা এই কার্য্যেই রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটীশ-বণিক-কোম্পানিকে নিয়োজিত করিবার জন্যই মুখ্যতঃ ইংরেজি-শিক্ষা প্রচলনের পক্ষপাতী হয়েন।

অন্যপক্ষে যাঁহারা ইংরেজি-শিক্ষা প্রচলনের বিরোধী ছিলেন,—তাঁহাদেরও মুখ্যলক্ষ্য একই ছিল। ভারতে ব্রিটীশ-প্রভুশক্তিকে নিরাপদ করা সেই লক্ষ্য। তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, যে বিদেশী শিক্ষা দিতে গেলে, দেশের লোকের প্রাণে ধর্ম্মহানি প্রভৃতি আশঙ্কার উদয় হইয়া, তাহাদিগকে উত্তেজিত করিয়া তুলিতে পারে। প্রজাকে অকারণে উত্তেজিত ও বিরুদ্ধভাবাপন্ন করা সুচতুর রাজনীতি নহে। অতএব ইংরেজি-শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা সমীচিন হইবে না। এই এক আপত্তি। আর এক আপত্তি তাঁহাদের এই ছিল যে, ইংরেজি-শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া, দেশের লোকে যখন পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিবে, যে উন্মাদিনী স্বাধীনতা-বাসনা য়ুরোপের নিরক্ষর প্রজাকুলকে আকুল করিয়া, ঘোরতর রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা করিয়াছে, সে প্রবৃত্তি, ইংরেজের ইতিহাস ও ইংরেজি শাস্ত্র-সাহিত্যাদি অধ্যয়নে ভারতবাসীর মনে জাগিয়া উঠিলে, ইংরেজের স্বেচ্ছাতন্ত্র বা একতন্ত্র রাজত্ব কদাপি এদেশে প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারিবে না।

এই আপত্তি খণ্ডন করিতে যাইয়াই মেকলে সেই সর্ব্বজনবিদিত উদার বাক্যাবলী রচনা করেন, "

যাহাদের আমরা শিক্ষা দীক্ষা দিলাম, তাহারা আমাদের পদ পাইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিবে,—তা আসুক। তা তো আমাদেরই গৌরবের কথা।"

পড়িলেই বোঝা যায় যে, কেবল পূর্ব্বপক্ষের যুক্তিতর্ক নিরস্ত করিবার জন্য মেকলে এখানে শেষ কথা বলিয়াছেন। শেষ কথাটা যে, সকল সময়ে মূলকথা হয়, তাহা নহে। মূলকথা আমরা যাহা বলিয়াছি—ব্রিটীশ-প্রভুশক্তিকে স্থায়ী করা, দৃঢ় করা, প্রজার আনুকূল্যের উপরে প্রতিষ্ঠা করা, তাহার চতুর্দ্দিকে ব্রিটীশ শাস্ত্রসাহিত্যাভিজ্ঞ, ব্রিটীশ-আদর্শদ্বারা অনুপ্রাণিত, ব্রিটীশের সঙ্গে দুশ্ছেদ্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে আবদ্ধ, ব্রিটীশের অন্নে ও অনুগ্রহে প্রতিপালিত, একদল ভারতবাসী অভিনব আভিজাত্যকে সৃষ্টি করা। এই সকল ভারতবাসী রাজ্যশাসনে ইংরেজের সাহচর্য্য করিবে, এই শাসনের শ্রীবৃদ্ধির উপরে তাহাদের সম্পদৈশ্বর্য্যাদি নির্ভর করিবে। বিদেশী শিক্ষা পাইয়া, বৈদেশিক আদর্শের অনুশরণে যাইয়া, ইহাঁদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি স্বল্পাধিক বৈদেশিক হইয়া যাইবে, এবং এইরূপে একদিকে ইহারা দেশের আপামরসাধারণ হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িবে, অন্যদিকে ব্রিটীশ-রাজত্বের স্থায়িত্বের উপরেই ইহাদের সম্পদ, গৌরব, পদমর্য্যাদা। জনগণের উপরে আধিপত্য ও অধিকার সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিবে বলিয়া, স্বার্থের বন্ধনে ভারতে ব্রিটীশ-সিংহাসনের সঙ্গে জড়িত হইয়া, ইহারা সে সিংহাসনের রক্ষক ও পোষক হইবে। ইহাই মেকলের শিক্ষানীতির মূল কথা। তাঁহার যে কথা লইয়া আমরা এতদিন আন্দোলন-আলোচনা করিয়াছি, তাহা তাঁহার শেষ কথা হইতে পারে, কিন্তু তাহা যে কেবল আপত্তি খণ্ডন মাত্র, ইহা অস্বীকার করা যায় না।

শাসননীতির মূলতত্ত্ব অতি সুস্পষ্টভাবে জানিতে ও বুঝিতে পারা যায়। ব্রিটীশ-নীতিও যে সাধারণ মানবীয় রাজনীতির প্রকৃতিকে একেবারে বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলে নাই, এখানেই আমরা ইহা উজ্জ্বলরূপে প্রত্যক্ষ করি। এই রাজনীতির মূলে স্বার্থ বিদ্যমান রহিয়াছে,—স্বার্থেই ইহার প্রতিষ্ঠা, পরার্থে বা প্রজার্থে নহে।

আর রাজার স্বার্থ ও প্রজার স্বার্থ এখনো ইংরেজাধিকৃত ভারতে এক হইতে পারে নাই। প্রত্যুত প্রজার স্বার্থের সঙ্গে রাজার স্বার্থের একটা চিরস্থায়ী বিরোধ জাগিয়া রহিয়াছে। ব্রিটীশ-ভারতের শাসন-নীতি ও শাসনপদ্ধতি যেরূপ, তাহাতে প্রজার কল্যাণে রাজার সম্যক কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। রাজা কেবল স্বেচ্ছাচারী নহেন, কিন্তু রাজা বিদেশী। তাঁর প্রীতির সম্বন্ধ যেমন, স্বার্থের সম্বন্ধও সেইরূপ স্বজাতীয় প্রজাবর্গেরই সঙ্গে, আমাদের সঙ্গে নহে। আর আমাদের রাজাও একজন নহেন; কিন্তু একটা সমগ্র জাতি। একতন্ত্র শাসনে রাজা যত কেন স্বেচ্ছাচার হউন না,—কোনো না কোনো উপায়ে তাঁহার স্বেচ্ছাচারিতা একক্ষেত্রে ক্লেশ বপন করিয়া, অন্তত্র সুধাবর্ষণ করে। ব্যক্তিবিশেষে তাঁহার শাসনদণ্ডে আহত ও বিকল হইতে পারে, কিন্তু তাঁহার আপনার সুখ, সুবিধা সাধন করিতে যাইয়াই তাঁহাকে অপর ব্যক্তি বা সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে আপনার অর্থ ও অনুগ্রহ বণ্টন করিতে হয়। কিন্তু বৈদেশিক রাজশক্তির অধীনে এ ক্ষতিপূরণের সম্ভাবনা নাই। বিশেষতঃ যেখানে একজাতি অপর জাতির উপরে রাজনৈতিক একচ্ছত্র অধিকার লাভ করে, সেখানে রাজা প্রজার স্বার্থবিরোধ রাবণের চিতার ন্যায় নিত্য প্রজ্জ্বলিত থাকে। আমাদের লাভে এই জন্য সকল বিষয়ে ইংরেজের ক্ষতি। ইংরেজের লাভে আমাদের সকল বিষয়েই ক্ষতি। ইংরেজ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যে পরিমাণে আপনার রাজ...

সম্যক অবসর প্রাপ্ত হয়, সেই পরিমাণে এই সকল অধিকার ও অবসরের অভাবে আমাদিগের জাতীয় মেধা হীনবল হইয়া থাকে। ইংরেজ যে পরিমাণে ভারতে ব্যবসায় বাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়া, আমাদের মাতৃগর্ভ হইতে ধনরাশি আহরণ করে, সেই পরিমাণে আমাদের দেশ অন্তঃসার শূন্য ও আমাদের জাতি নির্ধন হইতেছে। ইংরেজ যে পরিমাণে আমদিগের রক্ষণাবেক্ষণের ভার লইয়া আছে, সেই পরিমাণে উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে, আমাদের ক্ষাত্রবীর্য্য ফুটিয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছে না। এইরূপ আমাদের জাতীয়জীবনের প্রত্যেক দিকে আমাদের শক্তি-বিকাশে ইংরেজের শক্তিহানী, আমাদের স্বত্বস্বাধীনতার সম্প্রসারণে ইংরেজের অধিকার ও অবসরের সংকোচন, এবং আমাদের ধনবৃদ্ধিতে ইংরেজের ধনাগমের পন্থা সংকীর্ণ হইয়া যাইবেই যাইবে। একপক্ষের স্বার্থবর্জ্জন ব্যতিরেকে, ব্রিটীশ-ভারতে, ইংরেজ প্রবাসী ও হিন্দু মুসলমান অধিবাসাদিগের স্বার্থ-বিরোধ নষ্ট হইতে পারে না, কদাপি নষ্ট হইবে না।

এইজন্য যতদিন ইংরেজ একেবারে দেবপ্রকৃতি না পাইতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত আমরা সর্ব্বপ্রকারে স্বত্বস্বাধীনতা লাভ করিয়া জাতীয় চরম সফলতা প্রাপ্ত হই,—এতটা সদিচ্ছা তাহার কদাপি জন্মিতে পারে না।

অথচ ইংরেজের এই অস্বাভাবিক, ও অলৌকিক ঔদার্য্য ও সদিচ্ছার উপরেই আমাদের সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক আবেদন-আন্দোলন অদ্যাবধি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই আবেদন-নীতির অসারতা ও অপকারিতা ভাল করিয়া বুঝিতে গেলে, ভারতে ব্রিটীশ শাসননীতির কুটীল গতি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। এতকাল পর্য্যন্ত আমরা ইহা করি নাই বলিয়াই, আমাদের সর্ব্ববিধ রাজনৈতিক প্রয়াস এরূপভাবে নিষ্ফল হইয়া যাইতেছে।

সমসাময়িক ভারত।

(এর্ণেষ্ট-পিরিউর ফরাসী হইতে)

আর্থিক অবস্থা।

(৪)

প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার লুসিয়েন্, মক্ষিকার পক্ষের সহিত ভারতীয় বস্ত্রের তুলনা দিয়াছেন; তিনি বলেন, উহার বুনানি এরূপ সুকুমার ও সুসূক্ষ্ম যে, গ্রীক্‌দিগের স্থূল বস্ত্রাদি উহার নিকট দাঁড়াইতে পারে না। এইরূপ বহুপুরাকাল হইতে, ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত সকল দেশেরই বিদেশী সমাজদারেরা, এই "প্রভাত-শিশির" বাঙ্গলার লঘু মল্‌মল্-বস্ত্র পছন্দ করিয়া আসিয়াছে। কিন্তু সে দিন আর নাই, এখন ম্যাঞ্চেষ্টারের ছিটের কাপড়েরই জয়। এ কথা স্বীকার করিতে হইবে, এই মল্‌মল্-শিল্পের অবনতির জন্য ইংরাজ-শাসনতন্ত্রই সম্পূর্ণ-রূপে দায়ী নহে। এই সৌখীন শিল্পকলাটী যে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহার সহজ কারণ—এখনকার অবস্থা ইহার অনুকূল নহে। দেশের শিল্প দেশীয় রাজারা পোষণ করিবেন—এখন ভারতের সে ভরসাও নাই; বিলাত ভ্রমণ করিয়া তাঁহাদের রুচি বিকৃত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বিদেশীধরণে সভ্য হইয়াছেন—বিদেশীধরণে "আধুনিক" হইয়াছেন। বোধ হয় অনেকেরই বিশ্বাস, দেশীয় আস্‌বাব-সামগ্রী, দেশীয় বস্ত্রাদি রাজাদের প্রসাদে দেখিতে পাওয়া যায়;—না, তাহা মনেও করিও না। কতকগুলি ঝিনুক-খচিত সামগ্রী ও কতকগুলি রঙ্গিন কাচের সামগ্রী ছাড়া ভারতীয় জিনিস্-মাত্রই তাঁহারা

য়ুরোপীয় ধরণে সজ্জিত; "ক্রোমোলিথোগ্র্যাফি"-চিত্র ও দুর্লভ ঘড়ী সংগ্রহ করা তাঁহাদের একটা বাতিকের মধ্যে। দামী বিলাস-সামগ্রীই তাঁহারা বেশী পছন্দ করেন; তাঁহাদের রুচি শিশু-সুলভ ও খামখেয়ালি ধরণের; তাঁহাদের গৃহ-সজ্জা দেখিলে আমাদের হোটেলের সাজসজ্জা মনে পড়িয়া যায়। যদি এদেশীয় জিনিস দেখিবার ইচ্ছা থাকে ত ইংলণ্ডে যাও;—সেখানকার বড়বড় লাটদের প্রাসাদে বরং এদেশীয় জিনিসের সংগ্রহ দেখিতে পাইবে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও, ইংলণ্ড ভারতকে যে শিল্পকলা সম্বন্ধে শিক্ষা দিবেন ইংলণ্ডের সে যোগ্যতা নাই। সুশিক্ষা দেওয়া দূরে থাক্, বরং ইংরাজদের সান্নিধ্য, ইংরাজদের দৃষ্টান্ত, ইংরাজদের আনীত নমুনা, ইংরাজদের প্রতিষ্ঠিত কলা-বিদ্যালয়, ইংরাজদের য়ুরোপীয়ীকরণের চেষ্টা—এই সমস্ত, হিন্দু-রুচি বিগ্‌ড়াইয়া দিয়াছে। ইংরেজেরা এখন সপরিবারে ভারতে বাস করেন না, কাজেই ভারতের কীর্ত্তিমন্দিরগুলির প্রতি তাঁহারা বহুকাল হইতেই উদাসীন। ভারতীয় স্থপতি-হস্তের এই সব সুন্দর কীর্ত্তিমন্দির গুলির এক একটা করিয়া পাথর খসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু সে দিকে তাঁহাদের ভ্রুক্ষেপ নাই। লর্ড কর্জ্জন বলেন;—পৃথিবীর মধ্যে যাহা একটি সুন্দর জিনিস—দিল্লির সেই বৃহৎ মস্‌জিদটি ভাঙ্গিয়া সেই জায়গায় একটা "উত্তোলন-যন্ত্র" খাড়া করিবেন, এঞ্জিনিয়ারদিগের এইরূপ মতলব হয়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ যে সে মৎলব সিদ্ধ হয় নাই। অবশেষে তাঁহারা এই কার্য্য হইতে বিরত হন;—শিল্পকলার মর্ম্মজ্ঞ বলিয়া কি?—না, তাহা নহে;—পাছে ধর্ম্মান্ধ মুসলমানেরা ক্ষেপিয়া উঠে—এই ভয়ে।

প্রত্যক্ষভাবেই হউক বা পরোক্ষভাবেই হউক,—স্থানীয় পুরাতন শিল্পব্যবসায়গুলি, বিদেশীয় শাসনতন্ত্র হইতে এরূপ ঘোরতর আঘাত

আঘাতটা কলাশিল্প ও বিলাস-শিল্পের উপর আসিয়া পড়ে; তাহার পর বয়ন-শিল্পের উপর। এইরূপে সহরের ছোটখাট ব্যবসাগুলি নষ্ট হইল; ল্যাঙ্কেশিয়ারের কল-কারখানার প্রভাব, গ্রাম পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিল। ইংরাজ-সরকার এই সমস্ত অনিষ্ট দেখিয়াও দেখিলেন না;—প্রকারন্তরে অনুমোদন করিলেন। রমেশ দত্ত বলেন:—(British Empire Series India P. 127) "কলকারখানার প্রতিযোগিতায় বাঙ্গলার বয়ন-শিল্প একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং শতসহস্র তন্তুবায় নিজের ব্যবসায় ছাড়িয়া, জীবিকার জন্য অন্যান্য বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। য়ুরোপে "অ্যানিলাইন নামক কৃত্রিম রং আবিষ্কার হইবার পর হইতে, আমাদের সময়েই এতদ্দেশীয় অসংখ্য শিল্পীর ব্যবহৃত লাক্ষা-রং উঠিয়া গিয়াছে। চাম্ড়ার কাজ রংকরা চাম্ড়ার কাজ, এমন কি সস্তা-দরের ছাতা ও ছড়ির কাজ—এ সমস্তও উঠিয়া গিয়াছে। এখন ল্যাঙ্কেশিয়ারের ব্যবসায়ীরা বাঙ্গলার সমস্ত লোকের কাপড় যোগাইতেছে।" এক সময়ে বঙ্গদেশ যাহার একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল সেই রেশমের ব্যবসায়ও, এই শতাব্দির মধ্যেই অবনতি প্রাপ্ত হইয়াছে; কলকারখানা হইতে উৎপন্ন উৎকৃষ্ট বিদেশী মালের আমদানি হওয়ায়, অন্যান্য দেশীয় শিল্পও বিদলিত হইয়াছে। শুধু বাঙ্গলায় নহে, সমস্ত ভারতের লোক আজকাল যে জুতা ব্যবহার করে, যে কাপড় পরে, তৎসমস্তই ইংলণ্ডে প্রস্তুত হয়। এই সমস্ত দ্রব্য অপেক্ষাকৃত সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় এবং রেলপথ দিয়া গ্রামপল্লীতেও সহজে আসিয়া পৌঁছে। এখন বিজ্ঞানেরই জয়, কল-কারখানারই জয়, মূলধনেরই জয়! এই সমস্ত,—দারুণ অর্থনৈতিক নিয়মেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু মনে কর যদি নিজগৃহের কর্তৃত্ব ভারতের নিজের হস্তেই থাকিত, তাহা হইলে মার্কিন্ প্রভৃতি দেশের ন্যায় বিদেশী মালের উপর শুল্ক বসাইয়া ভারত অনায়াসেই রক্ষণী-

নীতির অনুসরণ করিতে পারিত এবং নিজেই কল-কারখানা খুলিয়া, নবপ্রবর্ত্তিত শিল্পাদির শৈশব দশা ঘুচাইতে সমর্থ হইত। কিন্তু তাহা হইলে যে শাস্ত্র-বিগর্হিত কাজ করিয়া নিন্দার ভাগী হইতে হইত। প্রচলিত অর্থ-শাস্ত্রের মতে,—যে দেশের লোক, মাল তৈয়ারী করে এবং যে দেশের লোক উহা ক্রয় করে—এই উভয়ের পক্ষেই অবাধবাণিজ্য সুবিধাজনক। অর্থ শাস্ত্রের এই মূল সূত্রটি অবাধ-বাণিজ্যে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ ইংরাজেরা এদেশে এই মূল সূত্রটির প্রতি একটু বেশী মাত্রায় অনুরাগ প্রদর্শন করেন। তাঁহারা খুব কড়াকড় ভাবে এ দেশেই অবাধবাণিজ্যের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। এই নিয়ম ভারতের পক্ষে যতটা অনুপযোগী এমন আর কিছুই নহে; অথচ এই নিয়মটি ভারতে যেরূপ পূর্ণমাত্রায় চলিতেছে এমন আর কোন দেশে নহে।

কি অবাধ-বাণিজ্য, কি রক্ষিত-বাণিজ্য—ইহার কোনটিই যে দেশ-কাল-নিরপেক্ষ ধ্রুবসত্য, একথায় আজকাল কে বিশ্বাস করিবে? শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত যাহাই হউক, যাহাতে স্থানীয় শিল্প ব্যবসায়ের উচ্ছেদ না হয়, তৎপ্রতি রাজসরকার মাত্রেরই পূর্ণ দৃষ্টি রাখা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। কিন্তু এস্থলে ভারত-সরকার নিজ কর্ত্তব্যসম্বন্ধে কিরূপ স্থির করিয়াছেন? আমার স্মরণ হয়, ১৮৬০ সাল পর্য্যন্ত, নির্ব্বিশেষ-ভাবে বিদেশী সকল পণ্যদ্রব্যেরই উপর, মূল্যের হিসাবে শতকরা দশ—এই হারে শুল্কগ্রহণ করা হইত। পরে ইংরাজবণিকেরা এই শুল্কের হার অর্দ্ধেক পরিমাণে কমাইয়া লইলেন। কিন্তু ম্যাঞ্চেষ্টারের কারখানাওয়ালারা বলিল, এইরূপ হারে শুল্ক থাকিলেও, তাহাদের মাল ভারতে প্রবেশলাভ করিতে পারিবে না। তখনও কিন্তু তাহাদের সমস্ত মনের ভাব প্রকাশ পায় নাই। আসল কথা, ছোটোখাটো

তুলারি কলকারখানা খুলিল। পাছে বোম্বাই, প্রাচ্যখণ্ডের ম্যাঞ্চেষ্টার হইয়া দাঁড়ায়, ইংরাজ বণিকের মনে এইরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হইল। ইংলণ্ডের কারখানা-ওয়ালারা পুনঃপুনঃ আবেদন করায়, তখনকার ভারত-সচিব লর্ড-স্যালস্‌বরি, আমদানি তুলাজাত দ্রব্যের শুল্ক উঠাইয়া দিবার জন্য ভারত-সরকারকে অনুরোধ করিলেন। যদি তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিতে হয়—ইংলণ্ডের স্বার্থের জন্য ততটা নহে যতটা ভারতের স্বার্থের জন্যই এই উপায়টি অবলম্বন করা আবশ্যক। রক্ষনী-নীতি অনুসরণ করিলে আপাততঃ ভারতের শিল্প ব্যবসায়াদি পরিপুষ্ট হইতে পারে বটে, কিন্তু ভবিষ্যতে ভারতের জন্য দারুণ বিড়ম্বনা সঞ্চিত করিয়া রাখা হয়। শিশু-শিল্প তাড়াতাড়ি পরিপুষ্ট হইয়া উঠিলে, কতকগুলা অযথা ধারণা তাহার মাথায় আসিতে পারে; এই বিপদ হইতে ভারতকে রক্ষা করিবার জন্যই তাঁহাদের এই মমতাময় উদ্বেগ—এই স্নেহের আশঙ্কা! অতএব শৈশবে এই সব শিল্পের অতি-বৃদ্ধির নিবারণ করা আবশ্যক। এই কথার মধ্যে একটা মিথ্যা যুক্তির গন্ধ—একটা মিথ্যা কল্পনার গন্ধ বিলক্ষণ পাওয়া যায়। বোধ হয় রাষ্ট্রনৈতিক প্রয়োজনানুরোধেই এইরূপ ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, স্বকীয় প্রতিযোগিতাকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপন করিবার জন্যই ম্যাঞ্চেষ্টারের এই সমস্ত গূঢ় চেষ্টা।

এবিষয়ে এখন আর সন্দেহ মাত্র নাই। ভারতের স্বার্থ ভাবিয়া যাহা কখন করা হয় নাই, ১৮৯৪ সালে সরকারী তহবিলের অভাব ঘুচাইবার জন্য তাহা করিতে হইল;—অবাধ-বাণিজ্য-নীতি পরিহার করিতে হইল। কিন্তু লক্ষ্য করিও—একটা বিষয় সাধারণ নিয়ম হইতে বর্জ্জিত হইল। যাহা হইতে সরকারী তহবিলে প্রভূত ধনাগম হইবার কথা—বিশেষ করিয়া সেই তুলাজাত দ্রব্যই সাধারণ শুল্ক

কর্ত্তৃপক্ষ মনে করিলেন, দেশীয় কলকারখানায় যে সব তুলাজাত দ্রব্য প্রস্তত হয়, তাহার উপর ৩১।২ শতকরা হারে স্থানীয়-মাসুল বসাইতে হইবে। ১৮৯৬ সালের "তুলার স্থানীয়-মাসুল আইনের" দ্বারা এই কর নির্দ্ধারিত হইল। এইবার কর্ত্তৃপক্ষ ভারতের প্রতিকূলে, ম্যাঞ্চেষ্টারকে স্পষ্টাপষ্টি সাহায্য করিলেন; এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের অনুকূলেই রক্ষণী নীতি অনুসৃত হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা এই—এই সমস্ত, অবাধ বাণিজ্যের নামেই অনুষ্ঠিত হইল। দেশীয় তুলার কারখানাদের বড়ই কঠিন প্রাণ; তাই এই সব গুপ্ত আক্রমণেও এখনও টিকিয়া আছে। "রাজস্ব বৃদ্ধির উদ্দেশে এই কর ধার্য্য হয় নাই। কেননা, ১৯০২ সালে খরচখর্চ্চা বাদে অনেক টাকা উদ্‌বৃত্ত হয়,—এতটা উদ্‌বৃত্ত হয় যে তাঁহারা টেক্‌স কমাইতেও উদ্যত হইয়াছিলেন। কিন্তু ভারত-সচিবের নিকট হইতে জোর হুকুম আসায় ল্যাঙ্কেশিয়ারের ইংরাজ বণিকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতীয় তুলাজাত দ্রব্যের উপর কর স্থাপিত হইল" এই কর নামতঃ মূল্যের হিসাবে ৩১।২ শতকরা হারে নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু আসলে ইহার হার আরো উচ্চ। কেননা, মোট উৎপন্নের উপর এই কর স্থাপিত। এখন দেখ, ইংলণ্ড হইতে ভারতে যে সব বস্ত্রাদির আমদানি হয়, তৎসমস্তই ২৪ নম্বরের ঊর্দ্ধতন সূতা দিয়া প্রস্তত। ১৯০২।৩ সালে, ভারত ১২ কোটি ত্রিশলক্ষ পৌণ্ডের সর্ব্বপ্রকার বস্ত্র প্রস্তত করে। কিন্তু ভারতের কারখানা হইতে শুধু সাড়ে তিন কোটি পৌণ্ড মূল্যের ২৪ নম্বরের সূতা উৎপন্ন হয়—যাহা প্রায় ৪ কোটি পৌণ্ড মূল্যের বস্ত্রের সমান। অতএব মোট উৎপন্নের হিসাবে না ধরিয়া, এই শেষোক্ত চারি কোটি মূল্যের হিসাবে এই কর গৃহীত হওয়াই উচিত। এই কর আয়-কর অপেক্ষাও দুর্ব্বহ; কেননা, ইহা মোট উৎপন্নের উপর

মালিকদিগের কিংবা শেয়ার-ধারীদিগের কোন লাভ থাকেনা (বহু কারখানারই এই অবস্থা) সেস্থলেও তাহাদিগকে মোট উৎপন্নের হিসাবে কর দিতে হয়। পক্ষান্তরে, আয়-করের নিয়মানুসারে, বাস্তবিক আয়ের হিসাবেই কর গৃহীত হয়। যাহাই হউক এই উদ্যম-রোধী নিরুৎসাহজনক কর-স্থাপন সত্ত্বেও, ভারতের কারখানাগুলা এখনো টিকিয়া আছে। এই সকল কারখানা হইতে, ১৯০৩ সালে, ১৪ কোটি ৪০ লক্ষ পৌণ্ড সূতায়-প্রস্তুত ২ কোটি ২০ লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক মূল্যের তুলাজাত বস্ত্র রপ্তানি হয়। কিন্তু সর্ব্বোপরি, স্বদেশীয় বাজার দখল করাই ভারতীয় কারখানা-ওয়ালাদিগের প্রধান লক্ষ্য। রবর্টসনের তালিকা-অনুসারে, ১৯০২ এর এপ্রিল হইতে, ১৯০৩এর এপ্রিল পর্য্যন্ত ৫১ কোটি ৭০ লক্ষ ফ্র্যাঙ্ক মূল্যের সূতা ও তুলাজাত বস্ত্র, ইংলণ্ড ভারতে অমদানি করিয়াছে। ৩০ কোটি মনুষ্যের যেখানে কাপড় যোগাইতে হইবে সেই ভারতের বাজার কি প্রকাণ্ড! মনে কর যদি ভারতের কারখানা-ওয়ালারা, ল্যাঙ্কেশিয়ারের কারখানা-ওয়ালাদিগকে —সম্পূর্ণরূপে না হউক অন্তত আংশিকরূপেও—ভারতের বাজার হইতে বহিষ্কৃত করিতে সমর্থ হয়—ইহাই তাহাদের উচ্চআশা। এই স্থানীয়-কর ছাড়া—আর একটা বিষম বাধা—দেশজ কার্পাসের নিকৃষ্টতা ; কিন্তু এইসব বাধা সত্ত্বেও,—ভারতীয় কারখানাগুলা তবুও চলিতেছে। দেশজ কার্পাসের আঁশ খাটো ; উহা ১ হইতে ৩০ পর্য্যন্ত নিকৃষ্ট নম্বরের সূতার কাপড়ের উপযোগী। এইরূপ সূতায় প্রস্তুত যে সকল বস্ত্র বিদেশ হইতে আম্‌দানি হয় তদপেক্ষা ৭৭ ½ গুণ অধিক পরিমাণে সেইরূপ বস্ত্র, ভারত এখানেই উৎপন্ন করে। ৪০ এর ঊর্দ্ধতন উৎকৃষ্ট নম্বর সূতার বস্ত্র, মার্কিন কিংবা মিসরীয় প্রভৃতি লম্বা আঁশের বিদেশী কার্পাস ভিন্ন, এখানকার কার্পাসে উৎপন্ন হইতে

এবং মিহি সূতার বস্ত্রের জন্যই, ভারতকে বিশেষরূপে ল্যাঙ্কেশিয়ারের উপর নির্ভর করিতে হয়। এই দুটী বাধা কিরূপে অতিক্রম করা যাইতে পারে? ন্যাশানাল-কংগ্রেস্, বিশেষত ১৯০২ সালের এলাহাবাদের কংগ্রেস,—এইরূপ প্রার্থনা করেন যে, বিদেশী আম্‌দানির উপর শুল্ক স্থাপিত হউক এবং দেশজ দ্রব্য স্থানীয়-কর হইতে মুক্ত হউক; কিন্তু এ দিকে ম্যাঞ্চেষ্টারের সতর্ক পাহারা! খাটো-আঁশ-কার্পাসের যদি একটু উন্নতি সাধন করা যায়, তাহা হইলেই ভারতের জয় নিশ্চিত! আমাদের বোম্বাই কনসল্ বলেন,—ভারতীয় কার্পাসের যদি এতটুকু উন্নতি হয় যে উহার দ্বারা ৩০ হইতে ৪০ নম্বরের—বিশেষতঃ ৪০ এর উর্দ্ধতন নম্বরের সূতা প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা হইলে, ভারতের অনুকূলে একটা অর্থনৈতিক বিপ্লব উপস্থিত হইবে। তাহা হইলে লণ্ডনের বাজার উঠিয়া যাইবে। এখন দেখা যাইতেছে, "কার্পাস উৎপাদনী সভার" উদ্যোগে, ১৫ বৎসরব্যাপী অনুশীলনের ফলে, এই প্রশ্নটির একপ্রকার মীমাংসা হইয়াছে। তাঁহারা বলেন মার্কিন ও মীসরীয় কার্পাসের চাষ এদেশে প্রবর্ত্তিত করিবার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়াছে। লম্বা-আঁসের কোনকোন-জাতীয় দেশজ কার্পাসের সহিত, খাটো-আঁসের কার্পাসের সংমিশ্রণে যে একপ্রকার দো-আঁশ্‌লা কার্পাস উৎপন্ন হয়, সেই কার্পাসের চারাই খুব সতেজ ও জোরাল, তাহারই আঁশ সুন্দর ও তাহাতে শীঘ্র ফুল ধরে।

কিন্তু এ সব কথা কেহ ভাবে না। ইংরাজ কার্পাস-বণিকেরা কেবল ভাবিতেছেন, কি বলিয়া শুল্কাদি স্থাপন করিয়া দেশীয় প্রতিযোগিতাকে বিদলিত করিবেন। কিন্তু তাঁহাদের এই সব চেষ্টায়, কার্পাস-চাষের অনুশীলনে এদেশীয় লোকের যে মনোযোগ আকৃষ্ট হইতেছে;—তাঁহারা যে অজ্ঞাতসারে আপনাদের জন্য ভীষণ ভাবী

ভাবেন না। যাহা হউক; ভারতের শুভদিনে আগতপ্রায়। ইংরাজ-সরকারের সদয় রাজনীতির প্রভাবে ইহার অভ্যুদয় হইবেনা ইংরাজ-সরকার বরং ইহাতে নিরুৎসাহ ও বাধা দিয়াই আসিতেছেন। ভারত যে এখন শিল্প-প্রধান দেশ নহে,—ইহা অনেক পরিমাণে য়ুরোপীয় শাসনতন্ত্রের দোষে। ভারতে শুধু তিন কোটি শ্রমজীবি—গণনায় নির্দ্ধারিত হইয়াছে; ভারতের লোকসংখ্যার তুলনায় উক্ত সংখ্যাটি কিছুই নয় বলিলেও হয়। যে প্রভুত পরিমাণ কাঁচা মাল। এখান হইতে রপ্তানি হয় এবং যাহা বিদেশ হইতে তৈয়ারি মালের আকারে আবার ফিরিয়া আইসে, তাহার মূল্যের সহিত তুলনা করিলে—সমুদ্র হইতে কিংবা রেল-গাড়ী হইতে যে সব ধুম-ধ্বজা, যে সব কল-কারখানা এখানে পরিলক্ষিত হয়—তাহা নগণ্য। আমি ভারতের শিল্পসামগ্রী সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করি নাই;—এই সম্বন্ধে যে রাষ্ট্রনীতি অনুসৃত হইয়াছে আমি তাহাই কেবল অনুশীলন করিয়াছি। অতএব এখন প্রশ্নটি এইরূপ দাঁড়াইতেছে;—বিদেশীয় প্রতিযোগিতায়, দেশের যে সকল শিল্প নষ্ট হইয়াছে,—অন্য নূতন শিল্প তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে কি না? এবং স্বকর্মচ্যুত শ্রমজীবিরা সেই সব নূতন শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে কিনা?—না, তাহা হয় নাই। এই সব শ্রমজীবিদের মধ্যে কিয়দংশ মাত্র তুলার কারখানার কাজ পাইয়াছে, অবশিষ্টাংশ—(একেইত কৃষি-মজুরের সংখ্যা খুব বেশী) কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত হইয়া মজুর-কৃষাণের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করিয়াছে। আবার লক্ষ্য করিও, যেমন একদিকে জীবিকার উপায় সকল কমিয়া যাইতেছে, সেই সঙ্গে আবার লোক সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতেছে। আর এক কথা;—কৃষিকার্য্যের দ্বারা এত লোকের অন্নসংস্থান হওয়া দুর্ঘট, ইহা জানিয়াও ইংরাজ-সরকার কি দেশের শিল্প-সম্বলের পুষ্টিসাধন ও উৎসাহবর্দ্ধনে তৎপর হইয়াছেন?—না, এখনও হন নাই। তাঁহাদের রাষ্ট্রনীতি বরং এই সব চেষ্টার পথে

তাঁহাদের সরকারী কারখানা হইতে কাহার লভ্য হয়? অধিকাংশ স্থলে বৈদেশিকদিগেরই লভ্য হইয়া থাকে। কেননা,—মূলধন, এঞ্জিনিয়ার, হেড্-মিস্ত্রী,—সমস্ত তাঁহারাই যোগাইয়া থাকেন; এদেশ যোগায় কি?—না, কতকগুলা দুইআনা-দৈনিক মজুরীর কতকগুলা মজুর এই মাত্র। সেকালের তাঁতিদের যে লাভ হইত, তাহা দেশেই থাকিয়া যাইত। তাছাড়া, আজকাল জোটবদ্ধ হইতে না পারিলে, কোন কাজই হয় না। মূলধন ভিন্ন কোন শিল্পব্যবসায় হইতে পারে না। যন্ত্রাদি উপকরণ সংগ্রহ করিবার জন্যও প্রথমে অর্থ চাই * * কিয়ৎবৎসর ধরিয়া তর্কবিতর্ক ও বাগ্‌বিতণ্ডার পর, আজকাল শিল্পব্যবসায়-শিক্ষার অনুকূলে সাধারণের মত দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু সরকার এখনো ইতস্তত করিতেছেন, চারিদিক হাতড়াইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাদের ভয়, পাছে এইরূপ করিলে, ভারতবাসীর হস্তে অস্ত্র দেওয়া হয়। তাঁহারা ভারতবাসীর প্রতিযোগিতাকে ভয় করেন। তাঁহাদের নিকট ইহাই ভারতীয় "বিভ্রাট-বিভীষিকা" ("Peril")

যেমন চীন, যেমন আফ্রিকা, সেইরূপ তাঁহাদের মাল কাটাইবার জন্যই ইণ্ডিয়ার সৃষ্টি। বিদেশী মালের আমদানি বজায় রাখিবার জন্যই ইণ্ডিয়াকে নিরস্ত্র করিতে হইবে—ইণ্ডিয়ার সর্ব্বাঙ্গ অবশ ও অসাড় করিয়া ফেলিতে হইবে;—ইহাই কর্ত্তৃপক্ষের আদেশ বাণী। এই প্রসঙ্গে একজাতীয় কীটের কথা আমার মনে পড়িল; এই কীট গুটি-পোকার উপর ডিম পাড়িয়া থাকে; এবং ডিম পাড়িয়া, তাহার স্নায়ু-কেন্দ্রগুলা ততটুকু চর্ব্বণ করে যাহাতে সে একেবারে না মরিয়া যায়, শুধু অবশাঙ্গ হইয়া অবস্থিতি করে; তখন সেই অন্তঃপ্রবিষ্ট ডিমগুলা তাহার তাজা মাংস অবাধে আহার কর্— পুষ্টিলাভ করিতে থাকে।

শ্রী জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

মূল, ব্রাত্য ও সংকর জাতি সম্বন্ধে প্রাচীন ও নব্যমত।

প্রাচীনমত—মূলজাতি।

ন্যায়শাস্ত্রের * মতে "নিত্যানেকসমবেতং জাতিঃ"। যে পদার্থ নিত্য এবং যাহাতে অনেক ব্যক্তি সমবায়সম্বন্ধে বিদ্যমান আছে তাহাকে জাতি বলে। অধিকাংশ প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র-কার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীর মনুষ্যের প্রত্যেক শ্রেণীকে জাতি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ব্রাহ্মণত্ব ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্ব ইহারা প্রত্যেকেই জাতি, সুতরাং নিত্য। এমন কোন সময় ছিল না যখন এই সকল জাতি বিদ্যমান ছিলনা, এবং এমন কোন সময় আসিবে না যখন এই সকল জাতির বিদ্যমানতা থাকিবে না, অর্থাৎ এই সকল জাতির প্রাগভাবও ছিলনা ধ্বংসও হইবেনা।

কতদিন হইল এই জাতি চতুষ্টয়ের সৃষ্টি হইয়াছে এই প্রশ্নের আন্দোলন নিষ্প্রয়োজন, কারণ উল্লিখিত প্রাচীনমতাবলম্বিগণ বলেন, পরমেশ্বর প্রত্যেক কল্পে যখনই পৃথিবী সৃষ্টি করেন উহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতির সৃষ্টি করিয়া থাকেন। এই চারি জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে ঋগ্বেদে বর্ণিত আছে ; যথা :—

ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ
বাহূ রাজন্যকৃতঃ।
উরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ
পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥ (ঋগ্বেদ ১০।৯০।১২)॥

---

* টীকা—

যখন ব্রহ্ম বা আদিপুরুষ বিভক্ত হইলেন তখন তাঁহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, বাহুযুগল রাজন্য করা হইল, যাহা বৈশ্য তাহাই উঁহার উরুযুগল হইল ; এবং উঁহার পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মগ্রহণ করিল।

বেদের মধ্যে উক্ত জাতিচতুষ্টয়ের বিস্তৃত বিবরণ নাই বটে, কিন্তু স্মৃতি ও পুরাণাদিতে উহাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ইত্যাদি বিশেষরূপে বিবৃত হইয়াছে। মনু লিখিয়াছেন :—

ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্য স্ত্রয়োবর্ণা দ্বিজাতয়ঃ।
চতুর্থ এ কজাতিস্তু শূদ্রো নাস্তি তু পঞ্চমঃ॥

(মনুসংহিতা ১০।৪)॥

ব্রা বৈশ্য এই তিন বর্ণ দ্বিজাতি অর্থাৎ ইহাদের উপনয়ন ...র হই থাকে, শূদ্র একজাতি অর্থাৎ ইহাদের উপনয়ন-সংস্কার হয় না। এই চারিটি ভিন্ন অন্য কোন জাতি নাই।

ব্রাহ্মণাদির কর্ত্তব্য নিম্নলিখিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে :—

ষট্‌কর্ম্মাণি ব্রা অধ্যয়নমধ্যাপনং যজনং যাজনং দানং প্রতিগ্রহশ্চেতি। ত্রীণি র. অধ্যয়নং যজনং দানং শাস্ত্রেণ প্রজাপালনং স্বধর্ম্মস্তেন ... এতান্যেব ত্রীণি বৈশ্যস্য কৃষিবাণিজ্যপাশুপাল্যকুসীদশ্চ। এ পরিচর্য্যা শূদ্রস্য॥

(বশিষ্ঠসংহিতা ২য় অধ্যায়ঃ)॥

ব্রাহ্মণের ছয়টি কর্ত্তব্যকর্ম্ম—যথা অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ। ক্ষত্রি র ত্রিবিধ কর্ম্ম—যথা অধ্যয়ন, যজন ও দান ; শাস্ত্রানুসারে প্রজাপ তাঁহাদের স্বধর্ম্ম। অধ্যয়ন, যজন, ও দান বৈশ্যেরও কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ব্যতীত কৃষি, বাণিজ্য পশুপালন ও

প্রাচীনমত—ব্রাত্যজাতি।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি মূলজাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। তাঁহাদের প্রত্যেকের শাস্ত্রানুমোদিত কর্ত্তব্যকার্য্যও সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির মধ্যে যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুমোদিত কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ হইয়া উপনয়নাদি সংস্কার-বিরহিত হন তাঁহাকে ব্রাত্য বলে। মনু বলিয়াছেন :—

দ্বিজাতয়ঃ সবর্ণাসু জনয়ন্ত্যব্রতাংস্তু যান্।
তান্ গায়ত্রী-পরিভ্রষ্টান্ ব্রাত্যা ইতি বি[illegible] দিশেৎ॥
(মনুসং[illegible] ১।১০।২০)॥

সবর্ণা স্ত্রীতে উৎপন্ন দ্বিজাতিগণ ব্রতহীন [illegible] হইলে তাহাদিগকে ব্রাত্য বলে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও [illegible] জাতীয় লোকই ব্রাত্যভাবাপন্ন হইতে পারেন। ক্ষত্রিয় ব্রাত্যের উদাহরণ—যথা :—

শনকৈস্তু ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়[illegible]ঃ।
বৃষলত্বং গতা লোকে ব্রাহ্মণাদর্শ[illegible]।
পৌণ্ড্রকাশ্চৌড্র দ্রবিড়াঃকা[illegible]নাঃ শকাঃ।
পারদাঃপহ্লবাশ্চীনাঃ কিরাত[illegible]ঃ খশাঃ॥
(মনুসংহিতা ১০।৪৩ ৪[illegible])॥

"উল্লিখ্যমান ক্ষত্রিয়গণ ক্রমে ক্রমে সংস্কার-বিহীন হইয়া ও ব্রাহ্মণের অদর্শনহেতু শূদ্রত্ব বা ব্রাত্যভাব প্রাপ্ত [illegible]ইয়াছেন—পৌণ্ড্রক, ঔড্র, দ্রাবিড়, যবন, শক, পারদ, পহ্লব, চীন[illegible]াত, দরদ ও খশ।"

প্রাচীন মতে এইরূপে সংস্কারবিহ[illegible]ইয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য

প্রাচীনমত—সংকরজাতি।

পূর্ব্বে যে মূল চারি জাতির বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে উহাদের পরস্পর মিশ্রণে সংকর জাতির উৎপত্তি হয়। মনু বলিয়াছেন—

ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ।
স্বকর্ম্মণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ন্তে বর্ণসংকরাঃ॥ (মনুসংহিতা ১০।৩৪)

"বর্ণসমূহের পরস্পর ব্যভিচারে, পরিণয়ের অযোগ্য স্ত্রীর সহ পরিণয়ে এবং স্বকর্ম্মের ত্যাগে বর্ণসংকরের উৎপত্তি হয়।"

ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষত্রিয়ার গর্ভে মূর্দ্ধাভিষিক্ত জাতির উৎপত্তি হয়; এইরূপ ব্রাহ্মণাদিবর্ণের পরস্পর মিশ্রণে বহু সংকীর্ণ জাতির উৎপত্তি হয়। ঐ সকল সংকীর্ণ জাতির পরস্পর মিশ্রণে বহু সংকীর্ণতর জাতির উৎপত্তি হয়। যদিও সৃষ্টির প্রারম্ভে চারি মূলজাতি ছিল, কিন্তু কালসহকারে উহাদের পরস্পর মিশ্রণে বহু জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। আজকাল ভারতবর্ষে অসংখ্য জাতি দেখিতে পাওয়া যায়, প্রাচীন-মতাবলম্বিগণের মতে উহাদের মধ্যে কোন কোনটি মূল, কোন কোনটি ব্রাত্য ও কোন কোনটি সংকর জাতি।

নব্যমত*—মূলজাতি

ইদানীন্তন প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতি নিত্য নহে, অর্থাৎ এমন সময় ছিল যখন এই চারি জাতি ছিলনা এবং এমন সময় আসিতে পারে, যখন এই চারি জাতি থাকিবে না। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করা মনুষ্যের স্বাভাবিক ইচ্ছা। সমাজবদ্ধ হইয়া বাস করিতে হইলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির সুখস্বচ্ছন্দতা, স্বাধীনতা, মান সম্ভ্রম প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য রাখিতে হয়। সমাজের নেতৃগণ

---

* [illegible] অনেকটা [illegible] মতের পক্ষপাতী। প্রায় ৩ বৎসর পূর্ব্বে এই মত সম্বন্ধে অধ্যাপক রীজ ডেভিড্‌স্‌ আমাকে যাহা লিখিয়াছিলেন নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

স্ব স্ব সমাজের লোকের প্রকৃতি বুঝিয়া এক এক প্রকার আচার ব্যবহার প্রবর্ত্তন করিয়াছেন; উহাই ঐ সমাজের সভ্যতা পদবাচ্য। অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কিরূপ সভ্যতা প্রবর্ত্তিত ছিল জানা যায় না। আর্য্যগণের ভারতবর্ষে আগমনের পর হইতে এদেশে যে সভ্যতা প্রবর্ত্তিত হয় তাহার কতক নিদর্শন আমরা প্রাচীন সংস্কৃতগ্রন্থে দেখিতে পাই। যে সময়ে ঋগ্বেদ প্রকাশিত হয় তখন এদেশে জাতিভেদ ছিল না, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে আমরা দেখিতে পাই আর্য্যজাতীয় প্রত্যেক ব্যক্তির হস্তেই এক এক খানি ধনুক থাকিত। ঐ ধনু দ্বারা তিনি পুরুষোচিত কার্য্য সম্পন্ন করিতেন; মৃত্যুর সময়ে তাঁহার হস্ত হইতে ঐ ধনু গ্রহণ করিয়া আনা হইত †। শনৈঃ শনৈঃ ধনুকের ব্যবহার কমিয়া আইসে। যখন আর্য্যগণ ভারতবর্ষে বদ্ধমূল

ROYAL ASIATIC SOCIETY

22, ALBEMARB STREET, LONDON. W.

19 June 1904.

DEAR SIR,

I am much obliged for the copies of your two papers you were kind enough to send me. They are both very interesting, and you have certainly succeeded in bringing some sense into Manu's list of castes. The fact is they are not castes, in the modern sense, at all.

I shall have much pleasure in laying your paper on the alphabet before the Council of its next meeting.

Your faithfully

(Sd). T. W. Rhys Davids.

† ধনুর্হস্তাদাদদানো মৃতস্যাস্মে ক্ষত্রায় বর্চসে বলায়।
অত্রৈব ত্বমিহ বয়ং সুবীরা বিশ্বাঃ স্পৃধো অভিমাতী র্জয়েম ॥৯॥
(ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল ১৮ সূক্ত)

মৃতব্যক্তির হস্ত হইতে ধনুগ্রহণ করিলাম ইহাতে আমাদের ক্ষত্রতেজ ও

হন এবং তাঁহাদের বীরত্বে ভারতের প্রাচীন অধিবাসিগণ নিরস্ত হইয়া যায়, তখন আর্য্য অনার্য্য এতদুভয়ের সঙ্ঘর্ষে এক নূতন সমাজের প্রয়োজন হইয়া উঠে। সেই সময়ে ব্যক্তিগত গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ করিয়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি শ্রেণীর সৃষ্টি করা হয়। যজ্ঞ, যুদ্ধ, কৃষি, বাণিজ্য, পরিচর্য্যা—সকল বিষয়ের প্রতি আর্য্যগণের দৃষ্টি নিপতিত হয়। পূর্ব্বে ঋগ্বেদ হইতে চাতুর্ব্বর্ণ্য বিষয়ক যে মন্ত্র উদ্ধৃত হইয়াছে কাহারও কাহারও মতে উহা অমূলক ও প্রক্ষিপ্ত; সমূলক হইলেও উহার তাৎপর্য্য অন্যরূপ,—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিটি জাতি নহে কিন্তু ইহারা শ্রেণীমাত্র। যে কোন লোক-যাজনাদি কার্য্য করিয়া ব্রাহ্মণ হইতে পারিতেন, শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করিতে পারিতেন, বাণিজ্যাদি দ্বারা বৈশ্যপদভাক্ হইতেন এবং পরিচর্য্যা দ্বারা শূদ্রনামে অভিহিত হইতেন। বস্তুতঃ ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব ও শূদ্রত্ব এই চারিটি বংশগত ছিল না। ব্যক্তিগণ স্ব স্ব গুণ ও কর্ম্মানুসারে* এই চারি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইতে পারিতেন। মূলজাতি শব্দের অর্থ মূলশ্রেণী অর্থাৎ যে সময়ে শ্রমবিভাগের কোন প্রকার নিয়ম ছিল না, সেই সময়ে সমাজের নেতৃগণ যে চারিটি আদর্শ শ্রেণীর সৃষ্টি করেন তাহাই চারিটি মূলজাতি। আর্য্য ও অনার্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বপ্রথমে স্ব স্ব গুণানুসারে এই শ্রেণীচতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিলেন তাঁহারাই মূলব্রাহ্মণ, মূলক্ষত্রিয়, মূলবৈশ্য বা মূলশূদ্র পদবাচ্য।

নব্যমত—ব্রাত্যজাতি।

উপরে যে চারিশ্রেণীর উল্লেখ করা হইয়াছে উঁহাদের প্রতি-পালনীয় নিয়মাদি ক্রমে ক্রমে বিধিবদ্ধ হইতে থাকে। কোন্ কার্য্য

* চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ ... গীতা।

ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্য, কোন্‌টি ক্ষত্রিয়ের অনুষ্ঠেয়, কোন্ কার্য্যে বৈশ্যের অধিকার এবং শূদ্রের সমুচিত কার্য্য কি, এই সকল বিষয়ের সম্যক আলোচনা করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রকারগণ ক্রমে ক্রমে অনেক গ্রন্থ বিরচন করেন। শনৈঃ শনৈঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতি বংশগত হইয়া পড়ে। এই সময়ে ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচিত হন, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব ইত্যাদি স্ব স্ব সীমায় নিবদ্ধ থাকে। ভারতবর্ষ ও বহির্দ্দেশের লোকসমূহ এখন আর অনায়াসে পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীচতুষ্টয়ের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। যাঁহারা ঐ চারি শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না তাঁহারাই ব্রাত্যনামে অভিহিত হইতেন; এমন কি একই বংশসম্ভূত দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন মূলব্রাহ্মণশ্রেণীর অন্তর্গত ও অপরজন ব্রাত্যনামে খ্যাত ছিলেন। সামবেদে কৌষীতকীবংশীয়গণ যজ্ঞাবকীর্ণ ও ব্রাত্যনামে অভিহিত হইয়াছেন। ব্রাত্যগণ মূলজাতিচতুষ্টয়ের নিয়ম প্রতিপালন করিয়া ষোড়শ নামক যজ্ঞ সমাপন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণাদি মূলজাতিতে পরিগণিত হইতে পারিতেন। সামবেদের তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের সপ্তদশ অধ্যায়ে ব্রাত্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা দৃষ্ট হয়;—"যখন দেবগণ স্বর্গে আরোহণ করেন তখন তাঁহাদের দুর্ভাগ্য ভ্রাতৃগণ ব্রাত্যরূপে পৃথিবীতে বিচরণ করিতে থাকেন। ইঁহারা কিয়ৎকালপরে দেবগণের সহিত মিলিত হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু ইঁহারা বেদ জানিতেন না বলিয়া ইঁহাদের উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। পরে দেবগণ এই দুর্ভাগ্য ভ্রাতৃগণকে ছন্দঃ (বেদ) শিক্ষা দেন; দুর্ভাগ্য ভ্রাতৃগণ ষোড়শ নামক মন্ত্র এবং অনুষ্টুপ্ নামক ছন্দঃ শিক্ষা করিয়া পরে দেবগণের অন্তর্ভুক্ত হন।"

উল্লিখিত আখ্যায়িকার তাৎপর্য্য এই যে, ভারতবর্ষ ও বহিঃ

কতি ক্ষাকৃত ক সর্ব্বপ্রথমে শ্রেণীচতুষ্টয়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে গণ য লোক বৈদিক আচার অনুষ্ঠান পূর্ব্বক ঐ চারি শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট ত্রি র। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত শেষে বৈদিক-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এই ধর্ম্ম গ্রহণের পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারাই ব্রাত্যনামে অভিহিত হইতেন। এমন কি, যে সময়ে অথর্ব্ববেদ প্রকাশিত হয় তখন ব্রাত্যের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক ছিল। ব্রাত্যগণ প্রথমতঃ বৈদিক-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেক বিদ্বান্ ও বিচক্ষণ লোক ছিলেন। অথর্ব্ববেদে ব্রাত্যের বহু প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। অথর্ব্বসংহিতার পঞ্চদশকাণ্ডের দ্বিতীয় অনুবাকে লিখিত আছে,—"যে গৃহস্থের বাড়ীতে বিদ্বান্ ব্রাত্য এক রাত্রিও বাস করেন তিনি পৃথিবীর অধীশ্বরত্ব লাভ করেন; যাঁহার গৃহে বিদ্বান্ ব্রাত্য দুইরাত্রি বাস করেন তিনি অন্তরীক্ষলোকের অধিপতি হন; যাঁহার গৃহে বিদ্বান্ ব্রাত্য তিন রাত্রি বাস করেন তিনি স্বর্গের অধীশ্বরত্ব লাভ করেন ইত্যাদি।" মনুর সময়েও সমস্তলোক বৈদিক ধর্ম্মের অনুশাসন স্বীকার করেন নাই, তখনও আর্য্যাবর্ত্তের কোন কোন স্থান, প্রায় সমুদয় দাক্ষিণাত্য এবং ভারতবর্ষের সন্নিহিত অনেক দেশ, ব্রাত্যভাবাপন্ন ছিল; কিন্তু ক্রমে ব্রাত্যযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া উহাদের অনেকেই বৈদিক-ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ইহার কোন না কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত হইতে থাকেন।

নব্যমত—সংকরজাতি।

যদিও পূর্ব্বকালে ব্রাত্যগণ বৈদিক-ধর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক অনায়াসে ব্রাহ্মণাদি শ্রেণীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিতেন, কিন্তু কয়েক শতাব্দী পরেই বৈদিকসমাজের পরিপাকশক্তির হ্রাস হইয়া আসিল।

অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া সুগম হইল না। এই সময়ে যাঁহারা বৈ র অনুষ্ঠান করিলেন অথচ মূল ব্রাহ্মণাদি জাতিতে পরি ইতে পারিলেন না তাঁহারাই সংকরজাতি। সংকর শব্দের উভয়-জাতির ধর্ম্মাক্রান্ত, যথা—মূর্দ্ধাভিষিক্তজাতির অর্থ এই যে এই জাতীয় লোকগণ পূর্ব্বে ব্রাত্য ছিলেন পরে বৈদিক-ধর্ম্মগ্রহণ পূর্ব্বক মূল-ব্রাহ্মণ বা মূলক্ষত্রিয় মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না বটে, কিন্তু উভয়জাতির ধর্ম্মাক্রান্ত এক নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি করিলেন। এইরূপ ব্রাত্যনামধেয় যে অসংখ্যলোক ছিল উহারা বৈদিক সমাজে প্রবেশ পূর্ব্বক স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে এক এক নূতন শ্রেণীর সৃষ্টি করিল। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন :—

সঙ্করে জাতয়স্ত্বেতাঃপিতৃমাতৃপ্রদর্শিতাঃ।
প্রচ্ছন্না বা প্রকাশা বা বেদিতব্যাঃ স্বকর্ম্মভিঃ॥

(মনুসংহিতা ১০।৪০)

"প্রসিদ্ধ সংকরজাতি সমূহের পিতা ও মাতার নাম নির্দ্দেশ পূর্ব্বক পরিচয় প্রদান করিলাম। এতদ্ভিন্ন যে সকল প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশমান সংকর জাতি আছে স্ব স্ব কর্ম্মের দ্বারা উহাদের জাতি নির্দ্দেশ করিতে হইবে।"

যে সময় পুরা[illegible] প্রভৃতি প্রকাশিত হয় [illegible]খন প্রায় সমগ্র আর্য্যাবর্ত[illegible]াত্য বৈদিক ধর্ম্মের আশ্রয় [illegible]হণ করিয়া নানা নূতন সংকরজা[illegible] উদ্ভব করে। বর্ত্তমানকা[illegible]ল কতিপয় পার্ব্বত্যজাতি ভিন্ন ভারতবর্ষের প্রায় সকল লোকেই কো[illegible]ন না কোন মূল, ব্রাত্য বা সংকরজাতির অন্তর্ভুক্ত।

অতএব নব্যমতে মূলজাতি শব্দের অর্থ যাহা[illegible]রা সর্ব্বপ্রথমে

অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে বৈদিক-ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যাহাকে জাতি (race or stock of people) বলেন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারিটি শব্দদ্বারা তাহার নির্দ্দেশ হয় না। সকলেই জানেন কাবুল, কান্দাহার, খোটান, খাসগড়, কাম্বোজ, ইরান্, কাশ্মীর, পাঞ্জাব প্রভৃতি অর্থাৎ মধ্যম ও পশ্চিম এশিয়া এবং ভারত-বর্ষের লোক সমূহ লইয়া হিন্দুসমাজ গঠিত। এই সমাজের মধ্যে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদের কেহ মূল, কেহ ব্রাত্য বা কেহ সংকর জাতি নামে অভিহিত। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ সর্ব্বপ্রথমে কোন্ দেশে কি ভাবে বাস করিতেন তাহা মূল ব্রাত্য বা সংকর শব্দ দ্বারা জানিতে পারা যায় না। [ক্রমশঃ]

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ

শিরী-ফারিদ।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

স্থল তাতার—জক্ষর্তিস-নদী তীরস্থ প্রান্তর—দূরে তুষারাচ্ছাদিত শৈলমালা—প্রান্তরবক্ষে লক্ষসৈন্যের আবাসোপযোগী শিবির-শ্রেণী। নদীতীরস্থ মসৃণ শিলাখণ্ডোপরি বসিয়া পারস্যের রাজা খসরু। পার্শ্বে দণ্ডায়মান বৃদ্ধমন্ত্রী ও আত্মীয়পুত্র জাফর। কিঞ্চিৎ দাঁড়াইয়া দূতগণ।

অতীব দুর্গম পথ—এই মত নদী
সর্ব্বদা ফেণিলমুখে, বিষম হুঙ্কারে
রাজ্যের প্রহরী কার্য্য করিছে রাজন্!
পরপারে, উচ্চশৈলমালা অভ্রভেদী
তুষারের স্তূপে, নির্ভয়ে দাঁড়ায়ে আছে।
…কলি কঠিন তার, রসশূন্য প্রাণ
…ী ধ্বংস তরে, সলিলেও করিয়াছে
…ঠোর। চলিতে চলিতে পথে
… পিপাসার্ত্ত হ'লে, জীবনের
…বারিতে খণ্ডে খণ্ডে শৃঙ্গে শৃঙ্গে
…সজ্জিত। অত্যন্ত প্রচণ্ড তেজে
…ক্কার। পারস্যে যে সমীরণ
…প্রাদ চুড়ে, প্রতি ঘরে ঘরে,
…বাতায়নে সম্রাটের
—সাগর সলিলবিন্দু

নিত্য শিরে বহিয়া আনিয়া রাজঅঙ্গে
কণায় কণায় করে সিঞ্চণ, ব্যজন,
সেথা ভিন্ন মূর্ত্তি তার। অলক্ষ্য সঞ্চারে
শুধু বহে রাশী রাশী শূলের বেদনা।
পক্ষাহত রোগীমত, নিস্পন্দ অসাড়
দেহে, অন্তর্দ্দাহে থাকে শুধু অস্তিত্বের
জ্ঞান।

২য় দূত। শুধু তাই নয়—রাজ্যে প্রবেশিতে
একমাত্র দুর্গম ঘর্ঘর, সূর্য্যরশ্মি
পশেনা সেথায়।

৩য় দূত। শুধু তাইকি রাজন্!—
শব্দভেদী বানমত ঘর্ঘর প্রাচীরে
সহস্র স্খলিতমূল শিলাখণ্ড ধ'রে
তুষারের চলিষ্ণু প্রান্তর। পদশব্দে
তড়িতের বেগে তারা নামিয়া আসিবে—
মুহূর্ত্তে সমস্ত সৈন্য চূর করে দিবে।

খসরু। কি বল জাফর?

জাফর। অমনি অমনি, ফিরে
বে[illegible] নৃমণি, মহারাজ্য বশে আনি,
ক্ষু[illegible]জ্য-রাণী কাছে পৃষ্ঠ দেখাইব?
প্র[illegible] কি বলিবে, পৃথিবীর লোক শুনে
মনে কি করিবে? এত অগ্রসর হয়ে
ফিরে যাব?

খসরু। মন্ত্রীবর, তোমার কি মত?

মন্ত্রী। অভিযান পূর্ব্বকালে বলেছি সম্রাট,
একার্য্য না বীরের উচিত। ক্ষুদ্র এক
পার্ব্বতীয়া বালা—কোপনকটাক্ষ যেই
সহিবারে নারে, বন্দিনী করিতে তারে
অগণ্য বাহিনী লয়ে আগমন, বীর-
নামে কলঙ্ক অর্পণ।

ভাল, অল্প সেনা
লয়ে যাব, অল্প সৈন্যবলে যদি বশে
আসে রাণী, তাহ'লেত কলঙ্ক হবে না!
অর্দ্ধ সেনা স্বরাজ্যে পাঠাব। ভূবিজয়ী
পারস্য সম্রাট,—কত ভাগ্য ক্ষুদ্র নারী
তাহারে বরিবে, সে তাঁহার আত্মদানে
করে অপমান, ভেট দেয় ফিরাইয়া।
যিনি দুনিয়ার রাজা, তিনি বর্ত্তমানে
রমণীর অহঙ্কার।

খস্রু। অল্প সৈন্যে হয় নাকি
তাতার বিজয়?

১ম দূত। দাসের আন্দাস
আছে জাঁহাপনা! তাতা[illegible] নহে
অবলা রমণী। প্রকৃতি সহায় [illegible]—
একটী একটী অঙ্গ যার শত শত
সৈন্যবল ধরে। তার পর আছে তার
প্রাসাদের দ্বারে কোষমুক্ত অসি করে
সমরে প্রবীন বীর রাজপ্রতিনিধি।

জাফর। পারস্য কি দুর্ব্বল এমন, প্রকৃতির
নাম শুনে ভঙ্গ দিবে রণে? আর কেবা
সেই রাজপ্রতিনিধি? দূত, আজীবন
আশ্রয় যাহারে বন, রমণীপুরীতে
করে বাস, সমরের কি জানে সেজন?

থস্রু। নিরুত্তর কেন মন্ত্রীবর?

মন্ত্রী। জাঁহাপনা!
আমি বৃদ্ধ,—হীন-বল। সমরকৌশল
যাহা কিছু শিখেছি যৌবনে, পারস্যের
গৌরব রক্ষণে প্রজার পালনে, আর
বাঁধিতে সামন্তগণে সদ্ভাব বন্ধনে
লেখনী ও পত্রে দি'ছি ডালি। কি করিলে
হয় রাজ্য-জয় জানে সেনাপতি। কিসে
সে রাজ্যের রয় প্রাণ, তাই মোর ধ্যান-
জ্ঞান। যদি অল্প সৈন্য বলে, বশে আসে
তেজস্বিনী, বহু সৈন্যে কিবা প্রয়োজন?
কিন্তু মোর নিশ্চয় ধারণা, জাঁহাপনা!
জয় পরাজয় সব অদৃষ্টের খেলা।
অদৃষ্টের বলে নর দিগ্বিজয়ী বীর,
অদৃষ্ট প্রহারে রাজা ধুলায় লুটায়।
প্রকৃতি বিরূপা হ'লে, বিশ্বের বীরত্ব
বিনিময়ে, রাশী রাশী আসে অপযশ।
বালিকার জয়ে অপমান, বালিকায়

জাফর। অপমান !

কেন অপমান, তুচ্ছ সে বালিকা—তার
ঔদ্ধত্য নেহারি; সমুচিত শিক্ষা যদি
না করি প্রদান, দুর্নীতি প্রশ্রয় পাবে।
রাজ্যের শাসনে তবে কিবা প্রয়োজন ?
মন্ত্রীর মন্ত্রণা কথা কি হবে শুনিলে ?
প্রজা ত দুর্ব্বল,—তবে তার শাসনের
কেন এত অসংখ্য কৌশল ? কেন এত
আইন গঠন ? শিশু যদি আত্মভুলে
পড়ে হে অনলে, জ্বলে নাকি অঙ্গ তার ?

খসরু। সত্য মন্ত্রী, বড়ই ঔদ্ধত্য ললনার।
অর্দ্ধাঙ্গভাগিণী আমি করিতে তাহারে
নানা উপহারে, তাতারে জাফরে দূত
করিনু প্রেরণ, অপমান কথা ক'য়ে
ফিরাল উহারে ! মমদত্ত উপহার
দলিল চরণে। অসম্ভব তার পণ,—
হেন মূঢ়মতি কোন জন, মতিহীনা
বালার কথায়, মর্য্যাদা করিবে নাশ ?
শক্তি আছে কেন তারে বশে আনিব না ?
শক্তি আছে কেন তারে বাঁদী করিব না ?

মন্ত্রী। বালিকা প্রেমের মূল্য ক'রে নির্দ্ধারণ
করিয়াছে পণ।—বুঝিয়াছি পাগলিনী
রাণী। কিন্তু লোকপাল ! অমূল্য প্রেমের
সেই তুচ্ছ বিনিময়, রক্ষা কি রাজার

ধর্ম্ম নয় ? হেন ধর্ম্ম-বিগর্হিত কাজে
দিতে হে প্রশ্রয়, যদি হয় পরাজয়,
মুখ মোরা দেখাব কেমনে ? জাঁহাপনা !
আছে ত স্মরণ, থর্ম্মাপলি গিরিপথে
লক্ষ লক্ষ সৈন্য সনে রণে, যে সময়
তিনশত গ্রীক বীর পরম আনন্দে
করেছিল শেষ মাতৃ-নাম উচ্চারণ,
মত্ত সমীরণ কি কথা তুলিয়াছিল
নগরে প্রান্তরে ? কি কথা ভাসিয়াছিল
ব্যোম-সিন্ধু জলে ? আবাল বণিতা বৃদ্ধ—
শত্রু মিত্র—স্বজাতি বিজাতি—সমস্বরে
তুলে কি ছিল না উচ্চতান —"জয় গ্রীক
মহাজন, পারস্যের হউক পতন,
জাহান্নমে যাক জরক্সিস্ ? জাঁহাপানা !
ভৃত্য আমি। প্রভুকার্য্যে সকলি আমার
মান। আসিয়াছি, ফিরে নাহি যাব। লোক
নাহি থাকে, পর্ব্বতের সনে যুদ্ধ দিব।
মরি, বাঁচি, হারি, জিতি—সকলি সমান।
তবে এই মাত্র অনুরোধ, যদি হয়
রণজয়, মহত্ত্ব দেখাতে হবে।

খসরু।　　　　　　ভাল
তাই হবে। রাণীরে সম্মান দিব, তার
অভিলাষে স্বাধীনতা অর্পণ করিব।
আমারে বরিতে চায়, আদর করিয়া
তারে তুলে লব শিরে। অন্তের হইতে

চায়, আমি নিজে ঘটক হইয়া, তারে
সেই ভাগ্যবান করে করিব অর্পণ।
তাতারি প্রজার সনে পারস্য-সম্রাট
আনন্দে করিবে যোগদান।

(প্রস্থান)

জাফর। মন্ত্রিবর!
পারস্যের সুলতান—খসরু যাঁর নাম—
তাঁরে যদি মহত্ত্ব শিখাতে হয়, তবে
মহত্ত্ব শিখান সেটা প্রকাণ্ড চাতুরী।
ক্ষুদ্র তাতারের রাণী মুহূর্ত্তে বন্দিনী
হবে, সম্রাটের পায়ে লোটাইবে, শেষে
দাসী হ'তে কতবার করিবে মিনতি।
দাসী হবে ভাগ্য তার, সে কভু কি রাজ-
হৃদে পায় স্থান? মন্ত্রীবর! বোধ হয়
তোমারি ললাটে আছে রূপবতী শিরী।

মন্ত্রী। স্বার্থ বিসর্জ্জন যদি জানিতে জাফর,
তাহলে কি এতদূরে আনিতে বাহিনী?

(সকলের প্রস্থান)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

নববর্ষে।

ওগো তরুণ তীর্থ-যাত্রী !
ভয় নাহি ওগো আর ভয় নাহি ;
পূর্ব্ব-আকাশে দেখ, দেখ চাহি ;
দুঃস্বপ্নভরা প্রেতপুরী সম
ফুরায় দীর্ঘ রাত্রি !
প্রাণবলে শুধু যাও, আগে যাও,
নবীন তীর্থ-যাত্রী !

ওগো তরুণ তীর্থ-যাত্রী !
নব বরষের আদিম প্রভাতে
সুধা নির্ঝর স্বর্ণ-প্রপাতে
সজ্জিত হবে বঙ্গজননী,
মুক্তি বিজয় দাত্রী।
আত্মবলে শুধু হও অগ্রসর,
নবীন তীর্থ-যাত্রী !

শুধু—আপনারে কর মুক্ত ;
জঞ্জাল শত ভস্মে পুড়িয়া,
আত্মদেবতা দীপ্ত করিয়া,
যাও ছুটে সেই ভাস্বর পথে,—
যেথা কেহ নাহি সুপ্ত ;
'ধর্ম্মের,' 'সত্যের,' 'আত্মার' আঘাতে
শৃঙ্খল কর মুক্ত।

শুধু—ভেবোনা কে যাবে সঙ্গে ;
ছাড়ি' বিপণীর পণ্য বিনিময়
লক্ষকথার ক্রয়-বিক্রয়,
মৃত্যু-পরাজয় বিভূতির মত
মাখি লও সর্ব্ব অঙ্গে ;
রচ আত্মার দুর্গ স্বতন্ত্র,
* ভেবোনা কে যাবে সঙ্গে !

শুধু—চেওনা পশ্চাতে ফিরে ;
যাত্রী যাহারা "দেবযান"-পথে,
ফিরেনা পশ্চাতে কি দিবা কি রাতে ;
দৃষ্টি তাদের অনিশযুক্ত
উদয় শৈলশিরে !
ধূমায়িত শত শ্মশানের পানে
চেওনা পশ্চাতে ফিরে' !

আজি—নির্ম্মল উষার হাসি
অন্ধ তামসে মগ্ন জগৎ,
সুবর্ণ-নেমি পুষ্পক রথ,
সৌধ-অঙ্গন চত্বর পথ
দিতেছে গো পরকাশি।
মাহেন্দ্র লগনে আনিয়াছে ওগো
বিমল উষার হাসি।

ওগো লও করে হেম ঝারি ;
আজি বৈশাখের প্রথম নিশ্বাসে,
মঙ্গল-শঙ্খ বাজাও আকাশে,
দীপ, পূর্ণকুম্ভ, লাজে, রক্তবাসে,
সাজ সবে পুরনারী।
পুরদ্বার-ধূলি দেও ভাসাইয়া
লয়ে করে হেমঝারি !

ওগো তরুণ তীর্থ-যাত্রী !
গাও উচ্চকণ্ঠে "বৃহৎসাম" গান ;
আজি সুর-নরে নাহি ব্যবধান ;
নির্ম্মাল্য লয়ে' ডাকিছে অই যে
বিশ্বজননী-ধাত্রী !
ভয় নাই ও গো, কোন ভয় নাই,
অতীত গহন-রাত্রি !
ওগো নবীন তীর্থ-যাত্রী !

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত।

হিমালয়ে।

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরং।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ॥

সম্মুখে ভারতবর্ষের সীমান্ত,—উচ্চাবনত, তরঙ্গায়িত তুষার-পর্ব্বত-মালা। ঐ বদরি, কেদার, ত্রিকূট, ত্রিশূল, নন্দাদেবী ও আরও কত অশ্রুতনামা রজতভূধর। মহাওজস্বী পূর্ব্বপুরুষদিগের ন্যায় এই কঠিন, দুর্গম, অতি অসহ্যশীতল হিমাচল লঙ্ঘন করিয়া—সূর্য্য যতদূর পর্য্যন্ত তাপদান করেন এবং চন্দ্রমা শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষীয় নক্ষত্রগণের সহিত যতদূর পর্য্যন্ত প্রদেশে দৃষ্ট হইয়া থাকেন, তাবৎ ভূর্গো তিনি রূপে মন বিনিবিষ্ট করিয়া ভগবানের শক্তির অশেষতায় বিমুগ্ধ বিভক্ত জন্য হৃদয় উৎফুল্ল হয়। এই তুষার প্রাচীরের ... রেই। বিশেষ ভূগোলবিভাগ—ইলাবৃতবর্ষ, কেতুমালবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ, অ...লিত ভাবে নানা প্রজাপতির আশ্রিত নব নব ...তি; আর যাহারা কোন কারণ ইহার এ পারে ভা... সরণ করিতে না পারিয়া স্বকর্ম্ম হইতে ব্রহ্মরন্ধ্রে। সেই যু... ত্যজাতি। কাল সহকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মহানাদের প্রতিধ্বই চারি মূল জাতির পরস্পর সংমিশ্রণে অনুলোম ও ভারতক্ষেত্রে ক্রমে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল উহারাই সংকর-ব্রাহ্মণ ও

প্রশ্নবাণে ...তাবলম্বিগণের মতে সৃষ্টির প্রারম্ভে মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রহ্মবিস্তার ক্রমে কোন জাতিভেদ ছিল না। আর্য্যগণ ভারতবর্ষে ঊর্দ্ধে জাও হইবার অনেক পরে পরিশ্রমের বিভাগ করিয়া সমাজের ...। সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র

মানচিত্রে ভারতবর্ষের উত্তর প্রদেশ যেরূপ অসমরেখায় চিত্রিত দেখা যায়, সম্মুখে প্রত্যক্ষে সেই বঙ্কিমরেখাবিশোভিত কঠিন ভূমি বিরাজিত। মম নয়নাগ্রে বিশ্বরূপে বিরাজিতে হে মাতঃ জন্মভূমি! নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে নমোস্তু তে সর্ব্বত এব—তোমার অগ্রে নমস্কার, তোমার পৃষ্ঠভাগে নমস্কার, তোমার পশ্চাতে নমস্কার, তোমার সকল দিকেই নমস্কার।

শ্রীসরলা দেবী।

মূল, ব্রাত্য ও সংকর জাতি সম্বন্ধে প্রাচীন ও নব্যমত।

(২)

প্রাচীন ও নব্যমতের পরস্পর তুলনা।

গতবারে জাতিভেদ সম্বন্ধে প্রাচীন ও নব্যমতের যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহার মর্ম্মার্থ এই :—প্রাচীন মতাবলম্বিগণের মতে যখন ব্রহ্মা মনুষ্য সৃষ্টি করেন সেই সময়েই তিনি উহাদিগকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি জাতিতে বিভক্ত করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্রহ্মা সৃষ্টিকালে উহাদের যে যে বিশেষ বৃত্তি নির্দ্ধারণ করিয়া দিয়াছিলেন তাহা যাহারা অবিচলিত ভাবে পালন করিয়াছিল তাহারাই মূলজাতি; আর যাহারা কোন কারণবশতঃ ব্রহ্মনির্দ্দিষ্ট বৃত্তি অনুসরণ করিতে না পারিয়া স্বকর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল তাহারাই ব্রাত্যজাতি। কাল সহকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি মূল জাতির পরস্পর সংমিশ্রণে অনুলোম ও প্রতিলোমক্রমে যে সকল সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল উহারাই সংকরজাতি।

নব্যমতাবলম্বিগণের মতে সৃষ্টির প্রারম্ভে মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণাদিক্রমে কোন জাতিভেদ ছিল না। আর্য্যগণ ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হইবার অনেক পরে পরিশ্রমের বিভাগ করিয়া সমাজের সুশৃঙ্খলতা সংস্থাপনের অভিপ্রায়ে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র

এই চারি শ্রেণীর কল্পনা করিয়াছিলেন; তাঁহারা এই চারি শ্রেণীর প্রতিপালনীয় যে সকল নিয়ম নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন তাহার অনুসরণ করিয়া ভারত ও বহিঃপ্রদেশের যে কোন ব্যক্তি মূল ব্রাহ্মণাদি বর্ণে মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে পারিত। কয়েক শত বৎসরের মধ্যে ব্রাহ্মণাদি জাতি বংশগত হইয়া পড়ে। বাহিরের লোককে আর সহজে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে প্রবেশ করান হয় না। যদি কোন বাহিরের লোক নিজের গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে প্রবেশ করিতে চাইতেন তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রাত্যযজ্ঞ সম্পাদন করিয়া ব্রাহ্মণাদিবর্ণে প্রবেশ করিতে হইত। যাঁহারা এইরূপে ব্রাহ্মণাদিবর্ণের মধ্যে প্রবেশ করিতেন, প্রবেশের পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে ব্রাত্য বলিত। ক্রমে ভারত ও বাহিরের এত বিভিন্নপ্রকার লোক বৈদিক ধর্ম্মে প্রবেশ করিতে আইসে যে উহাদিগকে ব্রাহ্মণজাতিতে প্রবিষ্ট করা হইবে কি ক্ষত্রিয় জাতির অন্তর্ভুক্ত করা হইবে বা বৈশ্য জাতির মধ্যে পরিগণিত করা হইবে অথবা উহাদিগকে শূদ্র রাখা হইবে ইহা সহজে নির্দ্ধারণ করিয়া উঠিতে পারা যায় নাই ; সুতরাং এই সময়ে এক একটী নবাগত জাতিকে এক একটী নূতন আখ্যা প্রদান করা হইল। উহাদের সাধারণ নাম সান্তরাল বা সংকরজাতি। সংকর শব্দের অর্থ, যে জাতি দুই বর্ণের মধ্যবর্ত্তী স্থান অধিকার করে। পিতা ও মাতা উল্লেখ করিয়া উহার জাতি নির্দ্দেশের তাৎপর্য্য এই যে কোন্ কোন্ মূলজাতির ধর্ম্ম কি পরিমাণে ঐ সংকরজাতিতে বিদ্যমান আছে তাহা ইহা দ্বারা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। সংকর-জাতি বাস্তবিক দুই জাতির মিশ্রণে উৎপন্ন হয় নাই। দুই দুই জাতির মিশ্রণে এক একটি স্বতন্ত্র সংকরজাতির উৎপত্তি হয়—ইহ

করণজাতি।

পাশ্চাত্য ভৌগোলিক পণ্ডিত টলেমির মতে মধ্যএশিয়ার স্কাইথিয়া (Skythia) নামক ভূভাগে খরণ নামক এক জনপদ ছিল উহাই করণ-জাতির আদিবাসভূমি। প্রাচীন মুদ্রায় যে কোরণ শব্দ উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় উহা করণশব্দের নামান্তর মাত্র। চীনগণ এই জাতিকে কৈষঙ্ বা কুশান্ বলিতেন। বাস্তবিকপক্ষে করণ, কোরণ, খরণ, কুশান ও কৈষঙ্ একই জাতির নাম। মহারাজ কনিষ্ক এই করণ-জাতির অন্তর্গত ছিলেন। এই জাতি খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে মধ্য-এশিয়া হইতে ধীরে ধীরে পঞ্জাব ও কাশ্মীর প্রভৃতি অঞ্চলে অগ্রসর হইতে থাকে। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে ভারতের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে উহাদের অক্ষুণ্ণ প্রভাব। উহাদেরই রাজা কনিষ্কের রাজত্বকালে জালন্ধর নগরে মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সর্ব্বপ্রথম সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে আসিয়া প্রথমতঃ উহারা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে বটে, কিন্তু ক্রমে ক্রমে উহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সমন্বয় সাধন করিয়া এদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম্ম বিদূরিত করে। মনুসংহিতাকার ইহাদের ক্ষত্রোচিত বলবীর্য্য দর্শনে উহাদিগকে ব্রাত্যক্ষত্রিয় নামে অভিহিত করিয়াছেন*। খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে

---

* ঝল্লোমল্লশ্চ রাজন্যাদ্ ব্রাত্যান্নিচ্ছিবিরেবচ।
নটশ্চ করণশ্চৈব খসো দ্রবিড় এবচ॥
(মনুসংহিতা, ১০ অধ্যায়, ২২)

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন মনু অতি প্রাচীন অথচ করণ জাতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক; তবে মনুসংহিতায় উহাদের নাম কি করিয়া উল্লিখিত হইল। ইহার উত্তর এই বর্ত্তমান মনুসংহিতা মনুর মত অবলম্বন করিয়া মহর্ষি ভৃগু

উহারা ব্রাত্য ছিল বটে কিন্তু ক্রমে ক্রমে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের মধ্যে উঁহাদের স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের ১০ম ও ৮৫ অধ্যায়ের মতে বৈশ্যের ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি। ইহারা লিপিকারের কার্য্য করে। বলা বাহুল্য এই মত নিতান্ত কাল্পনিক। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই, যে জাতি মনুসংহিতায় ব্রাত্যক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হইয়াছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকার সেই জাতিকে কেন সংকর আখ্যা প্রদান করিয়াছেন? ইহার উত্তরে কেহ কেহ বলেন মনূক্ত করণজাতি ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণোক্ত করণজাতি এক নহে। কিন্তু এই উত্তর সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। যদি উহারা পৃথক্ হইত মনুসংহিতায় যে ব্রাত্যকরণ জাতির উল্লেখ হইয়াছে, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণকার সেই করণজাতির পৃথক উল্লেখ করিলেন না কেন? অথবা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে করণ নামক যে সংকরজাতির উল্লেখ আছে মনুসংহিতাকার সেই জাতির উল্লেখ করিলেন না কেন? আমাদের মতে মনূক্ত করণ জাতি ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে উল্লিখিত করণ-জাতি পরস্পর অভিন্ন। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে করণসম্প্রদায় সংকরজাতির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন; দুই পৃথক্ জাতির মিশ্রণে করণগণের উৎপত্তি হইয়াছে। "বৈশ্যের ঔরসে ও শূদ্রার গর্ভে করণজাতির উৎপত্তি হইয়াছে" ইহা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ রচনাকালে করণগণের মধ্যে বৈশ্য ও শূদ্র উভয় জাতির আচার কিয়ৎপরিমাণে বিদ্যমান ছিল। ফলকথা করণজাতির সহিত বৈশ্য বা শূদ্রের কোন সম্পর্ক নাই। করণগণ মধ্যএসিয়া হইতে সমাগত একটি নূতন জাতি। উহারা মধ্যএসিয়ার যে স্কাইথিয়া ভূভাগ হইতে এদেশে আগমন করিয়াছিল সেই স্কাইথিয়া ভূভাগ হিমালয়ের উত্তরে শকজনপদের পূর্ব্বে অবস্থিত ছিল।

রাজা কনিষ্ক প্রভৃতিকে কেহ কেহ শক বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। করণগণ স্কাইথিয়া (Skythia) হইতে আগমন করিয়াছিল বলিয়া স্কায়েথ বা কায়স্থ মধ্যে ও পরিগণিত হইয়া থাকে। বর্ত্তমান সময়ে রাজপুতগণের নিম্নেই ইহাদিগের সামাজিক স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। মূল ক্ষত্রিয়জাতি ও করণজাতির আদি নিবাস হয়ত একস্থানেই ছিল; হয়ত উভয় জাতি এক বংশসম্ভূত; কিন্তু করণজাতি অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে আগমন করিয়াছিল বলিয়া স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হইয়াছে।

এইরূপে ভারতবর্ষে আজকাল যে অসংখ্য জাতি দেখিতে পাওয়া যায় উহাদের ইতিহাস অনুসন্ধান করিলে দৃষ্ট হয় যে উহাদের কেহ কেহ ভারতবর্ষের আদিম অধিবাসী, কেহ কেহ মধ্যএশিয়া হইতে সমাগত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থায় পড়িয়া বৈদিক ধর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছিল বলিয়া বর্ত্তমান সময়ে উহাদের পরস্পর সামাজিক অবস্থা এক প্রকার নহে।

রাষ্ট্রবিপ্লব, ধর্ম্মবিপ্লব ইত্যাদি নানাবিধ কারণে গত দুই হাজার বৎসর মধ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ কখনই এক সম্রাটের অধীন হয় নাই; সুতরাং ভারতবর্ষের নানাস্থানে নানা সময়ে নানা জাতির উদ্ভব হইয়াছে, রাজশাসন ঐ সকল জাতির মধ্যে সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয় নাই। আজ সমগ্র ভারত এক রাজার অধীন এবং মনুষ্য-গণনার তালিকায় ভারতের সমগ্র জাতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা একস্থানে প্রাপ্ত হইতেছি। ভগবান্ মনু যেমন সমগ্রভারতে চারি জাতির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন আমরাও এক্ষণে সকল জাতির মধ্যে পরস্পর সমন্বয় সাধন করিয়া চারিটি মূলজাতির প্রতিষ্ঠা করিতে পারি। আমরা প্রাচীন মতের অনুসরণ করি বা নব্য মতের অনুধাবন

সহায়তা করিবে। ব্রাত্য ও সংকরজাতীয়গণ ব্রাত্যস্তোম সম্পাদন করিয়া মূল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতিতে প্রবিষ্ট হইতে পারে—শাস্ত্রে ইহার ব্যবস্থা আছে।

ব্রাত্যযজ্ঞ।

সামবেদের তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে ও লাট্যায়নের শ্রৌতসূত্রে ব্রাত্যযজ্ঞ বা ব্রাত্যস্তোমের বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। যে আচারহীন ব্যক্তি সদাচারে আসিতে চান অর্থাৎ যিনি ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মানুমোদিত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র জাতিতে পরিণত হইতে চান তিনি যেন একটি * উষ্ণীষ, একটি প্রতোদ বা চাবুক, একখানি জ্যাহ্নোড় অর্থাৎ শরশূন্য ধনুক, একখানি বিপথ বা রথ, একখানি কলকাস্তীর্ণ কৃষ্ণবাস অর্থাৎ কাল কন্ধাবিশিষ্ট বস্ত্র, দুইটি কৃষ্ণবলক্ষ অজিন বা দুইখানি ঊর্ণানির্ম্মিত উত্তরীয়, একখণ্ড রজত, বলুকান্তদামতুষাণি অর্থাৎ এক জোড়া কাল নাগ্‌রাই জুতা, তেত্রিশটি গাভী ইত্যাদি সংগ্রহ করেন। অন্ততঃ তেত্রিশজন ব্রাত্য একত্র হওয়া চাই; এই তেত্রিশ জন ব্রাত্য অন্য একজন ব্রাত্যকে যেন নায়করূপে মনোনীত করেন। যিনি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিদ্বান্ বা ধনী অথবা বিশুদ্ধতম বংশসম্ভূত তিনিই নায়কপদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য। এইরূপে মনোনীত হওয়ার পর তিনি গৃহপতি নামে অভিহিত হন। গৃহপতি ঐ তেত্রিশ জন ব্রাত্যের প্রত্যেকের নিকট হইতে পূর্ব্বোক্ত সমস্ত দ্রব্য লইয়া যজ্ঞানুষ্ঠানকারী

---

* উষ্ণীষঞ্চ প্রতোদশ্চ জ্যাহ্নোড়শ্চ বিপথশ্চ কলকাস্তীর্ণঃ কৃষ্ণশংবাসঃ কৃষ্ণবলক্ষে অজিনে রজতো নিষ্কস্তদ্ গৃহতে।

(তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণ, ১৩।১।১৪)

বলুকান্তানি দামতুষাণীতরেষাং দ্বেদ্বে দামনী দ্বেদ্বে উপানহৌ দ্বিষং হিতানি

ব্রাহ্মণের নিকট উপস্থিত হইবেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে বলিবেন, "মহাশয়, ইহারা হীন ব্রাত্য, ব্রহ্মচর্য্যাদির অনুষ্ঠান করে নাই; কৃষি-বাণিজ্যাদি ধর্ম্ম পালন করে নাই; ইহারা এক্ষণে পূর্ব্বস্বভাব ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক; ইহারা ব্রাত্য অবস্থায় যে পরিচ্ছদ পরিত তাহা ত্যাগ করিয়াছে; ইহাদের ব্রাত্য অবস্থায় যে ধনসম্পদ ছিল তাহা বিসর্জ্জন দিয়াছে; ইহাদিকে গ্রহণ করুন।" গৃহপতির আবেদন শ্রবণ করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠানকারী ব্রাহ্মণ ঐ তেত্রিশ জন ব্রাত্যের জন্য তেত্রিশটি হোমকুণ্ড প্রস্তুত করিবেন। উহারা অনুতপ্ত হৃদয়ে ঐ হোমকুণ্ডে ঘৃতাদি প্রক্ষেপ পূর্ব্বক ষোড়শ মন্ত্র শ্রবণ ও উচ্চারণ করিয়া স্ব স্ব পাপের ক্ষয় করিবে। যজ্ঞ সমাপনান্তে গৃহপতি কর্ত্তৃক আনীত পূর্ব্বোক্ত তেত্রিশ জন ব্রাত্যের পরিচ্ছদ ও ধনাদি, যাহারা তখনও ব্রাত্যভাবে সংসারে বিচরণ করিতেছে তাহাদিগকে অথবা যে সকল নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ * ব্রাত্যের দান গ্রহণ করেন তাঁহাদিগকে অর্পণ করিতে হইবে। যজ্ঞ সমাপনান্তে যজ্ঞীয় পায়সান্ন প্রভৃতি গৃহপতি সর্ব্বপ্রথমে ভোজন করিবেন, তদনন্তর পূর্ব্বোক্ত তেত্রিশ জন ব্রাত্য উহার অবশিষ্টাংশ আহার করিবেন। যজ্ঞপরিসমাপ্তি ও যজ্ঞীয় পায়সান্ন প্রভৃতি ভোজনের পরেই পূর্ব্বোক্ত তেত্রিশ জন ব্রাত্য দ্বিজপদ-বাচ্য হন। যিনি ব্রাহ্মণ হইবার জন্য ব্রাত্যযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াছেন তিনি ব্রাহ্মণের সহিত যজন, যাজন, দান, অধ্যয়ন, প্রতিগ্রহ করিয়া থাকেন; যিনি ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য হইবার জন্য ব্রাত্যযজ্ঞ করিয়াছেন তিনি ক্ষত্রিয়ত্ব বা বৈশ্যত্ব প্রাপ্ত হন।

তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণের মতে তেত্রিশ জন ব্রাত্য একত্র না হইলে

* ব্রাত্যেভ্যো ব্রাত্যধনানি ব্রাত্যচর্য্যায়া অবিরতাঃ স্যুঃ ব্রহ্মবন্ধবে বা মগধদেশীয়ায় যথা এতদ্দদতি তস্মিন্নেব মৃজানা যন্তীতি হাহ (লাট্যায়নীয়ে শ্রৌতসূত্রে

ব্রাত্যযজ্ঞ হয় না ; লাট্যায়ন স্বীয় শ্রৌতসূত্রে এরূপ বিশেষভাবে কোন সংখ্যা নির্দ্দেশ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার টীকাকারগণ বলিয়াছেন তেত্রিশ জন ব্রাত্য একত্র আবেদন না করিলে কিছুতেই ব্রাত্যযজ্ঞ হইতে পারেনা।

ব্রাত্য বহুবিধ। তাহাদের উচ্চার্য্য মন্ত্রও বহুবিধ। প্রধানতঃ উহাদিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা—(১) হীনব্রাত্য—যাহারা বৈদিক ধর্ম্মের অন্তগত ছিলনা অথচ ব্রাত্যস্তোম করিয়া দ্বিজ হইতে ইচ্ছা করে তাহাদের জন্য হীন ব্রাত্যস্তোম সম্পন্ন করিতে হয়* ; (২) গরগির—যাহারা পূর্ব্বে বৈদিক ধর্ম্মের অন্তর্গত ছিল, নরহত্যার অপরাধে অথবা কোন প্রয়োজনবশতঃ ম্লেচ্ছ জাতিগণের মধ্যে কিছুকাল বাস করিয়া ম্লেচ্ছভাবাপন্ন হইয়াছে তাহাদিগকে গরগির বা বিষভোজী ব্রাত্য বলে ; ইহারা গরগির ব্রাত্য-স্তোম সম্পন্ন করিয়া পুনরায় ব্রাহ্মণত্বাদি লাভ করিতে পারে। কৌষীতকী ব্রাহ্মণগণ এইরূপে পুনরায় ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

শুধু বৈদিক সাহিত্য নহে পৌরাণিক সাহিত্যেও ব্রাত্যস্তোমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মৎস্যসূক্তের প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণের ৩৮ পটলে লিখিত আছে—যাঁহারা সাবিত্রী ভ্রষ্ট হইয়া ব্রাত্যভাবাপন্ন হইয়াছেন তাঁহারা ব্রাত্যস্তোম সম্পাদন দ্বারা আপনাদিগকে পুনঃ সংস্কৃত করিবেন। যে ব্যক্তি ব্রাত্যস্তোম সম্পাদনে অসমর্থ তিনি ঔদ্দানিক ব্রতের অনুষ্ঠান করিবেন। এই ব্রতের নিয়ম যথা—দুই মাস যাবক অর্থাৎ যবান্ন (barley) ভক্ষণ করিবে ; এক মাস দুগ্ধ পান করিয়া কাটাইবে ; এক পক্ষ কেবলমাত্র দধি ভোজন করিবে ; এক

* হীনা বা এতে হীয়ন্তে যে ব্রাত্যাং প্রবসন্তি নহি ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি ন কৃষিং ন

সপ্তাহ কেবল ঘৃত খাইয়া থাকিবে; ৬ দিন অযাচিতভাবে যাহা পাইবে তাহা খাইয়া থাকিবে; তিন দিন জলপান করিয়া থাকিবে; পরে একদিন কিছুই আহার করিবেনা; তদনন্তর সে ব্যক্তি পুনঃ-সংস্কার প্রাপ্ত হইবার উপযুক্ত হইবে। কাহারও কাহারও মতে যাহার পনর বৎসর পর্য্যন্ত সাবিত্রী ভ্রষ্ট হইয়াছে সে পুনঃসংস্কারের যোগ্য; কাহারও মতে তিন পুরুষ পর্য্যন্ত সাবিত্রী ভ্রষ্ট হইলে পুনঃসংস্কৃত হইতে পারে। দেশকালাদি বিপ্লববশতঃ সাবিত্রী ভ্রষ্ট হইলে বহুপুরুষের পরও পুনঃসংস্কার হইতে পারে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।

ভবিতব্য।

আদর করিয়া যোগেশচন্দ্র কন্যার নাম রাখিয়াছিলেন, লীলাবতী। এ নাম রাখিবার একটু কারণও ছিল। কন্যা যখন ছয় মাসের তখন হইতেই যোগেশচন্দ্রের হাতে বই বা কাগজ পত্র দেখিলেই তাহা আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য বড়ই কাঁদিত; দোয়াত উল্টাইয়া সর্ব্বাঙ্গ মসিলিপ্ত না করিয়া নিশ্চিন্ত হইত না। যোগেশচন্দ্র এই সবগুলির মধ্যে ভবিষ্যতে কন্যার একটা বড়গোছের বিদুষিতার পরিচয় দেখিতে পাইতেন, তাই আদর করিয়া নাম রাখিয়াছিলেন লীলাবতী।

যোগেশচন্দ্রের পুত্রসন্তান ছিল না, এই কন্যার উপর দিয়া তিনি ছেলের সাধ সব মিটাইতে চাহিতেন; তিন বছরে পা দিবা মাত্রই এক শুভদিনে কন্যার হাতেখড়ি দিয়া লেখা পড়ার ব্যবস্থা করিয়া

সরস্বতীর প্রতি এতটা গাঢ় অনুরাগ লীলাবতীর বড় বেসি দিন স্থায়ী হইল না; বালিকা শীঘ্রই পুস্তক অপেক্ষা পুতুলের আদর অধিক পরিমাণে করিতে লাগিল। যোগেশচন্দ্র কন্যাকে লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করাইতে পারিলেন না, মধ্যে মধ্যে শাসন করিতে লাগিলেন; কিন্তু পত্নীর আপত্তিতে সে শাসনও অধিক দিন টিকিল না, —যোগেশ-পত্নী বলিতেন—"মেয়ে ত আর জজ্ ম্যাজিষ্ট্রেট হবেনা তাহার লেখাপড়া শিখিবার দরকার কি ?"

যোগেশের বিদূষী কন্যার কল্পনা অচিরেই ভস্মীভূত হইয়া গেল। তিনি দেখিলেন, এত সাধের লীলাবতী নাম, সে নামের সার্থকতা নষ্ট, হইতেছে। কিন্তু কি করিবেন, উপায় নাই। একে কন্যা তায় সবে মাত্র একটী কাজেই তাহার উপর বেসি জুলুম চলেনা।

কন্যা লেখাপড়া শিখিলনা! তাহাতে যোগশচন্দ্র একেবারে হতাশ হইলেন না; বিদূষী কন্যার ঝোঁকটা বিদ্বান জামাইয়ের উপর গিয়া পড়িল। জামাই খুব বিদ্বান করিবেন এই আশায় যোগেশচন্দ্র অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন।

(২)

যোগেশচন্দ্রের প্রতি লক্ষ্মীর কৃপা যথেষ্ট পরিমাণে ছিল, কাজেই তাঁহাকে অনেকগুলি পোষ্য প্রতিপালন করিতে হইত, তন্মধ্যে বিষ্ণুচরণও একজন। প্রতিপালিতদিগের মধ্যে বিষ্ণুচরণের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদর ছিল, সে বাড়ীর-ছেলের মতই থাকিত। ইহার কারণ যোগেশ-পত্নী বিষ্ণুচরণকে স্নেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন; সে তাঁহার সখীপুত্র। সই যখন মৃত্যুশয্যায় তখন এই পাঁচ বছরের পিতৃহীন পুত্রটীকে তাঁহার হাতে সঁপিয়া দিয়া যান। যোগেশ-পত্নী তাই অতি যত্নে বিষ্ণুচরণকে মানুষ করিতেছিলেন।

করিবার কল্পনা যোগেশচন্দ্রের মনে উঠিল। পত্নীর নিকট অভিলাষটা ব্যক্ত করিলেন ; গৃহিনীও বিষ্ণুচরণকে আপন সন্তানের ন্যায় ভাল-বাসিতেন, কাজেই এ প্রস্তাবটা তাঁহারও অনুমোদিত হইল।

যেদিনই বিষ্ণুচরণ লীলাবতীর ভাবীস্বামী স্থির হইল, সেই দিন হইতেই তাহার পড়াশুনার একটা বড়গোছের বন্দোবস্ত হইয়া গেল ; তাহার জন্য একজন প্রাইভেট টিউটর নিযুক্ত হইল, এবং বিষ্ণুচরণ ইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়া আসিল।

সে এতদিন লেখাপড়ার কোন ধার ধারিত না, হঠাৎ এতটা আয়োজনে ভ্যাবা-চ্যাকা খাইয়া গেল। প্রথম দিন ইস্কুলে গিয়া সে কছুতেই পড়িতে চাহিল না, সমস্ত দিন কাঁদিয়া কাটিয়া অনর্থ করিল। গৃহে ফিরিয়াও বালক নিস্তার পাইল না, এখানেও পাঠাভ্যাসের কারাগারে বন্দী হইতে হইল। ইহাতে সে বড়ই অস্থির হইয়া উঠিল।

লেখাপড়ার চাপে বালককে পিসিয়া ফেলিবার ব্যবস্থা চলিতে লাগিল। বাটীর মাষ্টার মহাশয় ও ইস্কুলের মাষ্টার মহাশয়—এই দুই মাষ্টারের উগ্র কঠোর তাপে বালকের নবীন স্ফূর্ত্তি মরমর হইয়া পড়িতেছিল। যখন সারাটা দ্বিপ্রহর ইস্কুলে ও সারা সন্ধ্যা ও সকাল ঘরের মধ্যে রুদ্ধ হইয়া পুস্তকের অক্ষরে মনোনিবেশ করিতে হইত, তখন অক্ষরগুলা তার চক্ষে অগ্নিশলাকার ন্যায় বিধিত—মন তখন তাহার বাগানে বাগানে ঘুরিয়া, গাছে চড়িয়া, সাঁতার কাটিয়া, ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইবার জন্য ওষ্ঠাগত হইত।

দুই মাষ্টারে অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে কিছুতেই পাঠে মনো-যোগী করাইতে পারিল না।

এক বৎসরে তার লেখাপড়া কিছুই অগ্রসর হইল না। যোগেশ চন্দ্রের আজ্ঞায় বালকের প্রতি শাসন আরও কঠোরতর হইতে থাকিল।

কোথাও মিলিল না। স্বামীর ভয়ে যোগেশ-পত্নীও বিষ্ণুচরণকে আর তেমন আদর দিতে পারিতেন না।

এমন অবস্থায় এক দিন বিষ্ণুচরণ ইস্কুলের ছুটীর পর বাড়ী না ফিরিয়া হঠাৎ বোসেদের বাগানে ঢুকিয়া পড়িল। একেবারে এতটা স্বাধীনতা লইয়া বালক আনন্দে কাঁদিয়া ফেলিল; একটা গাছের শিরে কতকগুলা পাখী কলরব করিতেছিল, বালকের হৃদয়ে তখন আনন্দ ধরিতেছিলনা, সে তাড়াতাড়ি সেই বৃক্ষে আরোহণ করিয়া কতকগুলা পাখীর ডিম পাড়িয়া আনিল। তাহার পরে পুষ্করিণীতে নাবিয়া মনের সাধে অনেকক্ষণ ধরিয়া সাঁতার কাটিল। সমস্ত বাগানটা যেন মাথায় করিতে লাগিল। এত পরিশ্রমেও তাহার শ্রান্তি আসিতেছিল না।

ক্রমেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল, উৎসাহের ঝোঁকে তাহা বালকের নজরে পড়িল না। ক্রমে ঘন অন্ধকার যখন তাহার দৃষ্টিশক্তি রোধ করিয়া দাঁড়াইল তখন যেন তাহার চৈতন্য আসিল। বাড়ীর কথা মনে হইল; মাষ্টার মহাশয়ের ভীষণ মূর্ত্তি যেন তাহার চোখের সমুখে আসিয়া দাঁড়াইল, বালক শিহরিয়া উঠিল। বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা আর হইল না। নিদ্রায় তার চক্ষু ঢুলিতেছিল। বালক পুষ্করণীর সিঁড়ির একপাশে শুইয়া পড়িল।

বিষ্ণুচরণের জন্য সে দিন গৃহিণী বড়ই চঞ্চল হইলেন—সমস্ত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারিলেন না, ঘর ও বার করিতে লাগিলেন।

পর দিন সকাল হইলেই তল্লাসের জন্য লোক পাঠাইয়া বিষ্ণুচরণকে খুঁজিয়া আনা হইল। গৃহিণী তাহার মুখচুম্বন করিয়া আদর করিলেন। বালকের উপর সমস্ত শাসন শিথিল হইয়া গেল। যোগেশচন্দ্র বিষ্ণুচরণকে জামাই করিবার আশা পরিত্যাগ করিলেন।

খেলার প্রতি বিষ্ণুচরণের অনুরক্তি এত প্রবল দেখিয়া যোগেশ-চন্দ্র বড়ই চটিয়া গেলেন, বলিলেন—"ছোঁড়াটাকে এখনই বাড়ী হইতে দূর করিয়া দাও, আমি উহার মুখ দর্শন করিতে চাহিনা।" যোগেশ-পত্নী অনেক চেষ্টা করিয়াও বিষ্ণুচরণকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। বালকের উপর যোগেশের অনেক আশা ছিল। সে আশায় হত হইয়া মর্ম্মান্তিক চটিয়াছিলেন। কাজেই বিষ্ণুচরণকে তাঁহার আশ্রয় হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইল, তার এক গরীব মাসী ছিলেন, বালক তাঁহারই দ্বারস্থ হইল। বিষ্ণুচরণের ভরণপোষণের জন্য যোগেশ-পত্নী লুকাইয়া কিছু কিছু অর্থ পাঠাইতে লাগিলেন।

(৩)

লীলাবতী বিবাহযোগ্যা হইয়া উঠিল, কিন্তু যোগেশচন্দ্র বিবাহ দিবার কোন আয়োজন করিলেন না। তাঁহার এই অপরূপ উদাসীনতা সকলের চক্ষে ভাল ঠেকিল না—বিশেষতঃ তাঁহার স্ত্রীর। তিনি স্বামীকে যথেষ্ট উত্যক্ত করিতে লাগিলেন, তথাপি তাঁহাকে আদৌ মনোযোগী দেখা গেল না। কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, সুপাত্রের অভাব। কিন্তু অনুসন্ধান ও চেষ্টা ব্যতিরেকে মনোমত সামগ্রী যে মিলিবেনা একথা যোগেশচন্দ্র বুঝিয়াও বুঝিলেন না। কে আর কি করিবে?

বিষ্ণুচরণকে যোগেশ-পত্নী ভুলিতে পারেন নাই। তাহাকে জামাতা করিবার বাসনা তখনও ক্ষীণ আলোরেখার মত তাঁহার হৃদয়ে বর্ত্তমান ছিল। তিনি বুঝিতেন, বিদ্যাশিক্ষা অর্থোপার্জ্জনের জন্য, বিষ্ণুচরণ নাইবা তেমন লেখাপড়া শিখিল, তাঁহার জামাতা হইলেত তাহাকে আর অর্থকষ্ট ভোগ করিতে হইবে না, সে বাঁচিয়া থাকুক তাহাই যথেষ্ট।

কিন্তু যোগেশচন্দ্র কিছুতেই বুঝিলেন না, বলিলেন, মূর্খের সহিত কন্যার বিবাহ দিবনা। গৃহিণী হতাশ হইলেন।

কিন্তু বিষ্ণুচরণের যে ইতি মধ্যে অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, সে সংবাদ ইঁহারা কেহই রাখেন নাই। শৈশবে তুই মাষ্টারের তাড়নায় তাহার কিছুই করিতে পারে নাই, কিন্তু বয়সের সঙ্গে অভাবের তাড়না তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিতেছিল। মাসীমার দারিদ্র্য নিপীড়িত কুটীরের অভ্যন্তর হইতেই সে একদিন দিব্যচক্ষু লাভ করিয়া দেখিল, ইহসংসারে তাহার জন্য গ্রাসাচ্ছাদনের বন্দোবস্ত বিধাতা কিছুই রাখেন নাই; তাহাকে নিজেই তাহার সন্ধান করিয়া লইতে হইবে। ছেলেবেলায় পুস্তকের যে অক্ষরগুলি তাহার নেত্রে অগ্নিশলাকার ন্যায় বিঁধিয়াছিল, কৈশোরে একদিন বইয়ের পাতা খুলিয়া দেখিল সেগুলি শিরীষ কুসুমের ন্যায় কোমল হইয়া গিয়াছে। তখন আর কাহারও শাসন প্রয়োজন হইল না, বালক স্বেচ্ছায় পাঠে মনোনিবেশ করিল।

অবস্থাধাত্রী যে পুষ্টিদান করে তাহার শক্তি অস্বাভাবিক উপায়ে লব্ধ পুষ্টি অপেক্ষা অনেক অধিক। বিষ্ণুচরণ অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই এখন অনেক শিখিয়া ফেলিতে লাগিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার সংবাদ বাহির হইলেই যোগেশচন্দ্র একখানি গেজেট ক্রয় করিয়া সযত্নে বাক্সে তুলিয়া রাখিতেন, ইহার কারণ বড় কেহ বুঝিতে পারিত না।

একদিন যোগেশ-পত্নী স্বামীর কাছে কাঁদিয়া কাটিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "আর দেরী করিও না, লীলাবতীর বিবাহ শীঘ্র দাও।" যোগেশচন্দ্র গম্ভীর ভাবে উত্তর করিলেন—"তুমি স্থির হও, আমি সে ব্যবস্থা করিয়াছি।" স্বামীর একথায় স্ত্রী আশ্বস্ত হইলেন না, বলিলেন, "কি উপায় করিয়াছ বল।"

সেগুলা স্ত্রার দিকে নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "এই হইতেই তোমার মেয়ের বিবাহ হইবে।"

যোগেশ-পত্নী অবাক হইয়া রহিলেন, মনে করিলেন স্বামীর মস্তিষ্ক বোধহয় বিকৃত হইয়াছে। এক গাদা নির্জীব কাগজ কেমন করিয়া তাঁহার কন্যার জন্য একটি সুন্দর বর ধরিয়া আনিবে, তিনি তাহা কিছুতেই বুঝিতে পারিতেছিলেন না।

(৪)

সুবোধচন্দ্র প্রবেশিকা হইতে বি, এ, পর্য্যন্ত সবগুলি পরিক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষা হইতেই এই সুবোধের উপর যোগেশচন্দ্রের দৃষ্টি পড়ে, তিনি সেই সময়ই গোপনে সংবাদ লইয়া জানিয়াছিলেন সর্ব্ববিষয়ে সুবোধ তাঁহার জামাতা হইবার উপযুক্ত—সুবোধরা তাঁহাদেরই পাল্টীঘর। বারম্বার পাশের তলিকার শীর্ষে তাহার নাম দেখিয়া তাহার সহিত কন্যার বিবাহ দিবার লোভ যোগেশচন্দ্রের দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিতেছিল; তাই তিনি কন্যার আর সম্বন্ধ করেন নাই। সুবোধের বি, এ, পরীক্ষা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। মেয়ে একটু বড় হউক তাহাতে তত ক্ষতি বিবেচনা করেন নাই।

বি, এ, পরীক্ষার ফল বাহির হইবামাত্রই সুবোধের পিতাকে যোগেশচন্দ্র এক পত্র দিলেন। লিখিলেন, ছেলেকে কুড়ি হাজার টাকা নগদ দিব, আমার কন্যার সহিত বিবাহ দিন। যোগেশচন্দ্র জানিতেন, সুবোধের পিতা এই টাকার প্রলোভনে নিশ্চয়ই ধরা দিবেন, কারণ তিনি কপর্দ্দকহীন ব্রাহ্মণ।

সুবোধের পিতা কালবিলম্ব না করিয়া জানাইলেন যে, তাঁহাকে বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ করিতে পারিলে তিনি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিবেন।

(৫)

সুবোধের এই বিবাহের সম্বন্ধে তাহার পিতার বড়ই নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মিল। গরীব ব্রাহ্মণ এত গুলি টাকার উষ্ণতা সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না, সে উষ্ণতা তাঁহার মস্তিকের কোটর পর্য্যন্ত আশ্রয় লইয়াছিল।

ব্রাহ্মণ একদিন স্বপ্ন দেখিলেন, তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহার ঘরখানি টাকায় মোহরে ভরিয়া গিয়াছে, স্তিমিত আলোকে সেগুলি ঝক্ ঝক্ করিতেছে, খানিকক্ষন পরে দেখিলেন কতকগুলা কৃষ্ণকায় তস্কর তাঁহার সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া সব টাকা ও মোহরগুলি কুড়াইয়া লইতেছে; তাহারা সংখ্যায় অসংখ্য। ক্রমে ক্রমে সমস্ত ঘরটা সেই কালো কালো মূর্ত্তিতে ভরিয়া গেল, সকলেই টাকা উঠাইতেছে। ব্রাহ্মণ স্বপ্নে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, সেই শব্দে তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল।

পরদিন প্রাতঃকালে পাড়ার দৈবজ্ঞকে ডাকাইয়া ব্রাহ্মণ স্বপ্নের ফলাফল জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি দীর্ঘ আর্কফলা নাড়িয়া, অনেক সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করিয়া পরিশেষে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, এ স্বপ্নের ফল শুভ। যেহেতু শাস্ত্রেই আছে স্বপ্নের ফল বিপরীত হয়। এ যখন ধনহানির স্বপ্ন ইহার ফল তখন ধনপ্রাপ্তি। সুবোধের পিতা দৈবজ্ঞের এই উক্তিতে আশ্বস্ত হইলেন।

গ্রামময় রাষ্ট্র হইয়া গেল সুবোধের সহিত এক রাজকন্যার বিবাহ হইতেছে, গরীব ব্রাহ্মণের অদৃষ্ট ফিরিয়াছে, সে রাতারাতি বড় মানুষ হইতে চলিয়াছে। সবে মাত্র কুড়ি হাজার বাক্যের মোহিনী শক্তিতে কুড়ি লক্ষেরও অধিকে পরিণত হইল।

সুবোধচন্দ্র নিজে এ বিবাহ-প্রস্তাবটা বড় ভালভাবে লইল না।

বিবাহ করিবার ইচ্ছা ছিল না। বাঙ্গালীরা পরিণাম না ভাবিয়া, বিবাহ করাতে যে অধঃপাতে যাইতেছে, অনেকবার অনেক তর্কে সে এই কথা প্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তা ছাড়া ধনীদিগের উপর তাহার কেমন একটা মর্ম্মান্তিক বিসদৃশ ভাব ছিল। সে তাহাদের উপর বড় একটা সুদৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে পারিত না। ধনগর্ব্ব সে অসহ্য বোধ করিত। ধনী ও নির্ধনীর ভিতর একটা যে মিলনের স্থান থাকিতে পারে, এ কথা সে বিশ্বাস করিত না। বড় লোকের কাছে গরীবকে স্বভাবতই নত হইতে হয়—সে কেন এতটা হীনতা স্বীকার করিবে? সেই জন্য সে বাল্যকাল হইতে ধনী সহপাঠীর সংস্পর্শে প্রাণান্তে আসিত না।

সেই ধনীর কন্যাকে বিবাহ করিতে হইবে, তাহার ঐশ্বর্য্য-দৃপ্ত-দ্বারে করুণার ভিখারী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে, ইহা তাহার পক্ষে অসহ্য। তাহা অপেক্ষা সে চিরদিন অবিবাহিত থাকুক না কেন। সে যেন চোখের সাম্‌নে দেখিতেছিল, তাহার সেই ধনমদোন্মত্তা স্ত্রী তাহার প্রতি অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে; তাহার সমস্ত শরীরটা জ্বলিয়া উঠিল।

একদিন কথাপ্রসঙ্গে সুবোধচন্দ্র নিজের মনের ভাবটা পিতার সমক্ষে প্রকাশ করিল। এ কথা শুনিয়া তিনি পুত্রের বুদ্ধির প্রশংসা করিলেন না, ভাবিলেন অত্যধিক পাঠে পুত্রের মাথা খারাপ হইয়াছে, নচেৎ এতগুলি টাকা জলাঞ্জলী দিবার কথা কেমন করিয়া সে মুখাগ্রে আনিল! পিতা সুবোধকে বলিলেন—"তুমি বিদ্বান্ হইয়াও মূর্খ, এত টাকা কখন কেউ হাতছাড়া করে!"

সুবোধ বেসি তর্ক করিলনা, কেবল বলিল—"অর্থের জন্য বড়-লোকের দ্বারস্থ হইতেছেন কেন? আমি অমন ঢের কুড়ি হাজার উপার্জ্জনের আশা রাখি।"

সুবোধের পিতা ভবিষ্যতে দৃষ্টিপাত করিতে চাহিলেন না, বলিলেন—"উপস্থিত অন্ন ত্যাগ করা বিধেয় নহে।"

সুবোধ দেখিল, তর্ক করা বৃথা, তখন শুধু বলিল—"আমার বিবাহ করিবার ইচ্ছা নাই।"

বৃদ্ধ সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না।

(৬)

বৃদ্ধের ইচ্ছামতই কার্য্য চলিতে লাগিল। এক দিন খুব ধুম-ধাম করিয়া যোগেশচন্দ্র সুবোধকে দেখিয়া আসিলেন, নগদ পাঁচ শত টাকা দিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। সুবোধের পিতার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, কি দিয়া তিনি কনের মুখ দর্শন করিবেন, তিনি যে অর্থহীন! যোগেশচন্দ্র সে কথাটা ভাল রকমই জানিতেন তাই একেবারে পাঁচশত টাকা দিয়া বসিলেন। ব্রাহ্মণ হাতে স্বর্গ পাইলেন।

বড়লোক বলিয়া সুবোধ যোগেশচন্দ্রকে সুদৃষ্টিতে দেখিতে পারিতেছিলনা। তাহাদের গরীব জানিয়াও যোগেশচন্দ্র যে একেবারে পাঁচ শত টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিলেন, সে কেবল অহঙ্কারের চিহ্ন! ইহাতে তাহার পিতাকে কতই না হীন জ্ঞান করা হইল! যোগেশচন্দ্রের এতটা বড়মানুষী-গন্ধ সুবোধকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল। সে মনে মনে গর্জ্জিতে লাগিল।

সুবোধের পিতাও একদিন লীলাবতীকে দেখিয়া আসিলেন। সুবোধ যাইবার আগে পিতাকে বলিয়া দিল পাঁচশত টাকা দিয়াই যেন কন্যার মুখ দেখা হয়, কম টাকা দিলে যোগেশচন্দ্রের কাছে বড়ই হীনতা স্বীকার করিতে হইবে। পুত্রের মন রাখিবার জন্য কুড়ি খানি মোহর দিয়াই কন্যার মুখ দেখা হইল। যোগেশচন্দ্র যে পাঁচ শত টাকা দিয়া আসিয়াছিলেন, তাহা কেহই জ্ঞাত ছিলনা। কুড়ি খানা মোহর দেখিয়া অনেকেই চমকিয়া উঠিল। বলিল, বৃদ্ধ কৃপণ,

অনেক মোহরের ঘড়া নিশ্চয়ই তাহার গৃহকোণে প্রোথিত আছে, নচেৎ কুড়িখানা মোহর দিয়া কন্যার মুখ দেখিল কেমন করিয়া? যে সে কি পারে? সকলে আগ্রহ সহকারে দেখিয়া গেল মোহরগুলি আধুনিক কি আকব্বরী, সঙ্গে সঙ্গে বিবাহের দিনস্থির হইল।

(৭)

আজ লীলাবতীর বিবাহ। বাড়ীতে হৈচৈ পড়িয়া গিয়াছে, নহবতের সুমধুর লহরীতে বালক বালিকারা তালে তালে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে।

সন্ধ্যার সময় যোগেশচন্দ্রের বাটী আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া উঠিল। কন্যাযাত্রীতে বাড়ী পূর্ণ হইয়া উঠিল, আত্মীয় কুটুম্বের সমাগমে গৃহ প্রাঙ্গণ মুখরিত হইল। বিষ্ণুচরণও নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছিল।

বর খুবই ঘটা করিয়া বিবাহ করিতে আসিবে—পাড়ার আবাল-বৃদ্ধবণিতা সকলেই উন্মুখ হইয়া পথের ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। এত বড় সুযোগ পাড়ার মধ্যে আর কখনও হইবে কি না সন্দেহ, কাজেই সকলে ঘর হইতে ছুটিয়া বর দর্শনের জন্য বাহির হইল।

বরের মিছিল বড় শীঘ্র দেখা গেল না তখন সকলেই চঞ্চল হইয়া উঠিল, যাহারা আর অপেক্ষা করা অসম্ভব বিবেচনা করিল তাহারা উঠিয়া চলিয়া গেল। পথের ধারে বালকেরা দাঁড়াইয়া তখন জটলা করিতে লাগিল।

ক্রমেই বরাগমনের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ইহা দেখিয়া যোগেশ-চন্দ্র বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন, যখন লগ্নের সময় প্রায় অতিবাহিত হইয়া যায় তখন যোগেশচন্দ্র সংবাদ লইবার জন্য চারিদিকে লোক পাঠাইলেন।

ঠিক এমনই সময় কে একজন আসিয়া সংবাদ দিয়া গেল,—আজ

সকাল হইতে সুবোধচন্দ্রকে পাওয়া যাইতেছেনা, তাহার জন্য এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়া করিয়া, আর সময় নাই দেখিয়া সংবাদ দিতে আসিয়াছি।

এই সংবাদে বাড়ীময় একটা মহা গণ্ডগোল পড়িয়া গেল, সেই অবসরে লোকটা কোথায় সরিয়া পড়িল, তাহার সন্ধান হইল না। কাজেই সংবাদটা ভাল করিয়া পাওয়া গেল না

যোগেশচন্দ্র চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখিলেন। আজ কন্যার বিবাহ না দিলে তাঁহার জাতিপাত হইবে। মহা অনর্থ। কি করিবেন কিছুই বুঝিতে পারিতেছিলেন না, যোগেশচন্দ্র পাগলের মত ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। লগ্ন বহিয়া যাইতেছে, আর সময় নাই, যেমন করিয়া হউক লীলাবতীর বিবাহ দিতে হইবে।

যোগেশচন্দ্র পত্নীর নিকট গিয়া কাতর কণ্ঠে বলিলেন—"কি উপায় করি বল দেখি, এখন পাত্র পাই কোথা ?"

যোগেশচন্দ্রের স্ত্রীর মনে চট্ করিয়া একজনের চিত্র উদিত হইল, বলিলেন,—"কি করিবে ? বিষ্ণুর সহিতই বিবাহ দাও।"

যোগেশ বলিলেন—"সে যে মূর্খ।" বলিয়াই তিনি বসিয়া পড়িলেন, পায়ের পাশ হইতে ধরিত্রী যেন সরিয়া গেল বলিয়া তাঁহার বোধ হইল।

পত্নী বলিলেন—"মূর্খ ও বিদ্বান দেখিবার সময় নাই, বিষ্ণুর সহিতই বিবাহ দাও, নইলে সর্ব্বনাশ হইবে।"

পরমুহূর্ত্তে সুবোধচন্দ্রের পরিবর্ত্তে বিষ্ণুচরণ বিবাহস্থলে আসিয়া দাঁড়াইল।

ইহা দেখিয়া সকলে বলিল—"বিবাহ ভবিতব্য।"

পরদিন যোগেশচন্দ্র একখানি পত্র পাইলেন তাহাতে লেখা আছে—"আমি বিশেষ দুঃখিত, আপনার কন্যাকে বিবাহ করিতে পারিলাম না, তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। আমি ষ্টেট স্কলার-

পঞ্চকন্যা।

দ্রৌপদী।

দ্রৌপদী সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ আখ্যায়িকা আছে। ভগবান্ রামচন্দ্র বনগমন করিলে ভগবান্ অগ্নি তাঁহাকে ছায়াসীতা প্রদান করিয়া প্রকৃত সীতাকে আপনার নিকট রক্ষা করেন; —অধ্যাত্মরামায়ণেও একথা আছে। রাবণনিধনের পর সীতার অগ্নি-পরীক্ষার সময় দেব বৈশ্বানর মাতা জানকীকে মস্তকে লইয়া শ্রীরাম-চন্দ্রকে সমর্পণ করিয়া ছায়া লইয়া চলিয়া যান। সেই ছায়া ব্রহ্মকুণ্ডে বহুকাল তপস্যা করিলে ভগবান্ মহাদেব তাঁহাকে বর দান করিতে চাহেন। তখন শক্তি-ছায়া ব্যগ্র হইয়া 'পতিং দেহি,' 'পতিং দেহি' পাঁচবার বলিয়াছিলেন, ভগবান্ও পাঁচবার তথাস্তু বলেন। এই শক্তি-ছায়াই দ্রুপদের যজ্ঞকুণ্ড হইতে দ্রৌপদীরূপে আবির্ভূতা হয়েন। অর্জ্জুন দ্রৌপদী-স্বয়ম্বরের লক্ষ্যভেদ করিয়া দ্রৌপদীকে লাভ করতঃ আবাসে প্রতিগমনপূর্ব্বক গৃহাভ্যন্তরে কার্য্যে ব্যস্ত মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলেন—"মা, আমরা এক অপূর্ব্ব বস্তু ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছি।" কুন্তীদেবী অভ্যন্তর হইতেই বলিলেন—"পাঁচজনে সমান ভাগে ভাগ করিয়া লও।" এই কারণেই দ্রৌপদী পঞ্চপাণ্ডবের স্ত্রী হয়েন এবং মহাদেবের বরও সফল হয়। জ্ঞানতঃই হউক আর অজ্ঞানতঃই হউক কুন্তীদেবী যে অতিশয় বুদ্ধিমতীর কার্য্য করিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই স্ত্রীরত্ন লইয়াই হয়ত পঞ্চপাণ্ডবের মধ্যে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ সংঘটিত হইয়া অনর্থ উৎপাদন করিত।

দ্রৌপদীর এই পঞ্চস্বামীত্বই তাঁহার কন্যাত্বের অর্থাৎ অপূর্ব্ব শক্তি-মত্তার পরিচায়ক। এক স্ত্রী লইয়া জগতে কত না অনর্থ সংঘটিত

হইয়াছে ও হয়। এই নারীরূপ আমিষের জন্য কত রক্তপাত হইয়াছে, কত ভ্রাতৃবিচ্ছেদ, কত রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছে ও হইতেছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। স্ত্রীর একই পতি সম্ভব, অন্যথা পূর্ণ দাম্পত্যভাব প্রকটিত হয় না। যে নারী একাধিক পুরুষ-সেবিনী তাহার পুরুষ বিশেষের সহিত দাম্পত্যভাব সম্ভবে না, এই কারণেই এরূপ স্ত্রীকে পুংশ্চলী বলা যায়। কিন্তু পঞ্চপাণ্ডবের প্রত্যেকের সহিতই দ্রৌপদীর পূর্ণদাম্পত্য-ভাব ছিল। এ বিষয়ে অন্য কেহ সাক্ষ্য দিলে হয়ত বিশ্বাস করিতাম না, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়া প্রধানা মহিষী স্বয়ং ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। নারী যদি নারীর দাম্পত্য প্রেম বা সতীত্ব সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসা করে তবে তাহা ধ্রুবসত্য বলিয়া শিরোধার্য্য করিতে হয়।

মহাভারতের বনপর্ব্বে সত্যভমা-দ্রৌপদী-সংবাদ আছে। সেখানে সত্যভমা দ্রৌপদীর নিকট পতির তুষ্টি সাধন করিবার উপায় জানিতে চাওয়ায় দ্রৌপদী তাঁহাকে যে সকল উত্তর দিয়াছিলেন তাহা পাঠে স্পষ্ট বুঝা যায় যে ভগবান্ ব্যাস দ্রৌপদীকে এক অপূর্ব্ব সাধ্বী সতী ও আদর্শ আর্য্য গৃহলক্ষ্মী করিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন। সত্যভমা জিজ্ঞাসা করিতেছেন।—

> "কেন দ্রৌপদী বৃত্তেন পাণ্ডবানধিতিষ্ঠসি।
> লোকপালোপমান্ বীরান্ পুনঃ পরমসংহতান॥
> কথঞ্চ বশগাস্তভ্যং ন কুপ্যন্তি চ তে শুভে।
> মুখপ্রেক্ষ্যাশ্চতে সর্ব্বে তত্ত্বমেত ব্রবীহি মে॥

[দ্রৌপদী! তুমি কোন বৃত্তি অবলম্বন করিয়া লোকপালোপম বীর, আবার পরমাসংহত পাণ্ডবদিগের সেবা কর, কেমন করিয়া তুমি তাঁহাদিগকে এমন আপনার বশে রাখিয়াছ যে তাঁহারা কখন তোমার প্রতি কুপিত হয়েন না, সর্ব্বদা তোমার মুখপ্রেক্ষী হইয়া থাকেন,

পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে "লোকপালোপমান্ বীরান্" ও "পরমসংহতান" পাণ্ডবদিগের এই দুই বিশেষণ আছে। তাঁহারা প্রত্যেকেই এক এক লোকপালের ন্যায় বীর; সুতরাং কেহ কাহার অপেক্ষা ন্যূন নহেন। অথচ তাঁহারা পরমসংহতাঃ অর্থাৎ অপূর্ব্ব মিলনে মিলিত। দ্রৌপদীরূপ নারীরত্ন পঞ্চজনের সমান উপভোগ্য হইলেও তাঁহাকে লইয়া তাঁহাদের মধ্যে কখন কোন প্রকার মনোমালিন্য উপস্থিত হয় নাই, তাই তাঁহারা পরমসংহতাঃ। এ কাহার গুণে? সেই রমণীরত্নের গুণে। কি অপূর্ব্ব শক্তিবলে যে তিনি এই অতি দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাহা কল্পনায় আনা যায় না। তাহার পর সত্যভমা বলিতেছেন যে কোন পাণ্ডব তাঁহার উপর ক্রোধ করেন না। যদি দ্রৌপদী পাণ্ডবদিগের মধ্যে স্নেহ, প্রীতি বা প্রেম প্রদর্শনে অথবা সেবা বিষয়ে সামান্য মাত্র ইতর বিশেষ করিতেন তাহা হইলে বিনাযুদ্ধে পাণ্ডবকুল নির্ম্মূল হইয়া যাইত; ক্রোধের কথা ত পরে। তাই বলিতেছিলাম দ্রৌপদী যে কি অমানুষিক শক্তিবলে পঞ্চস্বামীর প্রত্যেকে পূর্ণ দাম্পত্যভাব এমন প্রকটিত রাখিতে পারিয়াছিলেন যে প্রত্যেকেই তাঁহার বশ ও মুখপ্রেক্ষী হইয়া থাকিতেন তাহা বাস্তবিকই কল্পনায় আনা যায় না। এ ব্যাপার বাস্তবিকই রহস্যময়।

বর্ত্তমান সময়েও কোন কোন ভারতবর্ষীয় জাতির মধ্যে স্ত্রীর বহু-স্বামীত্ব প্রথা প্রচলিত থাকিলেও, মহাভারতে এই একমাত্র দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। দ্রুপদরাজ পঞ্চজনকে একই কন্যা ... বরদানে করিতে ইতস্ততঃ করিলে নারদ তাঁহাকে বলেন যে এ বিবা ... ভূতঙ্গিণী হইয়া আছে এবং সেই কারণেই ইহা বহুপূর্ব্বে দেবগণেরও ব ... হইয়াছে। তখন দ্রুপদরাজ স্বীয় কন্যাকে পাঁচজনকেই ... দেখাইয়াছেন, সম্প্রদান করেন। তাহাতেই দ্রৌপদী পাঁচজনেরই ধর্ম্মপ ... হাভারতপাঠক

এই বিবাহের অনুমোদন করেন। তাহা না হইলে কৃষ্ণা ক্ষত্রিয় সমাজে এরূপ সম্মানিতা হইতে পারিতেন না। কৃষ্ণা পঞ্চপাণ্ডবের ধর্ম্মপত্নী হইয়া প্রত্যেকের সম্বন্ধেই ধর্ম্মপত্নীত্ব সম্পূর্ণ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন। প্রত্যেকের ঔরসেই তাঁহার একটার অধিক পুত্র হয় নাই। ইহাও পূর্ব্বোক্ত যুক্তির সম্পূর্ণ পরিপোষক।

ভগবান্ ব্যাস মহাপ্রস্থানে সর্ব্বাগ্রেই দ্রৌপদীর পতন দেখাইয়া ইহাই প্রকাশ করিয়াছেন যে অপূর্ব্ব প্রতিভাশালিনী ও অমানুষিক শক্তিসম্পন্না হইয়াও এবং ব্যবহারিক-জগতে সম্পূর্ণ সাম্যসম্পাদনে কৃতকার্য্য হইয়াও দ্রৌপদী অন্তরে সে সাম্য স্থির রাখিতে পারেন নাই, অসম্ভবকে সম্পূর্ণ সম্ভব করিতে পারেন নাই, তাঁহার অর্জ্জুনের প্রতি কিছু অধিক আন্তরিক আশক্তি ছিল; কিন্তু সে ভাব অন্তর্য্যামী ভগবান্ ভিন্ন আর কেহ জানিতেন না।

বঙ্কিমবাবু দ্রৌপদীর বিষয় লিখিতে গিয়া দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামীত্ব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মনের ভাব এই যে দ্রৌপদী যুধিষ্ঠীরের রাণী, পঞ্চসামীত্ব একটা গড়া কথা, এবং এই উপলক্ষে তাঁহার প্রসিদ্ধ প্রক্ষিপ্ততাদোষের অবতারণা করিতে ভুলেন নাই। অর্জ্জুন করিলেন লক্ষ্যভেদ, দ্রুপদের পণমত দ্রৌপদী অর্জ্জুনেরই ভার্য্যা। (আর বোধ হয় এইজন্যই তাঁহার অর্জ্জুনের প্রতি কিছু অধিক আশক্তি ছিল।) তিনি যুধিষ্ঠীরের রাণী কিরূপে হইবেন?

বাক্যের গৌরবরক্ষার্থ ও নারদের উপদেশে দ্রুপদরাজা কন্যাকে

[দ্রৌ'ক যথাশাস্ত্র সম্প্রদান করায় দ্রৌপদী পঞ্চজনের ধর্ম্মপত্নী বীর, আবাদন। ব্যাস তাঁহাকে সেই ধর্ম্মপত্নীত্বের সাধন করাইয়া এক তাঁহাদিগের্ণীরত্নের চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন তাহার আর সন্দেহ প্রতি কুকিন্তু বঙ্কিমবাবু দ্রৌপদী ও তাঁহার পঞ্চস্বামীকে মহাভারতের সেই তত্ত্বস্বরূপ দেখিয়া এই বলিয়া সমাধান করিয়াছেন যে পঞ্চজন

তাঁহার নিকট একজনের স্বরূপ ছিলেন এবং দ্রৌপদী সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত ছিলেন। আমরা কিন্তু ইহার ভাব বুঝিতে পারিলাম না। নির্লিপ্ততা পাতিব্রত্যের লক্ষণ নহে, লিপ্ততাই তাহার লক্ষণ। সাধ্বী স্ত্রী পতিময়, পতিতে ওতঃপ্রোতঃভাবে লিপ্ত এবং তাঁহা হইতে আপনাকে অভিন্ন মনে করেন। পতি ভিন্ন তাঁহার অন্য গুরু বা দেবতা নাই। সাধারণ গণিকারাও নির্লিপ্তভাবে বহুপুরুষের সেবা করিয়া থাকে; তাহাতে তাহাদের কোন মহত্ত্ব নাই। আমাদের বিশ্বাস দ্রৌপদী আদর্শ সতীর ন্যায় প্রত্যেক স্বামীতে সমভাবে লিপ্ত ছিলেন। ইহাই তাঁহার অদ্ভুত শক্তিমত্তার পরিচয়। রাসমণ্ডপে যেমন প্রত্যেক গোপিকা আপনার পার্শ্বে শ্রীকৃষ্ণকে পাইয়া মনে করিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ আমারই পার্শ্বে আছেন—আমাকেই স্নেহ প্রীতি দেখাইতেছেন, অদ্ভুতশক্তিশালিনী কৃষ্ণার আচরণেও তাঁহার পঞ্চস্বামীর প্রত্যেকেই তাঁহাকে আপনার সম্পূর্ণ ধর্ম্মপত্নী মনে করিতেন। ইহা বড় সহজ শক্তির পরিচয় নহে। ইহা হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব মনে করিয়াই বোধ হয় কর্ণ দ্রৌপদীকে বেশ্যা বলিয়া গালি দিয়াছিলেন এবং কৌরবেরা সভা মধ্যে তাঁহাকে অবমাননা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা বুঝেন নাই যে কালসাপিনীর লাঙ্গুলে পাদক্ষেপ করিতেছেন। জ্ঞানচক্ষু অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাহা বুঝিয়াছিলেন, তাই তিনি বরদানে কৃষ্ণাকে সান্ত্বনা করিতে যত্ন পাইয়াছিলেন। কিন্তু মনস্বিনী রমণীর মর্ম্মে আঘাত লাগিলে সে ক্ষত শীঘ্র শুষ্ক হয়না। ধৃতরাষ্ট্রের সান্ত্বনা ও বরদানে কৃষ্ণার মর্ম্মের ঘা শুকাইল না। তাঁহার মুক্তবেণী কালভুজঙ্গিনী হইয়া কুরুকুল ধ্বংশ করিল।

বঙ্কিমবাবু দ্রৌপদী-চরিত্রের আর আর যে সকল গুণ দেখাইয়াছেন, যথা দর্প বীরত্ব, ধর্ম্ম, ঈশ্বরবিশ্বাস প্রভৃতি, তাহা মহাভারতপাঠক

এক সম্পূর্ণ নূতন চরিত্র সৃজন করিয়া গিয়াছেন তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

যে দ্রৌপদী অযোনিজা, যিনি শক্তিছায়া এবং ত্রেতায় ভূভার হরণ-কল্পে চক্রীর হস্তে চক্রস্বরূপ, যিনি পঞ্চজনের ধর্ম্মপত্নী হইয়া প্রত্যেকের সম্বন্ধে সেই ধর্ম্মপত্নীত্ব এরূপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন যে সেই পঞ্চজন পরমসংহত থাকিয়া সর্ব্বদা তাঁহার বশানুগ ও মুখপ্রেক্ষী থাকিতেন, যে বীর রমণীর বাহুবলে জয়দ্রথ ভূতলশায়ী হইয়া লাঞ্ছিত, যাঁহার অচল অটল ভগবদ্বিশ্বাস রাজসভায় ভগবানকে বস্ত্ররূপে পরিণত করিতে পারিয়াছিল এবং বিনা অন্নপানে সশিষ্য দুর্ব্বাশার তৃপ্তিসাধন করিতে পারিয়াছিল, তিনি যে কন্যা, দীপ্যমানা, তেজস্বিনী, অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্না,—অতএব প্রাতঃস্মরণীয়া, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় আছে কি?

কুন্তি।

দেবী কুন্তি যুধিষ্ঠির, ভীম ও অর্জ্জুনের জননী। প্রথম ধর্ম্মের অবতার, দ্বিতীয় বর্ণের অবতার ও তৃতীয় বীরত্বের অবতার—সত্ত্বগুণ, তমোগুণ ও রজোগুণের মূর্ত্তি। যে ক্ষেত্র হইতে এই অপূর্ব্ব রত্নত্রে সমুত্থিত সেক্ষেত্রে এই মহৎ গুণত্রয়ের সত্ত্বা অবশ্যই স্বীকার্য্য। যে মনস্বিনী আপনার তিন পুত্র ও দুই সপত্নীপুত্রকে লইয়া তাহাদিগকে আপদ বিপদের ভিতর, প্রবল শত্রুগণের মধ্যে ও নিতান্ত অসহায় অবস্থায় সর্ব্বগুণে গুণান্বিত ও আদর্শচরিত্র করিয়া পরিবর্দ্ধিত করিতে পারিয়াছিলেন, এবং পরিণামে পৈত্রিক সিংহাসনে উপবিষ্ট করাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তিনি যে আদর্শ জননী তাহার আর সন্দেহ নাই। তাঁহার স্বীয় চিত্ত পাপস্পর্শ-শূন্য না হইলে তাঁহার পুত্র ধর্ম্মের অবতার হইতে পারিতেন না। নারী হইয়াও অমিতবলশালী চিত্তের অধি-কারিণী ও সর্ব্ববিধ বীরগুণে বিভূষিতা বীরাঙ্গনা না হইলে তাঁহার ভীম

অর্জ্জুনের ন্যায় পুত্র জন্মগ্রহণ করিত না। পঞ্চপাণ্ডব মাতৃদেব ছিলেন, তাঁহারা জননীকে দেবীবৎ মান্য করিতেন এবং কখনও তাঁহার বাক্য লঙ্ঘন করেন নাই। জননীর চরিত্রে দোষস্পর্শ যে সন্তানের পক্ষে কি ভয়াবহ ব্যাপার তাহা বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। এরূপ ঘটিলে সন্তান মাতাকে ভক্তি করা দূরে থাকুক পরম শত্রুবৎ ঘৃণা ও পরিহার করিয়া থাকে। সমগ্র ক্ষত্রিয় সমাজ কুন্তিদেবীকে দেবীবৎ সম্মান করিতেন, ইহাও তাঁহার গুণবত্তা ও শক্তিমত্তার আর একটি বিশেষ পরিচয়।

ইহা ত' গেল লৌকিক ব্যাপার; তাহার পর অলৌকিক ব্যাপারের কথা, অর্থাৎ দেবশক্তিদ্বারা কুন্তীর পুত্র উৎপাদনের কথা। ইহাই তাঁহার কন্যাত্বের বিশেষ পরিচায়ক। তৎকালে ক্ষেত্রজ পুত্র উৎপাদন করা শাস্ত্রসম্মত ও সমাজের অনুমোদিত ছিল। অতএব কুন্তীদেবী পতির অনুমত্যনুসারে শ্বশ্রূদিগের পন্থা অনুসরণ করিয়া পুরুষান্তরের দ্বারা পুত্রোৎপাদন করাইলেও পতিতা, পাপার্হা, বা নিন্দনীয়া হইতেন না। কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। আপনার সাধিত মন্ত্রশক্তির বলে দেবশক্তি সংযোগে তিনি দেবোপম পঞ্চপুত্রের আবির্ভাব করান। সেই দেবগণের মধ্যে ধর্ম্ম অন্যতম। স্বয়ং ধর্ম্ম যে অধর্ম্ম করিবেন তাহাই বা কি করিয়া বলা যায়? এ ব্যাপার অতীব রহস্যময়। বাইবেলেও ঈশশক্তি সংযোগে মেরীর গর্ভাধানের ও খৃষ্টের জন্মের কথা দেখা যায়। ইহাকে Immaculate conception বা পবিত্র গর্ভাধান বলা হয়। তবে প্রভেদ এই যে মেরীর পক্ষে মেরী আধার মাত্র, শক্তি অন্যত্র হইতে আগত, আর কুন্তিদেবীর পক্ষে শক্তি-সংযোগ-করণী ক্ষমতা তাঁহাতেই ছিল। পূর্ণমানুষীর এরূপ শক্তি বাস্তবিকই বিস্ময়কর এবং এই শক্তিমত্তাই

রামায়ণকার অহল্যায় এবং ব্যাসদেব দ্রৌপদী ও কুন্তিতে অমানুষী শক্তির আবির্ভাব করিয়া এই তিন জনকে সাধারণ বা বিশেষ স্ত্রীগণ হইতেও বিশেষতর করিয়া তিনটী অপূর্ব্ব আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই তাঁহারা কন্যা, দীপ্যমানা, অভিনব শক্তিসম্পন্না ও সাধারণ স্ত্রীগণ হইতে বিশেষ। মহাভারত-মহাসমুদ্রের উৎপত্তি-স্থল কুন্তিদেবী, লোকপালোপম বীর পঞ্চপাণ্ডব সেই উৎপত্তি-স্থল হইতে প্রবাহিত পঞ্চ মহানদ। সেই পঞ্চ মহানদ মিলিত হইলে, দ্রৌপদীরূপিণী মহাশক্তিসহ মিলিত হইয়া এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক নিয়মিত হইয়া এই মহাভারত-মহাসমুদ্রের অবতারণা হইয়াছে। তাই কুন্তি ও দ্রৌপদী উভয়েই মহাশক্তিশালিনী হইয়া একজন আদর্শ জননী ও অপরে আদর্শ ভার্য্যারূপে জগতে মহীয়সী কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন।

তারা ও মন্দোদরী।

মনুষ্যচরিত্রের আদর্শ লইয়া তারা ও মন্দোদরীকে বিচার করিতে গেলে মহাভ্রমে পড়িতে হইবে, কারণ তারা বানরী ও মন্দোদরী রাক্ষসী। আমাদের বিচার করিয়া দেখিতে হইবে যে বানরীর মধ্যে তারা ও রাক্ষসীর মধ্যে মন্দোদরী কন্যাপদবাচ্যা কি না।

ভগবান বাল্মীকি বানর, ঋক্ষ ও রাক্ষসদিগকে যেরূপ ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে তাহারা আকৃতি ও কতকগুলি আচার-ব্যবহারে মাত্র মনুষ্য হইতে পৃথক। তাঁহার বর্ণনায় ইহাই বুঝা যায় যে কবিবর সমগ্র জীবজগৎকে প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—উচ্চজীব ও ইতর-প্রাণী। উচ্চজীবদিগকে পুনশ্চ তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা মনুষ্য, বানর ও রাক্ষস। বালি ও সুগ্রীব বানরদিগের রাজা এবং রাবণ রাক্ষসদিগের অধিপতি। ইঁহাদিগের রাজধানী, ঐশ্বর্য্য

মনুষ্যগণ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন বলিয়া মনে হয় না। তবে তিনি যখন তাঁহাদের আকৃতির উল্লেখ করিয়াছেন তখনি পার্থক্য লক্ষিত হয়। আচার-ব্যবহারাদির উল্লেখেও স্থানে স্থানে পার্থক্য লক্ষিত হয়।

আদিকবি দুইজন মাত্র বানরীর নাম বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিয়াছেন—তারা ও রুমা। রুমার মুখে কোন কথাই শুনা যায় না। তাঁহার কার্য্যকলাপেও কোন বিশেষত্ব লক্ষিত হয় না। রাক্ষসীর নাম কবিবর অনেক করিয়াছেন বটে, কিন্তু তন্মধ্যে মন্দোদরীকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তারা ও মন্দোদরী প্রায় একই ছাঁচে গড়া।

বালির মৃত্যুর পর যখন তারা মৃতপতির শোকে বিহ্বলা হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন, তাঁহার তৎকালীন কার্য্যকলাপ ও চেষ্টা যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে তারা যে বানরীগণের মধ্যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা রমণী এবং মহাবিক্রান্ত বালির উপযুক্ত প্রধানা মহিষী সে বিষয়ে আর সংশয় থাকে না। বানরী হইয়াও তারা পণ্ডিতা; বুদ্ধিমান-গণের বরিষ্ঠ মহাবীর তাঁহাকে পণ্ডিতা বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন এবং তিনি যে পণ্ডিতা ছিলেন তাহার যথেষ্ট পরিচয়ও দিয়াছেন। তারা পূর্ব্বাপর বিচারশালিনী ও সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শিনী। মুমূর্ষু বালি সুগ্রীবকে বলিয়াছেন—"তারা যখন যাহা বলিবেন তুমি নিঃসংশয়ে ও অবিচারিত ভাবে তাহা করিবে, কারণ তারা অতীব সূক্ষ্মার্থদর্শিনী।" তারা বানরী হইয়াও একান্ত পতিপরায়ণা। তাঁহাকে বিমনস্ক করিবার জন্য যখন তাঁহার হৃদয়ে পুত্রস্নেহের উদ্রেক করিবার চেষ্টা হইল, তখন তিনি বলিলেন—"শত অঙ্গদ একত্রিত করিলে যে সুখ হয় পতিদেহস্পর্শ তদপেক্ষা সহস্র গুণে সুখকর।" প্রাণ ভরিয়া পতিদেহ আলিঙ্গন করিতে পারিতেছেন না বলিয়া সতী যারপরনাই ব্যাকুলা; যখন বালির শরীর হইতে বাণ তুলিয়া লওয়া হইল তখন প্রাণ ভরিয়া

মুমূর্ষু পতির দেহ আলিঙ্গন করিয়া তিনি যেন কি এক অপার সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। তারা বিলাস-রঙ্গমঞ্চস্থিত অভিনেত্রী নহেন, তাঁহার কথাগুলি যে সরল হৃদয়ের সরল উচ্ছ্বাস তাহা পাঠকের পাঠমাত্রেই বিনা বিচারে অনুভূত হয়। পতিহিতাকাঙ্ক্ষিনী তারা পতির হিতকামনায় পরমুখে সংবাদ সংগ্রহ করিয়া হিতাহিত বিচার করিতেন। এই হেতুই তিনি পতিকে সুগ্রীব সহ রণ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। তারা ভগবান রামচন্দ্রকে যে ভাবে সম্বোধন করেন তাহাতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বানর ও বানরীর মধ্যে তিনিই শ্রীরামচন্দ্রের মহীয়সী শক্তি ও দেবত্ব বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ইহাও সামান্য শক্তির পরিচয় নহে। তারা যে শ্রীরামচন্দ্রকে অভিসম্পাত দিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে তাহা মূল-রামায়ণে পাওয়া যায় না, কারণ তাহা অসঙ্গত। যে তারা ভগবান রামচন্দ্রকে পরব্রহ্ম বলিয়া চিনিয়াছিলেন, তিনিই যে তাঁহাকে অন্যায় করিয়াছেন বলিয়া অভিসম্পাত দিবেন তাহা সম্ভবই নহে। তাঁহার সান্ত্বনা কল্পে ভগবানের শ্রীমুখ হইতে যে সকল গভীর তত্ত্ববিশিষ্ট বাক্য নিঃসৃত হইয়াছিল বিদুষী তারা সহজেই সে সকল হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন। মহা মহা সাধকগণ বহুবিচারে ও সৎসঙ্গে চিত্তের যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়েন তারারও সেইরূপ চিত্তের অবস্থা ছিল।

বানরসমাজে একজন রাজার দেহান্তে পরবর্ত্তী রাজা তাঁহার রাজ্যসহ শুদ্ধান্তঃপুরও অধিকার করিতেন। বালির মৃত্যুর পর সুগ্রীব তাঁহার তারা প্রভৃতি ভার্য্যাদিগকে অধিকার করিলেন। এই স্থলেই বানরগণের মনুষ্য হইতে পার্থক্য লক্ষিত হয়। এ অবস্থায়ও তারা শুদ্ধান্তঃকরণে পতির হিতসাধনে নিযুক্তা। যখন ক্রুদ্ধ লক্ষ্মণ সুগ্রীবের নিকট উপস্থিত হয়েন তখন বানররাজ তারাকেই তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। যুক্তিযুক্তবাক্যে লক্ষ্মণের ক্রোধ উপশমিত হয় এবং তুষ্ট হইয়া তিনি তাঁহাকে ভর্ত্তৃহিতকারিণী বলিয়া সম্বোধন করেন।

তারা যে সুগ্রীবের ভার্য্যা হইয়াছিলেন তাহা লইয়াই তাঁহাকে লোকে দোষ দেয়। যাঁহারা দোষ দেন তাঁহারা তারা যে বানরী তাহা একবারও মনে করেন না। "ওঢ়ে ভ্রাতৃবধু" কথা বোধ হয় সকলেই জানেন। এপ্রথা এখনও মানবসমাজে প্রচলিত আছে। ইহা ধর্ম্মবিগর্হিত হইলে ভগবান রামচন্দ্র কখনই ইহার অনুমোদন করিতেন না। বালি বলপূর্ব্বক কনিষ্ঠের পত্নী রুমাকে গ্রহণ করিয়াছিল বলিয়াই প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বালি রামচন্দ্রকে ভৎর্সনা করিলে তিনি যখন তাঁহাকে তাহার অপরাধের কথা বুঝাইয়া দেন তখন বুঝিয়া তিনি নীরব হন।

আদিকবি বানরী তারাতে যে সকল গুণের সমাবেশ করিয়াছেন তাহা মানবীগণের মধ্যেও কচিৎ কখন দেখা যায়; সুতরাং বানরীগণের মধ্যে তারা যে কন্যা সে বিষয়ে সন্দেহ রহিল না।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভগবান বাল্মীকি তারা ও মন্দোদরীকে এক ছাঁচে গড়িয়াছেন। তবে স্তরের ইতর বিশেষে যাহা কিছু ইতর বিশেষ লক্ষিত হয়। মন্দোদরী ও তারার ন্যায় বুদ্ধিমতী, সূক্ষ্মতত্ত্বদর্শিনী ও পতিপ্রাণা ছিলেন। দেশের ও জাতির প্রথা অনুসারে তিনি রাবণের মৃত্যুর পর বিভীষণের শুদ্ধান্তঃপুরভুক্তা হয়েন। সকলকেই মনে রাখা উচিত যে মন্দোদরী রাক্ষসী হইয়াও যে সকল গুণের পরিচয় দিয়াছেন তাহা মনুষ্যসমাজে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না; সুতরাং তিনি যে অপরাপর রাক্ষসীর মধ্যে দীপ্যমানা অর্থাৎ কন্যা ছিলেন তাহা বলাই বাহুল্য।

লেখকের যাহা বক্তব্য তাহা বলা শেষ হইল। লেখকের বিশ্বাস যে এই প্রাতঃস্মরণীয়া পঞ্চমনস্বিনীর শক্তিবলে বলীয়ান হইয়াই যাহা কিছু লিখিতে সক্ষম হইয়াছেন। সুধীগণসমক্ষে ইহার প্রস্তাবনা করিবার উদ্দেশ্য এই যে, এ বিষয়ে যাহা কিছু বক্তব্য আছে তাহা শুনিতে পাওয়া যাইবে।

মহীশূর ভ্রমণ।

ব্যাঙ্গালোর ষ্টেশনে পৌঁছেই প্ল্যাটফরমে ক্ষৌরীতচিকুর, চশমাচোখে, পাগড়িমাথায় আমার বন্ধুটিকে দেখে আপ্যায়িত হ'লাম।—বন্ধুটি আয়েঙ্গার ব্রাহ্মণ। মাদ্রাজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েট—এই বৎসর আইন পরীক্ষা দেবেন। ইংরাজীতে কুশলাদি জিজ্ঞাসার পর একখানি ক্রগাম ঠিকাগাড়ি করে তাঁর বাড়িতে পৌঁছান গেল। উভয়েই ব্রাহ্মণ ও ভারতবাসী হ'লেও ইংরাজী ভাষা ছাড়া পরস্পরের মনের ভাব বদল করবার অন্য উপায় নাই, তার কারণ তামিল ও ক্যানারিস ভাষায় আমি যেমন অজ্ঞ, সুললিত বঙ্গভাষায় বন্ধুবরও তদ্রূপ। মহীশূরে ক্যানারিস ভাষাই অধিকাংশ লোকে বলে, তবে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর তামিলও খুব চলে। সত্য কথা বলতে কি—মহীশূরের লোকের মাতৃভাষাটা যে কি তা আমি বুঝে উঠতে পারি নি। কেতাবে লেখে, মহীশূরে ক্যানারিস্ কথিত হয়—সেখানকার লোককে জিজ্ঞেস করলেও প্রায় তাই বলে—এদিকে আবার কিন্তু অনেক ভদ্রলোককে নিজেদের ভিতর তামিল ভাষায় কথা বলতে শুনি। আমাদের যেমন বাঙ্গলা মহীশূরীদের ক্যানারিসটা যেন ঠিক্ তেমন নহে। কেমন একটা ধাঁধাঁ লাগ্‌ল, এদের কি দুটা মাতৃভাষা নাকি? কৌতূহলটা ক্রমে এত অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌ল যে ভদ্রতার গণ্ডী এড়িয়ে মুখ ফুটে আমার বন্ধুটিকে একদিন জিজ্ঞেস্ ক'রে ফেল্লুম যে নিজের স্ত্রীর সঙ্গে তিনি কোন ভাষায় কথা কন্। যা উত্তর পেলুম তাতে কিন্তু ধাঁধাঁ কাটা দূরে থাকুক্ আরও গোল বেধে গেল। তিনি স্ত্রীর সঙ্গে কথা কন্ তামিলে কিন্তু স্ত্রীকে পত্র লিখ্‌তে হ'লে ক্যানারিস্ ভাষায় লেখেন, কারণ তামিল লিখ্‌তে

দুজনেই অপারগ। কি বিপদ—একজন শিক্ষিত ব্যক্তি নিজের স্ত্রীর সঙ্গে যে ভাষায় কথা কন্ সে ভাষায় পত্র লিখিতে পারেন না—এ প্রহেলিকাটা আমি এখনও ভাল বুঝ্‌তে পারি নি।

যা হোক্ বাড়ি পৌঁছে ধড়াচূড়া খুলে একটু বিশ্রামের উদ্‌যোগ কর্‌তে লাগ্‌লুম্। একটি ভৃত্য মেটে প্রদীপের মত ছুঁচলোমুখবিশিষ্ট একটি রূপার গ্লাশবিশেষে কফি এনে হাজির কর্‌লে। মহীশূর প্রদেশটা কফি উৎপাদক দেশ বলেই হো'ক্ বা অন্য কোন কারণেই হোক্ এখানে চা অপেক্ষা কফির রেওয়াজটাই খুব বেশী। সকালে এক গ্লাশ্ কফি না হ'লে লোকের কিছুতেই চলে না। কাঁচের পেয়ালা বা পিরিচের কেউই ধার ধারে না—সবই ধাতুনির্ম্মিত গেলাশ। চুমুক্ দিয়ে চা কফি বা অন্যান্য তরল দ্রব্য পান করাটা এদেশের প্রথা নয়—হাঁ করে মুখে ঢালাই ব্যবস্থা; সেই জন্যই শুন্‌লুম্ গেলাসের মুখ প্রদীপের মত ছুঁচল।

এখানকার সমস্ত ব্রাহ্মণই নিরামিষাহারী ও অধিকাংশ ব্রাহ্মণই নিষ্ঠাবান্। বঙ্গদেশে অধিকাংশ ব্রাহ্মণই মাছ খান ও তামাক খান এবং সমস্ত ব্রাহ্মণই মুণ্ডিত-মস্তক হ'য়ে পিছনে প্রকাণ্ড ঝুঁটি রাখেন না ও কপালে ব্রাহ্মণোচিত দীর্ঘ ফোঁটা কাটেন না শুনে এঁরা আঁত্‌কে ওঠেন। ওদিকে আবার বঙ্গদেশের নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণেরা ভোরে উঠে চা বা কফির জন্য লালায়িত হন না এবং চা ও কফি পানকে অনেকটা ম্লেচ্ছাচারের ভিতর গণ্য করেন শুনে এঁদের মনে একটা ভারি হাস্য-রসের সঞ্চার হয়।

কফি পানটা নিজের খুব অভ্যাস না থাক্‌লেও "যস্মিন্ দেশে যদাচারঃ" ভেবে কফিটা উদরস্থ করা গেল। হাঁ ক'রে গলায় ঢালাটা নিজের তেমন অভ্যাস নাই বলে চেষ্টা কর্‌তেও সাহস হল না; গলায় বাধিয়ে 'বিষম' খেয়ে অপ্রতিভ হওয়ার চেয়ে চুমুক্ দিয়ে

খাওয়ার জন্য খোলাখুলি অনুমতি প্রার্থনা ক'রে ফেলা গেল। বন্ধুটি কিন্তু হেসেই আকুল—গলায় ঢাললে নাকি আবার 'বিষম' লাগে। ঘটনাটা যেন প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে ঘটাই অসম্ভব। কাফির পর স্নানের জন্য প্রস্তুত হ'লেম। দিব্য স্নানের ঘর। মহীশূরবাসীর বাঙ্গালীদের অপেক্ষা সহস্রগুণ বিলাসিতাবিহীন ও মিতব্যয়ী হ'লেও এদের স্নানের ঘরটা না হলে চলে না। স্নান কর্ত্তে গিয়ে কিন্তু এক মহা বিভ্রাট উপস্থিত হ'ল। ঘরে ঢুকে দেখ্‌লুন ৬ বাল্‌তি নানা রকমের গরম জল—তা ছাড়া একটি প্রকাণ্ড তামার হঁড়িায় টগ্‌বগ্‌ করে জল ফুটছে। ঠাণ্ডা জল কিন্তু কোন বাল্‌তিতেই নেই। ঐ সব বাল্‌তির জলের মধ্যে যার জল সকলের চেয়ে কম গরম তাতেও ফিকে চা বেশ তৈরি হয়। দোর বন্ধ করে আমি একটা বাল্‌তি হ'তে গরম জল কতক ফেলে দিয়ে কলখুলে ঠাণ্ডা জলের জন্যে সেটা যেমন নলের নীচে ধরেছি, বন্ধুবর অমনি দুমদাম্‌ করে স্নানের ঘরের দোর ঠেল্‌তে আরম্ভ কর্‌লেন। তাড়াতাড়ি দোর খুলে দিয়ে জিজ্ঞেস করলুম্‌ ব্যাপার কি। তিনি বললেন যে আমার যদি আরও জলের আবশ্যক হয় চাকরে এখনই এনে দিবে। কি বিপদ, ৬ বাল্‌তি গরম জল রয়েছে তা ছাড়া জলের কল রয়েছে আবার জলের কি আবশ্যক—আর সেটা জিজ্ঞেস্‌ করবার জন্য এই বীভৎস দোর ঠেলাঠেলিই বা কেন বন্ধুর উত্তর শুনে কিন্তু আমার চক্ষুস্থির হ'ল। আমি ঠাণ্ডা জলের জন্য ট্যাপ্‌ খুল্‌ছি এই শব্দ শুনেই নাকি তিনি অস্থির হ'য়ে উঠেছেন। ঠাণ্ডাজলে নাকি কিছুতেই আমাকে স্নান কর্‌তে দেবেন না। মহা জবরদস্তি ব্যাপার। এ রহস্যটা যে কি তা আমি প্রথমে বুঝতে পারি নি—শেষে অনেক বাকবিতণ্ডার পর বুঝলুম্‌ যে এখানে ঐ চা সিদ্ধকরা গরমজলে স্নান করাই ব্যবস্থা। নেহাৎ গরিব লোকেই নাকি এখানে ঠাণ্ডাজল ব্যবহার করে। তা ছাড়া তিনি ও মহিলারা মনে করেন যে আমি

ঠাণ্ডাজলে স্নান কর্‌লে তাঁদের অতিথিসৎকারের বেজায় ত্রুটি হবে।— কি মুস্কিল ! শেষে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে জোড়হস্তে বন্ধুবরকে বুঝিয়ে বল্লুম যে স্নান সম্বন্ধে ও রকম অতিথিসৎকারটা যেন আমার উপর না করা হয়, কারণ আমার গায়ের চামড়া ওরকম অতিথি-সৎকারটা একেবারেই সহ্য কত্তে পারবে না। যা হোক্ আমার ত্বকের সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে বন্ধুটি ও পাশের ঘর হতে মহিলারা অনেক পরিহাস করে শেষে আমাকে ঠাণ্ডাজলে স্নান কর্‌তে অনুমতি দিলেন ও বন্ধুটী আমাকে 'quite at home' হ'তে অনুরোধ কল্লেন।

তিন দিন রেলওয়ে ট্রেনে কয়লা, ধোঁয়া ও ধূলা খেয়ে আসার পর তৃপ্তির সহিত স্নান করে খুব স্নিগ্ধ হওয়া গেল। মনে হল এরকম তৃপ্তির সহিত স্নান অনেক দিন করিনি। স্নানান্তে বাইরে এসে বসবার ঘরে গন্ধতৈল ব্যবহার করে চিরুণী ও বুরুস সাহায্যে চুল আঁচড়াবার সময় পাশের ঘর হতে বন্ধুবরের ও ললনাকণ্ঠের অসংযত হাস্যধ্বনি আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্‌লে। কারণ, আমি স্থির বুঝেছিলুম যে সে হাস্যের লক্ষ্যস্থল ভাগ্যবান পুরুষ 'আমি ছাড়া আর কেউ নয়; ব্যতিব্যস্ত হবার আরও একটু বিশেষ কারণ এই যে হাসির কাজটা যা করেছি সেটা খুব সহজবোধ্য হলেও তখন কিছুতেই ঠিক সেটাকে ঠাওরাতে পাচ্ছিলাম না। বন্ধুবর এসে এক কথায় বিষয়টাকে খুব পরিষ্কার করে দিলেন—"চুলে গন্ধতৈল মেখে অতবড় চিরুণী দিয়ে অতক্ষণ মাথা আঁচড়ান ও চুল ফেরান নেহাৎ স্ত্রীজনোচিত—পুরুষের সাজে না।" কথাটা ঠিক্ বটে, সুতরাং হাসির মর্ম্মটাও বেশ বুঝতে পেরে লজ্জিত হলুম—কেবল বুঝতে পারলেম না 'অত বড়' চিরণীর মানেটা। আমার চিরুণীটা সেই কাল কাঁচকড়ার ১৪ পয়সা দামের 'পতি পরম গুরু' লেখা সাদাসিদে চিরুণী; সে চিরুণীগুলা অবশ্য হাতেবহরে এমন কিছু বেমানান বড় নয় যা দেখে

অত বড় চিরুণী" বলে হাসা যেতে পারে। সত্যই একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। শেষে মুখফুটে অনেক বিনয় করে ভয়ে ভয়ে আমার চিরুণীর আকার সম্বন্ধে বন্ধুবরের মন্তব্যটা কি জিজ্ঞেস করে ফেললুম। বন্ধুটি আমার সাদাসিদে মেজাজের; তিনি আমার বুদ্ধির স্থূলত্বের অনেক প্রশংসা করে ঝাঁ ক'রে ডেস্ক খুলে আমাদের দেশের দরোয়ানী কাঠের চিরুণীরমত একটা হস্তিদন্তনির্ম্মিত কারুকার্য্যবিশিষ্ট ছোট চিরুণী বের করে আমার হাতে দিয়ে বল্লেন "তোমার চিরুণীটা যে giant-চিরুণী সে কথা কে বল্ছে? তবে ও চিরুণী মেয়েদেরই ব্যবহারোপযুক্ত—পুরুষদের জন্য এই চিরুণী।" বেশ ভালক'রে দেখে বুঝলুম্ যে সেটি টিকী আঁচড়াবার চিরুণী, তাতে আমাদের চুল আঁচড়ান চলে না। একটু আশ্বস্ত হয়ে আমার এই অন্তকার স্ত্রীজনোচিত কেশবিন্যাসের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করলুম; তা ছাড়া আরও যে কয়দিন এখানে থাক্তে হবে সে কয়দিনও অভ্যাসদোষে এই রকম করেই কেশবিন্যাস কর্তে বাধ্য হব মনে ক'রে তার জন্যও আগোয়া ক্ষমা চেয়ে রাখলুম। যা হোক্ স্নানের পরই আহার প্রস্তুত হ'ল। আমরা দুজনেই একসঙ্গে খেতে বসলুম। অন্যান্য মাদ্রাজী ও মহীশূরী ব্রাহ্মণদের তুলনায় বন্ধুটিকে খুবই লিবরাল ও কস্‌মপলিটান বল্‌তে হবে। তা না হ'লে একজন মৎস্যমাংসভোজী টিকী-বর্জ্জিত বাঙ্গালা ব্রাহ্মণ হলেও তার সঙ্গে এত অসঙ্কোচে একত্রে খেতে বস্‌তে সাহসী হতেন না। আমিষের নামগন্ধ নাই—পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ঘি, বেগুন, ধ্যাঁড়োস, দাল, দই ও ঘোল। তা ছাড়া রসম্ নামধেয় এক রকমারি বড়া ও পাঁপর এখানে খুব ব্যবহার হয়। লঙ্কা ও তেঁতুলের দুঃখ নাই, মিষ্টান্নের নামগন্ধ নাই খাওয়াদাওয়া এখানে 'মধুরেণ সমাপয়েৎ' হয় না—সবই অম্লেন সমাপয়েৎ। বাঙ্গালীর মুখে মিষ্টি না খেয়ে জল খেলে যেন কেমন

মানসে একটু চিনি চাইলুম্। দয়ের সঙ্গে চিনি মাখ্‌ব শুনে বেচারারা ভয়ানক অশ্চর্য্য হয়ে গেল। দয়ে চিনি মেশালেই নাকি সব মাটি হয়ে যায়!

যাহোক্ এই রকম পরস্পরের রুচি সম্বন্ধে যথেষ্ট হাস্যপরিহাস করতে করতে খুব পরিতোষের সহিত খাওয়া শেষ করে ওঠা গেল। সত্যসত্যই এদের অনেক তরকারি আমাদের দেশের নিরামিষ তরকারির অপেক্ষা মুখপ্রিয়, তবে টক্ ও ঝালের কল্যাণে আবার অনেক তরকারির কাছে ঘেঁসা যায় না। টক্ ও ঝালটা খুবই ব্যবহার হয়। সর্‌ষের তেল এরা একেবারেই ব্যবহার করে না। বাঙ্গালাদেশে আমরা রাঁধবার সময় সর্‌ষের তেল ব্যবহার করি শুনে এরা চম্‌কে ওঠে—সর্‌ষের তেল খেয়ে আমাদের পেটে কেন যে ফোস্কা পড়ে না তাই ভেবেই এরা অস্থির হয়। এখানে সব জিনিষই ঘিয়ে ভাজে, অপেক্ষাকৃত গরিব লোকে তিলের তেল, Sweet Oil প্রভৃতি ব্যবহার করে।

আহার শেষ হ'লে আমরা বস্‌বার ঘরে এসে বসলুম। বন্ধুটির নববিবাহিতা ভ্রাতৃকন্যাটি রূপার থালে ক'রে আস্ত আস্ত পান, আলাদা সুপারি ও চূণ এবং নারকলের কুচিরমত কি, আমাদের টেবিলের উপর রেখে সলজ্জপদে প্রস্থান করলে। ঘোমটা কাকে বলে এদেশের স্ত্রীলোকে তা জানে না। ঘোমটা দূরে থাকুক মাথায় কাপড় দেওয়া এমন কি কবরী আবৃত করা এখানে অত্যন্ত দূষ্য বলে বিবেচিত হয়। স্ত্রীলোকদের ভিতর পর্দা বা জানানা বল্‌তে আমরা যা বুঝি তা এখানে নেই; তা বলে বঙ্গদেশের তীব্র সমাজসংস্কারকেরা স্ত্রী স্বাধীনতা বলতে যা বোঝেন সে রকম ইউরোপীয় ধরণের উগ্রস্বাধীনতাও স্ত্রীসমাজে এখানে একেবারেই নেই। এঁদের মুসলমান ও বঙ্গললনাদের ন্যায়

এঁদের মধ্যে স্ত্রীজনোচিত লজ্জা ও কোমলতা বঙ্গ ললনাদের ন্যায় পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। এঁরা গৃহকার্য্যেই সর্ব্বদা ব্যস্ত, বহির্জগতের মোটেই ধার ধারেন না। রন্ধন ও অন্যান্য গৃহকার্য্যে বিশেষ তৎপরা—আমার বিশ্বাস সে বিষয়ে বর্ত্তমান বঙ্গললনারাও এঁদের কাছে হার মানেন। এখানকার উচ্চ জাতীয় স্ত্রীলোকেরা, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ললনারা খুবই সুন্দরী। আমি বেশ বুঝতে পারছি, অনেক বাঙ্গালী চটকরে একথাটার উপর বিশ্বাস স্থাপন করবেন না, কারণ মান্দ্রাজ ও তন্নিকটস্থ প্রদেশের লোকের কথা হলেই বাঙ্গালীর মনে স্বভাবতই সেই কাল, ঠোঁটপুরু, পেটমোটা, অনেকটা চারুপাঠের সিন্ধুঘোটকেরমত কল্‌কাতার মান্দ্রাজী বাবুচ্চিদের কথা মনে পড়ে। দাক্ষিণাত্যে যাবার পূর্ব্বে কৃষ্ণবর্ণ সিন্ধুঘোটকের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের লোকের রূপগত সাদৃশ্য সম্বন্ধে আমারও একটা বিচিকিৎস সংস্কার ছিল। কিন্তু সত্যকথা বলতে কি, মালাবার ও ত্রিবাঙ্কুরের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ও মহীশূরের আয়েঙ্গার সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদের অপেক্ষা সুন্দরী স্ত্রীলোক এক গুজরাটিদের ভিতর ছাড়া আমি আর কোথাও দেখেছি বলে বোধ হয় না। তবে বাঙ্গালায় ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় যেমন শূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যেও যথেষ্ট সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখ্‌তে পাওয়া যায়, দক্ষিণ-ভারতে কিন্তু সে রকম নহে। ব্রাহ্মণ ও শূদ্রে যেন আকাশ পাতাল তফাৎ। "বাঁউন শুদ্দুরে তফাৎ" কথাটা যেন দক্ষিণভারতে অত্যন্ত জাজ্বল্যরূপে প্রত্যক্ষ করতে পারা যায়। ব্রাহ্মণদের জাত্যভিমানও এখানে তদ্রূপ। ত্রিবাঙ্কুরের ব্রাহ্মণদের জাত্যভিমান বঙ্গদেশের একজন জাত্যভিমানী কুলীন ব্রাহ্মণেরও চক্ষে যেন অসহ্য তীব্র ব'লে বোধ হয়। পোষাক পরিচ্ছদ সম্বন্ধে ভিন্ন দেশে ভিন্ন রুচি হলেও আমার চোখে কিন্তু মহীশূরদেশীয় স্ত্রীলোকদের পরিচ্ছদটা বড় সুন্দর ব'লে

আত্মীয় ও বন্ধু ব্যাখ্যা করছিলেন যে দক্ষিণভারতে দই ও লঙ্কা অপরিমিত পরিমাণে খেয়ে আমার সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার ক্ষমতাটা শুধু যে একেবারে ঘসাকাঁচের মত ম্লান হয়ে গেছে তা নয়, তবে একটু অধোগতিও হয়েছে, তা না হলে শান্তিপুরে মিহি-কালাপেড়ের সৌন্দর্য্য ভুলে এক বিজাতীয় ২১ হাত লম্বা লাল বা নীল রেশমের পরদারমত ডোরাকাটা কাপড়কে বা ঘাগ্‌রারমত এবং সকচ্ছ কাপড় পরাকে সুন্দর বলে কখনই মনে করতে পারতুম না। আমার এই স্বদেশী বন্ধুটি শান্তিপুরের মিহি ফুর্‌ফুরে কাপড়ের সৌন্দর্য্যব্যাখ্যার শেষে এতই উত্তেজিত হয়ে উঠছিলেন যে শ্লীলতার গণ্ডি এড়িয়ে মহীশূরী স্ত্রীলোকদের কাপড় পরার সহিত বঙ্গদেশের মেথরাণীদের কাপড়পরার সাদৃশ্য সম্বন্ধে একটি গবেষণাপূর্ণ মত প্রকাশ ক'রে আমাকে মহীশূরী পরিচ্ছদ-গুণ-বর্ণনায় ক্ষান্ত ক'রে তবে নিরস্ত হন। সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বন্ধুর যাই কেন মত হোক্ না, উপযুক্ত আবরুরক্ষার পক্ষে শান্তিপুরে কাপড় বিজাতীয় সেমিজ ও জ্যাকেটের সাহায্য না পেলে যে বাতাসেরও ভর সইতে পারে না সেটা তাঁকেও স্বীকার করতে হয়েছিল। এদেশে একরকম আঁট সাঁট হাতকাটা জামা স্ত্রীলোকেরা বক্ষ আবরণের জন্য সর্ব্বদাই ব্যবহার করেন। কুলীরমণী হ'তে মহীশূরের মহারাণী পর্য্যন্ত সকলেরই এটা অত্যাবশ্যকীয়।

যাহো'ক্ আহারাদির পর পান খাবার সময়ও একটু সমস্যা এ'সে উপস্থিত হ'ল। আস্ত আস্ত পান, আলাদা সুপারি ও চূণ দেখে বেশ বুঝতে পারলুম যে পানসাজার কাজটা নিজেদেরই করতে হ'বে। কাজটা বিশেষ গুরুতর না হলেও বঙ্গদেশে পানসাজাটা পুরুষদের নিত্যকর্ম্মের মধ্যে একটা নয় বলে সেটা নিজের বড় একটা অভ্যাস ছিল না, কাজেই অনেক ভেবেচিন্তে বন্ধুবরকেই আগে পান খেতে অনুরোধ করলুম—ভেবেছিলুম তাঁর দেখাদেখি মহীশূরী পান-

সাজাটা অনেকটা শিখে নেব। কিন্তু বন্ধুর অসহনীয় ভদ্রতার জ্বালায় তাতে ব্যর্থ-মনোরথ হ'তে হল; আমাকেই আগে পান নিতে হ'ল ও কাজেই শেষে ঐ আস্ত পানগুলাকে কি করে খাব সেটা যে ঠিক্ করতে পারছি না এটাও স্প... ভেঙ্গে বলতে হল। এ সম্বন্ধে একটু হাস্য-পরিহাসের পর বন্ধু ... খেলেন। দেখলুম প্রক্রিয়াটা খুবই আদিম রকমের। এক একটি ...ন নিয়ে মা... রা... একটু চূণ মাখাও আর সেটাকে গালে ফেলে দাও। এই রকম... পর ২।১ খানা সুপারি ও নার... চিবাও। পান সাজার কোন ... অনেকটা ভরসা পেয়ে পান খেলুম ... আশ্চর্য্য হলুম। কেন যে খয়ের এঁরা ব্যব... ও চট্ করে জিজ্ঞেস করতে পারছিলাম ... ...জীটা কিছুতেই মনে আসছিল না। "যাতে ঠোঁট ...র," "a sort of deep brown stuff, a sort of astringent vegetable stuff," ইত্যাদি অনেক রকমে প্রথমে বোঝাতে চেষ্টা করলুম বটে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। শেষে catechu কথাটা মনে হতেই ভাবলুম বুঝি ঝঞ্ঝাট মিট্‌ল, কিন্তু আমার যদিবা অনেক কষ্টে catechu বেরুল ত বন্ধুবর আবার তার মানে বোঝেন না। শেষে অভিধান খুলে অনেক ধস্তাধস্তির পর বন্ধু উৎফুল্ল হ'য়ে বল্লেন " Oh, you mean কাচ্?" কাচ্ কিরে বাবা? খয়েরকে কি কাচ্ বলে নাকি? যা হোক্ আর বাড়াবাড়িতে কাজ নেই মনে করে বল্লুম "হাঁ, তাই বটে।" তিনি বোঝালেন যে তাঁদের সুপারি অনেক মশলাপাতি দিয়ে সিদ্ধ ক'রে তৈরি হয়, ওতেই "কাচের" কাজ ক'রে, আলাদা 'কাচের' আবশ্যক হয় না—আমার কিন্তু সেটি বেশ আবশ্যক বোধ হচ্ছিল। আরও

শুনলুম যে তাঁদের দেশে মেয়েরা প্রসবের পর যখন আঁতুড়ে থাকেন, দাঁতের মাড়ি শক্ত রাখবার জন্য কেবল তখনই খয়ের ব্যবহার করেন। অন্য সময়ে করেন না। অন্য সময়ে দাঁতের মাড়ি শক্ত রাখবার চেষ্টা করলে যে কি ক্ষতি হয় তা আমি এখনও বুঝ[illegible]রি নি। আমার মুখে সেই সিদ্ধকরা সুপারি ও নারকেলের [illegible]যুক্ত পান, খয়ের ও অন্যান্য মশলা অভাবে বড়ই নীরস বোধ হ[illegible]ল। ও বিষয় কিন্তু আর বেশী ঘাঁটাতে সাহস হ'ল [illegible] কারণ খয়েরের ইংরাজী বের-করতেই যে কষ্ট হয়েছে [illegible]লুম যে ধনের চাল, মৌরী, যোয়াণ ইত্যাদি তরজমা ক[illegible]তে চেষ্টা করা একেবারেই দুরাশা।

[ক্রমশঃ]

—যতিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

সমসাময়িক ভারত।

আর্থিক অবস্থা।

৫

ভারত সরকারের "ব্লু-বুক"গুলা নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে; এই ব্লু-বুকের নাম:—"ভারতের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি।" কতকগুলা আশ্বাসজনক অঙ্গীকার-বাক্যেই ইহা পর্য্যবসিত। ইংরাজের সরকারী রিপোর্টাদি লিখিবার ধরণই এইরূপ। তবু যদি ইহা স্পষ্টরূপে বলা যাইতে পারিত যে, ইংরাজ-শাসনে ভারতীয় জনসাধারণের নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি সংসাধিত হইয়াছে; ব্যবসায়াদির ধ্বংস সত্ত্বেও,—অভাব পক্ষের নিশ্চেষ্টতা অপেক্ষা ভাবপক্ষের শুভচেষ্টা প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, তাহা হইলে বিদেশীয় শাসনতন্ত্রকে

দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করা যাইতে পারিত; কিন্তু পূর্ব্বে যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা হইতে এরূপ আশা করা যায় না।

কতকগুলি কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিব:—ইংরাজ-শাসনের কতকগুলি শুভ ফলের প্রতি সকলেরই দৃষ্টি সহজে আকৃষ্ট হয়: দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহের পর, ভারতে শান্তি ও সুব্যবস্থার আমল আসিয়াছে। ভারতকে যদি নিজের হস্তে সমর্পণ করা হইত, তাহা হইলে হয়ত ভারত অরাজকতার মধ্যেই ডুবিয়া থাকিত। সরকারী পূতকর্ম্মের অনুষ্ঠানে, রেলপথ প্রভৃতির উদ্ঘাটনে ভারতের অনেক হিত সাধিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে উহাদের দ্বারা আরো অধিক ইষ্ট সাধিত হইতে পারে। রেল-পথ হইয়াছে বলিয়া ভারতের কোন আক্ষেপ নাই; যে প্রণালীতে উহা গঠিত হইয়া থাকে এবং যে প্রণালীতে দেশের ধন-শোষণ কার্য্যে উহাকে খাটানো হয়, সেই সম্বন্ধেই ভারতের যাহা কিছু আপত্তি অভিযোগ। মহানুভব উদারনৈতিক ইংরাজদিগের উদার দৃষ্টির পরে আমার সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা আছে। তাঁহারা কল্পনা করিয়াছিলেন,—ভারত, ইংলণ্ডের সভ্যতা সহজেই আত্মসাৎ করিতে পারিবে। হয়ত তাঁহাদের এই কল্পনা স্বপ্নবৎ অলীক। কিন্তু ইহা অবিসম্বাদিত,—তাঁহারা যে শাসনতন্ত্রের দ্বারা ভারতকে সত্বস্বাধীনতা প্রদান করিবেন বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, সে শাসনতন্ত্র বাস্তবিকই সভ্যতাবিস্তারের নামান্তর। দাদাভাই বলেন,—"ইংরাজি শিক্ষার বিষয়ীভূত, ইংরাজের মহৎ সাহিত্য এবং উচ্চ উদার সভ্যতাপ্রদ সাহিত্য বিজ্ঞানের বহুল প্রচারই,—ইংরাজের কীর্ত্তিমন্দিরস্বরূপ ভারতে চিরকাল বিরাজমান থাকিবে।" কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ ও মহামূল্য সেই ১৮৩৩ সালের গুরুগম্ভীর অঙ্গীকারবাক্য এবং ১৮৩৩। ১৮৭৭। ১৮৮৭ সালের রাণীর সেই ঘোষণাপত্র যাহা ধর্ম্মত পরিপালিত হইলে "ভারতের

এই গেল ভাবপক্ষের কথা। এখন অভাবপক্ষের কথা আলোচনা করা যাক। যেরূপ অবস্থায় ভারত এখন অবস্থিত উহা নিতান্ত অসঙ্গত এবং বোধহয় উহার দৃষ্টান্তও আর কুত্রাপি নাই। একটি অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার এই—য়ুরোপীয় ভাবের ও য়ুরোপীয় সভ্যতার শুভ অনুষ্ঠানগুলি ভারতের প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছে। চিরাভ্যস্ত আপদ-সঙ্কুল অবস্থা অপেক্ষাও—সর্ব্বোচ্ছেদকারী বর্ব্বরদিগের চিরন্তন উপদ্রব দৌরাত্ম্য অপেক্ষাও—এই "ব্রিটানিকী শান্তি," পূতকর্ম্মের এই সমস্ত বৃহৎ অনুষ্ঠান, ব্যয়বহুল এই সমস্ত বৃহৎ ব্যাপার যাহা হইতে প্রভূত শুভফল আশা করা যাইতে পারে—এই সমস্ত দেশের পক্ষে আরো বেশী অনিষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দাদাভাই বলেন—"স্বেচ্ছাচারী দেশীয় রাজার আমলে প্রজাগণ, সময়ে সময়ে অত্যাচারে প্রপীড়িত হইলেও, নিজ উৎপাদিত ধনধান্য উহারা সংরক্ষণ ও সম্ভোগ করিতে পারিত। স্বেচ্ছাতন্ত্রী ইন্দো-ইঙ্গের আমলে প্রজারা শান্তি ভোগ করিতেছে সত্য, তাহাদিগকে কোন প্রকার উপদ্রব সহ্য করিতে হয় না সত্য, কিন্তু তাহাদের অজ্ঞাতসারে, শান্ত ও গূঢ় উপায়ে, তাহাদের সর্ব্বস্ব শোষিত হইতেছে; প্রজারা শান্তিতে থাকিয়া, সুশাসনের মধ্যে থাকিয়া, আইন কানুনের মধ্যে থাকিয়া, অন্নাভাবে মরিতেছে।" প্রাচ্য-লোকের নিকট তুমি আইন কানুনের বড়াই করিবে? প্রাচ্যদেশবাসী বরং স্বেচ্ছাচারী দেশীয় রাজার অধীনে থাকিতে চাহিবে, তবু ওরূপ আইনকানুনের সুব্যবস্থার মধ্যে থাকিতে চাহিবে না। কেননা উহারা যাহা চাহে, তাহা অনেকটা দেশীয় রাজার নিকট প্রাপ্ত হয়।

এই তিন শতাব্দিকাল মধ্যে, ভারত অপেক্ষাকৃত ধনী কিংবা অপেক্ষাকৃত দরিদ্র হইয়াছে, তাহা তুলনা করিয়া দেখিবার জন্য কোন

হইয়াছে—তাহার কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। কিন্তু ইহা কি কেবল হিসাব অঙ্কেরই কথা? এই পরিচ্ছেদে যে সকল হেতুবাদ বিবৃত হইয়াছে—যথা, দেশের অর্থশোষণ, ক্ষুদ্র কৃষক ভূস্বামিদের উচ্ছেদ সাধন, ছোট খাটো ব্যবসায়াদির বিলোপসাধন, দুর্ভিক্ষের আবির্ভাব।—এই সমস্ত হইতে রোগের মূল কারণ কি জানা যায় না? এই সমস্ত হইতে কি স্পষ্ট প্রকাশ পায় না যে, দেশ রক্তহীন হইয়া একেবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে,? "ইহা সত্ত্বেও, ১৯০০ সালের কংগ্রেসের সময়ে লাহোরের একটা সংবাদপত্রে লিখিত হয় যে তথ্যতালিকার দ্বারা ভারতের ধনবৃদ্ধি সপ্রমাণ হইয়াছে। কেবল, ইঙ্গ-স্যাক্সন্ দেশসমূহের ন্যায়,—অর্থ নৈতিক কারণেই, মধ্যবিত্ত ও ক্ষুদ্রলোকদের ধনসম্পত্তি ক্ষয় পাইয়া, তাহার স্থানে ধনীদের হস্তে বিপুল ধনসম্পত্তি সঞ্চিত হইয়াছে।" আমি জানিতে চাহি—সে কিরূপ তথ্যতালিকা? প্রায় সকল স্থানেই, এই সকল ধনসম্পত্তির অধিকাংশই ইংরাজদের হস্তে, য়ুরোপীয়দের হস্তে, য়ুরোপীয় মূলধনীদের হস্তে, শ্রমজীবীদের হস্তে, কুঠিওয়ালাদের হস্তে। সার রিচার্ড টেম্পল্—যাঁহার উদার অপক্ষপাতিতার আমি প্রশংসা করি (যে গুণটি তাঁহার মণ্ডলীমধ্যে বড়ই দুর্লভ) তিনি, ১০ বৎসর পূর্ব্বে, এই সম্বন্ধে বিরুদ্ধ-মত প্রকাশ করেন। তিনি বলেন,—বাসস্থান ও অস্থাবর সম্পত্তির উন্নতি—এইরূপ কতকগুলি নিশ্চিত নিদর্শন হইতে জানা যায় যে মধ্যবিত্ত ও নিম্নশ্রেণীর মধ্যে ধনরাশি ছড়াইয়া পড়িয়াছে।" তিনি আরো বলেন,—"দেশীয় লোকের হাতে ১৮ কোটি পৌণ্ডের গবর্ণমেণ্ট-কাগজ আছে। ইহা জাতীয়-ঋণের অষ্টমাংশ। তথ্যতালিকা ও সঠিক সংবাদের অভাবে, কতটা উন্নতি হইয়াছে ঠিক বলা যায় না। মুনিসিপাল-ঋণের একটা বৃহত্তর অংশ (নগরের আদায়ী কর যাহার প্রতিভূ) দেশীয় লোকের হস্তে। সরকার সম্পর্কীয় প্রধান-প্রধান নগরের কতকগুলি

ব্যাঙ্কও তাহাদের হস্তে।” এই কয়েক ছত্রে উনি যাহা নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট! দেশের ধনবৃদ্ধি হইয়াছে কি না জানিবার কোন তথ্যতালিকা নাই, পৌরকার্য্য সম্বন্ধীয় সরকারী ঋণের পরিমাণ কি—তাহারও কোন সঠিক্ সংবাদ নাই। আর একটা যাহা তিনি প্রকাশ করিয়াছেন তাহাও গুরুপরিণামগর্ভ। তিনি বলিয়াছেন, জাতীয় ঋণের কেবল অষ্টমাংশ দেশীয়দের হস্তে। অতএব দেখা যাইতেছে, এই দরিদ্র দেশে মূলধনীর সংখ্যা খুবই কম। ইহা সত্ত্বেও, এ দেশের গাত্রে, আরো দুই চারি ঘা অস্ত্র-বৈদ্যের ছুরী চালাইতে হইবে! বোম্বায়ের পার্শিরা একটি ক্ষুদ্র মণ্ডলীমাত্র, কিন্তু খুব ধনী ও খুব বিশিষ্ট। দাদাভাই একজন পার্শি, তিনিও ভারতের বিষম দারিদ্র্যের কথা বারংবার বলিয়া থাকেন। সুদ-খোর মারোয়ারী যে অল্পকাল মধ্যেই গর্হিত উপায়ে বিপুল অর্থ সঞ্চয় করে, সে বিষয়ে সকলেই একবাক্যে অভিযোগ করিয়া থাকে। গ্রাম-কে-গ্রাম এই সব পরস্বপহারীদের অধিকার-ভুক্ত হইয়া যায়—কেহ তাহা হইতে রক্ষা করিতে পারে না। আমি ভরসা করি, এই অবাঞ্ছিত পরিণামের জন্য ইংরাজ-সরকার আত্মশ্লাঘা করিবেন না। ইহা আমি স্বীকার করি, এক হিসাবে দেশীয় ব্যবসায়-কার্য্যের কতকটা সুবিধা হইয়াছে। বিদেশীয় সামগ্রীর কতকগুলি দেশীয় দোকান হইয়াছে। সামগ্রী বিদেশী, কিন্তু দোকান দেশী। এই দোকানদারেরা স্বল্প লাভেই সন্তুষ্ট। কতকগুলি য়ুরোপীয় “হোস” ও কতকগুলি য়ুরোপীয় ভাণ্ডার-বিপণীও আছে। কিন্তু বাকী সমস্ত ক্রয়বিক্রয়ের কাজ দেশীয় বাজারেই নিষ্পন্ন হয়।

এখন মূলধনের কথায় আসা যাক্। ইংরাজের আমলে ভারতের আর্থিক উন্নতি অবনতি, এই তৌলদণ্ডেই নির্দ্ধারিত হইতে পারে।

অপরাধী হইবে, নয় বেকসুর খালাস পাইবে। যদি জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি হইয়া থাকে, সুখস্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তবেই এই শাসনতন্ত্রকে ভাল বলিব, নচেৎ মন্দ বলিব।

এসম্বন্ধে কোন তথ্যতালিকা নাই, কেবল কতকগুলা মতামত আছে। সার্-রিচার্ডটেম্পেলের মত পূর্ব্বেই উদ্ধৃত করিয়াছি। "বিগত একবংশব্যাপী জীবনকালের মধ্যে, লোকদের ধনসম্পত্তি যে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার প্রমাণ,—খুব সামান্য লোকেরাও এখন পোড়া-মাটির গার্হস্থ্য সামগ্রীর পরিবর্ত্তে, ধাতব সামগ্রী ব্যবহার করিয়া থাকে, খোড়ো ঘরের বদলে অনেকস্থলে এখন খোলার ঘর দৃষ্ট হয়। দেশের লোক—দেশীয় মোটা কাপড় অপেক্ষা বিদেশী কাপড় এখন বেশী পছন্দ করে। কৃষিসম্বন্ধীয় শকট প্রভৃতিরও পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি হইয়াছে।" সার্-রিচার্ড বলেন, এ সমস্ত তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা। কিন্তু তিনি বঙ্গদেশেই অধিকাংশ সময় কাটাইয়াছেন। বঙ্গদেশকৃত সর্ব্বাপেক্ষা, সমৃদ্ধ। বাঙ্গালী চাষার অবস্থাও অপেক্ষাকৃত ভাল। তাহার কারণ, ভূমির স্বাভাবিক উচ্চতা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। কিন্তু সমস্ত ভারত ত আর বঙ্গদেশ নয়। তুলনা করিবার মত কোন তথ্যতালিকা না থাকিলেও এসম্বন্ধে কতকগুলি সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়। সেই সাক্ষীরা উচ্চৈঃস্বরে একই কথা বলিয়া থাকে। এই সকল সাক্ষ্যের মধ্যে ধরা যাইতে পারে—পর্য্যটকদিগের বর্ণনা, বিশ্বস্ত দেশীয়দিগের উক্তি, রাজপুরুষদিগের স্বীকৃত কথা, ব্লু-বুক্, আদম্-সুমারি, বেতন মজুরির হার, দেশোৎপন্ন দ্রব্যসামগ্রী, পার্শ্ববর্ত্তি রাজাদিগের সহিত তুলনা, এবং সকলের চেয়ে বেশী—দুর্ভিক্ষ ;—এই সমস্ত একই কথার সাক্ষ্য দেয়। ১৫০ বৎসর হইল, ভারত ইংরাজের হস্তে আসিয়াছে। এতদিনের পর আজ দাদাভাই-প্রদর্শিত তথ্যতালিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে, সরকারী কোন কাগজপত্রের প্রকাশ

নাই; তুলনা করিয়া দেখিবার মত কোন তথ্যতালিকা নাই; আঁক কসিয়া যে কিছু স্থির হইবে তাহার উপায় নাই;—পাটীগণিৎ এখানে অকর্ম্মণ্য। আর কিছু না হউক, ইংরাজ-আমলের পূর্ব্বে, যে সকল পর্য্যটক ভারতে আসিয়াছিল, অন্তত তাহাদের বিবরণাদি প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহারা সকলেই এক বাক্যে বলিয়াছে, ভারত খুব সমৃদ্ধ,—ভারত খুব সৌভাগ্যশালী

আর এখন?—অপক্ষপাতী আধুনিক পর্য্যটকদিগের বিবরণ পাঠ করিয়া দেখ। প্রথমেই গ্রামপল্লির দুঃখদুর্দ্দশা সকলেরই নজরে পড়ে। কেন না ভারতের বিপুলতর অংশ, নগরে বাস করে না—গ্রামপল্লিতেই বাস করে। গ্রামপল্লিবাসীদিগের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইয়াছে, একথা কি বলা যাইতে পারে? সত্য,—গ্রামপল্লিতেও, কেরোসিন্-তৈল, দেশীয় তৈলের স্থান ক্রমশ অধিকার করিয়াছে, গুড়ের বদলে চিনি, গ্রাম্য তাঁতের কাপড়ের বদলে ল্যাঙ্কেশিয়ারের কাপড় ব্যবহৃত হইতেছে। কিন্তু ইহাতে কি প্রমাণ হয়, উহাদের জীবনযাত্রার ধরণধারণে একটু উন্নতি হইয়াছে?—সুখস্বচ্ছন্দতা কুটীরেও প্রবেশ করিয়াছে?—না, তাহা প্রমাণ হয় না। উহার দ্বারায় কেবল এইমাত্র সূচিত হয় যে, বিলাতের সস্তা দ্রব্যসামগ্রী, দেশীয় দ্রব্যসামগ্রীকে দেশীয় বাজার হইতে, বহিষ্কৃত করিয়াছে। জনসাধারণের সুখস্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করিতে হইবে; প্রমাণ করিতে হইবে যে, লোকেরা পূর্ব্বে এত দরিদ্র ছিল যে দেশীয় কাপড় ক্রয় করা তাহাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য ছিল, এখন এত ধনী হইয়াছে যে, বিলাতী ছিটের কাপড় এখন উহারা অনায়াসে ক্রয় করিতে পারিতেছে। সে-সব কিছুই নহে আসল কথা এই,—হিন্দুকুলি—হলুদবর্ণ, ঝ্যাঁকাশে, কুষ্ঠ-পটিতে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছন্ন, মাথায় পাগড়ির আকারে একটা ময়লা কানি জড়ানো,—মোটের

অ্যানাম-বাসী চীনেকুলী ও একজন লাট। আমি জ্যানুয়ারী মাসে, উত্তরাঞ্চলের যে গ্রামটি দর্শন করিয়াছিলাম, সেখানে শিশুরা উলঙ্গ—থর্ থর্ করিয়া শীতে কাঁপিতেছে। লোকদের গায়ে আধখানা জামা বই আর কিছুই নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, যে সকল জিনিশ জীবন-ধারণের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যক, উহারা তাহা হইতেও বঞ্চিত। যে সকল গ্রাম সমৃদ্ধ বলিয়া প্রখ্যাত, সেখানেও দারিদ্র্যের বিষাদ-ছায়া প্রবেশ করিয়াছে। গুজরাট বহুকাল হইতে সমৃদ্ধ; তত্রত্য খোদাই-কাজকরা ও উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত গৃহাদির জন্য গুজরাট গৌরবান্বিত। কিন্তু শেষাশেষি যে কয়েকবার সেখানে দুর্ভিক্ষ হয়, তাহাতেই উহার শ্রীসৌভাগ্য প্রায় অন্তর্হিত হইয়াছে। এখন গ্রামবাসীরা ভাল করিয়া অঙ্গাচ্ছাদন করিতে পারে না—ভাল গৃহে বাস করিতে পায় না; এবং উহাদের সু-বৎসরেও পেট ভরিয়া খাইতে পায় কি না সন্দেহ। হণ্টার বলেন—"ভারতবর্ষের শস্যাদি ভারতবর্ষের বাহিরে চলিয়া যায়,—তাহার ফলে, অনেকগুলি উদরের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয় না। যদি ভারতের সকল শ্রেণীর দারিদ্রেরা প্রতিদিন দুই বেলা পেটভরিয়া খাইতে পাইত তাহা হইলে রপ্তানির জন্য শস্যাদি বড়-একটা উদ্বৃত্ত হইত না।" ভারতে লোকসংখ্যার বৃদ্ধি হইতেছে, প্রায়ই এইরূপ বলিতে শুনা যায়। কিন্তু ইহা একটা ভ্রম;—ইহার অনুপাত খুবই কম এবং সু-বৎসরেও মৃত্যুর হার অত্যন্ত অধিক। তাছাড়া, স্থায়ী ব্যাপক দুর্ভিক্ষ লাগিয়াই আছে। আমাদের এই যুগে এরূপ ঘটনা, একটা হেঁয়ালির মত। ইহা অমার্জ্জনীয়। ইহা একটা অনিবার্য্য অস্থায়ী দৈবঘটনা মাত্র নহে,—ইহা ভীষণ হইতে ভীষণতর আকারে পুনঃ পুনঃ দেখা দিতেছে। ইহার পর, যখন ভারতীয় দুর্ভিক্ষের নামে, লণ্ডনে রাশ-নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়, এবং সংবাদপত্রাদিতে চাঁদার দীর্ঘ ফর্দ্দ প্রকাশ করিয়া, ইংরাজের অক্ষয় বদান্যতা কীর্ত্তিত হয়, তখন তাহা কি একটা

প্রহসন বলিয়া মনে হয় না? কতকগুলি ব্যক্তিবিশেষের উদারতা ও বদান্যতার অপলাপ করা আমার অভিপ্রায় নহে, আমি শুধু এই কথা বলি, ইংলণ্ডের নিকট ভারত "ভিক্ষা চাহে না, ন্যায়বিচার চাহে"। তাঁহারা যেরূপ ভাবে কাজ করেন তাহা—একজন বাঙ্গালী কবির উক্তি অনুসারে—"গাছের গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা"।

দাদাভাই-নৌরোজি সমস্ত অবস্থাটা বেশ জোরের সহিত সমাহার করিয়াছেন ;—"পূর্ব্বে যেসব স্থলে, বিদেশীয়-কর্ত্তৃক ভারত বিজিত হয়—আক্রমণকারীরা হয় লুঠপাট করিয়া দেশ হইতে প্রস্থান করে, নয় দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের শাসনভার গ্রহণ করে। যে স্থলে তাহারা শুধু লুঠপাট করিত,—দেশকে খুব নিষ্ঠুরভাবে ক্ষতবিক্ষত করিয়া চলিয়া যাইত ; কিন্তু ভারত স্বকীয় শ্রমশিল্পের কল্যাণে, তাহার সমস্ত ক্ষত হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া পুনর্ব্বার জীবন উদ্যম লাভ করিত। যে স্থলে বিদেশী আক্রমণকারীরা, দেশে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দেশের শাসনভার গ্রহণ করিত—সে শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি যেরূপই হউক না কেন—দেশের আর্থিক কিংবা নৈতিক শোষণ কিছুতেই ঘটিত না। দেশের উৎপন্ন দ্রব্য দেশেই থাকিয়া যাইত। কিন্তু ইংরাজের সম্বন্ধে একথা বলা যায় না। গোড়ায় যে সব যুদ্ধবিগ্রহ হয়, তাহারই দরুণ সরকারী ঋণের বোঝা ভারতের উপর চাপিয়াছে এবং ইহা হইতেই একটা বিষম ক্ষত উৎপন্ন হইয়াছে। এই ক্ষতমুখ সেই অবধি খোলা রহিয়াছে এবং ক্রমশই বাড়িয়া যাইতেছে।"

উপস্থিত প্রশ্নটির কার্য্য-পরিসর ও প্রকৃতি এরূপ ব্যাপক যে, উহা ইংরাজ-রাষ্ট্রনীতিকে অতিক্রম করিয়া এক্ষণে সাধারণ রাষ্ট্রনীতির আলোচ্য-বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যে দুরারোগ্য বিষম রোগ, এই হতভাগ্য দেশ ভোগ করিতেছে তাহা এই :—ইহার শাসনতন্ত্র বিদেশী,

বাহির হইয়া না গেলে, কিছুতেই রোগের প্রতীকার নাই। তাই, দেড়শত বৎসর হইতে ভারত, বিজিত অথবা বিজেয় ভাবেই অবস্থিতি করিতেছে; এবং আগন্তুক বিদেশীরা এই ভাবেই উহাকে দেখিয়া থাকে। তেলে-জলে যেরূপ মিশ খায় না, সেইরূপ ভারতবাসী ও ইংরাজে কস্মিন্‌কালেও মিশ খাইবে না। ইংরাজ-অধিকারের আরম্ভে ভারতের যে অবস্থা ছিল, এখনও সেই অবস্থা। উভয়ের স্বার্থ সম্পূর্ণ রূপে বিভিন্ন ও বিসম্বাদী। রাজনৈতিক ক্ষমতা, মূলধন, ধনোৎপাদনের বন্দোবস্ত,—সমস্তই প্রভু-জাতির হস্তে। দেশীয় লোকেরা কেবল মজুর যোগাইতেছে। এইরূপে, দুইটি বিভিন্ন শ্রেণী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এক শ্রেণীর লোক দেশ শাসন করিতেছে ও সমস্তই তাহাদের হস্তগত; ইহারা সংখ্যায় খুব কম। আর এক শ্রেণী—সংখ্যায় বিপুল—কিন্তু দুর্ব্বল, শান্তপ্রকৃতি ও সহজ-বশ্য। এই শ্রেণীর অন্তর্ভূত সমস্ত জাতিকে, জাতি,—কুলি, মজুর ও নিঃস্ব ক্ষুদ্র প্রজা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যাহাকে উপনিবেশ-রাজ্য বলে, তাহার এইত ফল।

ভারত বাস্তবিকই দুর্ভাগ্য। ভারত সহনশীল ও সহজ-বশ্য;—তাই অপেক্ষাকৃত উদ্যমশীল, অর্থলোলুপ, কঠোরকর্ম্মা জাতির করকবলিত হইয়াছে; তাই বিদেশীর হস্তে নিগৃহীত, দলিত, পেষিত হইতেছে। এই তাপসিকতা, সংসারবৈরাগ্য ও মায়াবাদের দেশ এমন এক জাতির সংস্রবে আসিয়াছে যে জাতি জড়বিজ্ঞানবাদী,—এবং পারত্রিক স্বর্গ অপেক্ষা, পার্থিব সামগ্রীর প্রতি—ঐহিক সুখ-স্বচ্ছন্দতার প্রতি যাহার অধিকতর আস্থা। এই সব ভবঘুরে ভাগ্য শিকারীরা আসিয়া ভগবতী ভারত-ধরিত্রীর দুটি স্তনই দখল করিয়া বসিয়াছে এবং তাহাতে মুখ লাগাইয়া অনন্ত আগ্রহ সহকারে সমস্ত দুগ্ধ প্রাণপণে শোষণ করিতেছে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

শিরী-ফরিদ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

প্রাসাদ-কক্ষ

পর্য্যঙ্কে অর্দ্ধশয়ানা তাতারের রাণী শিরী।

গীত।

সে আছে কি না আছে কেহ জানে না।
আছে শুধু তার স্মৃতি যাতনা।
শুধু পড়ে আছে তার কথা,
শুধু পড়ে আছে তার একটা গাথা—
'সেযে বড়ই সুন্দর ওগো নাই তার তুলনা।'
সে যে মিলন আশে—
বসে আছে ধরণীর একটা পাশে,
প্রবাসে, কাহায় আশে বলে না।
পবন পরশে কত কেঁদেছে,
গগন নয়নে কত মুছেছে,
কত জ্যোছনা হইয়া গেছে মলিনা।
আনত বদন তার তুলিতে,
কত তুলেছে প্রকৃতি ছবি তুলিতে,
আশে পাশে দেছে হাসি ছলনা—
তবু সে মনের কথা দিলে না।

পার্শ্বের দ্বার দিয়া, শিরী যাহাতে দেখিতে না পায় এইরূপ ভাবে, শিরীর সহচরী আমিনা প্রবেশ করিল, শিরী তথাপি আমিনাকে দেখিতে পাইল, এবং সলজ্জভাবে বসনাদিতে দেহ আবৃত করিয়া উঠিয়া বসিল। রাণী যেন গান গাহিয়া কত অপরাধ করিয়াছেন। আমিনা দেখিল বহুদিন পরে, লজ্জার সহিত প্রফুল্লতা তাহার চিবুক দুটী এখনও স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে। কমল-কিসলয় ঝরিতে ঝরিতে, যেন আকুল আগ্রহে বৃন্তটীকে জড়াইয়া আছে।

আমিনা। বড় যে প্রফুল্ল রাণি!

শিরী। কি করি সজনি!—
তোমরা সবাই মিলে আবাহন ক'রে,
রাজ্যমধ্যে মালিন্য আনিলে, সে এখন
পাত্র মিত্র সভাসদ বিদূষক লয়ে,
সমস্ত তাতার জুড়ে পেতেছে আসন।
প্রফুল্লতা কোথা যায়!—কেঁদে কেঁদে
পড়ে দুটী পায়, কল্য রাত্রে মোর কাছে
যাচিল আশ্রয়। বড় দুঃখ হ'ল সখি!
সজল নয়ন দুটী দেখি, বলিলাম
"শোন্ প্রফুল্লতা! এই তাতার নগরে
আছে এক নারী,—বড় দয়াবতী,—নাম
আমিনা সুন্দরী। যদি পার কোন মতে
যেতে তার পালঙ্কের ধারে, সে তোমায়
দিবে স্থান। কিন্তু সাবধান, ভয়ে ভয়ে

একজন। সে যদি দেখিতে পায় তোরে,
সিন্ধু পারে পাঠাবে অমনি।” সেই কথা
শুনে সখি! কি করে যে প্রফুল্লতা ভয়ে
এ ক্ষুদ্র হৃদয় মোর ধরিল জড়ায়ে,
সারারাতি চেষ্টা ক’রে ছাড়াতে না পারি।

আমিনা। বটে বটে! এত কাণ্ড! তাত নাহি জানি!
সারারাতি যুদ্ধ করে প্রফুল্লতা সনে
তবে ত বড়ই কষ্ট ভুগিয়াছ রাণি!
আমি ভেবেছিনু, রজনী সুন্দরী বুঝি,
নিত্য নিত্য একাকিনী—তাতার-ঈশ্বরী
পাশে আসিয়া আসিয়া,—প্রণয়ে পড়িয়া—
আত্মহারা চলে যেতে, চাঁদ গেছে ফেলে।

শিরী। চাঁদ এলে কি হবে আমিনা? সেত জানে
কি কঠিন পণ তাতারীর। পণকরা
নারী প্রাণহীনা কি যে চায়, কারে চায়—
নিজেই না জানে। বিষম দুরাশা স্রোতে
ভাসিতে ভাসিতে, কত শ্যামতীর, কত
তরি, কত তরু, কত আলম্বন, কত
বাহু দুর্ব্বল রক্ষণ, কত প্রেমরজ্জু
প্রলোভন পড়িয়াছে এ পোড়া নয়নে।
কই কে পাইল অপাঙ্গের কণা? সখি!
চাঁদ কি জানে না, রমণী মুখের বিম্ব,—
অতি ভীরু অতি যে কলিতরঙ্গশঙ্কয়

ভয়ে, দিবসে দেয় না দেখা—শিরী যদি
বরিত তাহারে, তাহলে তার হাত
ছিনাইয়া,—অতি মূর্খ নীরস কঠিন,—
দিবারাত্র কর্ত্তব্য কর্ত্তব্য করে প্রেম
জ্ঞানহীন—তাতারের রাজ-প্রতিনিধি
লয়ে যেতে পারিত গো তোরে! জীবনের
সমস্ত সাধের সনে, আগে আমি, তোর
ওই চারুগলে পরাতাম মালা।

আমিনা।

বেশ
তাই দাও। এখনোত দিতে পার রাণি!
রাজা রাখে হাজার বেগম, আমি আর
দুইটী কি পারি না রাখিতে? তাই দাও—
মোর গলে মালা দাও। ধরণী জুড়াবে।
যত পাগলের উপদ্রবে, আর তারে
কাঁপিতে হবে না। রাজপুত্র ভস্ম মেখে
পথে গড়াবে না। ননী-অঙ্গ রবিতাপে
আর গলিবে না। তাই দাও শীঘ্র দাও—
রাণি! কত অঙ্গ পর্য্যঙ্ক ছেড়েছে, কত
বাহুলতা কত ভুজঙ্গ ধরেছে, কত
আঁখি ধরণীর মূর্ত্তি গেছে ভুলে, কত
ক্ষুধা সমীর করেছে সার। দাও মালা
আমিনায়। আহা! আমিনায় মালা দিলে,
শতরাজ্য যদি প্রাণ পায়, এ হ'তে কি
সুখ আছে? কিন্তু রাণি! সাধ নাহি চাই।

মালা দাও ক্ষতি নাই—সাধে মোর নাই
প্রয়োজন। সিঁধেল তস্কর আছে ঘরে।
সে কি সাধ কি রাখিতে দেয় রাণি!

শিরী।　　　　　　　　　　　　　　　চাঁদ
গেছে ফেলে।—আহা সখি, কি কথা বলিলি!
চাঁদ গেছে ফেলে!—উপমা না সত্য কথা!—
সত্য সখি, রজনী সুন্দরী, রাণীরে দুখিনী
হেরি দয়াবশে চাঁদ তারে করিয়াছে
দান। এখন প্রভাতবেলা চারিদিকে
রবির কিরণচ্ছটা। ভয়ে নিশামনি
গলে গলে পশেছে হৃদয়ে। তাই মোর
এত প্রফুল্লতা।—বিস্মিতা হইলি? কথা
বুঝিতে নারিলি? সত্য সখি, কাল রাত্রে
চাঁদ এসেছিল। সুধাচক্র, অঙ্গধরে
বঙ্কিম সুঠামে, আমার মুখের পানে
কত চেয়ে ছিল!

আমিনা।　　　　ও কি কথা বল রাণি!

শিরী। বিস্মিতা হয়ো না। শোন আরো বলি শোন।
সুধাংশুর মালা ফুটে ফুটে কথা হয়ে
শ্রবণ ভরায়ে দিল। বলিল—"সুন্দরি!
পাথর হইতে আমি রচেছি তোমায়।
রূপগর্ব্ব ক'রনা আমার কাছে।"

আমিনা। (স্বগত) একি
সর্ব্বনাশ! রাণী কি পাগল হ'ল!—রাণি,
এস যাই ভ্রমিব উদ্যানে।

শিরী। আরো শোন—

আমিনা। আর শুনিব না।

শিরী। না শুনিলে নড়িব না।—
তারপর স্মিতমুখে,—সাহসী করুণা-
প্রার্থী যে হাসি মাখিয়া মুখে কৃপাভিক্ষা
চায়—আহা হাসি কি সুন্দর!—

আমিনা। রাণি! রাণি!

শিরী। আর রাণী! আমি তোর রাণী—আমি তোর
রস্তমের রাণী,—তাতারের রাণী,—আর
প্রাসাদের দ্বারে যে সব রাজার পুত্র
তষ্টিরাম মত দিবানিশি প্রেমভিক্ষা
চায়, আমি সে সবার রাণী। কিন্তু তার
কাছে?—শুধু সমান্যা রমণী। রাজা যথা
ভিখারিণী হেরে দয়াবশে কথা কয়,
সেই মত কহিল সজনি!—বলে, "ওগো!
গরব ফেলিয়া দূরে দুটো কথা কও!
তোমার মুখের ছবি কল্পনা আমার।
চন্দ্ররশ্মিছাঁকা ওই হাসিটী তোমার,
আমার এ তুলি হ'তে ঝরেছে সুন্দরি!
বক্ষের তরঙ্গ, থরে থরে সাজাইতে

কত নিশি অনিদ্রায় গিয়াছে আমার,
কটাক্ষ বাঁধিতে চক্ষে, কল্পনার সব
সূত্র শেষ করে দিছি। সমস্তই জানি—
শুধু ও মুখের কথা আঁকিতে জানিনা।
শুন গো সৌন্দর্য্যময়ি! মান লাজ ভুলে,
দুটী কথা কয়ে, তোমার গঠন শ্রমে
দাও পুরস্কার।—(আমিনা চক্ষে রুমাল দিল)
ওকি কাঁদ কেন সখি!

আমিনা। সর্ব্বনাশ করিলে সজনি! পাগলিনী
হ'লে!

(মৃদু হাসিয়া আমিনা যে হস্তে চক্ষে রুমাল দিয়াছিল, সেই হস্ত ধরিল।—)

শিরী। পাগলিনী!—আমি পাগলিনী! কথা শুনে
রাণীরে কি তোর পাগলিনী হল জ্ঞান।
ভয় নাই, নই পাগলিনী। ছিনু ঘুমে
অচেতন, কোথা হতে আসিল স্বপন
অপূর্ব্ব রহস্যে ভরা।

অমিনা।　　　　স্বপন-স্বপন।

শিরী। তবে কি যথার্থ চাঁদ ঘরে ঢুকে ছিল!
তবে দেখি তুই পাগলিনী।

আমিনা।　　　　তাই ভাল
এই দেখ এখনও কাঁপিছে হৃদয়।
স্বপ্নকথা আগে কেন বলিলে না মোরে?

শিরী। জেগে উঠে আমি হেসে সারা। শতগ্রন্থি
ছিন্নবাসে মলিন যুবক,—কিন্তু সখি—
কুহেলিকা ঘেরা যেন পুর্ণিমার শশী!
বলিতে বলিতে হাসি পায়।—

আমিনা। থাক, আর
বলিতে হবেনা। সব বুঝিয়াছি।

শিরী। মোর
মাথা বুঝিয়াছ। ভয় নাই—জাগরণে
সহস্র লোকের চক্ষে যে শিরী পাষাণ,
স্বপ্নে সে যে তাহ'তে কঠিনা। করপ্রার্থী
সহস্র কুমার হ'তে ঘৃণায় ফিরায়ে
মুখ, স্বপ্নে যেই বসেছি উদ্যানে, পাছু
হতে শিরী ব'লে কে যেন ডাকিল। ফিরে
চেয়ে দেখি এক হাতে তুলি, অন্য হাতে
হাতুড়ি বাটালি, নয়নে প্রাচীর ভেদি
সুতীক্ষ্ণ দর্শন,—যেন মোর হৃদয়ের
ঘরে, কথা কিছু আছে কিনা দেখিবার
তরে, ভিক্ষু এক নিকটে আসিল। আঁখি
পরে আঁখি রাখি, তাহতে পলক কেড়ে
নিল।

আমিনা। তার পর?

শিরী। তার পর,—কেন নাহি
জানি,—তারে দেখে আপাদ মস্তক মোর
বসনে ঢাকিনু।—

আমিনা। যত কেন সাহাসনী,
যত কেন তেজগর্ব্বে মরিনা সজনি—
যেই অবকাশ পায়, নারীর হৃদয়
স্বভাবে ধরিয়া আনে ভয়!—ভয়ে রাণী
বসনে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে ছিলে।

শিরী। না, না সখি!
ভয় নয়, কিম্বা লজ্জা ভূষণ নারীর,—
যেন কোন দূরগত অভিমান, কোথা
হ'তে কাহার উপরে—কি জানি কেমন
করে এলো—সর্ব্ব অঙ্গ বসনে ঢাকিল।
কাণে কাণে বলে দিল, "শুনোনা মিনতি
কথা, মুখ দেখায়োনা! চরণে যদ্যপি
ধরে, তবু কথা কহিও না!"—কিন্তু সেত
ভিক্ষু নয়, চরণে ধরিবে বলে সেত
আসে নাই! সে যে এসেছিল মোর মাথা
নোয়াইতে। উচ্চহাসি হাসিয়া, বলিল,—
"কি লুকাও সুন্দরি আমারে? ও অঙ্গের
কোথা কি সুন্দর আছে দেব নাকি বলে?"—
এই বলে আরম্ভিলা রূপের বর্ণনা!
কি আর লজ্জার কথা বলিব আমিনা!
তাতারের রাণী—সর্ব্বাঙ্গ বসনে ঢাকা—
যেন উলঙ্গ দাঁড়াল তার কাছে।

আমিনা। স্বপ্ন
কারো রাখে নাকো মান। স্বপ্ন যদি সত্য

বিলাইত, এত দিনে ধরার ঘটিত
বিপর্য্যয়। তারপর তুমি কি করিলে?

শিরী। মিথ্যা, মিথ্যা! মিথ্যা নয় সহচরি! মোর
অঙ্গে কোথা কিবা আছে, তাহা আমি নিজে
নাহি জানি, সে ভিখারী কয়ে দিলে মোরে।
তারপর, যখন দেখিল মোর কথা
ফুটিল না, দ্রুতপদে উদ্যান ছাড়িয়া—
দূর-দূর-কতদূর,—কত দূরান্তর—
ধরণীর সীমাগত প্রকাণ্ড প্রান্তর,
তারা স্পর্শি ভূধর শিখর, তমোগর্ভ
গহন কন্দর, কত হ্রদ কত নদী,
কত অকূল সাগর, চক্ষের নিমিষে
হল পার। অব্যাহত দৃষ্টিশক্তি লয়ে
ধরণী ভেদিয়া তারে দেখিলাম সখি।
ইচ্ছাহ'ল কথাকই। বড় ইচ্ছাহ'ল,
আদর সোহাগমাখা মধুর বচনে
ধরণী সীমান্তহতে ধরে আনি তারে।
কিন্তু কথা ফুটিতে ফুটিতে ঘুম ভেঙে
গেল।—সখি হাসি পায়! শেষে কি আমার
ভিখারীর সঙ্গে আছে অদৃষ্ট বাঁধন।

আমিনা। পণ যদি ছেড়ে দাও, ভিখারীর কথা
কেন রাণি! নিজে এসে পারস্য-সম্রাট্
এখনি লোটায় তব পায়।—স্বপ্নকথা
ছেড়ে দাও। অঘটন ঘটায় স্বপন।

পঙ্গুরে লঙ্ঘায় গিরি, অন্ধজনে করে
সিন্ধুপার, দাসে দেয় স্বর্ণ সিংহাসন,
শিশুর চাঁদের পাশে বেঁধে দেয় ঘর।
সেযে অতি তুচ্ছ হীন ভিখারী সন্তানে
তোমারে আনিয়া দিবে, বিচিত্র কি তায়!
যেমন তোমার পণ, ভিখারী আসিয়া
যদি রাখে তায়, সে কি দেখাবেনা ভাল।
মিথ্যা স্বপনের কথা। তার তরে রাণি
হয়োনা উন্মনা।

শিরী।　　মিথ্যা যদি, তবে কেন
স্বপ্ন মোর রূপের রহস্য দিল ভেঙে ?

আমিনা।　ভুল ভুল—জাগরণে জীবনে যদ্যপি
সখি ভুল, স্বপনোকি ভুলিতে জানেনা ?
আজীবন স্বপ্ন মিথ্যা কয়, একদিন
ভুলে সত্য কয়েছে তোমারে।　কিম্বা রাণি,
জাগরণে ছিলে যে স্বপনে, স্বপ্ন তারে
কেড়ে নেছে।　তাই সে নিদ্রার কোলে শুয়ে
পলমাত্র জাগ্রত জীবনে, ওরূপের
কোথা কোথা কি গৌরব আছে, দৃষ্টি পথে
পড়িয়াছে।　যাইহোক—সত্যহোক মিথ্যা
হোক,—স্বপ্নকথা ছেড়ে দাও। ভেট লয়ে
পারস্য হইতে সেই দূত এসেছিল
জান কে সেজন ?

শিরী। কহ, কেবা এসেছিল,
মনে নাই।

আমিনা। তা থাকিবে কেন! স্বপ্নকথা
আদ্যোপান্ত অক্ষরে অক্ষরে আছে মনে।
আর যেই সত্য, বহ্নি, দুইদিন পরে
সমস্ত তাতারে পুড়ায়ে করিতে পারে
ক্ষার, তার কথা মনে রাখা মহাপাপ।
ছিছি তাও কি করিতে আছে!

শিরী। তিরস্কার
কেন সই, বলনা সে কোনজন।

আমিনা। মনে
নাই, সেই যে দাম্ভিক দূত, পারস্যের
সম্রাটের নামে, সঙ্গে সঙ্গে যেতে তোমা
আদেশ করিল?

শিরী। পড়েছে পড়েছে মনে
কে সে সখি?—নিজে কি সম্রাট ছদ্মবেশে?

আমিনা। বর্ত্তমান নয়, তবে ভবিষ্যতে তার
সিংহাসন। সম্রাটের আত্মীয়নন্দন
পারস্যের বর্ত্তমান সেনাপতি।

শিরী। বটে!
আমারে না দেখে সই এত খেদ যার,
দেখিতে পাইলে সে যে তাহারে পারস্যে
যেতে আদেশ করিত।

আমিনা। সম্রাটের বড়
প্রিয় সে যুবক, তাহার কথায় উঠে,
বসে। কি যে সে অনিষ্ট করে, তাই ভাবি
স্বামী মোর কয়দিন বড় ম্রিয়মাণ।

শিরী। বটে বটে! তাত কই বলনি আমায়!
শীঘ্র যাও সখারে ধরিয়া আন। আমি
চিন্তা-কুহেলিকাঘেরা শশাঙ্ক-বদন
তার বহুদিন দেখি নাই। রাজ্য রাজ্য
ক'রে সখা পাগল আমার। শিরী শিরী
ক'রে সখা ভুলে গেছে আমিনায়। যাও
শীঘ্র যাও, ধরে আন তারে।

[প্রস্থান।

(ক্রমশঃ)

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

জাপানের রাজনীতি।*

সমগ্র সভ্যজগতে জাপানের অভ্যুদয় বিষয়টী লইয়া আজকাল তুমুল আন্দোলন চলিতেছে। বাস্তবিক হইবারও কথা। অর্দ্ধশতাব্দীপূর্ব্বে যে জাপান একরূপ অপরিজ্ঞাত ছিল, বাজিকরের বাজির ন্যায় হঠাৎ ইহার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে বিষয়টীর গূঢ়তত্ত্ব নির্ণয়ে সকলেরই আগ্রহাতিশয় দেখা যাইতেছে। আধুনিক ভারতের যে অবস্থা তাহাতে এতাদৃশ বিষয়ের সমূহ আন্দোলন বিশেষ আবশ্যকীয় সন্দেহ নাই। জাপানের অভ্যুদয়ের মূলে রাজনীতি, সমাজ, শিল্প ও বাণিজ্য এবং শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার। সুতরাং এই চারিটী বিষয়ের আলোচনাতেই কি করিয়া একটী জাতি সামান্য অবস্থা হইতে উন্নতির চরম-শিখরে আরোহণ করিতে পারে তাহা সম্যক হৃদয়ঙ্গম হইবার কথা। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে যখন ওলন্দাজ-জাতি এই জাপানে প্রথম ব্যবসা-বাণিজ্য উপলক্ষে আগমন করে তখন উহাদের যাহা কিছু দেখিত সকলই জাপানীদের নিকট নূতন বলিয়া বিবেচিত হইত। জাপানীরা বলিত এসব খৃষ্ট। ওলন্দাজদের জিনিষপত্র, কার্য্যপ্রণালী, রীতিনীতি প্রভৃতি সমস্তই ইহাদের নিকট আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হইত; তাই ভোজের-খেলা এই অর্থে খৃষ্টনামে অভিহিত করিত। জাহাজ, কল-কারখানা, পোষাক-পরিচ্ছদ, চালচলন সমস্তই খৃষ্ট। অদ্যাপিও গণ্ড-গ্রামে অনেক প্রাচীন লোক ফণোগ্রাফ্, গ্রামোফণ, বাইওস্কোপ প্রভৃতিকে খৃষ্ট বলিয়া থাকেন। দেখিতে দেখিতে সেই জাপান বাষ্পীয়-শকটের ন্যায় উন্নতিমার্গে দ্রুতগতিতে প্রধাবিত হইয়া সমস্ত জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছে।

---

* চৈতন্য লাইব্রেরির বার্ষিক অধিবেশনে "বিশ্বম্ভর সেন পদক" প্রাপ্ত।

জাপানীদের ভিতর মানবোচিত গুণাবলীর সমাবেশ দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় ইহাদের উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। জাপানের বিখ্যাত পরিব্রাজক এবং সুলেখক মিঃ ওকাকুরা তাঁহার "জাপানের জাগ্রতাবস্থা" নামক (Awakening of Japan) গ্রন্থে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন— জাপানের উন্নতির মূলে জাপানে ভারত এবং চীনের ধর্ম্ম, রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতির প্রসারণ, ইউরোপ এবং আমেরিকার ধর্ম্ম, রীতিনীতি প্রভৃতি নহে। তবে কিনা পাশ্চাত্য রীতিনীতি এবং শিক্ষার যেটুকু উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে সেই টুকু প্রাচ্য রীতি-নীতি এবং শিক্ষার আনুসঙ্গিকরূপে গৃহীত হইয়াছে। তাহাতেই এতটা দ্রুতগতিতে এরূপ একটা জাতীয়শক্তির গঠন হইয়াছে। এবিষয়ে ভারত জাপানের ঠিক্ বিপরীত। ভালটুকুর দিকে না তাকা-ইয়া শুধু সাহেবী চালচলন, আহারবিহার, কায়দাকানুন প্রভৃতি, যাহাতে দীনদরিদ্র ভারতের সমূহ অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্টের সম্ভাবনা নাই, ভারতবাসী দিন দিন এমন অসার বিষয়গুলিই ক্রমশঃ বৈদেশিক জাতি হইতে গ্রহণ করিতেছে। আমাদের দেশের সভ্যতা জাপানীরা লইয়াছেন বলিয়া তাঁহারা তাঁহাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করেন, আর আমরা সম্পূর্ণ বৈদেশিক কণ্টকাবর্জ্জনায় স্বকীয় সভ্যতা-লতিকাকে আবৃত করিয়া ফেলিতেছি ; জাতীয়জীবনে এরচেয়ে শোচনীয় বিষয় আর কি হইতে পারে ! জাপানের উন্নতিমূলে উপরোক্ত চারিটি বিষয়ের পরিপোষণ, তাই তৎসম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত বিবরণ ক্রমান্বয়ে লিপিবদ্ধ করিব।

পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নাই যেখানে জাপানের ন্যায় একটী রাজবংশ একাদিক্রমে এত দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছেন। জাপান-ইতি-হাসের প্রথম হইতেই বর্ত্তমান রাজবংশ রাজত্ব করিয়া আসিতেছেন। খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দী হইতে অর্থাৎ আড়াই হাজার বৎসরাধিককাল-যাবৎ একই রাজবংশ একরূপ নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যশাসন করিয়া আসিতে-

ছেন। বর্ত্তমান মিকাদো মুৎসু হিতোতেন্নো ১২১শ সম্রাট। জাপানের সম্রাটগণ মিকাদো এবং তেন্নো হেইকা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। উভয়ের অর্থ ই দেবতার প্রতিনিধি। কোন দেশের ইতিহাস, এই কথা বলিলেই মনে হয় উক্ত দেশের ভিন্ন ভিন্ন রাজার ভিন্ন ভিন্ন শাসন-প্রণালী, এক রাজবংশের পতন অপরের অভ্যুত্থান, সাময়িক রাষ্ট্রবিপ্লব, যুদ্ধবিগ্রহ, যুদ্ধে অসংখ্য লোকের হত্যাকাণ্ড প্রভৃতি। কিন্তু জাপানের ইতিহাস আলোচনা করিলে তেমন কিছুই পরিলক্ষিত হয় না। ইহার কারণ জাপানীদের ভিতর অন্যান্য জাতির চেয়ে স্বদেশ-বৎসলতা এবং রাজভক্তি নিরতিশয় প্রবল। বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের পূর্ব্বে এদেশে একমাত্র সিন্তোধর্ম্ম ছিল। সিন্তোধর্ম্মাবলম্বীদের প্রকৃতি এবং রাজাই কেবল মাত্র উপাস্য। উহাদের অন্য কোন দেবদেবী নাই। তাই জাপানীরা রাজাকে দেবজ্ঞানে পূজা করিয়া থাকে। ইহাদের দৃঢ় বিশ্বাস রাজা দেববংশধর; রাজা ও রাণী এ রাজ্যশাসনের নিমিত্ত স্বর্গরাজ্য হইতে প্রেরিত হন। বর্ত্তমান শব্দতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা যদিও নানা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া এসিয়াটিক অন্যান্য আর্য্যজাতির আচার-ব্যবহার এবং ভাষার সহিত জাপানীদের আচার-ব্যবহার এবং ভাষার অনেকটা সাদৃশ্য দেখাইতেছেন, এবং প্রমাণ করিতেছেন যে আর্য্যজাতি পশ্চিম [illegible] হইতে ক্রমশঃ পূর্ব্বাভিমুখে বসতি বিস্তার করিতে করিতে জ[illegible]ন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া অসভ্য আদিমবাসীদিগকে পরাস্ত করিয়া রাজত্ব করিতেছেন, তথাপি রাজার প্রতি জাপদের যে বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছে উহা সহজে বিদুরিত হইবার নহে। কাজেই এরাজ্যে অশান্তির ভাব নাই। রাজবংশের ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। রাজার-প্রতি প্রজাদের এতাদৃশ ভক্তিপূর্ণ বিশ্বাস স্থায়ী হইবার আরও বিস্তর কারণ রহিয়াছে। রাজা অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিতেছেন। জনসাধারণ তাহাদের প্রতিনিধিদ্বারা যখন যে অভাব তাঁহার গোচর

করিয়া থাকে, তিনি যথাসাধ্য চেষ্টায় উহা মোচন করিতে যত্নশীল। প্রজাপুঞ্জ স্বকীয় উদার গবর্ণমেণ্টের অধীনে পরমসুখে জীবন যাপন করিতেছে। গবর্ণমেণ্টের সুনিয়ম সুশাসন দেখিলে বাস্তবিক আমাদের ঈর্ষারভাব মনে হয়। মনে মনে ভাবি ভারত-গবর্ণমেণ্টের এরূপ সুবন্দোবস্ত থাকিলে ভারত সভ্যজগতের অন্যকোন দেশ হইতে হীন হইত না। শিল্প, বাণিজ্য এবং বিজ্ঞান প্রভৃতির জন্য বৈদেশিকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইত না। যেহেতু ভারতে আর কিছুরই অভাব নাই; অভাব আছে কেবল যাহা আছে তাহার প্রয়োগে শক্তির। পৃথিবীতে যাহা আছে প্রকৃতিদেবী ভারতকে সে সমস্তই দিয়াছেন। গণিত, সাহিত্য, দর্শনাদিরও অভাব নাই; অভাব আছে কেবল ঐ সকলের প্রয়োগে উন্নতিপথে প্রধাবিত হইবার সহানুভূতিতে। তাই বলিতেছিলাম এখানকার গবর্ণমেণ্টের সহিত ভারত-গবর্ণমেণ্টের তুলনা করিলে ভারত যে কখন সুসভ্য আর্য্যজাতির বাসভূমি ছিল তাহাও যেন ভুলিয়া যাইতে হয়। এখানকার গবর্ণমেণ্ট ভাল, একথায় বুঝিতে হইবে না যে রাজার ক্ষমতা অত্যন্ত কম এবং প্রজাদের অপরিসীম ক্ষমতা। এখানে রাজার যেরূপ অপরিসীম ক্ষমতা পৃথিবীতে অন্য কোন দেশে কোন জাতির রাজার তেমন ক্ষমতা আছে কি না সন্দেহ। অথচ লোকের ভক্তিশ্রদ্ধা রাজারপ্রতি অচল অটল অবস্থায়ই রহিয়াছে। ৩৮ বৎসর পূর্ব্বে বর্ত্তমান সম্রাট যখন কিওটো রাজধানী হইতে নূতন রাজধানী টোকিও সহরে আগমন করেন তখন তাঁহার প্রতি সাধারণের অচলা ভক্তি দেখিয়া ইউরোপের জনৈক বিখ্যাত পরিব্রাজক বলিয়াছিলেন—"Is there another monarch on this globe as universally honoured and beloved by his people as the Emperor of Japan?"

জাপানীরা সম্রাটের আদেশ প্রতিপালনে সর্ব্বদাই তৎপর। সম্রাট ও

প্রজার প্রতি কোনরূপ অন্যায় অবিচার না হয় সেজন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত। প্রজারঞ্জন রাজার কর্ত্তব্য তাহা জাপানেই প্রতিকার্য্যে প্রতীয়মান হইতেছে। এখানে রাজা দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ধর্ম্ম এবং আইনের সমর্থন করিয়া জনসাধারণের প্রীতিভাজন হইয়া থাকেন। জাপানের বর্ত্তমান রাজা এবং রাণী উভয়েই সুকবি। রাজাপ্রজায় কিরূপ সম্বন্ধ তাহা বুঝাইবার জন্য সম্রাটলিখিত একখানা গ্রন্থের কয়েকটী কবিতা ইংরাজী অনুবাদসহ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম। এবং তৎপর পুরাকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত জাপানের রাজনৈতিক ইতিহাস এবং জাপানের ক্রমিক পরিবর্ত্তন সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিলাম। রাজা প্রজাদিগকে কেমন ভালবাসেন তাহা এই দুই একটী কবিতার অর্থেই অনুমেয়। এমন রাজার সুশাসিত রাজ্যের কেন না উন্নতি হইবে?

(১)

কোরে ওয়া মিনা ইকুছা নো নিওয়া নি ইদেগাতেতে ওকিনা ইয়া হিতোরি ইয়ামাদা মোরুরাণ	I suppose all sons to the front are gone, To do their duty all under arms, And their old Sire at home alone, Guards and watches their lonely farms.

(২)

ইউমে ছামেতে মাজু কোছো ওমোয়ে; ইকুছা বিতো মুকাইশি কাতা নো তাইওরি ইকানি তো	Each time from sleep I awake, One thought comes up at once to me, How matters go there, where is gone So many a warrior for my sake.

(৩)

চিবাইয়া কুয়া কামি নো কোকোরো নি কানো ওরাণ ওয়াগা কুনি-তামি নো মুকুছু মাকোতে ওয়া	The power above, so stern and just, Gladly approves, as I dare think, The sweet sincereness of my people, So earnest their devoir.

(৪)

কুনি ও ওমোও
মিচি নি কুতাৎছু ওয়া
নিকারি কিরি
ইকুছা নো নিওয়া নি
তাৎছু মো তাতামো মো

Some may stand on the battle-field,
And some—God not—may stay at home,
But all the souls that love their land,
Are all the same where'er they be.

(৫)

মাছুরাও নি
হাতা ও ছাজুকেতে
ওমোও কাণা
হিনোমোতো নো নাও
কাগাইয়া কাছু বেকু

When from my trusting hand the flag
Is given unto my faithful men,
My heart mounts high, the rising sun
Will surely bring it fame and light.

(৬)

ইনিশিয়ে নো
ফুমি মিরু তাবি নি
ওমোও কাণা
ওনো গা ওছামুরু
কুণ ওয়া ইকানি তো

Whenever I open
The ancient books,
The one thing I ponder is,
How goes it with the people I rule?

খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ত্তমান রাজবংশের রাজত্ব আরম্ভ হয়। ইহার পূর্ব্বের আর কোন ইতিহাস জানা যায় না। প্রায় বারশত বৎসর রাজ্যশাসন-প্রণালী ঠিক এক ভাবেই চলিতে থাকে। ইহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য তেমন কোন ঘটনাই সংঘটিত হয় নাই। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে চীনদেশীয় প্রচারকগণ জাপানে প্রথম বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় সাম্রাজ্ঞী সুইকো রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনিই এদেশের প্রথম স্ত্রী-শাসনকর্ত্রী। বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। তাঁহার চেষ্টায় অনেকে বৌদ্ধধর্ম্ম সমাদরে গ্রহণ করিতে থাকেন। ৭ম শতাব্দীতেই বৌদ্ধধর্ম্ম জাপানে বদ্ধমূল হয়। এই শতাব্দীতে মোট ৭জন সম্রাট এবং ৫জন সাম্রাজ্ঞী রাজত্ব করেন। আমাদের দেশের ন্যায় এখানেও পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকদের ভিতর

ধর্ম্মভাব প্রবল। উল্লিখিত পাঁচজন সাম্রাজ্ঞীই জাপানে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। তাঁহাদের চেষ্টাতেই জনসাধারণ এবং শিক্ষিত ভদ্রসমাজ উক্তধর্ম্মে দীক্ষিত হইতে আরম্ভ করেন। আমাদের দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম-ইতিহাসে আশোক যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন সাম্রাজ্ঞী কোমিও এবং কোকেন জাপানে ঠিক তেমনি প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। রাজ্ঞী কোমিওই সর্ব্বপ্রথম এদেশে পঞ্চাশ হস্ত পরিমিত উচ্চ নারার সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধমূর্ত্তি স্থাপন করেন। তিনি রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ধর্ম্মমন্দির স্থাপন করিয়া প্রত্যেক মন্দিরে ১৬ ফিট উচ্চ শাক্যমুনির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এবং রাজ্যের স্থানে স্থানে অনাথ-আশ্রম, পান্থশালা এবং চিকিৎসালয় স্থাপন করিয়া সর্ব্বজন-হিতকর কার্য্যে অজস্র অর্থব্যয় করেন। ঐ সকল কার্য্যের জন্য তিনি হিন্দুরাজা শিলাদিত্যের ন্যায় অনেকবার রাজকোষ নিঃশেষিত করেন। ফুজি-ওয়ারার সময় পুনরায় অপর কতিপয় সম্রাট এবং সাম্রাজ্ঞীর প্রযত্নে বৌদ্ধধর্ম্মের অসাধারণ বিস্তার হয়। ৯ম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১১শ শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজ্যের সর্ব্বত্র ফুজিয়ারা-বংশের বিশেষ প্রতিপত্তি হইয়া উঠায় ঐ সময়কে ফুজিয়ারা-সময় বলে। এই সময় মুরাসাকি-সিকিবু নাম্নী জনৈক ভদ্রমহিলা গেঞ্জিমোনো-গাতারি নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ-ধর্ম্মগ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

এদিকে সভ্যতাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লোক চতুর হইতে লাগিল। সুশৃঙ্খলভাবে একাকী রাজ্যশাসন সম্রাটের পক্ষে কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। তিনি দেশের প্রধান কতিপয় ব্যক্তিকে রাজ্যের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে জায়গীর প্রদান করতঃ সুশাসনের বিধিব্যবস্থা নির্দ্দেশ করেন। ১২শ শতাব্দীতে জাপানে প্রথম জায়গীর-প্রথার (feudal system) প্রবর্ত্তন হয়। জায়গীরদারগণকে জাপানী ভাষায় দাইমিও বলিয়া থাকে। দাইমিওগণ স্বীয় স্বীয় রাজ্য সংরক্ষণের খরচপত্র বাদে নিজেদের জীবি-

কার জন্য বার্ষিক ১০০০০ কোকু অর্থাৎ ৬০০০০/ মণ ধান্য পাইতেন। রাজ্যে শান্তিরক্ষণের নিমিত্ত এই সময় বহু রক্ষকের আবশ্যক হয়। সামুরাই নামক একশ্রেণীর লোক ঐ কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা আমাদের দেশের ক্ষত্রিয় জাতির ন্যায়। অধুনা সেই ক্ষত্রিয়-জাতিই ক্ষাত্রবীর্য্যে সমগ্র পৃথিবীকে স্তম্ভিত করিয়াছেন।

১৩শ শতাব্দীর প্রথমভাগেই ভারত হইতে জাপান পর্য্যন্ত এসিয়ার পূর্ব্বভাগের সমস্ত দেশে বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে সভ্যতাও ছাইয়া পড়ে। ১৩শ শতাব্দীতেই জেঙ্গিস খাঁ অন্যান্য দেশ লণ্ডভণ্ড করিয়া শেষে জাপান আক্রমণ করে। তারপর মুসলমানেরাও আক্রমণ করিতে চেষ্টা করে। জাপানীরা বলে—সমুদ্র আমাদের দেশ বেষ্টন করিয়া আছে, এ ছাড়া সভ্যতা তখন আমাদের দেশে বিরাজ করিতেছিল বলিয়াই বৈদেশিক শত্রু আমাদের কোন হানি করিতে সক্ষম হয় নাই। এক-খানা অধুনিক ইতিহাসে কোন জাপানী গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন—মঙ্গোলি-য়ান জাতি এবং মুসলমানেরা মরুভূমি প্রদেশ হইতে যাইয়া ভারতের ধর্ম্ম এবং প্রাচীন সভ্যতার সমূহ ব্যাঘাত ঘটাইয়া ক্রমে ক্রমে আধিপত্য স্থাপন করতঃ ভারতকেও একরূপ মরুভূমিতে পরিণত করিয়াছে। যদিও অধিকাংশ দেশই ক্রমশঃ সভ্যতারদিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইতেছে, তথাপি ভারত বর্ত্তমান যুগে উল্লেখযোগ্য কিছুই জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারিতেছে না। অথচ ভারতের প্রাচীন সভ্যতাই অনেক দেশকে উন্নত করিতেছে।

মিঃ ইতাজো-নিতোবে এ, এম্, পি, এইচ, ডি তাঁহার বুশিদো নামক গ্রন্থে জায়গীর-প্রথা, বৈদেশিক আক্রমণ এবং সামুরাই-জাতির অভ্যুত্থান সম্বন্ধে উল্লিখিত মতই প্রকাশ করিয়াছেন। এবং মিঃ কার্‌ল্‌-মার্ক্‌শ্‌ তাঁহার ক্যাপিটালে উক্তমতের অনুমোদন করিয়াছেন।

১২শ শতাব্দীর শেষভাগে সম্রাট সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিকে

সোগুণ (রাজ্য-রক্ষক) উপাধি দিয়া রাজপ্রতিনিধি নির্ব্বাচন করতঃ তাঁহার হস্তেই রাজ্যরক্ষার ভার অর্পণ করেন। রাজ্যের সুশৃঙ্খলার জন্য সোগুণ রাজধানী কিওটো সহর হইতে বহুদূরে কামাকুরা নামক স্থানে স্বীয় বাসভবন নির্ম্মাণ করেন। ১১৮৬ খৃঃ—১৩৩৩ খৃঃ প্রথম সোগুণবংশ রাজ্যশাসন করেন। ১৩৩৬ খৃঃ—১৫৭৩ খৃঃ আসিকাগা নামক দ্বিতীয় সোগুণবংশ কিওটোতে থাকিয়াই রাজ্যশাসন করেন। কার্য্যতঃ সোগুণই যেন রাজ্যের রাজা। সম্রাট কেবল্ নামে। লোকে সম্রাটকে ধর্ম্মবিষয়ক রাজা বলিয়া মনে করিত। আসিকাগা সোগুণবংশের কোন্ দাইমিও-বংশের কে সোগুণ হইবেন এই বিষয় লইয়া ভয়ানক গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। কয়েক বৎসর ঘোর বিবাদবিসম্বাদের পর হিদে-ইয়োশী নামক জনৈক তীক্ষ্ণ রাজনীতিজ্ঞ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি (জাপানী ইতিহাসে ইনি নেপোলিয়ানের ন্যায় ক্ষমতাবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত আছেন) স্বকীয় ক্ষমতাবলে আপন প্রভুত্বসংস্থাপনে কৃতকার্য্য হয়েন। তিনি সোগুণ হইয়া দুইবার কোরিয়া আক্রমণ করিয়া উহার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হস্তগত করেন। তিনিই বলিয়াছিলেন—আমি সমগ্র চীনদেশ জাপান-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিতে ইচ্ছা রাখি। কিন্তু হঠাৎ ১৫৯৮ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার উদ্দেশ্য সফল হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অনুপযুক্ত পুত্র পিতৃগৌরব বজায় রাখিতে সক্ষম হন নাই। ১৬০০ খৃঃ ইয়েইয়াছু নামক তাৎকালিক প্রভূত বুদ্ধিমান্ এবং ক্ষমতা-শালী ব্যক্তি সোগুণত্ব লাভ করেন, তিনি তোকুগাওয়া সোগুণবংশের আদিপুরুষ। ১৬০০ খৃঃ—১৮৬৮ খৃঃ এই তোকুগাওয়াবংশের সোগুণ-গণ সমগ্র জাপানের অধীশ্বর ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বর্ত্তমান সময়ে জাপানে রাজনীতি, সমাজনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সম্বন্ধীয় যত কিছু উন্নতি, সমস্তের মূলেই এই বংশের সোগুণদের রাজ্য-শাসন-প্রণালী এবং ভিন্ন ভিন্ন দেশীয় সভ্যতা এবং সুশিক্ষার প্রচলন।

যদিও এই সময় রাজ্যের প্রত্যেক গুরুতর বিষয় মীমাংসার নিমিত্ত প্রধান পাঁচজন দাইমিও লইয়া একটী কমিটি গঠিত হইত তথাপি সোগুনই একরূপ সর্ব্বেসর্ব্বা। কমিটি সোগুণের আদেশের কিছু মাত্র ব্যতিক্রম করিতে পারিত না। তোকুগাওয়া সোগুণ তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা পরিচালনে কিঞ্চিন্মাত্রও বিঘ্ন না ঘটে এজন্য তিনি রাজধানী কিওটো সহর হইতে তিন শত মাইল দূরে ইয়োদো (বর্ত্তমান টোকিও) নামক স্থানে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিয়া একাধীশ্বররূপে বিরাজ করিতে লাগিলেন। সাধারণ লোক যেন যাদুমন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার আদেশানুযায়ীই চলিতে লাগিল। এদিকে দাইমিও প্রভৃতিও তাঁহাকেই রাজাজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিলেন। উপঢৌকনাদিও পাঠাইতে লাগিলেন। এইরূপে সোগুণ যেন একটী স্বতন্ত্র জাতীয়-শক্তির সৃষ্টি করিলেন। কিওটো সহরে মিকাদো মেঘাচ্ছন্ন সূর্য্যের ন্যায় রহিলেন।

এই সময়ের কথায় ইউরোপীয়ান এবং আমেরিকান লেখকেরা বলিয়াছেন—জাপানে দুইটী রাজা রাজত্ব করেন, একটীর রাজধানী ইয়েদো (টোকিও) এবং অপরটীর রাজধানী কিওটো। ইয়েদোর রাজা রাজ্য-শাসন করেন। আর কিওটোর রাজা ধর্ম্মবিষয়ক শাসনকর্ত্তা। আমাদের ভারতে যেরূপ যথেষ্ট ক্ষমতাশালী রাজা, মহারাজা থাকাসত্ত্বেও মুনিঋষি প্রভৃতি ধার্ম্মিক মহাত্মাদের সম্মানের লাঘব হইত-না, তেমনি রাজ্য-শাসনের ভার তাঁহার হস্তস্খলিত হইলেও সোগুণের চেয়ে মিকাদোর প্রতি প্রজাদের আন্তরিক ভক্তি কম ছিল না। তোকুগাওয়া বংশের রাজত্বকাল বর্ণনে জনৈক প্রসিদ্ধ জাপানী ইতিহাসলেখক বলিয়াছেন :—"The Mikado may cease to govern but he always reigns. He exists not by divine right but by divine Law—a fact of man and nature. He is always there, like our beloved mount of Fuji." (অগ্ন্যুৎপাতের ভয়ে

জাপানীরা আজপর্য্যন্তও দেবজ্ঞানে ফুজি-আগ্নেয়গিরিকে প্রতিবৎসর নির্দ্দিষ্ট দিনে পূজা করিয়া থাকে)।

যদিও এই সময়ে কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির তেমন শক্তি ছিল না, তথাপি সোগুণ পাঁচজন শক্তিশালী দাইমিওর পরিবর্ত্তে নিজের অধীনস্থ পাঁচজন দুর্ব্বল দাইমিওদ্বারা কমিটি গঠন করেন। উহাঁরাই ঐ সময়ে সোগুণের মন্ত্রীস্বরূপ ছিলেন। এই সময় তোজামাবংশের দাইমিওগণ বিশেষ প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠেন। সোগুণ সামান্য অপরাধে গুরু-দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া তোজামাবংশকে নিস্তেজ করিয়া রাখেন। সামুরাই ক্ষত্রিয়গণ সোগুণের অধীনে কায করিতে লাগিল। সোগুণ নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সামুরাই-সৈন্যকে প্রত্যেক দাইমিওর অধীনে কায করিতে অনুমতি প্রদান করিলেন। জায়গীরদারদিগকে দমাইয়া রাখিতে যথাসম্ভব প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। এবং জনসাধারণকে বশে রাখিবার জন্য তাহাদিগকে নানারূপ লাভজনক সত্ত্ব প্রদান করিতে লাগিলেন। ক্রমে সমস্ত উপদ্রব থামিয়া গেল। সোগুণ নির্ব্বিঘ্নে রাজত্ব করিতে লাগিলেন। দেশের লোক এই সময় কিঞ্চিৎ শান্তি লাভ করিল। অবকাশ পাইয়া তাহারা শিল্প এবং লেখাপড়া শিক্ষার নিমিত্ত যত্নবান হইল। সাধারণ লোক জাগিয়া না উঠে, দেশের কোন জায়গায় স্বকীয় শাসন-নীতির বিরুদ্ধে কিছুই আলোচিত না হয় এজন্য সোগুণ স্থানে স্থানে বহু গুপ্তচর এবং সামুরাই-সৈন্য নিযুক্ত করেন। জাপানী পরিব্রাজক মিঃ ওকাকুরা এই সময়ের জাপানের অবস্থার সহিত বর্ত্তমান ভারত এবং চীন সাম্রাজ্যের তুলনা করিয়াছেন। দুইদেশই অসংখ্য অধিবাসী থাকা সত্ত্বেও জীবন্মৃতের ন্যায় রহিয়াছে। মাথাতুলিতেও প্রতিবন্ধক।

সোগুণ একদিকে যেমন কড়াভাবে রাজ্য-শাসন করিতেন অপর দিকে আবার দেশ এবং দেশের অধিবাসীদের উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই

বিব্রত ছিলেন। সোগুণ স্থানীয় ধর্ম্মযাজকের তত্ত্বাবধানে প্রত্যেক ছেলেকে লেখাপড়া শিখিতে ব ধ্য করেন। এই সময় হইতে সামান্য কৃষকের ছেলেরাও লিখিতে পড়িতে আরম্ভ করে। লেখাপড়ার সঙ্গে সঙ্গেই ক্রমে লোকের মন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। শিক্ষিত সমাজ বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহাদের প্রকৃত রাজা সোগুণের হস্ত-পুত্তলিকাবৎ হইয়া রহিয়াছেন; আর তাঁহারা সকলে যেন অরাজকতার কুফল ভোগ করিতেছেন, এতাবৎ কাল পর্য্যন্তও জাপানের প্রাচ্য রাজনীতি বৈদেশিক রাজনীতির সংস্পর্শে যায় নাই।

ক্রমেই শাসন-প্রণালীর সংস্কারের জন্য সর্ব্বসাধারণের মন উতলা হইয়া উঠিতে লাগল, লোকের মনের এহেন পরিবর্ত্তন সোগুনের রাজনীতির ফলেই সংঘটিত হইতেছিল। কালে এই পরিবর্ত্তনই জাপানের অভ্যুদয়ের সেতুরূপে দেশীয় এবং বিদেশীয় রাজনীতিজ্ঞ-কর্ত্তৃক বর্ণিত হয়। দেশের ভিতর এই সকল ঘটিতেছিল সত্য, কিন্তু অনেক বাহিরের ঘটনাও ইহাদের রাজনীতি-শাস্ত্র আলোচনার সহায়তা করিতেছিল। দেশের অন্যান্য বিষয় আলোচনা করার পূর্ব্বে এস্থানে বাহিরের কোন কোন বিষয়ের সমূহ আলোচনা নিতান্ত আবশ্যক। এই সময় ইউরোপীয়-জাতি এসিয়াটিকদের সংস্পর্শে আসিতে থাকে। বৈদেশিক-জাতি এই সময়ে জাপানের সংস্পর্শে না আসিলেও জাপানী-দের মন বাহিরেও আকৃষ্ট হয়। এসিয়ার অন্যান্য দেশের অধিবাসী-দের প্রতি ইউরোপীয়ান-জাতির ব্যবহার দেখিয়া জনৈক প্রসিদ্ধ জাপানী লেখক এক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"ইউরোপীয়-জাতি মানসম্ভ্রমে একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া শুধু ধনৈশ্বর্য্যকেই যথাসর্ব্বস্ব মনে করিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারে। এমন কি স্থলবিশেষে আমরা উহাদিগকে রক্ষক বলিয়া মনে করিলেও দেখিতে দেখিতে উহারা ভক্ষক হইয়া দাঁড়ায়। আর আমরা এসিয়াটিক-জাতি যতক্ষণ না

অপরের উৎপীড়ন অসহ্য হইয়া উঠে, ততক্ষণ নীরবে সহ্য করিয়া থাকি, যখন দেখি আমাদের স্বার্থ সমূলে বিনষ্ট হইবার উপক্রম, তখন নিতান্ত অসহ্য বলিয়া তৎপ্রতীকারের প্রয়াস পাইয়া থাকি।"

১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্তুগিজ্ এবং স্পেনিস্ প্রভৃতি জাতি বাণিজ্য উপলক্ষ করিয়া এসিয়ায় আসিয়া পদার্পণ করে। বাণিজ্য উঁহাদের উপলক্ষ, উদ্দেশ্য রাজ্যবিস্তার। জনৈক জাপানী ইতিহাস-লেখক লিখিয়াছেন—"যেদিন ইংরাজেরা বাণিজ্য উপলক্ষ করিয়া অন্যায়ভাবে রত্নগর্ভা সুবিশাল ভারতসম্রাজ্য আত্মসাৎ করিল সেইদিন হইতেই জাপানীরা ইউরোপীয়ান লোক-চরিত্র অবগত হইয়াছে। ক্রমেই যখন বিদেশীরা প্রাচ্যদেশবাসীকে (orientalকে) degenerate অর্থাৎ ভ্রষ্ট, ধর্ম্মত্যাগীর প্রতিশব্দরূপে প্রয়োগ করিতে লাগিল তখন হইতেই জাপানীরা উহাদের প্রতি ঘৃণার ভাব পোষণ করিয়া আসিতেছে।" এই সময়ের কথায় জাপানী অপর লেখকের গ্রন্থে লিখিত আছে—"To the down-trodden Oriental the glory of Europe is but the humiliation of Asia."

খৃষ্টান-জাতি ক্রমেই পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে। ১৮৪২খৃঃ উহারা (ইংরাজেরা) জোরজুলুম করিয়া চীনে আফিংএর ব্যবসা আরম্ভ করে এবং হঙ্কং দখল করিয়া লয়। ১৮৬০ খৃঃ সামান্য ওজর দেখাইয়াই ফরাসী এবং ইংরাজেরা পিকিণ আক্রমণ করে এবং সম্রাটের গ্রীষ্ম-প্রাসাদ লুণ্ঠন করিয়া উহার মণি, মুক্তা, রত্নরাজিতে ইউরোপের কোন কোন মিউজিয়াম সুসজ্জিত করে। এইসব দেখিয়া জাপানীরা ইউরোপীয়দিগকে এসিয়ার ঘোর শত্রু বলিয়া মনে করে। উহারা ক্রমে জাপান পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে পারে বলিয়া সন্দেহ করিতে থাকে, এবং শত্রুর সম্মুখীন হইতে যোগাড়-যন্ত্রেরও সূত্রপাত হয়।

এদিকে রুষ-জাতি জাপানরাজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে আরম্ভ করে। উহারা সাইবেরিয়া এবং কামস্কাটকা হইতে ক্রমে সাগালিয়েন দ্বীপ অধিকার করে (১৭০৬খৃঃ)। এবং যেশোদ্বীপ লুণ্ঠন করিতে থাকে। যেশোদ্বীপ সম্প্রতি হোকাইদো নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই সময় জাপানীশক্তি এত প্রবল ছিলনা যাহাতে রুষের ন্যায় প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইতে পারে। তবুও শত্রুর অত্যাচার নিবারণ জন্য ১৮০৬খৃষ্টাব্দে সোগুণ একজন মিলিটারী-গবর্ণরকে হোকাইদোর রক্ষক নিযুক্ত করেন। ১৮৩০খৃঃ মিতোর-নারি-আকি নামক এক অসীম ক্ষমতাশালী প্রিন্স তাঁহার রাজ্যের সমস্ত ধর্ম্মমন্দিরের পিত্তল ঘণ্টা গালাইয়া কামান তৈয়ার করিয়া সামুরাই জাতিকে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেন। তিনি রুষ-অত্যাচার নিবারণের জন্য সৈন্যসামন্তসহ হোকাইদো দ্বীপে বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতায় সোগুণ ভীত হন। অবশেষে সোগুণ উক্ত প্রিন্সকে রক্ষকতার কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন।

হঠাৎ এমন একটী ঘটনা ঘটে যাহাতে জাপানীদিগকে বিশেষ ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। ১৮৫৩খৃঃ কমোডর-পেরি কিঞ্চিৎ সৈন্য লইয়া আমেরিকা হইতে বরাবর টোকিও উপসাগরে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি জাপানের সহিত আমেরিকার ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবন্দোবস্ত করিয়া যাইতে অভিমত প্রকাশ করেন, এই সময় রাজ্যের মধ্যে তুমুল্ আন্দোলন উপস্থিত হয়। দেশের যাবতীয় লোক দুই দলে বিভক্ত হয়। পান খেয়ে মুখ পুড়িলে দধি দেখিয়াও চুণভ্রমে ভয় হয়। তাই একদল বলে বিদেশীজাতি বাণিজ্যের ভাণ করিয়া এসিয়ার বিভিন্ন দেশে যেরূপ ব্যবহার করিয়াছে ইহারাও নিশ্চয় তদনুরূপ করিবে। আমরা ইহাদের সহিত বাণিজ্যও করিতে চাই না, বন্ধুত্বও করিতে চাই না। দেশে মন্দিরে মন্দিরে বিপদের ঘণ্টা

(alarm-bell) বাজিতে লাগিল। ইতিহাসে লিখিত আছে দেশস্থ লোক যেন ক্ষেপিয়া উঠিল। দলে দলে বলিতে লাগিল—"To arms! Jhoi! Jhoi! Away with the barbarians!" গ্রামে গ্রামে মরিচাবিশিষ্ট বল্লমগুলি পর্য্যন্ত ধারে দেওয়া হইল। শাণিত-অসিও তৈয়ার করা হইল। শত্রুর রণতরী ধ্বংসের জন্য বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণ রণদেবতা কার্ত্তিকেয়ের এবং শিন্তোধর্ম্মাবলম্বীগণ সংযতচিত্তে কয়েক দিন অনশনাবস্থায় সমুদ্র এবং ঝটিকার আরাধনা করিয়াছিল।

এদিকে অপর পক্ষ বুঝিয়াছিল যে জাপানের তখনও এতটা শক্তি হয় নাই যাহাতে শক্রভাবে আমেরিকানদের সম্মুখীন হইতে পারে। তাহারা পেরির প্রস্তাবে সম্মতিপ্রদানে ইচ্ছুক। সোগুণ-গণ রাজ্য-সংরক্ষণ বিষয়ে ৫০০ বৎসর যাবৎ সম্রাটের নিকট একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা বোধ করিতেন আজ সেই তোকুগাওয়া-বংশের সোগুণ যখন দেখিলেন জাপানীদের নিজেদের গৃহবিবাদে দেশ বৈদেশিক-জাতির পদদলিত হইবার উপক্রম, তখন তিনি স্বয়ং এবিপদের অবসানের জন্য মিকাদোর নিকট সাম্রাজ্য রক্ষার উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পরামর্শ-প্রার্থী হন। শেষে দুইদল একত্র হইয়া আমেরিকানদের সহিত সন্ধি ও বন্ধুত্ব সংস্থাপন করাই স্থির করেন। পরস্পর ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রথমবার এবং ১০৫৭ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার আমেরিকাবাসী ও জাপানীদের সন্ধি হয়। কমোডোর-পেরি যখন এদেশে আইসেন তখন তোকুগাওয়া-বংশের দ্বাদশ সোগুণ রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি তাঁহার বংশের অন্যান্য সোগুনের ন্যায় তেমন ক্ষমতাশালী ছিলেন না, তবে তাঁহার প্রধান মন্ত্রী আবে-ইছেনো-কামি অতি বিচক্ষণ লোক ছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই আমেরিকানদের সহিত সন্ধি হয়। মন্ত্রী আবে জাপানী বৈদেশিক মন্ত্রী হোত্তার সহিত একযোগে সন্ধির বিধি-ব্যবস্থা করেন। ঐ সময়ে সন্ধি না হইলে হয়ত

জাপানের বর্ত্তমান অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইয়া দাঁড়াইত। মিঃ হোত্তা আবের মৃত্যুর পর প্রধান মন্ত্রী হন। তিনি পাশ্চাত্য-জাতির বিদ্যা-বুদ্ধি সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থপাঠে অবগত ছিলেন। তিনি গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে জাপানীদের শিক্ষার নিমিত্ত বিজ্ঞান স্কুল স্থাপন করেন, উত্তরকালে উহাই টোকিও ইম্পিরিয়াল ইউনিভার্সিটিতে পরিণত হইয়াছে। কমোডোর-পেরি ইঁহাদের প্রতি বিশেষ ভদ্রোচিত ব্যবহার দেখাইয়াছিলেন। জাপানীরা এখনও তাঁহার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞ। ১৯০০খৃঃ তাঁহার জাপান আগমনের ঠিক ৫০ বৎসর পর ইঁহারা তাঁহার জন্য যে বার্ষিক উৎসব করিয়াছেন তাহাতে তিনি জাপানের যে স্থানে প্রথম পাদার্পণ করেন সেখানে তাঁহার নামে একটী স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করেন।

ইহার কিয়দ্দিবস পরে ইংরাজ, ফরাসী এবং ইউরোপের অন্যান্য জাতি আমেরিকানদের পদানুসরণ করে। তাহারা সকলেই জাপানী-দের সহিত ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য সন্ধি করে। কিন্তু আমেরিকা-বাসীদের ন্যায় ইউরোপীয়ানেরা জাপানীদের প্রতি ভাল ব্যবহার দেখাইতে পারে নাই। তাহাদের অর্থলিপ্সা এবং আত্মম্ভরিতা সকলের পক্ষে নিতান্ত অসহ্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল, ক্রমেই গোল বাঁধিতে লাগিল। অবশেষে ১৮৬৩খৃঃ ১১ই আগষ্ট তারিখে কোগিশামা নামক স্থানে জাপানীদের সহিত ইউরোপীয়ানদের এক ক্ষুদ্র যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে জাপানীদের তিনখানা জাহাজ জলমগ্ন হয়। এই যুদ্ধেই জাপানী-দিগকে বর্ত্তমান সময়ে প্রবল বহিঃশত্রুর সম্মুখীন হইবার পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়। এই যুদ্ধের কথায় দি-ট্রিবিউন্-অব-লাহোর এবং নিউ-ইণ্ডিয়া মিঃ লিঞ্চ্ (Mr. Lynch) লিখিত প্রবন্ধের যে আলোচনা করিয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে—"This fight had the effect of convincing even the conservative Satsuma-clan of

the necessity of adopting the weapons of their conquerors, and made the whole people anxious to adapt the civilisation which possessed such weapons.

"To them as to all Asiatic nations," says Mr. Lynch, "the conquest of India stood out as an ominous warning ever present in their minds. The revolution in Japan was the result not of any admiration of our civilisation, our culture, our arts, manners, religion or morals, it was adopted as the only means of defence against the White Peril."

এই গোলযোগের অবসান হইলে পর অনেক বিজ্ঞলোক আইন সংস্কারকল্পে বহু চেষ্টা করেন। কিন্তু টোকিও-রাজ-মহিলাসমিতি (Boudoir) বিশেষ শক্তিশালিনী ছিল বলিয়া প্রস্তাবিত সংস্কার কিঞ্চিন্মাত্রই কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। তখন জাপানে রাজার কমিটির মত অন্দরে রাণীর কমিটিও বসিত। কোন বিষয় দুই কমিটির অনুমোদিত হইলে কার্য্যে পরিণত হইত। চীনে আজও বুদোয়ার অর্থাৎ রাজ-মহিলাসমিতি আছে। এই সময় তোকুগাওয়া-বংশের দ্বাদশ সোগুণ অপুত্রক ছিলেন। তাঁহার অভাবে কে সোগুণ হইবেন এই প্রশ্ন উত্থিত হয়। বৃদ্ধ মিতোরাজের চতুর্থ পুত্র কেইকি সবচেয়ে উপযুক্ত পাত্র বিবেচিত হওয়ায় সকলে তাঁহাকেই মনোনীত করেন। কেবল মাত্র তাৎকালিক সোগুণ এবং মহিলাসমিতি কেইকিকে সোগুণ করিতে অনিচ্ছুক ছিলেন। কেইকি এরূপ বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান ছিলেন যে প্রধান মন্ত্রী আবে অনেক সময় বলিতেন—যদি সোগুণ ও মহিলাসমিতির মত লইয়া কোন প্রকারে একবার কেইকিকে সোগুণের পদাভিষিক্ত করিতে পারি তাহা হইলে সোগুণের নষ্টপ্রতিপত্তি পুনঃ

উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিবে। হয়ত জাপানে সোগুণের আধিপত্য চিরদিনের তরে বদ্ধমূল হইবে। হঠাৎ ১৮৭৫ খৃঃ আবের অকালমৃত্যুতে ঘটনা-চক্রের আবর্ত্তন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইয়া গেল।

আবের মৃত্যুর পর হোত্তা প্রধান মন্ত্রী হন। হোত্তা যদিও বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন তবু বৈদেশিক-জাতির সহিত অতিরিক্ত মিশা-মিশি এবং তাহাদের প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ প্রদর্শনের জন্য জন-সাধারণের অপ্রিয় হইয়া উঠেন। টোকিওর মহিলাসমিতি তাঁহার টোকিও অবস্থান কালে হিকোনে-পতি-ঈকামোন্‌কে প্রধান মন্ত্রীত্বে নিয়োগ করেন। ১৮৫৮খৃঃ সোগুণ মৃত্যুকালে মন্ত্রী হিকোনেকে বলিয়া যান—আমার মৃত্যুর পর যেন কেইকির পরিবর্ত্তে কিউসিউ-বংশের প্রিন্স ইয়েমোচিকে সোগুণ করা হয়। হিকোণে তাঁহার প্রভুর আদেশানুযায়ী ত্রয়োদশবর্ষবয়স্ক ইয়েমোচিকেই সোগুণ করেন। তিনি ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া অকালে কালকবলে নিপতিত হন। তাঁহার পর কেইকি সোগুণ পদাভিষিক্ত হন। সোগুণ মনোনীত করিতে যে সকল দাইমিও হিকোণের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন প্রকাশ্যভাবে তিনি একে একে সকলকে অপমানিত করেন। অনেক উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে পদত্যাগ অথবা নিম্নপদ গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। তৃতীয়তঃ তিনি মিকাদোর ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্য-জাতির সহিত সৌহার্দ্দসূত্রে আবদ্ধ হইয়া সন্ধি স্থাপন করেন। মিকাদোর ইচ্ছারবিরুদ্ধে কার্য্যকরায় জনসাধারণ মন্ত্রী হিকোণেকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিল। মন্ত্রীর এই অসাধারণ সাহসিকতায় দাইমিও, প্রিন্স সকলেই যেন ক্ষেপিয়া উঠিলেন। সকলেই কিয়োটো যাইয়া মিকাদোর সহিত সোগুণের বিরুদ্ধে নানারূপ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। যাহাতে সমস্ত দাইমিও একত্র হইয়া সোগুনের কাউন্সিল সংস্কার করেন সেজন্য মিকাদো মিতোরাজের প্রতি ভারার্পণ করিলেন। এদিকে মন্ত্রী হিকোণে

গুপ্তচরদ্বারা রাজ্যের গূঢ়বৃত্তান্ত অবগত হইতে লাগিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধাচারী দলপতিদিগকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিলেন। ইঁহাদের অধিকাংশই দেশের শিক্ষিত প্রধান লোক। এই সময় বুদোয়ারের জনৈক মহিলাও নির্ব্বাসিতা হইয়াছিলেন। প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যক্তিগনের মধ্যে জেশিউয়ের ইওশিদাশোইন এবং এচিজেনের হাশিমোতো-শানাই সমধিক প্রসিদ্ধ। প্রথমোক্ত ব্যক্তি কিদো এবং মার্কুইশ্-ইতোর উপদেষ্টা ছিলেন। ইঁহার যত্ন এবং উৎসাহেই মার্কুইশ্-ইতোর ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ প্রশস্ত হয়। শেষোক্ত ব্যক্তিসম্বন্ধে ইতিহাসে লিখিত আছে,—কেবল মাত্র ইঁহার অন্যায় মৃত্যুতেই সোগুণ-বংশের পতন হওয়া উচিত। ১৮৬০খৃঃ মন্ত্রী হিকোণে একদিন প্রাতে সোগুণের রাজধানীতে গমন কালে হঠাৎ মিতো-বংশের ১৭ জন পদচ্যুত রাজকর্ম্মচারীকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিনষ্ট হন।

এই সকল অরাজকতার ভাবে দেশ যেন জাগিয়া উঠিল। অনেকেই মিকাদোর উপর সমস্ত ক্ষমতা অর্পণ করিতে আগ্রহ দেখাইতে লাগিল। গোপনে গোপনে সোগুণের বিরুদ্ধে স্থানে স্থানে নানারূপ বিজ্ঞাপন প্রচার করা হইল। মাঝে মাঝে রাস্তায় ডাক কাড়িয়া লইয়া গবর্ণমেণ্ট অপিষের কাগজপত্র ধ্বংশ করিতে লাগিল। রাজস্ব রাজকোষে প্রেরণ না করিয়া গরীব দুঃখীদের ভিতর দান করা হইল। সামুরাইগণ দলে দলে কিওটো যাইয়া সম্রাটের সহায়তায় কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একদল পদচ্যুত ব্যক্তি আণিকাগার গোরস্থানে গিয়া তোকুগাওয়া-বংশের ১৩জন সোগুণের মূর্ত্তিরই মস্তক দেহচ্যুত করিয়া ফেলিল।

হিকোণের মৃত্যুর পর আন্দোছুশিমানো-কামি সোগুণের প্রধান মন্ত্রী হন। তাঁহার চেষ্টায় মিকাদোর ভগ্নির সহিত সোগুণের বিবাহ হয়। তিনি মনে করিয়াছিলেন এই বিবাহে সম্রাট ও সোগুণের ভিতর পরস্পর সম্বন্ধ স্থাপিত হইলে দেশের সমস্ত গোলযোগ চুকিয়া যাইবে।

কিন্তু কিছুতেই জনসাধারণের ভাঙ্গামন যোড়া লাগিল না। হিকো-পের ন্যায় আবার কতিপয় ব্যক্তি মন্ত্রী আন্দোকে বিনাশ করিতে প্রয়াস পাইল। মন্ত্রী নিজে যোদ্ধা ছিলেন। আক্রমণকারীদিগের দুইজনকে হত্যা করিয়া অবশিষ্টগুলিকে তাড়াইয়া আত্মরক্ষা করেন। এই সময় সম্রাট ৪০ জন ক্ষমতাশালী দাইমিওর প্রতি কিওটো রক্ষার ভার অর্পণ করেন। কিওটো রাজধানীতে সম্রাটের ক্ষমতা আবার বাড়িয়া উঠে।

দেশের লোক দুইদলে বিভক্ত হইল। একদল সম্রাটের এবং অপরদল সোগুণের পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। অনেকস্থলে পিতা-পুত্রে, জ্যেষ্ঠ এবং কণিষ্ঠ ভ্রাতায় ভিন্ন ভিন্ন পক্ষ সমর্থন করিতে লাগিল। এমন সময় একটী তৃতীয় দল গঠিত হইয়া অপর দুই দলকে মিশাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই দলের অনেকেই বেশ শিক্ষিত লোক ছিলেন। এই সময় সম্রাট জায়গীর-প্রথা এবং সোগুণপদ উঠাইয়া দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কুগে-বংশীয়েরা, সোগুণকর্ত্তৃক বিতারিত সরকারী কর্ম্মচারিগণ, শিন্তোধর্ম্মাবলম্বীগণ এবং চোশিউর সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিলেন। তৃতীয় অর্থাৎ ঐক্যসংস্থাপক-দলে প্রায় সকলেই বৈদেশিক রাজনীতি অনেকটা অবগত ছিলেন। উহাদে মধ্যে ছাৎছুমা, চোশিউ এবং তোসা সামুরাইগণ অত্যধিক প্রতিপত্তি এবং ক্ষমতাসম্পন্ন ছিলেন। নব্যজাপান শেষোক্ত সামুরাইদের (তোসা) নিকট বিশেষ ঋণী। ঐক্যসংস্থাপক-দলের অনেকেই পশ্চাত্য রীতিনীতি বেশ পছন্দ করিতেন। শাকুমা-শোজান শিক্ষার প্রত্যেক বিভাগে ইউরোপীয়ান শিক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন জাপানী পোষাক পরিধানে যেন লোককে অলস করিয়া তোলে। আর ইউরোপীয়ান পোষাকে সকলের বেশ সজীবতা বৃদ্ধি পায়। জাপানে তিনিই প্রথম ইউরোপীয়ানদের ন্যায় পোষাক পরি-

ধান করেন। বিদেশী চালচলনে নিরতিশয় নেশা দেখিয়া রাজপক্ষীয় কতিপয় সামুরাই উহাঁকে নিহত করেন (১৮৬৬ খৃঃ)।

এদিকে রাজ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের ক্ষমতাও বাড়িতেছিল। ১৮৬২ খৃঃ সম্রাট সোগুণের নিকট দুইবার দূত প্রেরণ করেন। ইহাতে সোগুণ কতিপয় প্রতাপান্বিত দাইমিওকে তাঁহাদের পূর্ব্বশাসনকার্য্যের ভার অর্পণ করিতে এবং সম্রাটের নিকট উপঢৌকনাদি প্রেরণ করিতে বাধ্য হয়েন। এই সময়ে সোগুণের মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত হয়। তাহাতে কেইকি সোগুণের প্রধান উপদেশ দাতা, নাবেশিমা শিক্ষক, এচিজেন প্রধান মন্ত্রী, এবং আওয়া যুদ্ধবিভাগের ডিরেক্টর হন। সোগুণপক্ষীয় দলের একতাবন্ধন ক্রমেই শিথিল হইতে থাকে।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সম্রাট বিদেশীবণিকদিগকে জাপান হইতে তাড়াইয়া দিতে এবং উহাদের বন্দরে ঢুকিবার রাস্তা বন্ধ করিতে আদেশ প্রদান করেন। সোগুণ এ হুকুম গ্রাহ্য করেন না। চোশিউ-রাজ সম্রাটের আদেশানুযায়ী তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত বাকানপ্রণালী-দিয়া যে সকল বিদেশী জাহাজ যাইতেছিল উহার উপর গোলাবর্ষণ করেন। সম্রাটের হুকুম প্রতিপালনে কুগে-বংশীয়েরা গোপনে চোশিউ-রাজের সহিত যোগ দেওয়ায় সোগুণ, কুগে-বংশীয় প্রধান সাতজনকে শাস্তি দিতে মনস্থ করেন। উহাঁরা পালাইয়া চোশিউরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। সম্রাটপক্ষীয় দল ক্রমে তিন জায়গায় সোগুণপক্ষীয়দল কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া উক্ত চোশিউরাজের শরণাপন্ন হয়। সোগুণপক্ষ হইতে এচিজেন এবং ওয়ারিরাজ সৈন্যসামন্ত লইয়া চোশিউরাজ্য ঘেরাও করিলেন। সোগুণপক্ষ কর্ত্তৃক চোশিউরাজ রাজপক্ষীয় প্রধান তিনজন অমাত্যকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন, এবং নিজেও দণ্ডাজ্ঞার জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। সোগুণপক্ষ রণক্ষেত্র হইতে প্রত্যাবর্ত্তন

করিয়াছিল বটে, কিন্তু গুরুপাপে লঘুদণ্ড হইল বিবেচনা করিয়া পুনরায় চোশিউরাজ্য আক্রমণ করিল। নিজেদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ করিয়া দেশকে লণ্ডভণ্ড করা কোনক্রমেই সঙ্গত নহে। এই হেতু দেখাইয়া ঐক্যসংস্থাপক-দল সোগুণের দলকে হাত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আইজুরাজ কিছুতেই ক্ষান্ত হইলেন না। পুনরায় যুদ্ধ বাধিল। সোগুণপক্ষ সম্পূর্ণ পরাস্ত হইল। এই সময় (১৮৬৬ খৃঃ) ১৩শ সোগুণের মৃত্যু হয়। কাজেই দুইপক্ষে সহজে সন্ধি হইয়া যায়।

প্রিন্স কেইকি যদিও ঐক্যসংস্থাপককারীদের পক্ষপাতী ছিলেন এবং সম্রাটকে সর্ব্বেসর্ব্বা মনে করিতেন তথাপি বংশমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য সোগুণ হইলেন। এই সময় মিঃ ইতো এবং কতিপয় যুবক পাশ্চাত্যশিক্ষা লাভ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ ঐক্য সংস্থাপক-দলের অন্তর্ভুক্ত হয়েন। মিঃ তোসা কেইকিকে সোগুং পদ ত্যাগ করিতে অনুরোধ করেন। কিন্তু আইজু এবং তোকুগাওয় বংশের কতিপয় সামুরাই কিছুতেই আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিলেন ওসাকা এবং জাপানের উত্তরপ্রদেশে ঘোর বিদ্রোহানল প্রজ্জ হইয়া উঠিল। সোগুণের পক্ষে তেমন সুদক্ষ পরিচালক কেহই ছি না। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে স্থানে স্থানে ঘোরতর যুদ্ধ হইল। সোগুণ পরাস্ত হইয়া অবশেষে সম্রাটের বশতাপন্ন হইলেন। সোগুণপদ উঠিয়া গেল। আবার জাপান একমাত্র সম্রাটের অধীন হইল।

এই সময় রুষেরা সম্রাটের বিরুদ্ধে সোগুণের সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছিল। কিন্তু সোগুণ বলিয়াছিলেন—আমাদের ঘরওয়া বিবাদে তোমাদের আনন্দ হইয়াছে, তোমরা আমাদের জাতীয়শক্তি দুর্ব্বল করিতে প্রয়াসী হইয়াছ। ইহা জানিও স্বদেশের বিষয়ে বিদেশীয় সাহায্য কস্মিন্‌কালেও চাহিব না। ঘরের বিবাদ ঘরেই মিটিবে।

বিড়ালদ্বয় মাখন বণ্টনের নিমিত্ত বানরের নিকট যাইয়া যেরূপ প্রতারিত হইয়াছিল আমরা সেরূপ হইতে চাহি না।

১৮৬৮ খৃঃ জাপান নূতনজীবন প্রাপ্ত হয়। জাপানের অভ্যুদয় বলিতে যাহা বুঝি তাহা কার্য্যতঃ এই সময় হইতেই আরম্ভ হয়। তবে একটা জাতীয়শক্তি একদিনে গঠিত হইতে পারে না। কাজেই কিরূপে ক্রমে ক্রমে রাজনীতি এবং শাসন-প্রণালীর সঙ্গে সঙ্গে জাপান-অধিবাসীদের মানসিক উন্নতি এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নতি সংঘটিত হইল বিশদভাবে বর্ণনা করিতে গেলেই পূর্ব্ব-ইতিহাসের কথঞ্চিৎ উল্লেখ করা দরকার। তাই সংক্ষেপে অনেক বিষয়ের অবতারণা করিতে হইল।

১৮৬৮ খৃঃ জাপান যেন জীর্ণবাস পরিত্যাগ করতঃ নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। ক্রমে নানারূপ সুন্দর সুন্দর অলঙ্কারাদিও ধারণ করিতেছে। একদিনে এরূপ পরিবর্ত্তন না ঘটিলেও নব্যজাপান এখন এত পরিবর্ত্তিত যে ৮০০ আটশত বৎসর পূর্ব্বের জাপানের সহিত বর্ত্তমান জাপানের কবল মানচিত্রগতই অনেকটা সৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। এই বিদ্রোহের রই বর্ত্তমান সম্রাট সিংহাসনাধিরোহণ করেন। রাজধানী কিওটো .ত ইয়েদো নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। এই সময় হইতেই ,দো টোকিও নামে অভিহিত হয়। সোগুণের প্রাসাদই বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ। এই সময়েই মেইজি অব্দের প্রবর্ত্তন হয়। এখন মেইজির বয়স ৩৮ বৎসর মাত্র। সম্রাট সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ঘোষণাপত্রে এই পাঁচটী বিষয় প্রচার করেন।—(১) রাজ্যের কার্য্যপ্রণালী দেশের গণ্যমান্য লোক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইবে। (২) রাজাই কি আর প্রজাই কি সকলেই জাতীয় উন্নতির জন্য আত্মোৎসর্গ করিবে। (৩) সিবিল, মিলিটারী সকলেই দেশীয় শিল্পের সহায়তা করিবেন এবং তাঁহাদের কার্য্যকারীশক্তি যেন সজীবতার পরিচায়ক হইয়া দাঁড়ায়।

(৪) প্রাচীন অঙ্গহীন রীতিনীতির সংস্কার হইবে। (৫) দেশে বিভিন্ন দেশীয় আবশ্যকীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের বন্দোবস্ত হইবে; এইরূপে জাতীয়শক্তির ভিত্তি দৃঢ় করা হইবে।

সম্রাট রাজপদে অধিষ্ঠিত হওয়ার পরই রাজ্যে রাজনৈতিক আন্দোলনের তুমুল গোলমাল উপস্থিত হয়। অনেক আন্দোলনের পর সম্রাট এবং দেশস্থ যাবতীয় রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিই শিক্ষা, সৈন্য বিভাগ, এবং স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য কৃতসংকল্প হয়েন। সোগুণপদ উঠিয়া যাইতে না যাইতেই ঐক্যসংস্থাপক-দল দুইটী কৌন্সিল গঠন করেন। একটী জায়গীরদারগণ এবং কুগে-বংশীয় বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক এবং অপরটী ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের সামুরাইদিগের প্রতিনিধিগণ কর্ত্তৃক গঠিত হয়। সম্রাট সিংহাসনে আসীন হইয়াই একটী জাতীয় সমিতি গঠন করিতে ঘোষণা করেন। বলা বাহুল্য অন্যান্য দেশে প্রজাগ নানারূপ চেষ্টা করিয়াই এরূপ কায করিতে রাজাকে বাধ্য করে আর জাপানে প্রজারা উল্লেখ না করিতেই রাজা স্বয়ং উক্ত সমি গঠনের প্রস্তাব করেন। এই বিষয়ে জনৈক ইতিহাস-লেখক ব য়াছেন—"It is significant that their constitution was voluntary gift of the Mikado, and not, as in the ca some European nations, one forced from the sovereign by the people." রাজা ১৮৭৫ খৃঃ স্থানে স্থানে বিভিন্ন প্রদেশের জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের প্রস্তাব করেন। এবং ১৮৭৬ খৃঃ সুনিয়মে রাজ্যশাসন করিবার নিমিত্ত নূতন আইন প্রনয়ণ করিতে আদেশ প্রচার করেন।

১৮৭৫ খৃঃ একটী গেন্‌রোইন্ অর্থাৎ সিনেট গঠিত হয়। স্বয়ং সম্রাট উহার দ্বার-উদ্‌ঘাটন করেন এবং ঘোষণা করেন যে সিনেট কর্ত্তৃক অনুমোদিত আইনসমূহ মন্ত্রীসভার সম্মতিক্রমে গৃহীত হইবে। উহার

কতিপয় মাস পরেই শেষ অর্থাৎ চূড়ান্ত আপিলের বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়েই ব্যবস্থাপক সমিতি, ফৌজদারী এবং দেওয়ানী আদালত সংস্থাপিত হয়। প্রধান প্রধান আইনগুলি প্রায় সর্ব্বত্রই একরূপ। কাযেই সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখিলাম না। তবে কিনা এখানে বাস্তবিক আইনানুসারে নিরপেক্ষভাবে শাসনকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। সকলেই আইনের নিকট সমান। ১৮৭৯ খৃঃ সিনেট আইন করেন—প্রত্যেক জেলার করদাতার প্রতিনিধিগণ দ্বারা সেই সেই জেলার এক একটী স্থানীয় সমিতি গঠিত হইবে। সমিতি নিজ জেলার উন্নতিকল্পে আয়ব্যয় প্রভৃতি সকল বিষয়ক কর্ত্তব্যই নির্দ্ধারণ করিবে।

১৮৮১ খৃঃ সম্রাট পার্লিয়ামেণ্ট-মহাসভা স্থাপনের আদেশ দেন, ক্রমশঃ আয়োজনও হইতে থাকে। ১৮৮৫ খৃঃ মন্ত্রীসভা পুনর্গঠিত য়। দেশের উপযুক্ত লোকসমূহকে দায়িত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করিলে ধান মন্ত্রীর উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত হয়। ১৮৯০ খৃঃ (২৩শে মেইজি ব্দ) সম্রাটের আদেশানুসারে প্রথম পালিয়ামেণ্টের অধিবেশন হয়। শেষ উপলক্ষ ব্যতীত পার্লিয়ামেণ্ট বৎসরে একবার মাত্র বসিয়া । এক্ষণে পার্লিয়ামেণ্টের অষ্টাদশ সেশন (Session) তেছে।

১৮৯০ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাস হইতেই নবপ্রথানুযায়ী কার্য্য আরম্ভ হয়। ১৮৭৫ খৃঃ স্থাপিত সিনটই এখন হাউস-অব-পিয়াস নামধারণ করে। এবং জেলা কমিটির মেম্বরগণ-নির্ব্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারাই হাউস্-অব-কমন্স্ গঠিত হয়। বৎসরের প্রথম দিবসের অধিবেশনে সম্রাটই সাধারণতঃ দ্বার-উদ্ঘাটন করেন। সম্রাট, প্রধান মন্ত্রী কিম্বা অন্যকোন রাজপ্রতিনিধি প্রত্যেক দিবসের অধিবেশনে উপস্থিত থাকেন। প্রতিবৎসর তিনমাসকাল পার্লিয়ামেণ্ট বসিয়া থাকে।

অব্-পিয়ার্সে কেহ কেহ বংশপরম্পরাক্রমে মেম্বারশ্রেণীভুক্ত হইয়া আসিতেছেন, কেহ কেহ রাজাকর্ত্তৃক মনোনীত হইতেছেন, আবার কেহ কেহ বা নিয়মানুযায়ী অন্যান্য লোকদ্বারা মনোনীত হইতেছেন। আর হাউস-অব-কমন্সে সাধারণের নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিগণই মেম্বার হইয়া থাকেন। ব্যারণ, ভাইকাউন্ট্, কাউন্ট্, মার্কুইশ্, প্রিন্স্ এবং রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তিই হাউস-অব-পিয়ার্সের মেম্বার হইতে পারেন। এতদ্ব্যতীত অন্যান্যবংশীয় লোকের মধ্যে উপযুক্ত, কার্য্যক্ষম ব্যক্তিকেও স্বয়ং সম্রাট হাউস্-অব-পিয়ার্সের মেম্বারশ্রেণীভুক্ত করিতে পারেন। এবং প্রত্যেক সহর অথবা জেলার সর্ব্বোচ্চ করদাতাও উক্ত হাউসের মেম্বার হইতে পারেন। রাজবংশীয় মেম্বার বাদে অন্যান্য মেম্বারদিগকে অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়স্ক হওয়া আবশ্যক। রাজবংশীয়েরা একুশ বছর বয়স্ক হইলেই হয়। হাউস্-অব-পিয়ার্সের মেম্বারগণ সাত বছরের জন্য এবং হাউস্-অব-কমন্সের মেম্বারগণ চারি বছরের জন্য মনোনীত হইয়া থাকেন। আর রাজাকর্ত্তৃক মনোনীত ত্রিশ বা ততোধিক বৎসর বয়স্ক হাউস-অব-পিয়ার্সের মেম্বার যাবজ্জীবন পার্লিয়ামেণ্টের মেম্বার শ্রেণীভুক্তই থাকেন। যাঁহারা ২৫ বৎসর বয়স্ক অথচ ১০ ইয়েন অর্থাৎ ১৫৲ টাকা বা তদূর্দ্ধ কর দিয়া থাকেন তাঁহারাই হাউস-অব-কমন্সের মেম্বার মনোনীত করিতে একটী করিয়া ভোট দিতে পারেন। স্বয়ং সম্রাটই সাত বৎসরের জন্য পার্লিয়ামেণ্টের একজন প্রেসিডেণ্ট এবং একজন ভাইস্ প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন। পার্লিয়ামেণ্টে সভ্যসংখ্যার স্থিরতা নাই। সম্প্রতি হাউস্-অব-কমন্সে ৩৮১ জন মেম্বার আছেন তন্মধ্যে ৪৫টা জেলা হইতে ২৯৬টী, ৫৩টা সহর হইতে ৭৩টী, ৪টী দ্বীপ হইতে ৪টী, হোকাইদো হইতে ৬টা এবং ওকিনাওয়া হইতে ২টী মেম্বার মনোনীত হইয়াছেন। ফর্ম্মোজাবাসীর পার্লিয়ামেণ্টে অধিকার নাই।

মেম্বারগণ মহাসভায় যার যার স্বকীয় এবং অন্যান্য সাধারণের মত খোলাসাভাবে প্রকাশ করিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত। দুই হাউস এবং সম্রাটের অনুমোদনক্রমেই কোন বিল আইনে পরিণত হইতে পারে। গবর্ণমেণ্ট আইনের খসরা (draft) দুই হাউসের নিকট পেশ করিলে উঁহারা তাহা ইচ্ছানুরূপ আইনরূপে গ্রাহ্য করিতেও পারেন ; অথবা কোনরূপ পরিবর্ত্তন করিয়াও গ্রাহ্য করিতে পারেন। আবার এক হাউসের প্রস্তাবিত বিষয় অন্য হাউস এবং রাজার মনোনীত হইলেই আইনরূপে গৃহীত হয় ; নতুবা নহে। স্থূলকথা গায়ের জোরে কোন কায জাপানে আদৌ হয় না। সমগ্রদেশের বিদ্বান্ বুদ্ধিমান লোকের দ্বারাই দেশ পরিচালিত হইতেছে। জনসাধারণের বিষয় আলোচনাকালে মহাসভাস্থলে যে কেহ প্রবেশলাভ করিতে পারেন। বৈদেশিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধীয়, ব্যক্তিগত, সামরিক, এবং কোন কোন বিশেষ রাজনৈতিক আন্দোলন সময়ে পালিয়ামেণ্টে বাহিরের লোককে ঢুকিতে দেওয়া হয় না।

ফরাসীধরণে সমগ্র জাপানে কতকগুলি জেলা (prefect) আছে। প্রত্যেক জেলায় একজন গবর্ণর আছেন। প্রত্যেক গ্রামেই গ্রামবাসিগণ কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত ১২ জন প্রধান ব্যক্তি লইয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র গ্রাম্য কমিটি আছে। প্রত্যেক গ্রামে একজন করিয়া পুলিশ অবস্থান করে। কোন ব্যক্তি অপরাধ করিলে গ্রাম্য কমিটিই অপরাধীকে জেলার গবর্ণরের হস্তে অর্পণ করে। গ্রামের উন্নতির জন্য কমিটিই দায়ী। কমিটি পুকুরখনন, রাস্তা নির্ম্মাণ প্রভৃতি কার্য্যের দরকার বোধ করিলে গ্রামিক সাহায্যবাদে অতিরিক্ত সাহায্যের জন্য জেলা-গবর্ণরের নিকট আবেদন করিয়া থাকেন। এতাদৃশ কার্য্যের নিমিত্ত গ্রামের কাহার নিকট হইতে বার্ষিক ১৶০ একটাকা তিন আনার বেশী চাঁদা লওয়া হয় না। গ্রামের ন্যায় আবার প্রত্যেক জেলায়

জেলায় এক একটি কমিটি রহিয়াছে। জেলা কমিটি স্ব স্ব জেলার উন্নতির জন্য ব্যস্ত। কয়েক মাস পূর্ব্বে নিউইণ্ডিয়ার এডিটার মহাশয়, "কার্য্যকরী স্বায়ত্ত-শাসন (২)" (Practical Self-Government II) সম্বন্ধে লিখিতে ভারতে গ্রামে গ্রামে, মহকুমায় মহকুমায় এবং জেলায় জেলায় এমন ধরণের কমিটিরই বোধ হয় অভাব বোধ করিয়াছিলেন। আমরা অনেক সময়ে অনেক বিষয়েরই অভাব বোধ করিতেছি সত্য, কিন্তু আমাদের অভাব যে অপরে বোধ করে না সেইটাই পরিতাপের বিষয়।

১৮৯০ খৃঃ বর্ত্তমান শাসন-প্রণালীর প্রবর্ত্তন হয়। এই সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যে ইউরোপীয়-জাতির সঙ্গে জাপানীদের ক্রমশঃই অধিকতর মিশামিশি হইতে থাকে। জাপানীরা এই সময়ই পৃথিবীর অন্যান্য প্রধান জাতির সহিত অন্তর্জাতিক-সন্ধিতে (International leagueএ) আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং সন্ধির নিয়মানুযায়ী কার্য্য করিতেও প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতে চাহেন। কিন্তু কথানুযায়ী জাপানীরা কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে কিনা সন্দিহান হওয়ায় পাশ্চাত্য জাতি উহাদের আবেদন গ্রাহ্য করেন না, কিন্তু গত চীন-জাপান যুদ্ধে (১৮৯৪—৯৫) জাপানের রণপাণ্ডিত্য দর্শনে বিদেশীরা স্তম্ভিত হন এবং তখন উঁহারা বুঝিতে পারেন কালে জাপানীদের দ্বারা পূর্ব্ব-এশিয়াস্থ উহাঁদের অধিকৃত স্থানসমূহের বিশেষ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। তাই পাশ্চাত্য-জাতি উক্ত যুদ্ধের পরই জাপানকে এক প্রধান জাতিরূপে পূর্ব্বোক্ত সন্ধিসূত্রে অন্যান্য প্রধান জাতির শ্রেণীভুক্ত করেন।

১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে চীনের সহিত যে যুদ্ধ হয় উহাই জাপানের ইতিহাসে প্রথম উল্লেখযোগ্য প্রধান যুদ্ধ। এই যুদ্ধে জাপানীরা চীনের নিকট হইতে ফর্ম্মোজাদ্বীপ লাভ করেন। এই যুদ্ধেই বৈদেশিক-জাতি বিশেষতঃ রুষের নিকট জাপানীরা যে ব্যবহার পাইয়াছিলেন তাহা

ইঁহারা বিস্মৃত হন নাই। সেই ব্যবহারের পরিণামেই বর্ত্তমান রুষ-জাপান সমর, যাহার ন্যায় সমর পৃথিবীতে অল্পই ঘটিয়াছে। পোর্ট আর্থার, লাওইয়াং, মুকদেনের এবং মুশিমা-প্রণালীর নৌযুদ্ধে পাশ্চাত্য জাতিদের প্রায় সকলেরই পীতাতঙ্ক উপস্থিত। এই আতঙ্কেই অতি প্রবলশক্তি পর্য্যন্ত ইহাদের বন্ধুত্বপ্রার্থী হইয়া সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতেছে। এই যুদ্ধের ফলেই বর্ত্তমান জাপ-ইংরাজ সন্ধি (Anglo-Japanese Alliance). এ সন্ধিতে অন্য বিষয় দূরে থাকুক, ভারতের ভাবী শিল্প-বাণিজ্যের মূলেও কুঠারাঘাত হইবার উপক্রম হইয়াছে। রুষ আজ জাপানের নিকট পরাস্ত। যে রুষ কোথাও পরাভব স্বীকার করে নাই আজ ক্ষুদ্র জাপানের নিকট যুদ্ধে এবং সন্ধিতে পরাস্ত। বর্ত্তমান সন্ধির প্রস্তাবে সম্রাট অসাধারণ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন। সমগ্র জাপানবাসী, সমস্ত যুদ্ধব্যয় এবং কারাফুতো অর্থাৎ সাগালিয়েন দ্বীপ পাইলেও সন্তুষ্ট ছিলনা। সন্ধি-সংবাদ প্রকাশিত হওয়া মাত্র সেদিন জাপানে আমাদের চক্ষের সম্মুখে যে ভয়াবহ ঘটনা ঘটিল তাহা [illegible]না করিলে একখানা গ্রন্থ হয়। জনসাধারণ ওরূপ সন্ধিতে সন্তুষ্ট [illegible]হে। তাহারা প্রতিবাদ-সভা আহ্বান করিল। পুলীশ প্রতিবন্ধক [illegible]াইল। সেখানেই এক ছোটখাট যুদ্ধ হইয়া গেল। কতলোক আহত এবং হতও হইল। সকলে বলে—আমাদের আত্মীয়-স্বজন অনেকে রুষ-যুদ্ধে হত হইলেও আমরা বাঁচিয়া আছি। আজ্ঞা পাওয়ামাত্র আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত, তবু আমরা এরূপ সন্ধি-প্রস্তাবে রাজি নহি। দুদিন দুরাত্রি রাস্তাঘাটে লোকারণ্য হইয়াছিল। টোকিও, কিওটো, ওসাকা এবং ইয়াকোহামার সমস্ত পুলিশ-ষ্টেশন, কোন কোন গবর্ণমেণ্ট অফিষ এবং প্রধান মন্ত্রীর বাড়ী পর্য্যন্ত ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছিল। ভারতের প্রতিবাদ এবং জাপানের প্রতিবাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। ইহারা যাহা অন্যায় বলিয়া বুঝিবে তার প্রতিকার

করিবেই করিবে। আর আমাদের উপর রাজার অন্যায় ব্যবহার প্রদর্শিত হইলেও প্রতীকারের চেষ্টা দূরে থাকুক অম্লানবদনে নীরবে সহ্য করিয়া থাকি। আমাদের ধারণা কেরাণীগিরি হাতছাড়া হইলে প্রাণে মরিব। দুই চারিটী ঘুষি-লাথিতে বিশেষ তেমন কি হয়। এইরূপ বিষয় বর্ণনা করিতে বিদ্যাসাগর মহাশয় এক জায়গায় বলিয়াছেন—"পরের পা চেটে চেটে এ জাতটা উৎসন্ন গিয়াছে। লোকে তাঁবেদারি করা যত ছাড়্‌বে, ততই বাঁচবে।" পূর্ব্বাপর ভারতবাসীর রাজভক্তি অচলা বলিয়াই সরকারী অপমানকে অপমানের মধ্যে গণ্য করে না।

কি করিয়া সাড়ে-চারিকোটী লোকের আবাসভূমি জাপান এত অল্প সময়ে এরূপ উন্নত হইল জিজ্ঞাসা করিলে উত্তরে জাপানীরা বলিয়া থাকেন এবং বাস্তবিক আমরাও দেখিতে পাইতেছি—জাপানীদের স্বদেশবৎসলতা এবং অটুট রাজভক্তি। তাই সেদিন টোকিও সহরের এরূপ ভীষণ গোলমালটা রাজার আজ্ঞা প্রচারিত হওয়ামাত্রই একেবারে থামিয়া গেল। জাপানীদের ন্যায় ভারতবাসীদের রাজভক্তি বেশ প্রবলাই রহিয়াছে কিন্তু স্বদেশবৎসলতা আদৌ নাই। কয়জন ভারতবাসী জাপানীদের ন্যায় স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে পারে? রাজার সুনিয়ম ও সুশাসন ব্যতিরেকে প্রজাপুঞ্জের রাজভক্তি চিরদিন অক্ষুণ্ণা থাকিতে পারে না। জাপানের ন্যায় রাজাপ্রজার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক অন্য কোথাও আছে কি না সন্দেহ। একটু প্রয়াস পাইলেই কেহ তাহার অভাব অভিযোগ স্বয়ং সম্রাটকে জ্ঞাপন করিতে পারে; আর ভারতের অভিযোগ সম্রাট দূরের কথা বড়কর্ত্তা পর্য্যন্ত পৌঁছিলেই শুভাদৃষ্ট বলিতে হইবে।

জাপানের রাজনীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না, সেটী পুলিশ-প্রথা। এখানে অজস্র টাকা ব্যয় করিয়া পুলিশ কমিশন বসাইতে হয় নাই। ইহারা পৃথিবীর

অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিয়া জাপানের পুলিশ-প্রথাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচনা করিয়াছেন। তবুও জাপান-গবর্ণমেণ্ট পুলিশ-প্রথার অন্য কোন প্রকার উন্নতি সম্ভবপর কিনা তাহার অনুসন্ধান করিতেছেন। ভারতে পুলিশের মূর্ত্তি দেখিলেই শরীর শিহরিয়া উঠে। অর্থ ও শরীরের রক্ত শোষণ করিবার জন্যই যেন ভারতে পুলিশের সৃষ্টি। ভারতে পুলিশের দোষেই অনেক সময় অসতের পরিবর্ত্তে সৎলোককেই লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়। আর জাপানে অন্যান্য লোকের চেয়ে পুলিশের নিকটই শাস্তি বেশী। জাপানী পুলিশের ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ অন্য কোন দেশের পুলিশ হইতে পারে না আমার বিশ্বাস। উচ্চ-কর্ম্মচারী হইতে সামান্য নিম্ন-কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত সকলেই যথানির্দ্দিষ্ট নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া কায করিতেছেন। দিন নাই রাত্রি নাই, সমভাবে তাঁহারা নির্দ্দিষ্ট স্থানের শান্তির জন্য কতই কষ্ট স্বীকার করিতেছেন। বরফ পতনকালে অথবা বৃষ্টির সময় সময়োপযোগী পোষাকে আবৃত হইয়া অনবরত রাস্তায় দাঁড়াইয়াই আছেন। কাহার কোন বিষয় অনুসন্ধান করিতে হইলেই অমনি পুলিশের নিকট দৌড়িয়া যায়। তিনি অবনত মস্তকে সম্মান প্রদর্শন করতঃ যথাযথ বিবরণ জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। প্রত্যেক পুলীশের নিকট তাঁহার এলাকাধীন স্থানের মানচিত্র এবং অধিবাসীদের নামধাম লিখিত তালিকা রহিয়াছে। যে কোন বিষয় তাঁহার নিকট অবগত হওয়া যায়। গুরুতর বিষয় তাড়াতাড়ি দূরবর্ত্তী স্থানে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত প্রত্যেক পুলিশের রাস্তার পার্শ্বস্থ বিশ্রাম-মন্দিরে টেলিফণ সংযোগ রহিয়াছে। উক্ত টেলিফণের সঙ্গেই সকল অফিষ এবং অবস্থাপন্ন লোকে বাড়ীর টেলিফণ সংযোগ আছে। প্রায় প্রত্যেক সহরেই টেলিফণের সুন্দর বন্দোবস্ত রহিয়াছে। যে কেহ যে কোন পুলিশের নিকট গিয়া পাঁচটী পয়সা দিলেই পাঁচ মিনিটের জন্য অন্যত্র সংবাদাদি জ্ঞাপন করিতে পারে।

এখানে সকলের সমভাব। ট্রামগাড়িতে প্রথম দ্বিতীয় শ্রেণী নাই। লর্ড হইতে মুটে পর্য্যন্ত একত্র একসঙ্গে একবেঞ্চে বসিয়া যাওয়া আইসা করিয়া থাকে। ট্রামে অতিরিক্ত লোক হইলে পুলিশ কর্ম্মচারীরা দাঁড়াইয়া রহেন এবং অন্যান্য আরোহীর বসিবার সুবিধা করিয়া দেন। আর আমাদের দেশে গাড়ি বলিয়া কেন, যেখানে সেখানে পুলিশ কর্ম্মচারীগণ মহা ক্ষমতাশালী, অন্যান্য লোক যেন তাঁহাদেরই অনুগ্রহপ্রার্থী। এখানে গ্রামে গ্রামে যে একজন করিয়া পুলিশ আছেন তাঁহারা তাঁহাদের স্ব স্ব গ্রামের শান্তি স্থাপন, চোর ডাকাতের উপদ্রব নিবারণ, অগ্নির ভয় দমন, এবং নানারূপ সংক্রামক রোগ নিবারণের জন্য স্বকীয় অফিষে অবস্থান করিয়া কত ভাবে কত রকম প্রয়াস পাইতেছেন। সাধারণ পুলিশগুলিও ১৭ ইয়েন অর্থাৎ ২৫৲ টাকার [illegible]র মাহিয়ানা পাইয়া থাকেন। ঘুষের বন্দোবস্ত এখানে আদৌ [illegible]াই।

[ক্রমশঃ]

শ্রীযদুনাথ সরকার।

মরাঠার শিবাজী-উৎসব ও বাঙ্গালীর প্রতাপসীতারামোৎসব।

বিগত ২৫শে এপ্রিল রায়গড় দুর্গে মহা আড়ম্বরে মহারাজা ছত্রপতি শিবাজীর উৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। অন্যান্যবার এই উৎসবে কয়েক শত লোক মাত্র উপস্থিত হইতেন। কিন্তু শিবাজী-ফণ্ডের সেক্রেটারীরা প্রত্যেক পঞ্চম বৎসরে মহা আড়ম্বরে এই উৎসব সম্পন্ন করেন এবং শিবাজী-ফণ্ড হইতেই তাহার ব্যয়াদি নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। মহাত্মা শিবাজীর জন্মোৎসব ১৮০৬ সনের এপ্রিল মাসে প্রথম সম্পাদিত হয়। এই রায়গড় দুর্গেই তিনি রীতিমত শাস্ত্রবিধিমতে "রাজা" উপাধি গ্রহণ করেন এবং এখানেই তিনি সমাধিস্থ হন। এই কারণেই বিগত ১০ বৎসর যাবত ইহা রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের তীর্থস্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যদিও ইহার রাস্তাঘাট নিতান্ত খারাপ এবং দুরারোহ তথাপি এ বৎসর ৫০০০ হাজার হিন্দু মুসলমান এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে একজন ডিপুটী কালেক্টর এবং একজন মামলতদার উপস্থিত ছিলেন। এই উৎসবের সবিশেষ বন্দোবস্ত করার জন্য মহাদনগরে একটী কমিটি গঠিত হয়। এই সভ্যেরা যেরূপ সুন্দরভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন সেজন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। ১৮২০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রায়গড় দুর্গ জনমানবশূন্য ছিল। এবং ইহার প্রাচীর প্রভৃতির নির্ম্মাণ-প্রণালী কেবল ইহার পূর্ব্বগৌরব স্মরণ করাইত। ইহা উচ্চে প্রায় ২৮০০ ফিট। ইহা বর্ত্তমানেও একটী বিজন স্থান এবং উৎসব উপলক্ষে যাহাকিছু দরকার সমস্তই ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী

এই মহাদনগর হইতে নীত হয়। কাজেই সেখানে এরূপ একটী মহোৎসবের এবং একদিনে প্রায় ৬০০০ হাজার লোকের আহারের বন্দোবস্ত করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নয়। উৎসবের ১ দিন পূর্ব্বেই মিঃ ও মিসেস খাড়ে (khare), মিঃ তিলক, মিঃ বোদস এবং মিঃ রানাডে প্রভৃতি প্রায় শতাধিক লোক পর্ব্বতোপরি রায়গড়ে পৌঁছিয়াছিলেন। ২৫শে তারিখ সকালবেলা হইতেই উৎসব আরম্ভ হয়। তিন সহস্রাধিক মাউলী এবং সহস্রাধিক ব্রাহ্মণ, প্রভু প্রভৃতি উচ্চজাতীয় লোক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উত্তরে অমরাবতী এবং দক্ষিণে চিকোদী প্রভৃতি সুদূরবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে আসিয়াছিলেন। প্রাতে নয়টার সময়ই নানা স্থান হইতে আগত লোকে পাহাড়ের উপরিভাগ পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। মহারাজা শিবাজার রাজপ্রাসাদের সম্মুখস্থ ময়দানে উৎসবমণ্ডপ প্রস্তুত হইয়াছিল। প্রাতঃকালে মেলা-সঙ্গীতের দ্বারা উৎসবের আরম্ভ হইলে "জয় শ্রীশিবাজী মহারাজাকি জয়" এবং "বন্দে মাতরম্" ধ্বনি পুনঃ পুনঃ উত্থিত হইয়া সভামণ্ডপ বিকম্পিত করিতেছিল। অভ্যাগতদিগের অভ্যর্থনা-সঙ্গীত এবং মহাত্মা শিবাজীর গুণগান ও নানাবিধ জাতীয়-সঙ্গীত গীত হইলে পর মিঃ আংঢ্যাকার শিবাজীর কল্যাণদুর্গ অবরোধ এবং তথাকার মুসলমান সর্দ্দারের পরিবারের প্রতি তাঁহার সদ্ব্যবহার সম্বন্ধে কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়াছিলেন। কীর্ত্তনের পর জয়ন্তী-উৎসবে যে সকল "পালন-গীতি" হয় তাহাই গীত হইয়াছিল। তৎপর সন্ধ্যা ছয়টা পর্য্যন্ত উপস্থিত জনমণ্ডলীর খাওয়া দাওয়া হয়। সান্ধ্যোৎসবের প্রারম্ভে সেই পূর্ব্ব-মণ্ডপেই বাদ্য এবং মেলা-সঙ্গীত গীত হয়। বোম্বের মিঃ এম্, আর, বোদাসের প্রস্তাবে অনারবল মিঃ দাজী-আবাজী-খাড়ে সভাপতি হইয়াছিলেন। "কাল" পত্রিকার সম্পাদক মিঃ শিবরাম-মহাদেব পরাঞ্জপে প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তিনি তাঁহার প্রস্তাবে

শিবাজী-ফণ্ডের সেক্রেটারী যে হিসাব দাখিল করিয়াছিলেন তাহার সম্বন্ধে কিছু বলিলেন এবং এই ফণ্ডের জন্য ১৮৯৫ সনে যে কমিটি গঠিত হয় তাহার সভ্যদিগকে ধন্যবাদ দিলেন। হিসাবে দেখা যায় যে এই ফণ্ডের কোষাধ্যক্ষ পুনার শ্রীমন্ত রামচন্দ্র নাথুর হস্তে বর্ত্তমানে প্রায় ২৫ হাজার টাকা আছে এবং তিনি তাহার অধিকাংশই শতকরা ৬ টাকা হিসাবে পুনার Deccan Bankএ গচ্ছিত রাখিয়াছেন। মহাদের উকীল মিঃ ডংগ্রে Dongre) দ্বিতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ইহাতে মিঃ তিলক পুনর্ব্বার সেক্রেটারী ও শ্রীমন্ত-বলবন্ত-রামচন্দ্র-নাথু কোষাধ্যক্ষ নির্ব্বাচিত হন। এই প্রস্তাবও প্রথম প্রস্তাবের ন্যায় সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। বোম্বের প্রফেসর এন্, বি, রানাডে তৃতীয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন। যাহাতে মহারাজা শিবাজীর সমাধির উপর একটী ছত্র নির্ম্মাণ হইতে পারে সেবিষয়ে গবর্ণমেণ্টের অনুমতি প্রার্থনার জন্য দরখাস্ত করিবার ভার সভাপতির উপর অর্পিত হইল। তারপরদিন গবর্ণমেণ্টের নিকট সেই দরখাস্ত পেশ করা হয়: এই উৎসব উপলক্ষে ইহাই একটী যথার্থ কাজ করা হইয়াছে। বিগত ১০ বৎসর যাবৎ শিবাজী-ফণ্ডের কার্য্য ভালরূপ চলিতেছিল না। এখন যাহাতে এই ফণ্ডের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সে বিষয়ে সকলেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন, এবং গবর্ণমেণ্টের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইবে স্থির করিয়া কাজ আরম্ভ করা হয়। তারপর মিঃ তিলক, সভাপতি মহাশয়, তদীয় পত্নী, মহাদ এবং ভেলাসের কার্য্য-নির্ব্বাহক-সভার সভ্যগণ, ভলাণ্টিয়ারগণ,—যাহাদের সাহায্য ব্যতীত এরূপ দুর্গমস্থানে কিছুতেই এরূপ উৎসব সুসম্পন্ন হইতে পারিত না—এবং অন্যান্য উপস্থিত জনমণ্ডলীকে ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। তদুত্তরে অনারবল মিঃ থাড়ে কিছু বলিয়া সভা ভঙ্গ করেন। তিনি বলিলেন যে স্বয়ং উপস্থিত হইয়া এরূপ একটী উৎসব পরিদর্শন না করিলে ইহার কার্য্য

এবং উপকারিতা সম্বন্ধে কিছুই উপলব্ধি করিতে পারা যায় না। তিনি জনসাধারণকে অন্ততঃ একবার আসিয়া এই উৎসব দেখিবার জন্য অনুরোধ করিলেন; কোন অজুহাত দেখাইয়া এখানে না আসা নির্ব্বোধের কাজ। তৎপর রাজপ্রাসাদ হইতে সমাধির নিকটস্থ মহাদেবের মন্দির পর্য্যন্ত একটী পালকী ও মশালের মিছিল বাহির করা হয়। এইরূপে সকাল হইতে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত খুব উৎসাহের সহিত সভার কার্য্যাদি নিষ্পন্ন হয়। পরদিন সকাল হইতেই লোক-সংখ্যা কমিতে লাগিল এবং অবশেষে রায়গড় পূর্ব্ববৎ নির্জ্জন হইল। রায়গড়ের চারিদিকে কলেরার প্রাদুর্ভাব ছিল, নহিলে উপস্থিত জন-সংখ্যা আরও অধিক হইত। যে মাউলী-সৈন্যের সাহায্যে শিবাজী তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন সেই মাউলী প্রায় ৩০০০ হাজার উপস্থিত ছিল। ইহাতেই দেখা যায় যে এই উৎসব শিক্ষিত, অশিক্ষিত সমস্ত শ্রেণীর মধ্যেই বিস্তৃত হইতেছে। একজন মহর-বক্তা মিঃ তিলকের প্রস্তাব অনুমোদন করিবার সময়ে একটী সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তিনি সমস্ত সভ্যদিগকে অনুরোধ করিলেন যে, যদি সম্ভবপর হয় তবে প্রত্যেক বৎসরই যেন এইরূপ আড়ম্বরে শিবাজী-উৎসব সম্পন্ন হয়। ইহাতে মহারাজা ছত্রপতি শিবাজীর কার্য্য এবং জীবনী লোকের মনে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে মহারাজা ছত্রপতি শিবাজীর সমাধিস্তম্ভের উপর একটী ছত্র নির্ম্মাণের জন্য এবং যাহাতে ইহার সমস্ত কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইতে পারে এবং বৎসর বৎসর সেখানে একটী উৎসব সম্পন্ন হইতে পারে তজ্জন্য দাক্ষিণাত্যে একবার একটী আন্দোলন উঠিয়াছিল। ১৮৮৩ খৃঃ অঃ James Douglas তাঁহার "Book of Bombay" নামক গ্রন্থে শিবাজীর সমাধিস্তম্ভের দুরবস্থার বিষয় বর্ণনা করেন। মহাত্মা শিবাজীর বর্ত্তমান বংশধর রাজা ও সর্দ্দারেরা, তাঁহাদের পূজ্যপাদ

মরাঠা-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা—যাঁহার গুণে এখন তাঁহারা এই বিস্তৃত রাজ্যভোগ করিতেছেন—মহারাজা শিবাজীর সমাধিস্থান সংস্কার করাইতে একবার মনেও করেন না দেখিয়া তিনি বড় দুঃখিত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুদিন পরেই বোম্বের মিঃ পি, বি, জোসী এই বিষয়ে মারাট্টী ভাষায় একটী কবিতা লেখেন। ইহার দুই বৎসর পর Bassenএর মিঃ গোবিন্দ-বাবাজী-জোসী রায়গড় দুর্গ দেখিতে যান এবং নিজে সেই সমাধির দুরবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া তাহার সংস্কারার্থে এবং তদুপরি একটী ছত্র নির্ম্মাণার্থে কিছু কিছু অর্থ সাহায্যের জন্য সর্ব্বসাধারণের নিকট নিবেদন করেন। ইতিমধ্যে দাক্ষিণাত্যের নেতৃবৃন্দ এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। এবং ১৮৮৫ খৃঃ অঃ ২৪শে মে রায় বাহাদুর (পরে জষ্টিস্) মহাদেব-গোবিন্দ-রানাডের উদ্যোগে দাক্ষিণাত্যের সর্দ্দার এবং পুনাবাসীদিগের একটী সাধারণ সভা আহুত হয়। এই সভায় সমাধিসংস্কার প্রভৃতি কার্য্য করিয়া, মরাঠা-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা শিবাজীর নাম চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহার কয়েক মাস পরে বম্বের তৎকালীন গভর্ণর লর্ড রে (Lord Reay) সেই সমাধির চতুষ্পার্শ্বস্থ ভূমি পরিষ্কার করাইবার এবং ইহার চারিদিকে বেড়া দিবার ও যাহাতে ইহা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে পারে তজ্জন্য বৎসর ৫৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করেন।

এই সময়ে মরাঠাদিগের জাতীয়-ইতিহাস সম্বন্ধে কতকগুলি অতি পুরাতন কাগজপত্র এবং মিঃ একওয়ার্থ প্রণীত জাতীয় বীর-গাথা প্রথম প্রকাশিত হয়। এই সকল পাঠে এই আন্দোলন সকলের মনেই জাগরিত রহিল। ১৮৯৩ খৃঃ অঃ James Douglas প্রণীত “Book of Bombay and Western India” নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহাতে শিবাজী-সমাধির দুরবস্থা সম্বন্ধে আবার উল্লেখ করা

হয়। এই কারণে আন্দোলন আরও প্রবল হইয়া উঠে। এই পুস্তকে Mr. Douglas একস্থলে ফুটনোটে, এই বিষয়ে Lord Reay যাহা করিয়াছেন তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। এবং লিখিয়াছেন যে পূর্ব্ব-কালের শিল্পবিদ্যার সামান্য চিহ্নও তখনকার দিনের শৌর্য্য-বীর্য্যের কথা সর্ব্বদা স্মরণপথে উদিত রাখিবে। ইহার পর সেখানকার স্থানীয় কাগজে এই বিষয় লইয়া খুব আন্দোলন উপস্থিত হয়। এবং ১৮৯৫ সনের ৩০শে মে পুনানগরে, অযোধ্যার তৎকালীন শাসনকর্ত্তা ৺শ্রীমন্ত শ্রীনিবাস-রায়-পন্থ-প্রতিনিধি মহাশয়ের সভাপতিত্বে দাক্ষিণাত্যের সর্দ্দার ও পুনাবাসী ভদ্রমহোদয়দিগের একটী সাধারণ সভার অধিবেশন হয়। ৺ মিঃ জষ্টিস্ রানাডে—যাঁহার উদ্যোগে ১৮৮৫ সনে প্রথম সভা আহুত হয়—এই সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার সহানুভূতি টেলীগ্রাম করিয়া জানান, এবং একটী চিরস্থায়ী ফণ্ড তৈয়ারী করিবার জন্য তাঁহার নিজের মত প্রকাশ করেন। তদনুসারে ৺শ্রীমন্ত গণপৎ-রায়-হরিহর এবং করুন্দাবাদের তৎকালীন শাসনকর্ত্তা বাপুসাহেব-পান্ডুরধন এই প্রস্তাব উত্থাপিত করেন যে সমাধি-সংস্কার, তদুপরি একটী ছত্র তৈরীকরণ এবং ইহার রক্ষণাবেক্ষণ ও মরাঠা বীরের সম্মানার্থে প্রতি বৎসর একটী উৎসবের আয়োজন ইত্যাদি কার্য্যের খরচ নির্ব্বাহের জন্য একটী ফণ্ড তৈরী করা হউক, এবং মিঃ বালগঙ্গাধর-তিলককে সেক্রেটারী করিয়া তাঁহার অধীনে একটী কমিটি গঠিত হউক। এই প্রস্তাব সর্ব্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তারপর শিবাজীর দ্বিতীয় পুত্র রাজারামের সম্মানার্থে পুনার নিকটবর্ত্তী সিংহগড়দুর্গে বার্ষিক ১০০০৲ হাজার টাকা সরকারী সাহায্যে যেমন একটী ইন্‌স্‌টিটিউসন্ দেবস্থান-রূপে চালিত হইতেছে এবং বৎসর বৎসর সেখানে রাজারাম-উৎসব সম্পাদিত হইতেছে সেইরূপ রায়গড়েও যাহাতে হইতে পারে সে বিষয় উল্লেখ করা হয়। ইহার পর ১৮৯৬ সনে ১৫ই এপ্রিল রায়গড়ে প্রথম

শিবাজী-উৎসব সম্পন্ন হয়। তারপর হইতেই মহারাষ্ট্রদেশের নানা স্থানে বৎসর বৎসর শিবাজীর জন্মদিন অথবা রাজ্যাভিষেকদিন উপলক্ষে উৎসব হইতে আরম্ভ হয়। ১৮৯৫ সনের ৩০শে মে তারিখ পুনার সভায় যে সাধারণ ফণ্ড তৈরী হয় এখন তাহাতে প্রায় ২৫০০০৲ টাকা জমা হইয়াছে। ইহা সহস্র সহস্র লোকের দানের সমষ্টি যাহারা প্রত্যেকে এক আনারও কম দান করিয়াছে। আবশ্যক হইলে আরও এইরূপ দান পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যায়।

*   *   *

ইহা হইতেই দেখা যায় মরাঠীরা কিরূপ ভক্তি ও উৎসাহ সহকারে তাহাদের বীররাজা শিবাজীর সম্মানার্থে রায়গড়ে শিবাজী-উৎসব সম্পন্ন করিয়াছে। পুনা হইতে রায়গড় প্রায় ৮০ মাইল দূরবর্ত্তী। ইহা একটী ২৮০০ ফিট্ উচ্চ পাহাড়ের উপর অবস্থিত। সেখানকার রাস্তাঘাট যে কিরূপ দুর্গম তাহা আমরা সমতলদেশবাসীরা সহজে অনুমান করিতে পারিনা। সেই একদিনে তথায় প্রায় ৬০০০ লোক আহার করিয়াছে। তাহাদের আহারীয় সমস্ত দ্রব্য রায়গড় হইতে ১৮ মাইল দূরবর্ত্তী মহাদ নামক একটী নগর হইতে ভলাণ্টিয়ারগণ নিজেরা বহন করিয়া নিয়াছে। ধন্য তাহাদের উৎসাহ ও উদ্যম। বাঙ্গালীদের কি পূজা করিবার এইরূপ বীর নাই? মরাঠীদের রায়গড়, সিংহগড় প্রভৃতি পূণ্যস্থান আছে, আমাদের কি সেরূপ নাই? মহারাজা প্রতাপাদিত্য, মহারাজা সীতারাম রায় প্রভৃতি বাঙ্গালী বীরগণ হিন্দুধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কিরূপ অমিতপরাক্রমে মুসলমান সম্রাটদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন! মরাঠা শিবাজী এবং বাঙ্গালী প্রতাপ, সীতারাম প্রভৃতির উদ্দেশ্য কি এক ছিলনা? আমরা পরীক্ষা পাশ করিবার সময় ইংলণ্ডের রাজাদের ৫৬ পুরুষ পর্য্যন্ত ব[illegible]

পারি না। আমরা আজকাল প্রতাপাদিত্য, সীতারাম এবং মেনাহাতী প্রভৃতি বীরের নাম এবং ধূমঘাট, মহম্মদপুর প্রভৃতি স্থানের নাম জানিতে যেরূপ উদাসীন মরাঠীরাও একদিন শিবাজী-উৎসব সম্বন্ধে এরূপ উদাসীন ছিল। শিবাজীর বংশধর রাজা ও সর্দ্দারগণ, যাঁহার পরিশ্রমের ফলস্বরূপ এই বিস্তৃত রাজ্য ভোগ করিতেছেন, তাঁহার শেষচিহ্ন সমাধিমন্দিরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে পর্য্যন্ত যত্ন করিতেন না। অবশেষে Mr. Douglas এবং Lord Reay এই দুজনের যত্নে এ বিষয়ে সমস্ত মরাঠা জাতির দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছে। সেই সময় হইতে মরাঠা জাতির অক্লান্ত চেষ্টায় গত ১০ বৎসর যাবৎ শিবাজী-উৎসব আরম্ভ হইয়াছে। আমাদের দেশের বীরের সম্মান আমরা করিতে জানিনা। তাহাও আমাদিগকে বিদেশীর নিকট হইতে শিখিতে হয়! হায়, দাসত্বের কি বিষম পরিণাম! মরাঠীরা Lord Reayএর মত গভর্ণরের নিকট হইতে যতদূর সাহায্য পাইয়াছিলেন, রাজপুরুষদের নিকট হইতে এখন আমাদের সেরূপ আশা করা দুরাশা মাত্র। আজকালকার রাজপুরুষেরা যাহাতে এরূপ ভাব আমাদের মনে না জাগিতে পারে সে বিষয়ে সচেষ্ট। এ বিষয়ে যাহা কিছু করিতে হয় আমাদের নিজেদেরই করিতে হইবে। বীরপূজা করিতে না জানিলে হৃদয়ে বীরভাব জন্মিবে কোথা হইতে? সমস্ত বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া আজকাল প্রতাপাদিত্য-উৎসব বিস্তৃত হওয়া দরকার। পূজনীয়া শ্রীমতী সরলা দেবী যে প্রতাপাদিত্য-উৎসব এবং বীরাষ্টমী-উৎসবের সূচনা করিয়াছেন তাহাতে দেশের প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে। কিন্তু তিনি এখন বঙ্গদেশে নাই সেজন্য কি বঙ্গদেশে প্রতাপাদিত্য-উৎসব এবং বীরাষ্টমী-উৎসব হইবেনা? আমার দৃঢ়বিশ্বাস, বাঙ্গালার ছেলেরা তাহা করিবেই করিবে। বঙ্গদেশে যে কোন নূতন ভাবের সূচনা হইয়াছে বাঙ্গালীর ছেলেরাই তাহার সূত্রপাত

করিয়াছে। এই যে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি যাহা আজকাল বঙ্গের আবালবৃদ্ধবণিতার জপমালা হইয়াছে, যাহা উচ্চারণ করিতে পারিবেন না শুনিয়া সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি বঙ্গের বৃদ্ধ নেতারা এবার বরিশালে আতিথ্য গ্রহণ করিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, যাহা উচ্চারণ করার অপরাধে ফুলার-রাজ্যে শত শত ছাত্র অকাতরে পুলীশের হস্তে লাঞ্ছিত হইতেছে এবং জেলে যাইতেছে, যাহার জন্য সুরেন্দ্রবাবু পর্য্যন্ত সেদিন গ্রেপ্তার হইয়াছিলেন এবং আরও দুচার জন সেজন্য প্রস্তুত ছিলেন, তাহা প্রথম বাঙ্গালীর ছেলেদের দ্বারাই প্রচারিত হয়। গতবৎসর "ময়মনসিংহ সুহৃদ্-সমিতি"র প্রতাপাদিত্য-উৎসব উপলক্ষে যখন পূজনীয়া শ্রীমতী সরলা দেবী সেখানে নিমন্ত্রিত হইয়া যান তখন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যে ভলাণ্টিয়ারগণ নিযুক্ত ছিল তাহারা ড্রিল করিবার ইংরাজী আর সব কায়দাগুলিই বজায় রাখিয়াছিল, কেবল ইংরেজী সেলিউটের পরিবর্ত্তে "বন্দেমাতরম্" বলিত। সমুদ্রের একস্থানে একটী লোষ্ট্র নিক্ষেপ করিলে যেমন সমস্ত সমুদ্র আলোড়িক হয়, সেইরূপ "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি—যাহা প্রথম ময়মনসিংহের ছেলেদের দ্বারা প্রচারিত হইয়াছিল—এখন সমস্ত বঙ্গদেশ এমনকি সমস্ত ভারত ব্যাপিয়া বিস্তৃত হইয়াছে। এমন সময়ও ছিল যখন এই "সুহৃদ্ সমিতি"র সভ্যেরা "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া লোকের হাস্যাস্পদ হইয়াছিল। আজ সেই ধ্বনিই সমস্ত ভারতবাসীর "সঙ্কটে মধুসূদনের" স্থান অধিকার করিয়াছে। পূর্ব্বে লোকে মরিবার আগে "রাম রাম" বলিত এখন বলে "বন্দেমাতরম্"। বাঙ্গালী তাহাদের পোষা তোতাকে "রাম রাম", "রাধা কৃষ্ণ" বুলি না শিখাইয়া "বন্দেমাতরম্" শিখাইতেছে। ছেলেরা প্রথম যাহার সূচনা করে বৃদ্ধেরা পরে তাহাই গ্রহণ করেন। আমাদের বাঙ্গালীর ছেলেরা প্রতাপাদিত্য-উৎসব

করিতেছে, বৃদ্ধেরা আর কতদিন তাহাতে যোগ না দিয়া দূরে থাকিবেন? মহারাষ্ট্রদেশে শিবাজী-উৎসব উপলক্ষে মিঃ খাড়ে, মিঃ তিলক প্রভৃতি বৃদ্ধ নেতারা যেরূপ উৎসাহ-সহকারে যোগ দিয়াছেন, বঙ্গদেশে মিঃ খাড়ে এবং তিলকের স্থানীয় নেতারা কি আমাদের প্রতাপাদিত্য-উৎসবে সেরূপ যোগ দিবেন না? আমার দৃঢ় বিশ্বাস তাঁহারা এখন যোগ না দিলেও কিছুদিন পরে নিশ্চয়ই দিবেন। ভাই ছাত্রবৃন্দ, তোমরা যে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি প্রচার করিয়াছিলে আজ তাহা বঙ্গদেশের প্রতি ঘরে ঘরে নিনাদিত হইতেছে। তোমরা এখন প্রতাপাদিত্য-উৎসবও সেরূপভাবে প্রচার কর। দেখিবে, একদিন বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ইহাও দেবোৎসবের ন্যায় সম্পন্ন হইবে।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ধর।

ব্যাপ্তি ।

দুইটী পূরাণ গান শিখিলাম—

আমার মা ত্বং হি তারা

তুমি ত্রিগুণধরা পরাৎপরা ।

তোমায় জানি মা ও দীনদয়াময়ী

তুমিই দুর্গমেতে দুঃখহরা ।

তুমি সন্ধ্যা তুমি গায়ত্রী

তুমিই জগদ্ধাত্রী গো মা,

তুমি অকুলের ত্রাণকর্ত্রী

সদা শিবের মনোহরা ।

তুমি জলে তুমি স্থলে

তুমি আদ্যা মূলে গো মা,

আছ সর্ব্বঘটে অক্ষপুটে

সাকার আকার নিরাকারা ।

আর—

(বারোয়াঁ)

কেন মা তোর পাগলিনীর বেশ ।

পাগলিনীর বেশ মা তোর এলোথেলো কেশ ।

এলায়ে পড়েছে বেণী, যেন কাল ভুজঙ্গিনী,

কটিতে কিঙ্কিনী শোভে, মা তোর চরণে মহেশ ।

এই মা হইতেছেন আদ্যাশক্তি মূলপ্রকৃতি । সংসারে এত অঘটন কেন ঘটে ; এত অনিষ্ট কেন হয়, এত দুর্ম্মতির ক্রীড়া কেন চলে ?—দেখ, দুর্ব্বল জীবের দোষ নাই—তার মূল যেখানে,—সেই আদ্যাশক্তি, তিনিই থাকিয়া থাকিয়া পাগলিনীর বেশ ধরিয়া শিবকে—কল্যাণকে

পায়ে দলিতেছেন। অর্থাৎ জগতের যে আদি কারণ সেইখানেই এই বিভ্রান্তি।

জ্ঞানীনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি॥

দেবী ভগবতী মহামায়া জ্ঞানীদিগেরও চেতনা বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহে পাতিত করেন।

আমাদের প্রত্যেকের ভুলভ্রান্তি যদি জগতের এই আদিকারণের ভ্রান্তিতে গিয়া আশ্রয় পায় তবে তাহাতে সহনীয়তা থাকে না কি? বুদ্ধদেবের নিকট যে পুত্রশোকার্ত্তা রমনী পুত্রের জীবন ফিরিয়া চাহিয়াছিল, তাহাকে বুদ্ধ বলিয়াছিলে—"যে গৃহে মৃত্যু কখনও শোক দেয় নাই এমন গৃহ হইতে সরিষা চাহিয়া আন, তোমার পুত্র তা হইলে বাঁচিবে।" রমনী সারাদেশ ভ্রমণ করিয়া এমন গৃহ একটিও পাইল না যেখানে মৃত্যু তাহার করাল দাগ দাগিয়া যায় নাই। তখন তাহার শোক শান্ত হইল।

তবে ব্যাপ্তিতেই দুঃখের প্রশমতা ও সহনীয়তা। সেই ব্যাপ্তি যখন ব্যক্তজগৎ ছাড়িয়া অব্যক্ত মূলকারণ পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে তখন মনটা কতই বাড়িয়া যায়, তখনই ঘন দুঃখ তরল হইয়া ক্রমে চরাচরে মিলাইয়া যায়। তখন আর দুঃখ দুঃখ থাকে না, সুখও সুখ থাকেনা—সুখদুঃখ দুইই সেই অব্যক্তের সাক্ষাৎকারে তন্ময়তায় পরিণত হয়।

কিন্তু সুখ কি? "তারা দুর্গমেতে দুঃখহরা" কেমন করিয়া? জগতে দুঃখইত দেখা যাইতেছে, কেবলই কামনা ও অতৃপ্তির ভয়াবহতা

নিঃস্বো বষ্টিশতং
শতী দশশতং
লক্ষং সহস্রাধিপঃ
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং

ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশতাং
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং
সুরপতির্ব্রাহ্মংপদং বাঞ্ছতি।
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং, হরির্হরপদং
তৃষ্ণাবধিং কো গতঃ॥

নিঃস্ব শত চায়, শতী দশশত, সহস্রাধিপ লক্ষ, লক্ষেশ ক্ষিতিপালতা, ক্ষিতিপতি চক্রেশতা, চক্রেশ আবার ইন্দ্রত্ব, ইন্দ্র ব্রহ্মার পদ বাঞ্ছা করেন, ব্রহ্মা বিষ্ণুত্ব ও বিষ্ণু শিবত্ব—তৃষ্ণার সীমায় কে পৌঁছিয়াছে? সেই মূল হইতে ধরিয়া সর্ব্বত্রই অতৃপ্তির দাহ, বুকের রক্তপাত—মার হাতের খাঁড়ার কাজই সর্ব্বদা অবিরাম চলিতেছে। তবে "বরাভয়" এর মর্ম্ম কি? বরাভয় কোন্ পথ নির্দ্দেশ করিতেছে? আবিষ্ণুত্ব ত নয়—তারও উপরে যা কিছু, স্বরূপে লীন হওয়া, একমেব সচ্চিদানন্দে লয়—তাছাড়া আর কিছুই নয়।

সেই জন্যই পরমেশ্বর যিনি শিব, অজ, অব্যয়, অবিকারী, নির্গুণ, ব্রহ্মের নীচেই যিনি পুরুষরূপী প্রকৃতির সংযোগে বিশ্বসৃষ্টি করিতেছেন —তিনি মহাযোগী বলিয়া কল্পিত। তাঁরও যোগের প্রয়োজন নির্গুণ ব্রহ্মে লীন হওয়া।

এখন যদি বল আমি তাহা চাহিনা, আমি কামনা তৃপ্তির সুখ চাই, মা আমাকে যে বরাভয় দেখাইতেছেন তাহা তৃষ্ণাপরিতৃপ্তিবিষয়ক। তবে বলিতে হইবে তুমি অজ্ঞ ও মূঢ়, তুমি জান না যে

ন জাতুঃ কাম কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহী যবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্য্যাপ্তং—তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ॥
যা দুস্ত্যজা দুর্ম্মতিভিঃ যা ন জীর্য্যতি জীর্য্যতঃ।
যাসৌ প্রাণান্তিকো রোগঃ তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখং॥

ভোগের দ্বারা ভোগলালসার তৃপ্তি হয় না, বরং অগ্নিতে ঘৃতাহুতির ন্যায় ক্রমশই বৃদ্ধি হইতে থাকে। পৃথিবীর যত ধান্য যব সুবর্ণ পণ্য ও স্ত্রী সব যদি একজনের উপভোগের বিষয় হইত তথাপি তাহাতে তৃপ্তির পর্য্যাপ্তি হইত না। অতএব তৃষ্ণাই পরিত্যজ্য, দুর্ম্মতিগণের যাহা দুস্ত্যজ্য, বার্দ্ধক্যেও যাহার ক্ষয় হয় না, যাহা প্রাণান্তিক রোগ সেই তৃষ্ণা ত্যাগ করিলেই সুখ।

আবহমানকাল হইতে ভুক্তভোগীদের সাক্ষ্য এই যে—তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখং—প্রাণান্তিক যে রোগতৃষ্ণা তাহা ত্যাগেই সুখ। কিন্তু ইহা ত অভাবাত্মক সুখ—ভাবাত্মক সুখ কি? কোন্ ভাব বিষয়ে আদ্যাশক্তি মা আমাদের আশ্বাস ও অভয় দিতেছেন। সুখ কোথায় আছে দেখাইতেছেন? লয়েতে, ব্যাপ্তিতে, ভূমীতে সুখ—আর কিছুতেই নহে।

শ্রীসরলা দেবী।

লামা-কুমারী।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আজ রবিবার। আজ কিশোরীমোহন, হেমচন্দ্র-প্রভৃতির সহিত দার্জ্জিলিঙ যাত্রা করিবে। আজ তাহার অত্যন্ত আনন্দের দিন। তাহার বহুদিনের আশা আজ ফলবতী হইবার উপক্রম হইয়াছে; প্রথম, দার্জ্জিলিঙভ্রমণ,—দ্বিতীয়, নব্যসমাজে অবাধমিশ্রণ। কিন্তু তথাপি তাহার মুখমণ্ডল আজ যেন শুষ্ক,—যেন চিন্তাযুক্ত। ইহার কারণ কি?

দার্জ্জিলিঙযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে তাহার জীবনের যে একটি বিপদ-সঙ্কুল পরিচ্ছেদের প্রারম্ভ সূচিত হইল, তাহা সে এখনও অবগত নহে। ভবিষ্যঘটনা পূর্ব্বাবধিই মানবহৃদয়ে নিজ ছায়াপাত করিয়া থাকে, তাই কি অজ্ঞাতসারে আজ কিশোরীর মনটা এমন অন্ধকার? হইতে পারে। কিন্তু আরও একটা স্পষ্টতর কারণ বিদ্যমান রহিয়াছে।

নব্যতন্ত্রের মহিলাগণের সহিত আজ সে প্রথম পরিচিত হইবে। তাই তাহার মনে একটা অনিশ্চয়তার, একটা শঙ্কার রেখা পড়িয়াছে। তাহার কথাবার্ত্তায়, তাহার ব্যবহারে, যদি তাহার অনুপযুক্ততা প্রকাশ পায়? যখন হেমচন্দ্র প্রথম তাহাকে ইঁহাদের নিকট পরিচিত করিয়া দিবে, সে সময় কি কি করা কর্ত্তব্য, তাহা হেমচন্দ্র উত্তমরূপে শিখাইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু কার্য্যকালে যদি ঠিকটি না করিতে পারে? তাহার 'বাউ'' অর্থাৎ শিরোনমন যদি যথানিয়মের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বা কিঞ্চিৎ অল্প হইয়া পড়ে? কথায়-বার্ত্তায় যদি ইংরাজি উচ্চারণ সর্ব্বদা বিশুদ্ধতম না হয়? পদ্মায় জাহাজে সান্ধ্যভোজনের সময়, হেমচন্দ্রের শিক্ষানুসারে মহিলাগণের প্রতি তাহার 'মনোযোগে' যদি কিছু ত্রুটি

হইয়া যায়? এক কথায়, যদি তাঁহারা কিশোরীকে একটি 'জানোয়ার' ঠাওরান? সেই বিখ্যাত সুন্দরী কুমারীদ্বয়ের চারিচক্ষু যদি তাহার অলক্ষিতে ঘৃণা ও বিদ্রূপপূর্ণ মন্তব্য বিনিময় করিয়া লয়? যদি কাহারো গোলাপী অধরযুগল রেশমী রুমালের অন্তরালে গোপনে একটু হাস্য করে?

এইরূপ দুশ্চিন্তায় প্রভাতকাল অতিবাহিত হইল। ক্রমে স্নানের সময় হইল। কিশোরীর একটি কুক্কুর ছিল, তাহার নাম টম্ বা টমি। কিশোরী কখনও কখনও তাহাকে আদর করিয়া মিষ্টার টম্ বলিয়াও ডাকিত। আজ স্নান করিবার সময় সে স্বহস্তে টম্‌কেও উত্তমরূপে স্নান করাইয়া দিল, কারণ টমও তাহার সহিত দার্জ্জিলিঙ যাইবে। টম্, কিশোরীর বড়ই আদরের কুকুর। টমির যখন একমাসমাত্র বয়স, তখনই কিশোরী তাহাকে পুষিয়াছিল,—সে আজ দুই বৎসরের কথা। তখন টমি ঘেউ ঘেউ করিতে পারিত না, দৌড়িতে পারিত না, চলিতেও ভাল পারিত না। তখন, উপর-ঘরে শয়ন করিতে যাইবার সময় কিশোরী তাহাকে কোলে করিয়া লইয়া যাইত, কারণ সিঁড়ি উঠিবার শক্তি তখন টমের ছিল না। প্রভাতে আবার কোলে করিয়া নামাইয়া আনিতে হইত। তখন টমি কেবল দুগ্ধপান করিত মাত্র, আর কিছুই খাইতে জানিত না। প্রথম রাত্রে, নিজ পালঙ্কের নিম্নে, একটি ছোট ঝুড়িতে বিছানা করিয়া কিশোরী তাহাকে শোয়াইয়া দিয়াছিল। টমি এই প্রথম মার কাছ ছাড়া হইয়াছে; রাত্রে কুঁই কুঁই করিয়া কাঁদিতে লাগিল। কিশোরী তখন টমিকে ঝুড়ি হইতে উঠাইয়া নিজের বিছানায় লইল। কিশোরীকে মা মনে করিয়া টমি নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা গেল। কিশোরী যখন কোথাও বাহির হয়, টম্ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়। যদি কোন সময় টম্‌কে সঙ্গে লওয়া অসম্ভব হয়, তবে তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়া যাইতে হয়। কিশোরী যতক্ষণ ফিরিয়া না

আসে, ততক্ষণ টম্ খাদ্য স্পর্শ করে না,—তাহার ভাত যেমন তেমনি পড়িয়া থাকে। প্রভু ফিরিবামাত্র টম্ লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া অনর্থ করে। তাহার ভাবটা যেন—"আমায় ফেলে তুমি কোথায় গিয়েছিলে ?" প্রভুকে অভ্যর্থনা করা শেষ হইলে, টম্ নিশ্চিন্তমনে নিজের খাবার খাইতে থাকে। কিশোরী কত লোককে বলিয়াছে, বাড়ী ফিরিলে কুকুরে যেমন অভ্যর্থনা করে, ওরূপ অভ্যর্থনা মানুষের স্ত্রীপুত্রও করে না। কথাটা যথার্থ। যিনিই কুকুর পুষিয়াছেন, কুকুরকে ভালবাসিয়াছেন, তাঁহাকেই এ কথা স্বীকার করিতে হইবে।

অদ্য আহার করিয়া কিশোরী পান খাইল না। সাহেবী আদর্শের জন্য এই তাহার প্রথম ত্যাগস্বীকার। আহারান্তে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহার মন এত উত্তেজিত যে, কোন মতেই নিদ্রা আসিল না। ক্রমে একটা বাজিল জিনিষপত্র পূর্ব্বে হইতেই তাহার গোছান প্যাক করা ছিল। এখন দুয়ার বন্ধ করিয়া সে পোষাক পরিধান করিতে আরম্ভ করিল। তাহার ইংরাজী পোষাক প্রস্তুত হওয়া অবধি এতদিন হেমচন্দ্রের গৃহেই ছিল। এ দুই তিন দিন সন্ধ্যাবেলা সে সেখানে যাইয়া হেমচন্দ্রের উপদেশানুসারে 'পোষাক পরা' অভ্যাস করিত। গত কল্য রাত্রে পোষাক বাড়ী লইয়া আসিয়াছে। প্রধান কঠিনতা, নেকটাইটা নির্দ্দোষভাবে বাঁধা। দুই তিন দিন অভ্যাস করিয়া, এ বিদ্যাটি তাহার অনেকটা আয়ত্ত হইয়া আসিয়াছে। দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া, একা নেকটাই কিশোরী কতবার যে বাঁধিল, আর কতবার যে খুলিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। অবশেষে যখন কতকটা পছন্দসই হইল, তখন তাহার দেহ ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

একটু বিশ্রাম করিয়া, পুনর্ব্বার দর্পণের সম্মুখে গিয়া, স্বীয় নূতন উজ্জ্বল ষ্ট্র-হ্যাটটি মাথায় দিয়া দাঁড়াইল। সেই ভাবে লুব্ধনেত্রে

নিজেকে অনেকক্ষণ ধরিয়া অবলোকন করিল। তাহার পর, হেমচন্দ্র যখন তাহাকে শিয়ালদহ ষ্টেশনে মহিলাগণের নিকট পরিচিত করিয়া দিবে, তখন কিরূপ করিয়া টুপীটি তুলিয়া শিরোনমন করিবে, তাহাই বারম্বার অভ্যাস করিতে লাগিল। হেমচন্দ্র বলিয়া দিয়াছে, প্রথম আলাপে মহিলাগণ তাহার সহিত করমর্দ্দন করিবার জন্য হস্তপ্রসারণ করিবেন কি না, তাহার স্থিরতা নাই। করিতেও পারেন, না-ও করিতে পারেন। প্রথম আলাপে করাটা অত্যাবশ্যক নহে। যদি তাঁহারা হাত বাড়াইয়া দেন, তবে তৎক্ষণাৎ টুপীটি মস্তকে পুনরায় স্থাপন করিয়া করমর্দ্দন করিতে হইবে। এই ক্ষিপ্রকারিতাটুকুও অভ্যাসের ফল। আনাড়ি লোকে ওরূপ করিতে গেলে সম্ভবতঃ হ্যাটটি মস্তকে সিধাভাবে বসিবে না,—বাঁকা হইয়া থাকিবে। তাই বারম্বার কিশোরী-মোহন সে কসরৎটিও অভ্যাস করিতে লাগিল। তাহার মনে অত্যন্ত ভয় ছিল, পাছে পরিচিত হইবার সময় টুপীটি উত্তোলন করিতে একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যায়। কোনও কোনও আনাড়ি "সাহেব" প্রথমবার এরূপ করিয়াছে! তাই হেমচন্দ্র কিশোরীকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিয়াছিল। যদি ভুলিয়া যায়, তবে তাহার আর লজ্জা রাখিবার ঠাঁই থাকিবে না। তখন গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যা করাই তাহার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত অবশিষ্ট থাকিবে।

টম এতক্ষণ বাহিরে কোথায় খেলা করিতে গিয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার মনিবের দুয়ার বন্ধ। তাই সে বাহির হইতে আঁচড়াইতে ও শব্দ করিতে লাগিল।

কিশোরী দুয়ার খুলিয়া দিল। টম প্রবেশ করিয়াই এ নূতন মূর্ত্তি দেখিয়া অবাক। স্বীয় প্রভু কি না স্থির করিতে না পারিয়া, অপরিচিত ব্যক্তি অনধিকার প্রবেশ করিয়াছে ভাবিয়া অনতিউচ্চে ভেউ ভেউ করিয়া ডাকিয়া উঠিল। কিশোরী কুকুরের ভ্রম বুঝিয়া বলিল—

"টম্‌!" গলার স্বর শুনিয়া টমের তৎক্ষণাৎ সন্দেহভঞ্জন হইয়া গেল। লজ্জায় তখন সে অধোবদন। কানদুইটি পশ্চাৎভাগে গুটাইয়া, সবিনয়ে লাঙ্গুল নাড়িতে লাগিল।

কিশোরী তাহার পিঠে হাত চাপড়াইয়া বলিল—"টমি, কোথায় গিয়েছিলি? এত করে সাবান দিয়ে গা পরিষ্কার করে দিলাম, এখনি ধূলো মেখে এসেছিস?"

টম এ আদরে, তাহার পূর্ব্ব অসভ্যতার মার্জ্জনা হইয়াছে জানিয়া, কিশোরীর পদদ্বয়ের বস্ত্রাবরণ আঘ্রাণ করিতে লাগিল। তাহার মনের ভাবটা যেন—"এ আবার কি পরা হইয়াছে? এ রকম ত কখনও দেখিনি!"

কিশোরী কুকুরের গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিতে দিতে বলিল—"টম্‌ আজ আমরা কোথায় যাচ্চি তা জানিসনে বুঝি? আজ আমরা দার্জ্জিলিঙ যাচ্চি।"

টম্‌ ল্যাজ নাড়িতে লাগিল। তাহার অর্থ মানুষ কি বুঝিবে? বাল্যকালে শুনিতাম, পশুপক্ষীরা ভবিষ্যদ্দর্শী। তাহা যদি সত্য হয়, তবে টম নিশ্চয়ই মিনতি করিয়া তাহার প্রভুকে দার্জ্জিলিঙ যাত্রা করিতে নিষেধ করিতেছিল।

ক্রমে তিনটা বাজিল। কিশোরী তখন গাড়ী ডাকাইয়া, জিনিষ-পত্র লইয়া, কুকুর লইয়া, শিয়ালদহষ্টেশন-অভিমুখে যাত্রা করিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

কিশোরী যখন শিয়ালদহে পৌঁছিল, তখনও গাড়ী ছাড়িবার অনেক বিলম্ব আছে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীরা গাড়ীতে উঠিতেছে বটে, কিন্তু প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রিগণ তখনও বড় একটা কেহ আসে নাই। কিশোরী নিজের জিনিষ-পত্র একটা গাড়ীতে উঠাইয়া,

কুলীকে বিদায় করিয়া, চুরুট মুখে, পেণ্টালুনের পকেটে বামহস্ত প্রবেশ করাইয়া দিয়া, অত্যন্ত গম্ভীরভাবে প্ল্যাটফর্ম্মের উপর পদচারণা করিতে লাগিল।

আকাশে তখন অল্প অল্প মেঘ উঠিতেছে; একটু বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে হেমচন্দ্রের আর্দ্দালি আসিয়া তাহাকে সেলাম করিল। কিশোরী জিজ্ঞাসা করিল—"তুমারা সাহেব কাঁহা?"

আর্দ্দালি বলিল—"হজুর, সাহেব তো হামকো লাগিজ উগিজ সাথ ভেজ দিহিন হ্যায়। সাহেব মালুম, ঘোষ মেম-সাহেব লোগকে সাথ আবেঙ্গে।"

ইহা শুনিয়া কিশোরী নিজের গাড়ী দেখাইয়া দিল; আর্দ্দালি জিনিষপত্র গুলা তাহাতে বোঝাই করিতে লাগিল।

আর কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর, এক বিপুলকায় ঘুড়ী-গাড়ী আসিয়া বাহিরে দাঁড়াইল। হেমচন্দ্র এক লম্ফে অবতরণ করিয়া, মহিলাগণকে নামিতে সাহায্য করিতে লাগিল। মিষ্টার ঘোষ আসেন নাই, হেমচন্দ্রই ইহাঁদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিয়াছে। তখন মেঘটা একটু ঘনীভূত,—বায়ুও প্রবলতর হইয়াছে। কুমারীদ্বয়ের বাহুল্য বস্ত্রাদি বাতাসে উড়িতে লাগিল। দেখিয়া, কিশোরীমোহনের মনে Tempest নাটকের ছবিতে মিরান্দার চিত্র মনে পড়িল।

কিশোরী বেড়াইতে বেড়াইতে প্ল্যাটফর্ম্মের প্রান্তদেশ অভিমুখে গেল। ইহাঁরা আসিলে সে আবার এই দিকে আসিবে। এখনি দেখা হইবে, হেমচন্দ্র তাহাকে ইণ্ট্রোডিউস্ করিবে। ভালয় ভালয় সে পরীক্ষাটায় উত্তীর্ণ হইয়া গেলে কিশোরী নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচে।

দূর হইতে কিশোরী যখন দেখিল ইহাঁরা প্ল্যাটফর্ম্মে আসিয়াছেন, তখন সে ধীরপদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতে লাগিল।

টুপী খোলার কথাটা—মনে আছে ত? বেশ মনে আছে।

ঐ, অদূরে, ঘোষজায়া কন্যাদুইটি সহ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের তিনজনেরই পরিধানে রেশমের শাড়ী—তবে ঘোষজায়ার শাড়ীখানি শুভ্রবর্ণ; মেয়েদুইটীর শাড়ী রঙীন্। একখানি ঈষন্নীল,—অপরখানি বাদামী রঙের। ঘোষজায়ার মস্তকে একটি টুপী—যাহার নাম এখন ব্রাহ্মিকা টুপী হইয়াছে। টুপীর পশ্চাদ্ভাগ হইতে একখণ্ড সুদীর্ঘ শিফঁ ঝুলিতেছে। এইরূপ বিলম্বিত দীর্ঘ শিফঁখণ্ড বিলাতে অনুমান ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে ফ্যাসান্ ছিল। সে সময়ের অঙ্কিত ছবিতে ইহা দেখা যায়। নব্যতন্ত্রের বঙ্গমহিলাসমাজ সম্ভবতঃ সেই সময়েই উহা গ্রহণ করিয়া থাকিবেন। কিন্তু বিলাতে পরবৎসরই উহা পুরাতন হইয়া গেল,—পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। কিন্তু নব্যবঙ্গ-মহিলার বেশে এখনও তাহার স্মৃতিচিহ্ন দেখা যায়। কুমারীদ্বয়ের মস্তক, কেবলমাত্র লেসের দ্বারা আবৃত। তাঁহারা ঐ শিফঁব্যাপারটি পছন্দ করেন না,—বলেন, উহা পরিলে বুড়ো বুড়ো দেখায়।

কিশোরীমোহন ক্রমশঃ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। তাহার অনতিদূরেই যে সৌন্দর্য্যের বিকাশ হইয়াছিল, তাহা উপভোগ করিবার সময় এখন তাহার নহে।

নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র হেমচন্দ্র ইংরাজিতে বলিল—"হেল্লো—কতক্ষণ?"

"অধিক্ষণ না।"—কিশোরী দেখিল, মহিলারা কেহ মৃত্তিকা পানে, কেহ অন্যদিকে চাহিয়া রহিয়াছেন। সঙ্গে সঙ্গে হেমচন্দ্র বলিল—"Ladies, allow me to introduce my friend."

এই কথা বলিবামাত্র মহিলাগণ সস্মিতবদনে কিশোরীমোহনের প্রতি চাহিলেন। হেমচন্দ্র বলিল—"Mr. Nag—Mrs. Ghose, Miss Ghose, and Miss Vina Ghose."

কিশোরীমোহন টুপী তুলিয়া অভিবাদন করিল। সঙ্গে সঙ্গে মিসেস্ ঘোষ নিজ কর প্রসারণ করিয়া দিলেন।

কিশোরী ঝটিতি টুপীটি মাথায় বসাইয়া তাঁহার সহিত করমর্দ্দন করিল। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে একটা দম্‌কা বাতাস আসিয়া হতভাগ্য কিশোরীমোহনের টুপী উড়াইয়া প্ল্যাটফর্ম্মের উপর ফেলিল। টুপীটি প্ল্যাট্‌ফর্ম্ম স্পর্শ করিবামাত্র বায়ুবেগে গড়াইয়া যাইতে লাগিল।

কিশোরী সেখান হইতে এক লম্ফ দিয়া টুপীর পশ্চাদ্ধাবন করিল। গড় গড় করিয়া টুপীও যত গড়াইয়া যায়, কিশোরীও ক্ষিপ্তের মতন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ লম্ফ দিয়া ছুটে। আর এদিকে,—'আমার মনিব কোথায় যাইতেছে' ভাবিয়া টম্ কুকুরটিও উর্দ্ধলাঙ্গুল হইয়া কিশোরীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে লাগিল।

অনেক দূর গিয়া অবশেষে টুপী গেরেপ্তার হইল। তখন কিশোরী থামিয়া, টুপীটি হাতে করিয়া, চিন্তা করিবার অবসর পাইল।

সময়বিশেষে দুই এক মুহূর্ত্তের মধেই মানুষ যে কত গভীর চিন্তা করিতে পারে, তাহা ভুক্তভোগী ব্যক্তিমাত্রই অবগত আছেন।

কিশোরী চিন্তা করিতে লাগিল—ছি ছি, ছি ছি—এ কি চলান্‌টা চলাইলাম! এতক্ষণ তাহারা মুখে রুমাল দিয়া না জানি কি হাসিই হাসিতেছে! হেমচন্দ্র ত সাবধান করিয়া দিয়াছিল,—তাহা সত্ত্বেও টুপীটা মাথায় ভাল করিয়া বসাইতে পারি নাই। পারিলে কখনই উড়িয়া পড়িত না। ছি ছি, কি কেলেঙ্কারি, কি কেলেঙ্কারি। উঃ—এ কালামুখ আর তাহাদিগকে দেখাইব কোন লজ্জায়? এই বেলা এখান হতেই সরিয়া পড়ি, দার্জ্জিলিঙ গিয়া আর কাজ নাই।

দুই এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই কিশোরীমোহনের মস্তিষ্ক দিয়া উপরোক্ত-প্রকার চিন্তাস্রোত ভাসিয়া গেল। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিল, দূরে হেমচন্দ্র তাহারই সন্ধানে আসিতেছে। সুতরাং পলায়নও অসম্ভব।

টুপীটি মাথায় দিয়া কিশোরী ফিরিল। তাহার মুখ-চক্ষু লজ্জায়, ক্ষোভে, ধিক্কারে পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে।

হেমচন্দ্রের সহিত মহিলাগণের নিকট ফিরিয়া আসিবামাত্র, মিস্ ঘোষ বলিলেন—"আপনার টুপীটি জখম্ হয়নি ত ?"

কিশোরীর কণ্ঠস্বর তখন কোথায় যেন হারাইয়া গিয়াছে। অনেক কষ্টে সে বলিল—"না।"

হেমচন্দ্র বলিল—"ঝড়-বাতাসের দিনে টুপীজিনিষটে সময়ে সময়ে বড়ই ধোঁকা দেয়। সেই জন্মে আমি যখনি কোনও খানে যাতায়াত করি, একটা দ্বিতীয় টুপী সঙ্গে নিই। একবার চলন্ত রেলগাড়ী থেকে আমার টুপী উড়ে পড়ে গিয়েছিল, সেই অবধি আমি সাবধান হয়েচি ”

এ কথা শুনিয়া, কিশোরী কতকটা প্রকৃতিস্থ হইল। তবে, হেমচন্দ্রের মত লোকেরও টুপী উড়িয়া যায় ? এখন তাহার নিজের অপরাধ অনেকটা লঘু বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

শ্রীমতী বাণা বলিলেন—"মা,—বাবার বিলেতে সেই টুপী উড়ে যাওয়ার গল্পটা বল না।"

ইহা যেন কিশোরীর দগ্ধহৃদয়ে অমৃতসিঞ্চনের ন্যায় বোধ হইল। মিষ্টার ঘোষ, যে অমন প্রবল সাহেব, তাঁহারও টুপী উড়িয়া গিয়াছিল! —এবং যেখানে সেখানে নয়, বিলাতে! তবে আর কিশোরীর টুপী উড়িয়াছে বলিয়া দুঃখ কিসের ?

মিসেস ঘোষ বলিলেন—"সে আমি তাঁর মত সে রকম মজা করে বলতে পারব না। তিনি ত এখনি আসবেন হাইকোর্ট থেকে, তাঁকেই বলতে বলিস্।"

বীণা বলিল—"তিনি কখন আসবেন্! তিনি আসতে আসতে জুড়িয়ে যাবে—এখনই সে গল্প জমবে ভাল। বল, বল।"

মিসেস্ ঘোষ বলিলেন—"সেও ষ্ট্রাণ্ড্। হর্বর্ণ দিয়ে যাচ্ছিলেন,

এমন সময় হঠাৎ হাওয়া এসে টুপী উড়িয়ে ফেল্লে। এত হাওয়া যে টুপীটা পড়েই মেলস্পীডে গড়াতে লাগল। তিনিও টুপীর পিছু পিছু উন্মত্ত হয়ে ছুট্‌তে লাগ্‌লেন। সুমুখে একখানা অমনিবস্‌ আসছিল, ভাগ্যিস্‌ একটা পুলিসম্যান্‌ তাঁকে ধরে ফেল্লে, নইলে অমনিবসের নীচে পড়ে প্রাণটা যেত। সেই অমনিবসের চাকাতেই টুপী গুঁড়ো হয়ে গেল।”

হেমচন্দ্র বলিল—“কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! তার পর কি হল?”

মিসেস্‌ ঘোষ বলিয়া যাইতে লাগিলেন—“সেখানে কাছাকাছি কোথাও টুপীর দোকানও ছিল না,—আর থাকলেও, সঙ্গে টাকা ছিল না। চট্‌ করে একটা ক্যাব ডেকে, তার মধ্যে ঢুকে, বাড়ী ফিরে এলেন।”

মিস্‌ ঘোষ বলিলেন—“মা, সে ক্যাবির উপদেশটাও বলে দাও।”

“ক্যাবিটা আগাগোড়া সমস্ত দেখেছিল কি না; বাড়ী পৌঁছে দিয়ে ভাড়াটি নিয়ে বল্লে—মশাই, টুপী উড়ে গেলে কি করতে হয় জানেন না? Pickwick Papers পড়বেন—Pickwick Papers পড়বেন।”

মিস্‌ বীণা ঘোষ ব'ললেন—“Pickwickএরও ঠিক্‌ ঐ বিপত্তি হয়েছিল কি না। সেই যে ছবিটে আছে, যখনি দেখি, হেসে আর বাঁচিনে। টুপী গড়িয়ে যাচ্চে আর পিছু পিছু Pickwick বেচারি—একে মোটা মানুষ—তাতে বুড়ো—থপোস্‌ থপোস্‌ করে দৌড়চ্ছে। Pickwickএ সব ছবির চেয়ে এইটেই আমার মজার লাগে।” বলিয়া তিনি হাসিতে লাগিলেন।

ইহা শুনিয়া কিশোরীর মন হইতে সকল দুঃখই দূর হইল।

হেমচন্দ্র বলিল—“উপদেশটা কি?”

মিস্‌ ঘোষ বলিলেন—“উপদেশটা হচ্চে, টুপীটি উড়ে গেলে,

খবরদার তার পিছু পিছু দৌড়াবে না। ঠিক্ দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। আর পাঁচজনে যেমন হাস্‌বে, তুমিও তেম্‌নি হাস্‌বে,—যেন কত মজাই হচ্চে। তার পর, কেউ একজন টুপীটি ধরে তোমার হাতে এনে দেবে এখন।"

হেমচন্দ্র অত্যন্ত অভিভূত হইবার ভান করিয়া বলিল—"বাঃ—বাঃ—এ উপদেশ মহামূল্য। Dickens, তুমিই ধন্য। আহা, ডিকেন্সের বই পড়লে যেমন সাংসারিক জ্ঞান লাভ করা যায়, তেমন আর কিছুতেই নয়।"

বীণা বলিলেন—"বাবা ত বলেন—যাহা নাই ডিকেন্সে, তাহা নাই ভিকেন্সে।"

শুনিয়া সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন। মিসেস্ ঘোষ বলিলেন—"এ সব আলোচনা পরে হবে এখন। এখন আমরা গাড়ীতে উঠি আগে।"

হেমচন্দ্র বলিলেন—"আপনারা কি মেয়েদের গাড়ীতে উঠবেন না কি? চলুন না দামুকদিয়াঘাট অবধি একত্রেই যাই গল্প কর্‌তে কর্‌তে।"

"তোমাদের গাড়ীতে হয়ত একগাদা ইংরেজ-টিংরেজ উঠবে, সে দরকার নেই।"

হেমচন্দ্র বলিল—"এখনও অনেক গাড়ী পুরো খালি রয়েছে, আমরা পাঁচ কালোমূর্ত্তি উঠে বসে থাকি আসুন, তাহলে আর কোনও ইংরেজ ঘেঁসতে সাহস কর্‌বে না।"

এই কথা শুনিবামাত্র মিস্ ঘোষ কৃত্রিম কোপ সহকারে বলিলেন—"আপনি আমাদের কালো বলছেন? আপনাদের সঙ্গে আমরা যাব না, যান।"

হেমচন্দ্র ব্যস্ত হইয়া বলিল—"কি আশ্চর্য্য, আপনি রাগ কর্‌লেন?

আমি আপনাদের একটু flatter ক'রে কালো বল্লাম বইত নয়। আজ-কাল কালোরঙের যে বড় কদর, তা শোনেন নি ?"

"একজন বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, মানুষের শাদা রঙই কুশ্রী। শ্যামবর্ণ, প্রকৃতির নিজের গায়ের রঙ। আকাশ শ্যাম, সমুদ্র শ্যাম, গাছপালা শ্যাম—"

মিস্ ঘোষ বাধা দিয়া বলিলেন—"বৈজ্ঞানিক না কবি বলুন।"

হেমচন্দ্র কিয়ৎকাল স্মরণ করিবার ভান করিয়া বলিল—"হ্যাঁ—হ্যাঁ—ঠিক্ তাই। কবিই বটে—কবিই বটে।"

"এবং সে কবিটি আপনি।"

হেমচন্দ্র হাত যোড় করিয়া বলিল—"দোহাই আপনার। এ জীবনে অনেক পাপ করেছি বটে—কিন্তু ও পাপটি করিনি। আমি কখনও কবিতা লিখিনি। সে যদি বলেন—তবে এই আমাদের মিষ্টার নাগ। ইনি একজন কবি বটেন।"—বলিয়া হেমচন্দ্র কিশোরীর পিঠ ঠুকিয়া দিল। মিস্ ঘোষ বলিলেন—"মিষ্টার নাগ, আপনি কবি ?"

এতক্ষণ কথাবার্ত্তায় কিশোরীর মনটা বেশ প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছিল। হাসিয়া সে উত্তর করিল—"আপনি এমন অসম্ভব কথায় বিশ্বাস করেন ?"

বীণা বলিলেন—"নাগ ! নাগ !—আপনার পুরো নামটি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি ?"

কিশোরী উত্তর দিবার পূর্ব্বে হেমচন্দ্র বলিয়া দিল—"কিশোরীমোহন নাগ।"

শুনিয়া মিস্ ঘোষ বলিয়া উঠিলেন—"ওঃ—হো। তাই বলুন। শুধু মিষ্টার নাগ শুনলে বুঝতে পারব কি করে ? মাসিকপত্রে ওঁর ত কত কবিতা পড়েছি।"

বীণা বলিলেন—"এবারকার বঙ্গদর্পণে 'বসন্তে কুহুধ্বনি' কবিতা আপনিই ত লিখিয়াছেন ?"

কিশোরী মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া উত্তর করিল—"ওরকম করে যদি ধরে ফেল্লেন, তাহলে আসামী কবুল জবাব করছে।"

এই হাসির মধ্যে মিষ্টার ঘোষ আসিয়া পৌঁছিলেন।

কিশোরী তাঁহারও নিকট পরিচিত হইল। ক্রমে ভীড় হইতেছে দেখিয়া, মহিলাকক্ষে মিসেস্ ঘোষ প্রভৃতিকে উঠাইয়া দেওয়া হইল। কিশোরী ও হেমচন্দ্র অন্য গাড়ীতে আরোহণ করিল। গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

সমসাময়িক ভারত।

রাষ্ট্রনীতি।

(১)

ভারত-সৈন্যমণ্ডলীর একজন সেনা-নায়ক, প্রসিদ্ধ "ব্যুসিফ্যালসের" সমাধিস্তম্ভ দর্শনার্থ যাত্রা করিবার প্রস্তাব করেন। উপস্থিত অন্যান্য সেনা-নায়কেরা বলিয়া উঠিল;—"যে তাজ দেখিয়াছে, সে এখন মরিতে পারে; তা-ছাড়া, এই ব্যুসিফ্যালস্ নিগার্‌টা আবার কে ?" ব্যুসিফ্যালস্, অ্যালেক্‌জান্দারের ঘোড়ার নাম—এই সেনা-নায়কেরা তাহা জানিত না; তাহারা মনে করিয়াছিল,

—একজন "নিগার্"—একজন হিন্দু। কেননা, তাহাদের ধারণা, নিগার ও হিন্দু—একই কথা। তা-কেন, লর্ড স্যালিস্‌বারি, ইংলণ্ডীয় পার্লেমেণ্ট সভার সমক্ষে এইরূপ ভাবের কথাই বলিয়াছিলেন। ইংলণ্ডীয় আমীরওম্‌রাওদের যে উদ্ধত অবজ্ঞার ভাব স্বভাবসিদ্ধ, সেইরূপ একটা অবজ্ঞার ভাবে তিনি "কালা আদ্‌মির" উল্লেখ করিয়াছিলেন। এক সময়ে কোন প্রতিনিধি, ভারতের দুঃখদুর্দ্দশার কথা উপস্থিত করায় তিনিই ত মুখথাব্‌ড়া দিয়া রুক্ষভাবে এক কথায় তার মুখ বন্ধ করিয়া দেন। স্যালিস্‌বারি বলিলেন ;—"এই সব কপটতায় প্রয়োজন কি ?...হিন্দুরা বেশ জানে, তাহারা "এক উচ্চতর জাতির" শাসনাধীনে অবস্থিতি করিতেছে ; ভাবটা এই—কালো চাম্‌ড়ার লোক, লাল চাম্‌ড়ার লোক, অথবা হল্‌দে চাম্‌ড়ার লোক—ইহাদের শাসনকর্ত্তা যদি সাদা চাম্‌ড়ার লোক হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের ভাগ্য বলিয়া মানা উচিত, এবং ইহা "বিধি-প্রেরিত" মনে করিয়া, এবিষয়ে তাহাদের মতান্তর কিংবা কোন মতামত থাকাই উচিত নহে ;—শুধু অবনত মস্তকে ধন্যবাদ করাই তাহাদের একমাত্র কাজ।

মনে কর, একজন ভারত-ভ্রমণকারী বিদেশী—যাহার মনে পূর্ব্ব-সঞ্চিত কোন অন্ধসংস্কার নাই (অন্তত সে এইরূপ মনে করে)—এদেশ-সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় জানিবার জন্য লালায়িত হইয়া অমুক বাসিন্দা ইংরাজের দ্বারে কিংবা বাসিন্দা ফরাসীর দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইল,—যিনি ১৫ বৎসর কাল এদেশে অবস্থিতি করিতেছেন। ভেবে দেখ,—পো-নে-রো বৎসর! তাঁহার মুখ হইতে দুই একটা কথা শুনিয়াই সেই অবোধ-সরল ভ্রমণকারীর যেন জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যায় ; তাঁহার মনে হয়, যেন প্রায় দেশীয় লোকের মুখের কথাই তিনি শুনিতেছেন। যে ব্যক্তি এত দিন এদেশে আছে, সে এদেশের কথা ঠিক্ জানিবে না ত আর জানিবে কে ? তাঁহার ক্ষীণদৃষ্টি-রোগই

থাকুক, আর তিনি গিরিগর্ত্তের মধ্যেই আবদ্ধ থাকুন, তাহাতে কি আসিয়া যায়...সত্য বটে, নবাগত পর্য্যটক, জাহাজ হইতে নামিয়াই মনে করেন, তিনি সমস্তই আবিষ্কার করিয়াছেন এবং যাহা খুব জানা-কথা, বাসিন্দা ইংরাজের কাছে তাহার ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হয়েন; তাই তাঁহার কথায়, বাসিন্দা ইংরাজের ধৈর্য্য থাকে না। নবাগত পর্য্যটকের অন্তরে সহজ সহানুভূতি বিদ্যমান; তাঁহার হৃদয় মমতা-রসে সিক্ত; তাই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই সব সৎ-"বর্ব্বরদের" সমীপে গমন করেন,—যাহাদের আকৃতি মনুষ্যের মত, যাহারা অতীব ভদ্র, এবং খুব নিকটে গিয়া দেখিলে—যাহাদের সভ্যতা আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাসিন্দা ইংরাজের হৃদয় এরূপ টকিয়া গিয়াছে যে, তাঁহার নিকট এই প্রকার হৃদয়ের অনস্ত উচ্ছ্বাস প্রত্যাশা করা যায় না। এই দুই পৃথক্ জাতির মধ্যে সম্বন্ধসূত্র বন্ধন করিতে হইলে, বিশেষ দক্ষতা চাই—আন্তরিক সহানুভূতি চাই। অনেক দিন একত্র বাস করিতে করিতে, এই সূত্রটি প্রসারিত হইতেও পারে, ছিঁড়িয়া যাইতেও পারে; সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু বাসিন্দা ইংরাজ, চিরকালই তফাতে-তফাতে বাস করায়, অন্ধ-সংস্কারের গুল্মজালে সর্ব্বদাই আচ্ছন্ন হইয়া থাকেন। তাঁহার নিকট আর কিছু প্রত্যাশা করা যায় না।

তাহাতে যদি আবার এই বাসিন্দা য়ুরোপীয়, ইংরাজ রাজপুরুষ হন, তাহা হইলে ত সোনায় সোহাগা। ইঁহারা এদেশের প্রতি সহানুভূতি করিতে একেবারেই অসমর্থ। জঙ্গলের মধ্যে থাকিয়া তাঁহারা যেরূপ ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন, তাহা অতীব বিষাদময়। কলিকাতায় থাকিয়া তাঁহারা লণ্ডনের আমোদ-প্রমোদ হইতে বঞ্চিত। তাই, এই ঔদাস্যপ্রদ প্রবাসভূমির প্রতি তাঁহারা নিতান্ত বিমুখ। আমার মনে হয়,—সামাজিকতা দূরে থাকুক, কৌতূহল দূরে থাকুক,

শাসনাধীন প্রজাবর্গকে অন্তত ভাল করিয়া জানিবার জন্যও,—তাহাদের সহিত আলাপ পরিচয় করা, আবশ্যক হইলে তাহাদের ধরণে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা, শাসনকর্ত্তৃপুরুষদিগের নিতান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহারা সেরূপ করেন না। কোন উদ্ধত প্রচ্ছন্ন দেবতার ন্যায়, তাঁহারা দূর হইতে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন। প্রজাবর্গকে তাঁহারা অবজ্ঞা করেন না—তাহাদের সম্বন্ধে তাঁহারা অনভিজ্ঞ। কেহ কেহ মনে করেন, এই অজ্ঞতার মধ্যেই তাঁহাদের একটা জোর আছে ;—এই দূরত্বই, তাঁহাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি (Prestige) বজায় রাখিয়াছে। ভাল! তাঁহাদের প্রতাপ-প্রতিপত্তি তাঁহারা রক্ষা করুন ; কিন্তু এই কারণেই, তাঁহারা দেশীয় লোকের চরিত্র, মনোভাব, অভাবাদি বুঝিতে পারেন না, কিংবা ভুল বুঝিয়া থাকেন।

"বাবু"দের লেখাগুলা জঞ্জাল-ঝুড়ির মধ্যে ফেলিয়া দেও, কংগ্রেসের কথায় কানে আঙ্গুল দিয়া থাক,—ইহাই তাঁহাদের সহজ-শোভন-সিদ্ধান্ত! যাহারা দেখিয়াও দেখিবে না, শুনিয়াও শুনিবে না—যাহাদের এরূপ অবিচলিত "একগুয়ঁ্যামি"—সেই ইংরাজ রাজপুরুষদের বিচার-সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমি অসমর্থ। পক্ষান্তরে, দেশীয় লোকের কথা যে অসঙ্গত নহে, তাহা আমার স্পষ্টই উপলব্ধি হয়। যে পরিমাণে, সরকারী কর্ম্মচারীদিগের মতামত একদেশদর্শী ও রুদ্ধদ্বারিতা-দুষ্ট, সেই পরিমাণে দেশীয় লোকের মতামত সারবান ও বরণীয় বলিয়া আমার মনে হয়।

দেখ পিয়ের-লোটি! আমার বোধ হয়, সেকন্দরাবাদের ইংরাজেরা তোমাকে কখনই মার্জ্জনা করিবে না। কোন খ্যাতনামা ব্যক্তি যখনই এদেশে ভ্রমণ করিতে আইসে—তাঁহার নিকট নিমন্ত্রণ-পত্র চারি-দিক্ হইতে ঝাঁকে-ঝাঁকে উড়িয়া আইসে। তোমার এতদূর ধৃষ্টতা, তুমি এই সকল নিমন্ত্রণপত্র উপেক্ষা করিয়াছিলে। "কালা আদ্‌মির"

সংসর্গে তুমি আনন্দলাভ করিয়াছিলে। হায়, কি রুচি-বিকার! এমন কি, তুমি সাহস করিয়া বলিয়াছিলে,—ভারতবাসীদিগকে দেখিবার জন্যই আমি ভারতবর্ষে আসিয়াছি। এ যে চূড়ান্ত ধৃষ্টতা! তাই কতকগুলি লোক মনে করিল, ইহার দরুণ তোমার উপর শোধ তুলিবে;—তাহারা প্রচার করিল, তুমি রুষের নিযুক্ত গোয়েন্দা...

ভাল! আমাকে গোয়েন্দাই বলুক্, আর বদমাইস্ই বলুক্,—এইরূপ অপবাদ-রটনার ঝুঁটিসত্ত্বেও,—আমার বিশ্বাস, দেশীয় লোকদিগের সহিত কথোপকথনে আমি সমধিক লাভবান্ হইব। দেশীয়দিগের দুঃখদুর্দ্দশা, ও রাজপুরুষদের সুখবাদিসুলভ রঞ্জিত চিত্র—এই উভয়ের মধ্যে প্রভূত ব্যবধান। ইংরাজের ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি শোনো—ইহা উৎসবের আনন্দধ্বনি; অপর ঘড়িটির ঘণ্টাধ্বনি শোনো—ইহা মৃত্যু-সংবাদের শোকধ্বনি...'

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আমার শিকারকাহিনী।

"Oh jealousy! Thou bone of pleasing friendship,
Thou worst invader of our tender bosom;
How does thy rancour poison all our softness,
And turn our gentle nature into bitterness!"

চুরুটের ধূমে বনভূমি ধূমায়িত করিয়া আমি গাউজের পাহারায় নিযুক্ত, এবং একএকবার সতৃষ্ণনয়নে হত হরিণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া আপন মনে আপনি একটুকু আনন্দ অনুভব করিতেছি;—এমন সময় শাঁ শাঁ করিয়া অন্য প্রান্ত হইতে,

অন্যান্য হাতীসহ বাবু আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মনে ভাবিয়াছিলাম, আজ বাবু না-জানি আমার শিকার দেখিয়া কত সুখী হইবেন,—আমার কৃতকার্য্যতায় কত ধন্যবাদ দিবেন, কতই উৎসাহিত হইবেন। কিন্তু হায়! ধন্যবাদ দূরের কথা, বাবুর মুখ দেখিয়া, আমার চক্ষুস্থির হইল, আমি অবাক হইয়া রহিলাম। তাঁহার মুখ যেন ভাদ্রের ভরা-মেঘ। যে মুখ, আমি আশা করিয়াছিলাম,—শারদ চন্দ্রের মত প্রীতি-প্রফুল্ল দেখিয়া কতই রহস্যের কথা পাড়িব,—কিন্তু হায়! সে মুখ আজ মলিন; শুভ্ররশ্মির পশ্চাতে অন্ধকারের কাল ছায়া বিরাজমান। যেন চাঁদে আজ গ্রহণ লাগিয়াছে। বুঝিলাম,—স্পষ্ট অনুমান করিলাম, মানুষের স্বভাবসিদ্ধ হিংসা, বাবুকে আক্রমণ করিয়া বসিয়াছে। তিনি আজ আমার শিকার দেখিয়া বেশ হৃদয়ভেদী যন্ত্রণা অনুভব করিতেছেন। কি করেন, কিছু না বলাও শিষ্টাচারবিরুদ্ধ। তাই, কফমিশ্রিত ভাঙ্গা গলায় কহিলেন, "ভালই হইয়াছে, শিকার মন্দ হয় নাই।" বাবুর ভাব দেখিয়া, ও তাঁহার কথার ভঙ্গিমা শুনিয়া আমার প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগিল।

মনে মনে কত কি ভাবিলাম, হৃদয়ের মধ্যে যেন একটা দুঃখের তুফান প্রবলবেগে প্রবাহিত হইল। ভাবিলাম, সংসারের একি ব্যবহার! এই বিস্তীর্ণ সংসারের কোথাও কি একবিন্দু প্রেম নাই, প্রেম কি স্বার্থের বিনিময়! কেহ কি অন্যের দুঃখে দুঃখী হয় না? কষ্টে প্রাণ কাঁদে না, এবং উল্লাসে প্রীতি-উৎফুল্ল হয় না! কেবলই কি সংসারে হিংসা ও ঈর্ষার তুমুল সংঘর্ষণ? জিঘাংসার দারুণ অট্টহাসি! ন্যায়ের প্রতি অন্যায়ের দ্বেষ, কৃতীর প্রতি সাধারণের খড়্গহস্ততা! দার্শনিক! বৃথা তুমি বলিতেছ,—"আত্মসম্মানে মানুষের যত না সুখ, আপনার প্রাণ-প্রিয়জনের উপযুক্ত সম্মানে তাহা হইতেও সহস্রগুণে বেশী সুখ।" কই সংসারে মানুষের প্রাণে এ ভাব ত দেখিতে পাই না!

আশৈশব তন্ন তন্ন করিয়া সংসার খুঁজিয়া বেড়াইলাম, সকলেরই মুখে কবির একই কথা—

"অমিয়সাগরে সিনান করিতে সকলি গরল ভেল"।

বুঝিলাম,—ইহা কেবল কথার কথা, মানুষের উচ্ছৃঙ্খল ভাষার এ কথাটাও এক চঞ্চল উচ্ছ্বাস! এ রহস্যের মূলে ধুয়াঁর মন্দির, অথবা জলের রেখা। বাস্তবিক হিংসা-ঈর্ষার অট্টহাসি লইয়া পৃথিবী অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কোথাও সুখ নাই, কোথাও শান্তি নাই, মানুষ ভ্রান্তি ও মোহে মজিয়া সময় সময় আত্মহারা হয়।

বাবুর প্রতি আমার যতটা স্নেহ, যতটা বিশ্বাস, বুঝিলাম তুলনায় তাঁহার প্রতিদানের অংশ অতি ক্ষুদ্র, অতি নীচ। প্রেমিক বলে—"প্রেম প্রতিদান চায় না; প্রেমের বাজারে বেচা-কেনা বিনিময় নাই।" স্বীকার করিলাম এ কথা সত্য—ভালবাসিয়া যত সুখ, ভালবাসা পাইয়া তত সুখ হয় না। কিন্তু ভালবাসার জনকে ভালবাসা না দেয় কে? তাহা যদি কেহ উপেক্ষা করে ত প্রাণে বড় লাগে—প্রাণ ভাঙ্গিয়া যায়।

এই সংসারে যাবতীয় পদার্থেই প্রচ্ছন্নভাবে অগ্নি বিনিক্ষিপ্ত। চক্‌মকি পাথর, কি বিলাতী দিয়াসলাই ইত্যাদি হইতে যেমন ঈষৎ ঘর্ষণে অগ্নিকণা নির্গত হয়, মনুষ্যের হৃদয়ের অন্তস্তলে যে আগুন অন্তর্নিহিত, তাহাও অবস্থানভেদে প্রবৃত্তির ঈষৎ সংঘর্ষণে জ্বলিয়া উঠে। ভিক্ষুকের বুভুক্ষানিনাদ, দীনের কাতরোক্তি, শোকার্ত্তের আর্ত্তনাদ, আশ্রিতের এবং শিশুর প্রাণ-খোলা সরল ব্যবহার প্রভৃতি দ্বারা অন্তর্নিহিত যে অনল জ্বলিয়া উঠে, তাহার দাহিকা শক্তি নাই, কিন্তু প্রতিভা আছে; সে সিত-স্নিগ্ধ অমিয়-আলোকে নরসত্ত্ব উৎফুল্লপ্রাণে মগ্ন হইয়া থাকে। আর এতদ্ভিন্ন হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে একরূপ আগুন জ্বলিয়া উঠে, সে আগুনের প্রতিভা নাই, কিন্তু দাহিকা শক্তি বিষম;

তাহাতে শান্ত হৃদয় জ্বলিয়া-পুড়িয়া অঙ্গার হইয়া যায়, বুদ্ধি-বিবেক-আত্মসম্মান প্রভৃতি সৎবৃত্তিগুলি, সসঙ্কোচে মানবহৃদয় হইতে দূরে সরিয়া পলায়। সে আগুনের নাম—পরশ্রীকাতরতা, হিংসা, ঈর্ষা এবং দ্বেষ। এই বৃত্তিগুলি কম-বেশ সকলের স্বভাবেই আছে। যিনি সংযমী তিনি তাহা চাপিয়া রাখিতে কৌশল করেন, আর অকৌশলী, উচ্ছৃঙ্খল, প্রমত্ত, অর্ব্বাচীন, তাহাতে জ্বলিয়া নিজে মরে এবং অপরকেও দগ্ধ করে। দয়া, দাক্ষিণ্য, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি সৎগুণ-নিচয় যেরূপ মনুষ্যচরিত্রে সর্ব্বদা লক্ষিত হয়, এবং প্রকাশ পাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, এই পিশাচবৃত্তি হিংসা তেমন সহজে প্রকাশ পাইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয় না। ইহার অবস্থা এবং কারণ-করণ যেন কেমন একটু স্বতন্ত্ররকমের। হিংসা অর্থে, "চৌর্য্যাদি ঘাতোয়রিতি।"—সুতরাং হিংসুক দুর্জ্জন! "দুর্জ্জনো পরিহর্ত্তব্য বিদ্যয়া-লঙ্কৃতোঽপি সন্। মণিনা ভূষিতঃ সর্পঃ কিমসৌ ন ভয়ঙ্করঃ।" স্বীকার করি, দুর্জ্জনের সংসর্গ সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। কিন্তু এ সংসার এমনই প্রহেলিকাময় যে, ইচ্ছাসত্বেও সে পরিবর্জ্জনবৃত্তি কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না। তাহা করিতে গেলে, সমস্ত সংসারখানা বুঝিবা "কম্বলের লোম-বাছার" অবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং তাহা অপরিহার্য্য।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, হিংসা মনুষ্যের চরিত্রগত বৃত্তি। বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলেই কম-বেশ এই বৃত্তিটা বহন করিয়া থাকে। এবং সকলেরই হৃদয়ে প্রচ্ছন্নভাবে ইহা বিরাজমান। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা স্ত্রীজাতির মধ্যে যেন এ বৃত্তির উন্মেষ একটু অধিক বলিয়া বোধ হয়। সুন্দরী স্ত্রীলোকের কথা দূরে থাক—কুৎসিত, কুরূপার নিকটও যদি অপর সুন্দরীর প্রশংসা করা হয়, তাহাতেও সে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া থাকে, সে প্রসঙ্গ তাহার প্রীতিকর হয় না। জানি না এ রহস্যের মূলে কি গুপ্ত কারণ নিহিত আছে। চরিত্রবিদ্ ইহার অবশ্যই মীমাংসা করিবেন।

যিনি লেখাপড়ার ধার ধারেন, পণ্ডিত বলিয়া গণ্যমান্ত, তিনি অনন্তসাধারণকে মূর্খ ভাবিয়া অবহেলার চক্ষে দেখেন; বুদ্ধিমান নিজের যোড়ামিল এই বিশ্ব-সংসারের কুত্রাপিও খুঁজিয়া পান না। ধনী অন্যের ধন কম দেখেন। আর আজকাল এই মহামান্ত বাঙ্গালা-দেশটায় রাজপ্রদত্ত উপাধিধারী অনেকে আছেন, তন্মধ্যে আমার ন্যায় কেহ কেহ ব্যাধিগ্রস্থ সম্মানিত ব্যক্তি, পাশ্চাত্য বর্ণমালায় সমলঙ্কৃত হইয়া ধরাকে সরা ভাবেন, এবং স্বাধীন-মিত্ররাজ্যের সম্মানিতের সহিত একতারে চলিতে ইচ্ছা করিয়া অপরের প্রতি উপেক্ষার দৃষ্টিপাত করেন। হায়! কি লজ্জা—বাবু যে ছিলাম, তাহা স্মৃতি হইতে একবারে মুছিয়া ফেলিবার চেষ্টা! শৈশবে আচার্য্যের মুখে শুনিয়াছি—

"খাঁটি যদি হবে ভাই!
মাটি ভিন্ন গতি নাই।"

বাস্তবিক, কর্ম্মক্ষেত্রে মাটি না হইলে খাঁটি হওয়া যায় না, নিজে নত না হইলে কে কবে উন্নতি লাভ করিয়াছে, কে কবে বড় হইয়াছে?

ফিকিরচাঁদ বলিয়াছেন——

"মানুষ বড় কিসে, ভাবি তিনবেলা;
সে ত বিদ্যাবুদ্ধিজ্ঞান পেয়ে, না বোঝে পরের জ্বালা।
গাছেতে ফল ধরে যত,
নত হ'য়ে বিলায়, সে ত
খায়না;
মানুষ ধন-জ্ঞান-বিদ্যা পেলে
লাগায় তালার উপর তালা।"

উন্নতির বিষয় অবস্থানিচয়ে হিংসার উন্মেষ যতটা না,—শিকারীর

কিন্তু তাহা হইতেও কিছু বেশী। পরস্পর শিকারীর মধ্যে হিংসা আরও গুরুতর, ভয়ানক। এক শিকারী ভাল একটী শিকার পাইলে, অপর শিকারীর তাহাতে অসহ্য হিংসা হয়,—বিষ-নজরে দেখেন! পার্টির মধ্যে কেহ শিকার পান নাই, কি তাঁহার পাইতে সুযোগ অথবা সুবিধা ঘটে নাই, তবুও হিংসা—কেন অন্যে শিকার পাইল! স্মরণ হয় একবার আমাদের সঙ্গে "K" নামে একব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার আর গুণ কিছু থাক কি না থাক, হিংসাগুণটুকু বিলক্ষণ ছিল। "হাঁটিতে না জানিলে উঠানের দোষ"—তিনি তাহার প্রত্যক্ষপ্রমাণ। বাঘ-শিকারে যাইতে তাঁহার বিলক্ষণ সখ ছিল, লাইনের সঙ্গেও যাইতে ভালবাসিতেন, কিন্তু তাঁহার হাওদার হাতী রাখিতেন অন্য একটী হাতীর পিছনে! কি আশ্চর্য্য! সঙ্গী শিকারীর মধ্যে যদি কেহ বাঘ মারিত, তবে তাঁহার দারুণ মর্ম্মদাহ উপস্থিত হইত, হিংসার উদ্রেক হইত, দুঃখিত হইতেন এবং অসুখও বোধ করিতেন। বলিতে কি, সমস্তটা দিন "ভেনর ভেনর" করিয়া তাম্বুস্থ সকলকে উত্যক্ত করিতে কশুর করিতেন না; এবং বলিতেন—"সকলে বাঘ মারে, তাঁহাকে বাঘ মারিতে সুযোগ দেওয়া হয় না।" দুঃখের বিষয় তিনি নিজের অক্ষমতার বিষয় ভ্রমেও একবার চিন্তা করিতেন না।

হিংসা পরস্পর সকলের মধ্যেই আছে, নাই কেবল পিতা-পুত্রে—অধ্যাপক-ছাত্রে। পুত্র যদি পিতা হইতে সমধিক পণ্ডিত, বুদ্ধিমান এবং কৃতী হয়, তাহাতে পিতা অতুল আনন্দিত এবং গর্ব্বিত হন। ছাত্র অধ্যাপক হইতে সমুন্নত হইলে, শিষ্য না যতটা সুখী, পণ্ডিত ততোধিক পরিতুষ্ট। অনেকস্থলে এমত দেখা যায়—ছাত্র, অধ্যাপকের ভ্রম সংশোধন করিয়া দিলে, অধ্যাপক আত্মহারা হইয়া প্রীতিপ্রফুল্লহৃদয়ে ছাত্রকে প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া কৃতার্থ হয়েন এবং স্মিতমুখে

করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। নরসমাজে এমন মন-প্রাণ-মাতোয়ারা দ্রব্য আর কিছু আছে কি? কিন্তু হায়, কি বলিব, বলিতে দুঃখ হয়—লজ্জায় শির অবনত হইয়া পড়ে, যিনি আমাকে বন্দুক-ধরা শিক্ষা দিয়াছেন, কিরূপে শিকার করিতে হয়, তাহা অক্ষরে অক্ষরে উপদেশ দিয়াছেন, সম্মুখের শিকার নিজে না মারিয়া আমা-দ্বারা বধ করাইয়াছেন এবং ঠিকরূপে গুলি বিদ্ধ হইলে অপার আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন,—কিন্তু কি আশ্চর্য্য, ব্যাধবৃত্তির কি পাশব উত্তেজনা!—দুদিন পরে, শিকারক্ষেত্রে তিনিই আমার সহিত ঈর্ষা করিতে অনুমাত্র সঙ্কোচিত হয়েন নাই। এই জন্যই বলি সর্ব্বপ্রকার হিংসা হইতে শিকারীর মধ্যে এ বৃত্তিটি সমধিক জাগরূক।

আমার বয়স তখন খুবই অল্প—সবেমাত্র কৈশোরের সুকুমার বৃত্তি-গুলি অতীতের কক্ষে রাখিয়া ধীরে ধীরে যৌবনের উন্মত্তস্রোতে গা ঢালিয়া দিতেছে। পৃথিবীর কুট্‌কাট্ কি দগ্ধ প্রহেলিকার কোন ধার ধারি না, সরলতার শুভ্র আলোক, যে দিকে পথ দেখাইয়া লইয়া যায় অবিচার্য্যচিত্তে সেই দিকেই অগ্রসর হই, কুটিল সংসারের চলন-চালনের কিছুই জানি না। এমতাবস্থায় বাবু-বন্ধুর উক্তরূপ ব্যবহার প্রাণে বড়ই বাজিল, হৃদয়টা যেন হঠাৎ একেবারে দমিয়া গেল।

দেখিতে দেখিতে টিফিনের হাতী আসিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইল; কিন্তু আমার খাইবার প্রবৃত্তি আদৌ নাই। হরিণটিকে হাতীর উপর তুলিয়া, তাম্বুরদিকে হাতী চালাইতে অভিপ্রায় করিলাম। বেলা তখন অনুমান একটা। চৈত্র মাস—দুপ্রহরের দারুণ কাঠফাটা রৌদ্র। চারিদিক ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে। ভয়ানক গরম। রৌদ্রের উত্তাপ যেন, মাটি ফাটিয়া বাহির হইয়া হাতীকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। হাতী বেচারী শীতলতার আশয় শুণ্ডদ্বারা ফঁশ্ ফঁশ্ করিয়া ঘন ঘন তাহার শরীরে বারিপ্রক্ষেপ করিতেছে। গাছ, পালা, লতা, বল্লরী প্রভৃতি যেন

প্রখর রৌদ্রকিরণে অবসন্ন হইয়া ঢুলিয়া পড়িয়াছে। গভীর অরণ্য-মধ্যে দুই একটী ফুল-কুমারী অন্তরাল হইতে লতাগুচ্ছ ভেদ করিয়া সময় সময় যেন শ্রান্ত পথিকের চিত্তাকর্ষণ করিয়া, ক্ষণেকের জন্য একটু শান্তি প্রদান করে, তেমতি আতপ-তাপিত নানারকমের পাখীগুলি সসঙ্কোচে, পাতায় পাতায় মিশিয়া নির্জ্জন শীতল স্থানে লুকাইয়া আছে। বনের সুন্দর সুন্দর ফুলগুলি অন্যান্য দেবদেবীর পূজায় ত কখন যাইবে না, ঐ গুলি সূর্য্যদেবেরই একচাটিয়া মহালের ধন, বুঝি তাঁহারই সেবায় ফুল-জন্ম সার্থক করিয়া বিশুষ্ক নির্ম্মাল্যে পরিণত হইয়াছে। দিগন্তের সীমা হারাইয়া আকাশ পৃথিবী যেন এক হইয়া গিয়াছে, ভাবের সৌন্দর্য্যে বিশ্ব যেন ডুবিয়া গিয়াছে। আমি আর কি করি, আমিও আমার ভারাক্রান্ত প্রাণটা লইয়া চিন্তার তরঙ্গে উঠাপড়া করিতেছি, আর ভাবিতেছি,—ইতিপূর্ব্বে দুদিন আগে এমনি শিকারের পর, বাবু ও আমি এক হাতীতে চড়িয়া তাম্বুতে আসিয়াছি, কত আমোদ, কত জড়াজড়ি, কত রহস্যের ছড়াছড়ি, প্রাণখোলা হাসিরই বা কত বাড়াবাড়ি! কিন্তু আজ বাবু স্বতন্ত্র হাতীতে একা। আমার দিকে দৃষ্টি নাই, দৃষ্টি অন্যদিকে! হে হিংসা! অপার তোমার মহিমা!

চলিতে চলিতে অনুমান দুটার সময় খুব বড় একটা দীঘির নিকট আসিলাম, ইহাকে "সুতানরার পুকুর" বলে। স্থানটী বড় মনোরম, স্নিগ্ধ ও শান্তিপ্রদ। লতা, পাতা, গাছ-গাছড়ায় সমাচ্ছন্ন থাকায় বোধ হয় যেন প্রকৃতিদেবীর নিভৃত নিকুঞ্জ। স্থানটী অসূর্য্যম্পশ্য, সুতরাং শীতল। দীর্ঘিকার উভয়তীরস্থ বৃক্ষাবলীর ছায়া, কোণায় কোণায় পড়িয়া কাল কাল রেখা টানিয়া দিয়াছে। আমার ইচ্ছা হইল, এই স্থানে একটু দাঁড়াই, বিশ্রাম করিয়া অর্দ্ধভর্জ্জিত দেহ আর পোড়া প্রাণ এই দুটাকেই কিঞ্চিৎ শীতল করিয়া লই। একটা প্রকাণ্ড পলাশগাছের নীচে হাতী দাঁড়-করাইলাম। হাতী ফঁশ্

করিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িল,—ফরাজি মিঞা আসিয়া করজোড়ে বিনয়াবনতভাবে বলিল—"মহারাজ! বেলা অনেক হইয়াছে, এই স্থানে জলযোগের অনুমতি হয়, অনেকটা দূরে আসিয়া পড়িয়াছি; তাঁবুতে ফিরিতে বিলম্ব হইবে।" আমিও ইতস্ততঃ না করিয়া স্বীকৃত হইলাম, এবং হাতী হইতে অবতরণ করিয়া একটী বৃক্ষের নীচে টিফিনের বাক্সের অপেক্ষায় পথপানে চাহিয়া রহিলাম। বাবুও হাতী হইতে নামিয়া আসিলেন; কিন্তু আজ বুঝি বাগ্দেবী বাবুর প্রতি নিতান্ত অপ্রসন্ন, তাই জিহ্বাযন্ত্র জড়তা প্রাপ্ত, মুখে কথাটী নাই! কি করি,—"বোধ হয় তোমার ক্ষুধা বোধ হইয়াছে"—বলিয়া আমিই প্রথমতঃ নীরবতা ভঙ্গ করিলাম। বাবু ক্ষীণকণ্ঠে—"বেলা অধিক হইয়াছে, রৌদ্রের বড় উত্তাপ, ক্ষুধা অশেষ, পিপাসার বেগ অধিক হইয়াছে, কিছু শীতল জল হইলে বড় তৃপ্তিলাভ করিব"—বলিয়া টিফিনে বসিলেন। বাবু সামান্য কিছু খাইয়া "চোঁ" টানে একগ্লাস পানীয় নিঃশেষ করিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ভাবে গাউজটী পাওয়া গিয়াছিল এবং কিরূপেই বা উহা বধ করা হইল?" আমি তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত অবস্থা বিস্তারিত কহিলাম। উত্তরে তিনি কিছু স্তম্ভিত, ভীত এবং আশঙ্কান্বিত হইয়া আমাকে কিঞ্চিৎ মৃদুভর্ৎসনায় চরিতার্থ করিলেন। অনেকটা দূরে যাইতে হইবে বলিয়া আমরা ক্ষিপ্রকরে জলযোগ সমাধা করিয়া হাতীতে আরোহণপূর্ব্বক তাম্বুর অভিমুখে ধাবিত হইলাম। সূর্য্যদেব তাঁহার দিনের খাটুনি খাটিয়া অস্তাচলশায়ী হইতেছেন, পথেই রাত্রি হইল।

লোকে কথায় বলে—"মন্দ সময় একা আসে না",—ঘটনা তাহাই হইল। একে প্রাতে গাউজের পাছে কর্ম্মভোগ, তাহার পর বাবুর ব্যবহারে মনটা ব্যথিত, ভারাক্রান্ত। ইহার পর আবার আমাদের পাছে বাঘ!—পশ্চাতে যে হাতীতে গাউজটী ছিল, ঐ হাতীর মাহুত

চীৎকার করিয়া বলিল,—"হুজুর! বাঘে হরিণ লইয়া যায়!" ব্যাপার কিছু বুঝিতে পারিলাম না, হঠাৎ প্রাণ চমকিয়া উঠিল। আমার হাতী একটু দাঁড়-করাইয়া উহাকে নিকটে আসিতে আদেশ করিলাম। হাতী আসিলে দেখি বাস্তবিকই হরিণ-শোণিতের গন্ধে এক চিতাবাঘ হাতীর পাছ ধরিয়াছে!

শ্রীসূর্য্যকান্ত আচার্য্য।

মহানন্দির পরে ভারতে মহাবিপ্লব।

এই বিপ্লব বুঝিতে হইলে, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের অবস্থা অবগত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, বায়ু ও মৎস্যপুরাণ অনুসারে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পরেও কতিপয় শতাব্দী ব্যাপিয়া চন্দ্র ও সূর্য্যবংশীয় মূলশাখার রাজগণ স্ব স্ব কেন্দ্র লইয়া হস্তিনা ও অযোধ্যায় সম্রাট্ ছিলেন; এই কথাটী একটু ভাঙ্গিয়া বলিতে হইবে।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অভিমন্যুর মৃত্যু হয়। সূর্য্যবংশীয় তদানীন্তন রাজা বৃহদ্বল তখনই অভিমন্যুর হস্তে নিহত হন। ভারতযুদ্ধের পর অভিমন্যুর সন্তানগণ পুত্র ও পৌত্রক্রমে হস্তিনায় রাজ্য করিতে থাকেন। অভিমন্যুর অধস্তন ২৭শ পুরুষ রাজা ক্ষেমক। এই ক্ষেমকই চন্দ্রবংশের শেষ সম্রাট্। ইঁহার পর চন্দ্রবংশে আর রাজা রহিলেন না।(১) চন্দ্রবংশ এই অবধি নিঃশেষ হইল। ভারতযুদ্ধে অভিমন্যু-কর্ত্তৃক নিহত সূর্য্যবংশীয় রাজা বৃহদ্বলের পুত্রই রাজা

---

(১) ক্ষেমকং প্রাপ্য রাজানং স সংস্থাং (মৃতিং) প্রাপ্স্যতে কলৌ। (বিষ্ণু পুং)
ক্ষেমকের সঙ্গেই চন্দ্রবংশের লোপ হয়।

বৃহৎক্ষণ। তাঁহার সন্ততিগণ কোশলরাজ্য শাসন করিতে থাকেন। বৃহদ্‌বলের অধস্তন ২৯শ পুরুষ রাজা সুমিত্র। ইঁহার সঙ্গেই সূর্য্য-বংশের রাজত্ব শেষ হয়।(১)

ভারতযুদ্ধের অবসানে, অভিমন্যুর ২৭শ পুরুষ পরে চন্দ্রবংশের, এবং বৃহদ্‌বলের ২৯শ পুরুষ পরে সূর্য্যবংশের রাজত্ব শেষ হয়। এই সময়েই মগধের রাজবংশ প্রবল হইয়া উঠে।

কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কিছু পূর্ব্বে মগধের সম্রাট্ জরাসন্ধ নিহত হন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের সময়ে তদীয় পুত্র সহদেব মগধের সম্রাট্ ছিলেন। সহদেবের ২১শ পুরুষ অধস্তন সন্তান রিপুঞ্জয়ই এই জরাসন্ধবংশের শেষ সম্রাট্; কিন্তু চন্দ্রবংশীয় শেষ রাজা ক্ষেমক ও সূর্য্যবংশীয় শেষ রাজা সুমিত্র পরলোক গমন করিবার পরই যেমন ঐ উভয় বংশের সিংহাসন চিরতরে শূন্য হইয়াছিল, জরাসন্ধের সন্ততি রিপুঞ্জয়ের মৃত্যুতে মগধসিংহাসন সেরূপ শূন্য হইল না। রিপুঞ্জয়ের মন্ত্রী সুনিকই রিপুঞ্জয়কে নিহত করিয়া মগধের সম্রাট্ হইলেন। রাজা সুনিকের অধস্তন ৫ম সম্রাট্ নন্দীবর্দ্ধন। তাঁহার মৃত্যুর পর শিশু-নাগ নামা একজন ক্ষত্রিয় মগধরাজ্যের সম্রাট্ হন। এই বংশের দশজন রাজা পুত্রপৌত্রাদিক্রমে রাজত্ব করেন। এই বংশের শেষ রাজা মহানন্দি সমগ্র ভারতবর্ষের পরাক্রান্ত ক্ষত্রিয় সম্রাট্ ছিলেন (বিষ্ণু পুং, ৪র্থ অংশ)। মহানন্দি জাতিতে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাঁহার সময় পর্য্যন্তই ক্ষত্রিয়জাতির প্রভুত্ব ও সাম্রাজ্য। বিষ্ণু, ভাগবত, বায়ু ও মৎস্য পুরাণাদিতে এই কথা অতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে, বাহুল্যভয়ে বচন উদ্ধৃত হইল না।

---

(১) ইক্ষ্বাকুণাময়ং বংশঃ সুমিত্রান্তো ভবিষ্যতি। (বিষ্ণু পুং)
সুমিত্রই ইক্ষ্বাকুবংশের শেষ রাজা।

সঙ্কর ক্ষত্রিয়গণের রাজত্ব।

মগধের ক্ষত্রিয়সম্রাট্ মহানন্দি শূদ্রা পত্নীর গর্ভে এক পুত্র উৎপাদন করেন। ইহাঁর নাম নন্দ। ইনিই মহানন্দির পরে ভারতের সম্রাট্‌পদে উপবিষ্ট হন। ভারতের অদ্বিতীয় পণ্ডিত নাগেশভট্ট বলেন, অনুলোম সঙ্করজাতি মাতৃধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, এই জন্য ইনি মাতৃজাতীয় শূদ্রের আচারবিশিষ্ট ছিলেন। তাহাতেই উগ্রগণকে শূদ্র বলা হইয়াছে।(১) নন্দের উপনাম মহাপদ্ম। ইহাঁর পূর্ণ নাম মহাপদ্মনন্দ। যিনি পুরাণ-অরণ্যে সিংহের ন্যায় অকুতোভয়ে বিচরণ করেন, সেই জ্ঞানী, ভক্ত, ও পণ্ডিতচূড়ামণি শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন, ইঁহার মহাপদ্ম অর্থাৎ বহু বহু কোটি পরিমিত সৈন্য বা ধন সঞ্চিত ছিল বলিয়াই ইঁহাকে মহাপদ্মনন্দ বলা হইত। (২) ভারতবন্দ্য নাগেশভট্ট বা নাগোজীভট্ট বলেন, তাঁহার পদ্মপরিমিত ধন ও সৈন্য উভয়ই ছিল। (৩)

ইনি এই বিপুল ধন ও বাহিনী দ্বারা ভারতের তদানীন্তন নিখিল ক্ষত্রিয়জাতি বিধ্বংস করিয়া, প্রত্যেক দেশের সিংহাসনে উগ্র-ক্ষত্রিয়জাতিকে স্থাপিত করেন; সমস্ত পুরাণ ইহা একবাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ইঁহার ভয়াবহ কর্ম্মদ্বারাই ভারতের সমস্ত ক্ষত্রিয়জাতি একেবারে বিলুপ্ত হয়। যে ক্ষত্রিয়গণ ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিলেন, নন্দের ভয়ঙ্কর প্রতাপে সে জাতি ধরাধাম হইতে একেবারে উচ্ছিন্ন হন। এই অবধি সমগ্র ভারতবর্ষে শূদ্রতুল্য উগ্রাদি বর্ণসঙ্করদিগের রাজ্য বিস্তৃত হয়।

---

(১) শূদ্রা ভূমিপালা ইতি নন্দস্য উগ্রত্বেঽপি অনুলোম সঙ্করাণাং মাতৃজাতীয়ত্বাৎ শূদ্রা ইত্যুক্তম্। নাগেশঃ।

(২) তাবৎ সংখ্যকস্য সৈন্যস্য ধনস্য বা স্বামী। শ্রীধরস্বামী।

(৩) মহাপদ্ম ইত্যস্য তাবৎসংখ্য ধন স্তাবৎ সৈন্য ইতি চার্থঃ। নাগেশঃ।

তদবধি ব্রাহ্মণগণ হীনতেজা হইয়া পড়েন, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নিতান্ত শিথিল হইয়া যায়।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন :—"ততো মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবঃ অতিলুব্ধঃ মহাপদ্মঃ নন্দঃ পরশুরামইব অখিলক্ষত্রান্তকারী ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি।"(১)

নাগেশভট্ট ইহার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, নিম্নে তাহার অনুবাদ উদ্ধৃত হইল :—মহাপদ্মের সঙ্গে পরশুরামের তুলনা দেওয়াতে বুঝা গেল, মহাপদ্ম পরশুরামের ন্যায় নির্দ্দয়ভাবে ক্ষত্রিয়জাতির স্ত্রী এবং বালক পর্য্যন্ত বধ করিয়াছিলেন। মহাপদ্মশব্দে ইঁহার তাবৎ পরিমিত ধন ও সৈন্য ছিল এরূপ বুঝায়। পরশুরাম ক্ষত্রজাতীয় স্ত্রী এবং বালক পর্য্যন্ত বধ করিলেও কতিপয় ক্ষত্রিয় বাকী রাখিয়াছিলেন বলিয়াই আবার একশ্রেণীর মিশ্রিত ক্ষত্রিয় জন্মিয়াছিল। মহাপদ্ম কি সেইরূপ কতকগুলি ক্ষত্রিয় অবশিষ্ট রাখিয়াছিলেন? এই সন্দেহ নিরাকরণার্থে পুরাণ বলিলেন "অখিলক্ষত্রান্তকারী" অর্থাৎ ইনি একজন ক্ষত্রিয়ও অবশিষ্ট রাখেন নাই। অতএব মহাপদ্মের পর কলিতে ক্ষত্রিয়ের অত্যন্তাভাব (একজনও না থাকা) ঘটিল, এই জন্য মুনি বলিলেন—"ইহার পর শূদ্রগণ রাজা হইবে।" মহাপদ্ম অনুলোম-সঙ্করজাতীয় লোক; কাজেই তিনি মাতৃজাতির ধর্ম্ম পান, এইজন্য তাঁহাকে শূদ্র বলা হইল, তিনি আসল শূদ্র নহেন।

---

(১) তৎপর মগধে মহানন্দির শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত সন্তান নন্দ সম্রাট হন। তাঁহার পদ্মপরিমিত ধন ও সৈন্য সঞ্চিত হয়। তিনি অতিশয় লুব্ধ ছিলেন। সম্রাট নন্দ দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় সমুত্থিত হইয়া ভারতবর্ষের নিখিল ক্ষত্রিয়জাতি উৎসাদিত করেন। ক্ষত্রিয়জাতি নির্ম্মূল হওয়ায় শূদ্রতুল্য উগ্রক্ষত্রিয়প্রভৃতি সঙ্করক্ষত্রিয়গণ ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রাজা হন। এই হইতে ক্ষত্রিয়জাতি নিঃশেষিত হইল।

মহাপদ্ম ভিন্ন ভিন্ন দেশের ক্ষত্রিয় রাজাদিগকে বধ করিয়া সেই সেই রাজার সন্তানভূত উগ্রজাতীয় লোকদিগকে রাজ্যে স্থাপিত করেন। এই জন্যই শ্রীভাগবতপুরাণের ১২শ স্কন্ধে লিখিত আছে—"হে রাজন্, শূদ্রাগর্ভজাত মহানন্দিপুত্র বলবান্ মহাপদ্মনন্দ ক্ষত্রিয় বিনাশ করিবেন। তৎপর পৃথিবীর রাজারা শূদ্রপ্রায় ও অধার্ম্মিক হইবেন।" নন্দাদি রাজগণ জাতিতে উগ্র ছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে শূদ্রপ্রায় অর্থাৎ "শূদ্রবৎ" বলা হইয়াছে। এরূপ ভ্রম করিতে নাই যে, মহাপদ্ম কেবল মগধদেশীয় ক্ষত্রিয়দিগকেই বধ করিয়াছিলেন, অন্য স্থানের ক্ষত্রিয়দিগকে বধ করেন নাই; কেননা বচনটি সামান্য বিষয়ক, তাহাকে দেশবিশেষে নিরুদ্ধ করিয়া সঙ্কোচিত করিবার অনুকূলে কোন প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ সেরূপ অর্থ করিলে বক্ষ্যমাণ বচনের সঙ্গেও গুরুতর বিরোধ হয়। (১)

নন্দ-কর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়কুল একেবারে নির্ম্মূল হয়। ইঁহার পরে সঙ্কর-জাতীয় উগ্রসূতাদি জাতি ক্ষত্রিয়ের ভাণ করিয়া ভারতে আধিপত্য করিতে থাকেন। এই সময়কেই পুরাণকারগণ কলির বৃদ্ধি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পুনরুক্তি-বাহুল্য-ভয়ে এই সম্বন্ধে কেবল ভাগবতের বচন উদ্ধৃত করিয়াই ক্ষান্ত হইব।

মহানন্দি সুতো রাজন্ শূদ্রাগর্ভসমুদ্ভবঃ।
মহাপদ্মপতিঃ কশ্চিৎ নন্দঃ ক্ষত্র বিনাশকৃৎ॥

---

(১) ততো মহানন্দিসুতঃ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবঃ অতিলুব্ধো মহাপদ্মো নন্দঃ পরশুরাম ইবাখিলক্ষত্রান্তকরো ভবিতা। ততঃ প্রভৃতি শূদ্রা ভূমিপালা ভবিষ্যন্তি স চৈকচ্ছত্রামনুলঙ্ঘিতশাসনো মহাপদ্মঃ পৃথিবীং ভোক্ষ্যতীত্যুক্তম্। অত্র পরশুরামোপময়া স্ত্রীবালাবধি নির্দ্দয়হন্তৃত্বং সূচিতম্। মহাপদ্ম ইত্যস্য তাবৎ সংখ্যধনস্তাবৎ সৈন্য ইতি চার্থঃ। পরশুরামেণেব কতিপয়ানামহননমপিস্যাদত আহ "অখিলক্ষত্রান্তকারী"তি। তেন ক্ষত্রিয়সামান্যাভাবঃ সূচিতস্তদেবোক্তং "শূদ্রা-ভূমিপালা" ইতি।

অর্থাৎ হে রাজন্, মহানন্দি শূদ্রাগর্ভে নন্দনামক পুত্র উৎপাদন করিবেন। তিনি মহাপদ্মপরিমিত সৈন্যের অধিপতি হইয়া ক্ষত্রিয়-বর্ণের উৎসাদন করিবেন।

ইহাতে প্রতীতি হয়, ইনি প্রথমেই সৈন্য মধ্যে সঙ্করক্ষত্রিয়গণকে সমধিক পরিমাণে প্রবেশ করান এবং তাহাদের সাহায্যে গর্ব্বিত অথচ শক্তিহীন ক্ষত্রিয়গণকে একেবারে শেষ করিয়া ফেলেন। নাগেশ ভট্ট শেখরে এ সকল কথা উত্তমরূপে বিচার করিয়াছেন।* এই সময়েই সৈন্য মধ্যে উগ্র, সূত, আভীর, দাশ প্রভৃতি সঙ্করগণ প্রচুর পরিমাণে প্রবিষ্ট হন।

সম্রাট্ নন্দ ক্ষত্রিয়জাতি ধ্বংস করিয়াছিলেন, ইহা শ্রবণ করিয়াই, নন্দের পর ধরণী নিঃক্ষত্রিয় হইয়াছে, এরূপ সিদ্ধান্ত করা সঙ্গত হয় না; স্পষ্টবচন উদ্ধৃত করা আবশ্যক। এই জন্য মূল বিষ্ণুপুরাণে এ সম্বন্ধে যে সকল স্পষ্টবচন আছে, স্বামিকৃত টীকাসহ উদ্ধৃত করা গেল। নিম্নে ক্ষত্রিয়ের অত্যন্তাভাববিষয়ক অতি স্পষ্ট বচন ও অতি বিস্পষ্ট ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইল। উহা পাঠ করিলে মনে আর কোন সন্দেহই থাকে না।

এতেন ক্রমযুগেন মনু পুত্রৈর্ব্বসুন্ধরা।
কৃত ত্রেতাদি সংজ্ঞানি যুগানি ত্রীণি ভুজ্যতে॥

বিষ্ণু, ৪।২৪ অধ্যায়।

---

* নন্দস্তোগ্রত্বেপ্য, মনুলোহসঙ্করাণাং মাতৃজাতীয়ত্বাচ্ছূদ্রা ইত্যুক্তম্। তত্তদ্দেশীয়-ক্ষত্রিয়ান্ হত্বা তৎসন্তানভূতা উগ্রাস্তত্ত্রাজ্যে স্থাপিতা ইতি তাৎপর্য্যং ভাগবতে দ্বাদশে "মহানন্দিসুতো রাজন্ শূদ্রাগর্ভোদ্ভবো বলী। মহাপদ্মপতিঃ কশ্চিন্নন্দঃ ক্ষত্রবিনাশকৃৎ"। ততোনৃপা ভবিষ্যন্তি শূদ্রপ্রায়াস্ত্বধার্ম্মিকা ইতি নন্দাদীনামুগ্রত্বাৎ শূদ্রপ্রায়া ইত্যুক্তম্। এতেন রাজ্যাধিকারিণো মাগধা এবানেন নাশিতা নতু দেশান্তরস্থাঃ, শূদ্ররাজ্যোক্তিরপি মগধদেশবিষয়েবেতি নিরস্তম্, সামান্যপ্রবৃত্তবাক্যস্য সংকোচে মানাভাবাৎ বক্ষ্যমাণবাক্যবিরোধাচ্চ মাগধরিপুঞ্জয় কাল এব সর্ব্বক্ষত্রিয় বংশশাখানাশাচ্চ এতচ্চাগ্রে স্ফুটং ভবিষ্যতি।" ইতি নাগেশঃ।

মনুপুত্র ক্ষত্রিয়গণ সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর এই তিনযুগ পৃথিবী ভোগ করেন; অর্থাৎ কলিতে ভোগ করেন না। স্বামী—কলেঃ সন্ধ্যায়ামেব ক্ষত্রিয়সত্বাৎ ত্রীণি যুগানি ভুঞ্জতে ইত্যুক্তম্। অর্থাৎ কলির কেবল প্রথমাংসেই ক্ষত্রিয় থাকে, অন্য ভাগে থাকে না; এই জন্য বলা হইল ক্ষত্রিয়জাতি সত্যাদি তিনযুগ পৃথিবী ভোগ করেন। কলিতে ভোগ করেন না। অর্থাৎ কলির প্রথমাংশে যে কিয়ৎকাল ক্ষত্রিয়জাতি ছিলেন, কলির সেই অংশও দ্বাপরসংস্পর্শে দ্বাপর মধ্যেই গণ্য করা হইয়াছে। কলির প্রথমাংশে ক্ষেমক, সুমিত্র ও মহানন্দি পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয় ছিল। তৎপর ক্ষত্রিয় নাই। তৎপর এই ভারতীয় হিন্দুসমাজ ক্ষত্রিয়শূন্য হইয়াছে।

প্রশ্ন এই, সত্যযুগে চারিবর্ণ থাকা আবশ্যক; যদি মহানন্দির পরে মহাপদ্মনন্দ সমস্ত ক্ষত্রিয় নাশ করিয়া থাকেন, তবে আগামী সত্যযুগে ক্ষত্রিয় জন্মিবে কোথা হইতে? কল্পের প্রথমেই চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হয়, যুগে যুগে বর্ণ সৃষ্টি হয় না। তর্কটি এই—স্বায়ম্ভুব প্রভৃতি চৌদ্দজন মনুর অধিকারান্তে প্রলয় হয়। এক একজন মনুর অধিকারে বহুবার সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ আবর্ত্তন করে। সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে চারিবর্ণ থাকে, কলিতে মাত্র দুইবর্ণ থাকে। কলিতে যদি ক্ষত্রিয়-বৈশ্য লোপ পাইল, তবে সেই কলির পরে যে সত্যযুগ উপস্থিত হয়, তাহাতে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য জন্মে কোথা হইতে? যদি বল, সত্যযুগে ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করিবেন, সে কথা গ্রাহ্য হইবে না; কারণ ১৪ জন মনুর অধিকার মধ্যে প্রথম মনু বা স্বায়ম্ভুব মনুর অধিকারকালের প্রথম সত্যযুগেই ব্রহ্মা প্রজাসৃষ্টি করেন। ঐ সৃষ্টিপ্রবাহ ১৪ জন মনুর অধিকার ব্যাপিয়া চলিতে থাকে এবং ১৪ জন মনুর অধিকারকালান্তে প্রলয়কালে প্রজা নষ্ট হয়; তাহার পর নূতন কল্পের [illegible]

মন্বন্তর চলিতেছে, সেই মন্বন্তরের এই অষ্টাবিংশ কলিযুগ চলিতেছে। ইহার পরবর্ত্তী সত্যে প্রজাসৃষ্টি হইতে পারে না। কাজেই এই কলিতে ক্ষত্রিয়জাতি নিঃশেষিত হইলেও পরবর্ত্তী সত্যযুগের জন্য ক্ষত্রিয়-জাতির বীজ থাকা আবশ্যক। এই বীজ কিরূপে রক্ষা পাইল, তাহাই মহর্ষিগণ ও শ্রীধরস্বামী এবং নাগোজীভট্টপ্রমুখ আচার্য্যগণ ভাঙ্গিয়া বলিতেছেন। নন্দকর্ত্তৃক ক্ষত্রিয়নাশ হইলে ক্ষত্রিয়ের বীজ থাকিবে কিরূপে? এই প্রশ্নের উত্তরে বিষ্ণুপুরাণ বলিতেছেন :—

দেবাপিঃ পৌরবো রাজা মরুশ্চেক্ষ্বাকুবংশজঃ।
মহাযোগবলোপেতৌ কলাপগ্রামসংশ্রয়ৌ।
কৃতে যুগে ইহা গত্য ক্ষাত্রপ্রবর্ত্তকৌ হিতৌ।
ভবিষ্যতো মনোর্বংশে বীজভূতৌ ব্যবস্থিতৌ।

বিষ্ণু পুং, ৪।২৪ অং।

চন্দ্রবংশীয় রাজর্ষি দেবাপি ও সূর্য্যবংশীয় রাজর্ষি মরু এই দুইজন ক্ষত্রিয় মহাযোগ অবলম্বন করিয়া হিমালয়ের পার্শ্বে কলাপগ্রামে বাস করিতেছেন, আগামী সত্যযুগে ভূতলে আসিয়া তাঁহারাই ক্ষত্রিয়জাতি উৎপাদন করিবেন। ইঁহারা ক্ষত্রিয়জাতির বীজস্বরূপে অবস্থান করিতেছেন। এইরূপে বীজভূত বৈশ্যও দুইচারিজন গোপনে আছেন।

ভাল, বর্ত্তমান কলিতে দেবাপি ও মরু নামক রাজর্ষিদ্বয় ক্ষত্রিয়ের বীজ আছেন। অন্যান্য কলিতে ক্ষত্রিয়ের বীজ কিরূপে রক্ষা পায়? তদুত্তরে বিষ্ণুপুরাণ বলেন :—

কলৌ তু বীজভূতাস্তে কেচিত্তিষ্ঠন্তি ভূতলে।
যথৈব দেবাপিমরূ সাম্প্রতং ক্ষিতিমণ্ডলে।

বিষ্ণু পুং, ৪।২৪ অং।

বর্ত্তমান কলিতে যেমন রাজর্ষি দেবাপি ও মরু ক্ষত্রিয়ের বীজ রহিয়াছেন, অন্যান্য কলিতেও সেইরূপ বীজভূত ক্ষত্রিয়গণ অলক্ষ্যভাবে বিদ্যমান থাকেন। অতএব দৃশ্যমান কোন ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য ভূমণ্ডলে বিদ্যমান নাই। কলিতে আছে মাত্র ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। (১)

বিষ্ণুপুরাণ যাহা বলিলেন, ভাগবতের ১২শ স্কন্ধে অবিকল তাহাই আছে। বায়ু এবং মৎস্য পুরাণ তাহারই প্রতিধ্বনি করিতেছে এবং পুরাণব্যাখ্যাতা আচার্য্যগণ তাহাই বলিতেছেন। কলিতে ক্ষত্রিয়বর্ণ লোপ পাইয়াছে। হিমালয়ে দেবাপি ও মরু নামে মাত্র দুইজন ক্ষত্রিয় যোগ-অবলম্বনে অলক্ষ্যভাবে বাস করিতেছেন, আগামী সত্যযুগে তাঁহারা ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিবেন। ইহাতে বিবেচক ও ধর্ম্মভীরু লোকমাত্রই বুঝিতে পারিলেন, ভূতলে মানবসমাজে বর্ত্তমানকালে একজন ক্ষত্রিয়ও বর্ত্তমান নাই।

এই সম্বন্ধে পাঠকের মনে যতরূপ সন্দেহ উঠিতে পারে, নাগেশভট্ট

---

(১) পশ্চিমের বীর রাজপুতজাতি ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু পুরাণমতে এই জাতি ক্ষত্রিয় নহেন, সঙ্কর-ক্ষত্রিয়ও নহেন, একশ্রেণীর সঙ্করশূদ্রমাত্র। ইহাদের প্রধান গুণ এই, ইহাদের অনুকূলে কোন শ্লোকই পুরাণে প্রক্ষিপ্ত হয় নাই। কিন্তু অন্যান্য দুই এক শ্রেণীর শূদ্র ক্ষত্রিয় হইবার জন্য অগ্নি, স্কন্দ, গরুড় ও মৎস্য পুরাণে বহুসংখ্যক শ্লোক প্রক্ষেপ করিয়াছেন। এই কার্য্য বঙ্গ ও বম্বে এই দুই প্রদেশেই বিশেষরূপে ঘটিয়াছে। এই সকল প্রক্ষেপকারক নির্ব্বোধগণ শাস্ত্রজ্ঞ নহেন। শাস্ত্রজ্ঞ হইলে ঐ সকল গ্রন্থে এরূপ প্রক্ষেপ করিতেন না। চিৎসুখযোগী, শ্রীধরস্বামী, নাগেশভট্ট প্রভৃতি পণ্ডিতগণ অগ্নি, গরুড়, স্কন্দ ও মৎস্য পুরাণ হইতে বহুতর বচন স্ব স্ব টীকায় ও নিবন্ধে উদ্ধৃত করিয়াছেন, এবং তাঁহারা ঐ সকল পুরাণে পণ্ডিত ছিলেন। যদি ঐ সকল পুরাণে এরূপ কথা থাকিত যে, কলিতে বিদ্যমান কোন কোন জাতি সাক্ষাৎ ক্ষত্রিয়, তবে কলিতে সঙ্কর-ক্ষত্রিয় পর্য্যন্ত বিদ্যমান নাই, এরূপ সিদ্ধান্ত তাঁহারা কখনও করিতেন না। এবং ঐ সকল বচন তাঁহাদের সময়ে ঐ সকল পুরাণে থাকিলে তাঁহারা তাহা উদ্ধৃত করিয়া খণ্ডন করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে ঐ সকল প্রক্ষিপ্ত বচন পূর্ব্বে ঐ সকল পুরাণে ছিল না।

সেরূপ সকল রকমের আশঙ্কা উঠাইয়া উঠাইয়া উত্তর দিয়াছেন। দুই একটী উত্তরের মর্ম্ম নিম্নে লিখিয়া দিতেছি।

১ম প্রশ্ন। যদি কলিতে ক্ষত্রিয়-বৈশ্য না থাকিল, তবে কলির ধর্ম্ম-শাস্ত্র পরাশরসংহিতাদি গ্রন্থে ক্ষত্রিয়বৈশ্যের কর্ত্তব্যসম্বন্ধে ব্যবস্থা লিখা রহিল কেন?

উঃ। কলিতে রাজা পরীক্ষিৎ হইতে মহানন্দি পর্য্যন্ত ক্ষত্রিয়-জাতি বিদ্যমান ছিল, ঐ সময়টুকুর জন্যই ঐ সকল উপদেশ লিখিত হইয়াছে। বিশেষতঃ কলিতে যে সকল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের কর্ম্ম করিবেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের ধর্ম্ম পাইবেন; তাঁহাদের জন্যও কলির শাস্ত্রে ক্ষত্রিয়-বৈশ্যের কর্ত্তব্য লিখা আবশ্যক হইয়াছে।

২য় প্রশ্ন। এখন ত ক্ষত্রিয় নাই; যদি কোন শূদ্রজাতীয় লোক ক্ষত্রিয়জাতিতে জন্মগ্রহণ করার যোগ্য পুণ্যকর্ম্ম করেন, তবে মৃত্যুর পর তাঁহার জন্ম হইবে কোন জাতিতে? অথবা আগামী সত্যযুগ পর্য্যন্ত তাঁহার জন্ম আটক থাকিবে কি? এরূপ জন্ম আটক থাকার অনুকূলে প্রমাণ কই?

উঃ। প্রথম প্রশ্নের উত্তরের শেষভাগেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ কলিতেই যথাকালে ক্ষত্রিয়কর্ম্মকারী ব্রাহ্মণ-গৃহে তাঁহার জন্ম হইবে। নাগেশভট্ট এইরূপ নানাবিধ প্রশ্নোত্তর দান করিয়াছেন।

মহানন্দির পর ভারতে ক্ষত্রিয় থাকিল না। বাকি রহিল সঙ্কর-ক্ষত্রিয়, উগ্র ও সুতাদি। মহাপদ্মনন্দ এই সকল সঙ্কর-জাতিকে ভারতের বিভিন্ন সিংহাসনে স্থাপন করিলেন। উগ্রসুতাদি অনুলোম ও প্রতিলোম সঙ্করগণ ভারতে একাধিপত্য বিস্তার করিলেন। ব্রাহ্মণগণ নিস্তেজ হইলেন, শূদ্রগণ ক্রমশঃ মাথা-তোলা দিতে লাগিলেন। "তত্তদেশীয়ান্ ক্ষত্রিয়ান্ হত্বা তৎসন্তানভূতা উগ্রাঃ রাজ্যে স্থাপিতাঃ।"

(নাগেশঃ)। অর্থাৎ মহাপদ্মনন্দ ভারতবর্ষস্থ প্রত্যেক দেশের ক্ষত্রিয়-দিগকে বধ করিয়া তাহাদের সন্তানস্থানীয় উগ্রক্ষত্রিয়দিগকে রাজ্যে (রাজার কর্ম্মে) স্থাপিত করিলেন। এই সময় হইতেই ক্ষত্রিয়জাতি একেবারে উচ্ছিন্ন হইল ; (১) কেবল উগ্রাদি সঙ্করগণ ভারতবর্ষে অবশিষ্ট রহিলেন। কাজেই এখন সমাজে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বৈকল্য ঘটিয়া উঠিল, সমাজ নিতান্ত শিথিল হইয়া উঠিল, দেশে নূতন আচার ও নূতন সমাজপ্রণালী উদ্ভাবিত হইল।

ইহার পরেই মহাবিপ্লব আরম্ভ হয়। আমরা বারান্তরে পাঠকের কৌতূহল পরিতর্পিত করিবার জন্য সেই কথার অবতারণা করিব।

শ্রীপ্যারীমোহন দাস।

---

(১) এই সিদ্ধান্ত ভারতীয় ও য়ুরোপীয় বড় বড় সমস্ত পণ্ডিতই অবগত আছেন। বিখ্যাত টড্ সাহেব রাজস্থানে লিখিয়াছেন ঃ—

This last prince (Mahananda) who was also named Bykyat, carried on an exterminating warfare against the ancient Rajpoot princes of pure blood ; the Puranas declaring that since the dynasty of Sisunag, the princes were Sudras.

Chapter V., p. 58.

আকবর সাহের তাসখেলা।

সম্রাট আকবর যখন ভারতসিংহাসনে অধিষ্ঠিত তখন পাশ্চাত্য বণিকগণ নানাবিধ সৌখিন সামগ্রীর সহিত তাঁহাদের দেশ হইতে তাস আনিয়া তাঁহাকে উপহার দেন। সেই অবধি ভারতবর্ষে তাসখেলা বিশেষভাবে চলিয়া আসিতেছে।

আইনী-আকবরী গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আকবর যখন বিশ্রামের জন্য আমখাসদরবারে অবস্থান করিতেন, সেই সময় তিনি উজির-ওমরাও এবং সমবয়স্ক রাজপুত রাজকুমারদিগের সহিত তাস খেলিয়া আমোদ উপভোগ করিতেন।

আজকাল আমরা যেরূপ তাস লইয়া খেলি তাহার সহিত আকবরের তাসের বিশেষ সৌসাদৃশ্য নাই, তাহা একেবারে অন্য প্রকারেরই ছিল। গোলাম, বিবি, সাহেব, টেক্কা প্রভৃতি চিত্র তাহাতে ছিল না। গোলামচুরি, বিবিধরা, গ্রাবু ইত্যাদি খেলাও তখন প্রচলিত ছিল না। ঐ প্রকারের তাস ও খেলা আকবরের পরবর্ত্তী নবাবগণ সৃষ্টি করেন। অনেকে বলেন, নবাব ইব্রাইম খাঁ আধুনিক তাসের প্রবর্ত্তক।

পশ্চাত্য বণিকগণ যেরূপ তাস আনিয়া দেন, আকবর তাহার আগা-গোড়া পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন রকমের তাস প্রস্তুত করেন, পশ্চাত্যদিগের তাসের সহিত তাহার কোন মিল রাখেন নাই, তাঁহাদের সৃষ্ট রং বা চিত্র তিনি কিছুই গ্রহণ করেন নাই। নূতন চিত্রাদি তিনি স্বয়ং উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। সেই তাসের বিবরণই এই প্রবন্ধে প্রদান করিব।

আকবর বারপ্রস্থ তাস প্রস্তুত করিয়াছিলেন, প্রত্যেক প্রস্থে বারখানি করিয়া তাস থাকিত। খেলিবার সময় যে প্রস্থ লইতেন তাহার সহিত আরো কতকগুলি খুচরা তাস থাকিত।

বারপ্রস্থ তাসের নাম ও চিত্র।

প্রথম প্রস্থ।—নাম অশ্বপতি। প্রথম তাসের চিত্র ;—দিল্লিপতি অশ্বারোহণে, হাতে ছত্র-পতাকা ; দ্বিতীয় খানিতে অশ্বারোহণে উজির ; তাঁহার হস্তে দহলা, টেক্কাটিতে একটা ঘোড়ার চিত্র।

দ্বিতীয় প্রস্থ।—নাম, গজপতি। প্রথম তাসে উড়িষ্যার রাজা গজারোহণে ; দ্বিতীয়টীতে করিপৃষ্ঠে উজির, বাকিগুলিতে শ্রেণীবদ্ধ হস্তীর চিত্র।

তৃতীয় প্রস্থ।—নাম, নরপতি। বিজাপুরের রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট, পাদপৃষ্ঠে উজির এবং পদাতিক সেনা।

চতুর্থ প্রস্থ।—নাম গড়পতি। প্রধান তাসখানিতে গড়ের উপর সিংহাসনে রাজা ; পাদপীঠে উজির, অপর তাসগুলিতে শ্রেণীবদ্ধ গড়খাই।

পঞ্চম প্রস্থ।— নাম, ধনপতি। প্রথম খানিতে সিংহাসনে রাজা, সম্মুখে স্তূপীকৃত অর্থ, পাদপীঠে উজির হিসাব গ্রহণ করিতে উপবিষ্ট, অন্যগুলিতে স্বর্ণ-রৌপ্য-ঘড়া ও লেখনি এবং মস্যাধার।

ষষ্ঠ প্রস্থ।—নাম, দলপতি। প্রথম খানিতে বর্ম্মাবৃত রাজসিংহাসনে উজির। অপরগুলিতে শ্রেণীবদ্ধ বর্ম্মাবৃত পুরুষমূর্ত্তি।

সপ্তম প্রস্থ।—নাম নৌপতি। প্রথম খানিতে জাহাজের উপর সিংহাসনে রাজা উপবিষ্ট, পাদপীঠে জাহাজে উজির, অপরগুলি শ্রেণীবদ্ধ নৌকা।

অষ্টম প্রস্থ।—নাম, স্ত্রীপতি। প্রথম সিংহাসনে রাণী, অপর পৃষ্ঠে উজির-পত্নী, তাহার পর কতকগুলি স্ত্রীচিত্র।

নবম প্রস্থ।—নাম, দেবপতি। প্রথম খানিতে দেবরাজ ইন্দ্র। দ্বিতীয় খানিতে দেবগুরু বৃহস্পতি দণ্ডায়মান। অপরগুলি কতিপয় দেবমূর্ত্তি।

দশম প্রস্থ।—নাম, অসুরপতি। প্রথমখানিতে দাউদ-পুত্র সোলেমান সিংহাসনে আসীন, অপর পৃষ্ঠে উজির, অন্যগুলিতে অসুরের প্রতিকৃতি।

একাদশ প্রস্থ।—নাম, বনপতি। প্রথম খানিতে পশুরাজ সিংহ, দ্বিতীয় খানিতে ব্যাঘ্রমূর্ত্তি, অপরগুলিতে কতকগুলি বন্য পশুর আকার।

দ্বাদশ প্রস্থ।—নাম অহিপতি। প্রথম খানিতে মকরের পৃষ্ঠে সর্পরাজ বাসুকী, দ্বিতীয় খানিতে সর্প, আসনে উজির, অপরগুলি সর্প-চিহ্নাঙ্কিত।

ইহা ছাড়া অপর তাসগুলিতে অর্থাৎ ক্রীড়াকালীন আবশ্যক বাজে তাসগুলিতে ছয় রং, বিশ বল প্রভৃতি বহুবিধ চিত্র আছে। ইহাতে ক্রীড়ার শক্তিবোধক বল অর্থাৎ খেলিবার কালীন হার-জিতের তারতম্যানুসারে শক্তিপ্রয়োগরূপ চিত্র চিত্রিত আছে। যেমন ধরুন, জিৎ দলের জন্য অশ্ববল, আর হার দলের জন্য ছাগবল।

এতদ্ব্যতীত এই তাসের ১১২ খানির মধ্যে প্রথম খানিতে ধনপতি ধনদানে, দ্বিতীয় খানিতে উজির ধন-ব্যয়-হিসাবে রত। তাহার পর, পরপর রাজকোষ, জহুরী, ধাতুদ্রবকারী, টাকা-মোহর কাটিবার লোক, ওজন করিবার লোক, ছাপ দিবার লোক, মোহর গণিবার লোক, "মান"-নামক মুদ্রা গণিবার লোক, পোদ্দার, ধাতু কাটিবার লোক এবং একখানিতে সম্রাট ভূমিদানকারী রাজাকে চিত্র করিতেছেন; ইহার সম্মুখে "ফরমান" দানপত্র, দোয়াত, কাগজ, ও পাদপৃষ্ঠে উজির রসিদ সম্মুখে অন্যবিধ খুজরা কার্য্যে নিযুক্ত। ইহা ছাড়া রাজস্বকর্ম্মচারীর চিত্রও আছে।

আবার কাগজ উল্টাইবার লোক, দপ্তরে কাগজ লিখিবার লোক, কাগজে রূপলি-সোণালি রং করিবার লোক, নকসা করিবার লোক, সোণার জল ও নীলবর্ণের রেখা টানিবার লোক, ফরমান লিখিবার লোক, পুস্তক বান্ধিবার লোক। আর-একখানি তাসে পূর্ব্বকালের শিল্পকার্য্যের নিদর্শন দেখাইতে বাদশাহ রেশম-পশমের কার্য্য দেখাইতেছেন; পাদপৃষ্ঠে উজির বসিয়া তদারক করিতেছেন। অপর কতকগুলিতে ভারবাহী জীবের চিত্র আছে। তাহার বিপরীত পৃষ্ঠে সম্রাট বংশীবাদন শুনিতেছেন, উজির গায়ক-বাদকের তত্ত্ব লইতেছেন। আর কতকগুলিতে রৌপ্যরাজ রৌপ্য দেখিতেছেন, উজির তাহার তদারক করিতেছেন,—এইরূপ কতকগুলি রৌপ্যছিদ্র-কারীর চিত্র আছে। আর কতকগুলিতে অসিরাজ তরবারী চালাইতে-ছেন, উজির তাহা দেখিতেছেন, অপর পৃষ্ঠে অস্ত্রাগার মধ্যে উজির অস্ত্র-পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন, ইত্যাদি।

এইরূপ ভাবের চিত্রাঙ্কিত তাসে আকবরশাহ তাসক্রীড়া করিতেন। তাঁহার এই অভিনব তাসচিত্র এবং ক্রীড়াকে আইনী-আকবরী-প্রণেতা আবুলফাজেল রাজকার্য্যের একটী অতি কূটনীতিময়ী প্রথা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, আকবর অতি কৌশলী মোগল ভূপতি। ভারতীয় হিন্দু রাজন্যবর্গের সঙ্গে ছলে-বলে-কৌশলে-ক্রীড়ায়, আমোদে-উৎসবে এবং আচারে-ব্যবহারে, বাক্যে-কার্য্যে, সখ্যতা সংস্থাপন করাই তাঁহার জীবনের এক মহা কার্য্য ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন, হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী রাজপুত নৃপতিবৃন্দকে আপনার করিতে না পারিলে, এই হিন্দুস্থানে আধিপত্য রাখিতে পারা যাইবে না। তাঁহার এই সমজ্ঞানমূলক স্বার্থকামনা-সংরক্ষা-ক্রিয়ার অন্যান্য রাজ-নীতিক কৌশলের মধ্যে "তাসখেলাও" একটি চাতুর্য্যময় কার্য্য।

শ্রীমোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য্য।

জীবন ও যম।

আজন্মটা জাৎ মানিনে, জ্ঞানী আমি খাসা!
তাহে দুটি সঙ্গী আমার অঙ্গে নেছে বাসা।
জেগে ফেরে সদাই সাথে কভু নাহি ভ্রম;
এক্‌টি বামুন্ আর একটি সে অতি নীচ ডোম।

প্রাণে প্রাণে গেছে মিলে, নাহিক তফাৎ;
জড়িয়ে থাকে দুজনেরি গলায় দুটি হাত।
সমান্ সমান্ চলি ছুটে, সমান্ পড়ে দম্;
বামুন্ হাসে হী হী কোরে, চুপে চুপে ডোম।

ফর্সা বটে বামুন্, কিন্তু ডোম্ ভারি কালো;
তুল্য মূল্য করি দোঁহে, সমান বাসি ভাল।
মঙ্গল-সংকল্পে যবে বামুন্ করে হোম্,
ছাইভস্মটুকু তার কুড়িয়ে রাখে ডোম।

বামুন্ গাহে গলা খুলে, ডোম্ দেয় শিষ;
সমান্ তালে হাতে তালি, নাহি উনিশ বিশ্।
বামুন্ দেখায় উষার আলো, নিশাকালে সোম;
সন্ধ্যা আর অমানিশা দেখায় মোরে ডোম।

আঁধার হ'লে বামুন্ বলে, "কোথা মোরা যাই?"
ডোম্ বলে, "চেনা পথ, কিছু ভয় নাই।"
অম্‌নি মোরা ছুটে চলি; সাহস নহে কম্।
সঙ্গীদুটি গলাগলি, জীবন্ এবং যম।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

———

চাক্‌মাজাতি।

জাতীয় পরিচয় এবং প্রাচীন কাহিনী।

বর্ত্তমান সভ্যতার নৈকষ-পরীক্ষায় পার্ব্বতীয় জাতিসমূহের মধ্যে চাক্‌মাদিগের শ্রেষ্ঠতম আসন স্বীকার করা যাইতে পারে। বিদ্যা-বুদ্ধি-শিল্প-সাহিত্যে ইহাদিগের শক্তি সভ্যজাতিরই প্রায় সমকক্ষ, এবং উন্নতিও সন্তোষজনক, সন্দেহ নাই। কিন্তু তথাপি মিঃ হগ্‌সন (Mr. Hodgson)-প্রমুখ কোন কোন বিদেশীয় ঐতিহাসিক অনুমানবলে ইহাদিগকে আদিম অসভ্য বর্ব্বর (Aboriginal)-শ্রেণীভুক্ত করিতে চাহেন (১), এ কেমন অবিচার? ইহাদিগের উৎপত্তি, স্থিতি বা পরিব্যাপ্তিমূলক এ যাবত যে সমুদয় বিবরণী প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তদ্দ্বারা ইহারা যে অনার্য্য নহে, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন করা যায়। সে সমুদায় বাদ-বিচার যথাক্রমে আলোচিত হইতেছে।

সভ্যতা।

ইহাদিগের মুখমণ্ডল গোলাকার, নাসিকা নত ও চিপিট, গণ্ড-দেশের অস্থি উন্নত, বক্ষঃ প্রশস্ত, বাহুযুগল মাংসল, জঙ্ঘাদেশ অতিশয় স্থূল ও সুদৃঢ় (বোধ হয় পর্ব্বতারোহণ ও অবরোহণই ইহার প্রধানতম কারণ হইবে), সর্ব্বোপরি অক্ষি-গোলকের কপিলাভাষ এবং বক্রদৃষ্টি ইত্যাদি লইয়া শরীর বেশ হৃষ্টপুষ্ট, বলিষ্ঠ ও সুদৃঢ় বটে, কিন্তু সুগঠিত নহে! শারীরিক উপাদানগুলির মধ্যে কোনও সামঞ্জস্য নাই। বিশেষ কি, বর্ণ গৌর সত্য—কিন্তু লাবণ্য-বর্জ্জিত (gloryless)। অপরতঃ কেশভূষণেও ইহারা নিতান্ত অসৌ-

শারীরিক গঠন।

---

(১) Vide :—
I. Bengal Asiatic Society's Journal, No. 1, 1853.
II. The Calcutta Review, October, 1869.
III. Census Report, 1901.

ভাগ্য। পুরুষেরা বিরলগুল্‌ফ—শ্মশ্রুহীন বলিলেও চলে (১)। রমণী-সমাজেও আগুল্‌ফলম্বিত কেশদাম স্বপ্নের অগোচর। ফলকথা, পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মঙ্গোলিয়ান-সংজ্ঞার সহিত অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গিয়াছে। "বঙ্গের জাতিতত্ত্ব" (Tribes and Castes of Bengal) নামক পুস্তকে মিঃ রিজলী মহোদয় নানা প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে দেখাইয়াছেন যে, এতাদৃশ শারীরিক গঠন এবং বর্ণগত সৌসাদৃশ্যে ইহাদিগকে মঙ্গোলীয় শ্রেণীভুক্ত করা যায়। তৎসমর্থনার্থে তিনি ইহাদের শতকরা ৮৪·৫ জনের মঙ্গোলীয় চেহারা পাওয়া গিয়াছে বলিয়া সাক্ষ্যও দিয়াছেন। পক্ষান্তরে পণ্ডিত (Herr Verchow) হার ভার্‌চো মহোদয় বলেন, এই পরিমাণ কোনও জাতিরই আকৃতিগত তুলনার পক্ষে যথেষ্ট নহে।

পরন্তু আমরা মানবজাতির ককেশিয়ান, মঙ্গোলিয়ান প্রভৃতি ভিত্তি-হীন বিভাগগুলির উপর আস্থা স্থাপন করিতে অসম্মত। জলবায়ু এবং মানসিক বৃত্তি ও ব্যবসায়াদিভেদে জীবের নিত্য পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে। তাহা দেখিয়া শুনিয়াও, বিভিন্নপ্রদেশবাসী—বিভিন্নবৃত্তিক মানবগণের বর্ণ ও আকারগত বিভিন্নতায়—বিভিন্নবংশভুক্ত নির্দ্দেশ করা কদাপি সঙ্গত নহে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী হনু, নাসিকা ও করোটির গঠন এবং সংস্থান-বৈষম্য দেখিয়া যে, চীন ও মগ (কিরাত)-দিগকে মঙ্গোলীয় স্থির করিয়াছেন, মনুসংহিতা-প্রভৃতি বহু প্রামাণ্য গ্রন্থে তাহাদিগকে ভূতপূর্ব্ব ভারতবাসী বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়সন্তান বলিয়াই জানিতে পারি (২)।

---

(১) যে দুই একগাছি উঠে, অনেকে তাহাও "চিম্‌ঠা"র সাহায্যে উৎপাটন করিয়া ফেলে।

(২) "সাহিত্য সংহিতা'র ১৩১২ সালের আষাঢ় সংখ্যায় এসম্বন্ধে বিস্তারিত মন্তব্য বাহির হইয়াছে।

সুতরাং চাক্‌মাগণ মঙ্গোলীয় কি না এবংবিধ প্রশ্নের মীমাংসা আমরা আদৌ প্রয়োজন মনে করি না।

চাক্‌মাদিগের জাতীয় ইতিবৃত্ত বিশ্লেষণ ক'রতে, হইলে প্রথমত দেখাইতে হইবে, তাহাদের আদিম বসতিস্থান কোথায়, এবং কিরূপেই বা তাহারা বর্ত্তমান অধ্যুষিত স্থানসমূহে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। পণ্ডিতপ্রবর এফ্, মুলার (F. Müller) ব্রহ্মদেশ, আরাকান ও পার্ব্বত্য চট্টগ্রামনিবাসী জাতিমাত্রকেই "লোহিতিক"-(১)-বংশসম্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন (২); অর্থাৎ ভারতের এই উত্তর-পূর্ব্বাঞ্চলবাসী প্রায় সমুদায় জাতির মূলশাখা লোহিত্য-নামান্তরে ব্রহ্মপুত্র (যারাকিও-সাংপো) নদের তীরভূমি হইতে আগত। অপরাপর নরতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে "তিব্বতাব্রহ্ম" নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। এই 'লোহিতিক' বা 'তিব্বতী ব্রহ্ম' সংজ্ঞার সহিত বক্ষ্যমাণ চাক্‌মাজাতির

মূল নির্দ্দেশ।

সম্বন্ধনির্ণয় করিবার পূর্ব্বে, "পার্ব্বত্য চট্টগ্রাম এবং তথাকার অধিবাসিবৃন্দ" (The Hill Tracts of Chittagong and Dewellers therein)-প্রণেতা—এই পার্ব্বত্য চট্টগ্রামেরই ভূতপূর্ব্ব ডিপুটি কমিশনার কাপ্তেন টি, এইচ্, লুইন (Captain T. H. Lewin)-কৃত শ্রেণীবিভাগের আলোচনা সমীচীন মনে করি। তিনি এই পার্ব্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসিবর্গকে ব্রহ্মদেশীয় নামানুকরণে "খ্যয়ংথা" এবং "টংথা" শ্রেণীদ্বয়ে বিভাজিত করিয়াছেন। শব্দদুইটী ব্রহ্মভাষাজ; 'খ্যয়ং' অর্থ নদী, 'টং' অর্থ পর্ব্বত, আর 'থা' বা 'ছা' শব্দের অর্থ সন্তান। অতএব যাহারা নদীকূলে বাস করে,

---

(১) Lohitic--from Lohita, 'red' a name of the Brahmaputra believed by Hassen to have reference to the east and the rising sun. (Ind. Alt. i, 667, note.)

(২) Allgemeine Ethnographic, p. 405.

তাহাদিগকে "থ্যয়ংথা" অর্থাৎ নদীর সন্তান এবং পর্ব্বতশৃঙ্গবাসিগণকে "টংথা" অর্থাৎ পাহাড়ের সন্তান বলা যায় (১)। এই সংজ্ঞামতে চাক্‌মাগণকে তিনি "থ্যয়ংথা"-শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত (২) করিয়া গিয়াছেন। গ্রুণওয়েডেল সাহেব (Herr A. Grünwedel) বলেন, ইহা কেবল বাহ্যভাবে নহে, কার্য্যতঃ এই প্রথা তাহারা সম্পূর্ণরূপে পালন করিয়া থাকে। কিন্তু (Herr Virchow) ভারচো সাহেবের মতে এই সকল বিভাগ তাহাদের নদীকূলে আবাস ও পার্ব্বত্য বাসস্থান অনুযায়ী হইয়াছে; এতদ্বারা আদিম বসতি বা কোন বিশেষবিধি কিছুতেই অনুমান করা যায় না। আমরাও এই শেষোক্ত মত সমর্থন করিতেছি।

সিদ্ধান্তবিশেষ।

শারীরিক গঠনাদি দেখিয়া আবার কেহ কেহ সন্দেহ করেন, ইহারা আরাকান হইতে উৎপন্ন (৩); বাঙ্গালীদিগের সহিত বিবাহসম্বন্ধে আকৃতিগত কিঞ্চিৎ পার্থক্য ঘটিয়াছে। তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত সমর্থনকল্পে ইহাও বলিতে চাহেন যে, চাক্‌মাগণ সম্প্রতি মাত্র আরাকানী ভাষা ছাড়িয়াছে। বস্তুতঃ ইহা সত্য নহে, তাহা হইলে এখনও আমরা চাক্‌মাভাষায় প্রচুর মগীশব্দ পাইতাম, কিন্তু ইহা একপ্রকার নাই বলিলেও হয়। অন্তত, রিজলী

---

(১) "রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস" লেখক বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ "থ্যয়ংথা"গণকে মগবংশজ এবং 'টংথা'দিগকে কিরাতবংশজ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শেষে আবার তিনি কাপ্তেন লুইনের মতে মত দিয়া বলিয়াছেন—"থ্যয়ংথা' বংশের একটী শাখা চাক্‌মা নামে পরিচিত" (৩৩৩ পৃষ্ঠা); তবে কি তিনি চাক্‌মাগণকে মগজ বলিতে চাহেন? অন্তত আমরা মগ এবং কিরাতদিগকে অভিন্নজাতি বলিয়াই জানি।

(২) কাপ্তেন লুইনের এই মন্তব্য হইতে "চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত"কার শ্রীযুক্ত তারকপ্রসাদ গুপ্ত 'ইয়ংথা' অর্থাৎ 'থ্যয়ংথা' শব্দের এক ব্যাপক অর্থ নির্দ্দেশ করিয়া চাক্‌মাজাতিকে বুঝাইয়াছেন। তাঁহার মতে "টংথা' মিশ্র ও সঙ্কর জাতি।"

(৩) তারকবাবুও লিখিয়াছেন, "ইয়ংথা (অর্থাৎ চাক্‌মীগণ) আরাকানবংশসম্ভূত।" "চট্টগ্রাম ইতিবৃত্ত," পৃষ্ঠা—৫।

মহোদয় বলেন, "এতৎ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক প্রমাণও অতিশয় দুর্ব্বল। কেন না, আমরা যতদূর জানি, স্বল্পকাল মাত্র হইল আরাকানে লোকবসতি আরম্ভ হইয়াছে" (১) তবে কি না ইহারা যে এক সময়ে আরাকানে বসবাস করিতেছিল, তাহাতে কোন ভুল নাই; তথা হইতে অনুকৃত বর্ণাবলী এযাবৎ ব্যবহৃত হইতেছে।

ইহাদিগের উৎপত্তি ও বিস্তৃতিমূলক এরূপ নানাবিধ কিম্বদন্তী শুনিতে পাওয়া যায়। মগেরা বলে, ইহারা মোগলবংশধর। কোন সময়ে চট্টগ্রামের (মুসলমান) উজীর কতকগুলি সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আরাকানরাজ-বিরুদ্ধে অভিযান করেন। তাঁহারা পথিমধ্যে এক বিশুদ্ধাচারী "ফুঙ্গীর" (২) কুটীর-পার্শ্ব দিয়া যাইতেছিলেন, তখন ফুঙ্গী উজীরকে তদীয় আশ্রমে কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া যৎকিঞ্চিৎ আহার্য্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন। কথা রহিল, অতি সত্বরেই ভক্ষ্য প্রস্তুত করিয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে উজীরও সম্মত হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে পাকের বিলম্ব দেখিয়া তিনি জনৈক সৈনিককে তত্ত্ব জানিবার নিমিত্ত পাঠাইলেন, সে আসিয়া কুটীরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, ফুঙ্গী চাউল ও মাংস একটি পাত্রে দিয়া উনানের উপর স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু উনানে কাষ্ঠ দেওয়া হয় নাই, তৎপরিবর্ত্তে ফুঙ্গী পাত্রনিম্নে পদদ্বয় রাখিয়াছেন—অঙ্গুল্যগ্র হইতে অগ্নিশিখা উত্থিত হইতেছে। সে এই অলৌকিক দৃশ্যে অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া প্রভুকে আসিয়া সমুদয় বিবৃত করিল। ইহাতে তিনি রাগান্বিত হইয়া বলিলেন 'তাদৃশ প্রক্রিয়ায় কখনও অন্ন পরিপক্ক হইতে পারে না'। অনন্তর তিনি সৈন্যগণকে পুনর্যাত্রার নিমিত্ত আদেশ করিলেন। এদিকে

(১) Tribes and Castes of Bengal, p. 168.

(২) ফুঙ্গী—বৌদ্ধযাজক।

সেই বিশুদ্ধচেতা ফুঙ্গী অতিথিগণকে অভ্যর্থনা করিতে আসিয়া দেখিলেন যে, তাঁহারা চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তিনি অতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া সসৈন্যে উজীরকে অভিশপ্ত করিলেন—তাঁহাদের প্রতি এক যাদুমন্ত্র তেজ প্রেরিত হইল। তাহারই ফলে আরাকান-রাজের সৈন্যসম্মুখে উপনীত হইলে তাঁহাদের চিত্তবল বিলুপ্তপ্রায় হইয়া গেল, অনায়াসেই পরাজিত এবং বিপক্ষের হস্তে বন্দী হইলেন। আরাকানেশ্বর এই মোগলগণকে স্থানীয় অধিবাসীদের হইতে পত্নীগ্রহণের অনুমতি দিয়া স্বীয় রাজ্যে দাসস্বরূপে স্থাপন করিলেন। ইহারাই ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া বর্ত্তমান চাকমাজাতিতে পরিণত হইয়াছে।

এই জনশ্রুতির পরিপোষকতায় কাপ্তেন লুইন দেখাইয়াছেন যে, ১৭১৫ হইতে ১৮৩০ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত জামুল খাঁ, সেরমুস্ত খাঁ, সের দৌলত খাঁ, জানবক্স খাঁ, জব্বর খাঁ, টব্বর খাঁ, ধরম বক্স খাঁ প্রভৃতি চাক্‌মাভূপতিবর্গ "খাঁ"-উপাধি পরিগ্রহণ করিতেন। তদানুষঙ্গিক ইহাও উল্লিখিত হইতে পারে যে, এই সময়ে তাঁহাদের কুলবধূগণেরও 'বিবি' খেতাব প্রচলিত ছিল। এখনও সাধারণ সম্প্রদায় 'সালাম' শব্দে অভিবাদন করে এবং আশ্চর্য্য বা খেদসূচক আবেগে 'খোদা'র নাম স্মরণ করিয়া থাকে। পরন্তু, কেবল এই সমুদয়ের উপর নির্ভর করিয়া কখন ইহাদিগকে মোগল-প্রসূতি বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বিশেষতঃ চট্টগ্রামে মোগলাধিকার স্থায়ীরূপে সংস্থাপিত হইয়াছিল, আড়াইশত বৎসরেরও কম। ইহার দেড়শত বৎসর পূর্ব্ব হইতে চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছিল মাত্র! পূর্ব্বোক্ত প্রবাদ সত্য হইলে চাক্‌মাজাতির উৎপত্তিকাল তিন শত বৎসরের অধিক হইতে পারে না, সুতরাং ইহা একেবারে অসম্ভব। চট্টগ্রামে মুসলমান-প্রাবল্য-সময়ে এই

মুসলমানী শব্দের প্রাধান্য।

খেতাব গ্রহণ করিয়াছেন (১)। এমন কি, জড় কামানও কালুখাঁ, ফতেখাঁ-প্রভৃতি 'খাঁ' এই গৌরববাচক আখ্যা লাভ করিয়াছিল। সেই সঙ্গে সঙ্গে উপরিউক্ত দুএকটী মুসলমানী সংস্কার এবং 'আদব-কায়দা'ও প্রবেশলাভ করিয়াছে, ইহা অবশ্য মানিয়া লওয়া যায়।

ব্রহ্মদেশীয়েরা ইহাদিগকে 'ছাক্' বা 'থেক্' নামে নির্দ্দেশ করেন। কর্ণেল ফেইরি (Colonel Fhayre) (২) আরাকানের ইতিবৃত্তে লিখিয়াছেন, (৩) 'রাজা-ওং' অর্থাৎ আরাকানের রাজমালাতে পাওয়া যায়, বারানথির রাজপুত্র যুবরাজ কৌমিসিং পিতাকর্ত্তৃক ব্রহ্ম, শান (বর্ত্তমান শ্যাম) এবং মালয়জাতি-অধ্যুষিত দেশসমূহের দায়দাধিকারী নিযুক্ত হইলে, তিনি বর্ত্তমান ছান্দোয়ানগরের নিকটবর্ত্তী আরাকানের প্রাচীন রাজধানী রামায়তীনগরে আসিয়াছিলেন। এখানে তিনি পশ্চিম ভারতের বিভিন্নদেশ হইতে নানাজাতীয় লোক আনয়ন করেন। তাহাদের মধ্যে যাহারা সর্ব্বাদৌ উপজীবিকা প্রার্থনা করে, তিনি সেই সম্প্রদায়ের নাম রাখিলেন—'থেক্'। (৪) ইহারাই ক্রমে রাজকীয় ইতিবৃত্তে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল। ৩৫৬ মগাব্দে (৯৯৪-৯৫ খৃঃ অঃ) রাজা ন্যা-সিংন্যা-

চাক্মানামের ব্যুৎপত্তি।

(১) পরন্তু এই সকল উপাধি হয়তঃ কেহ কেহ মুসলমান সম্রাট্ হইতে পাইয়া থাকিবেন। কেন না দেখা যায়, হুসেনসাহ স্বীয় মন্ত্রী গোপীনাথ বসুকে 'পুরন্দর খাঁ' এবং সভাসদ্ পণ্ডিত মালাধর বসুকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় লিখিয়াছেন,—"সেকালের উপাধিগুলি কিছু অদ্ভুত রকমের ছিল; 'পুরন্দর খাঁ,' 'গুণরাজ খাঁ' এই সব রাজদত্ত খেতাব"। (বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (২য়) ১৪৯ পৃঃ)। যাহা হউক এগুলি আধুনিক বর্ণপুচ্ছাপেক্ষা যেন অধিকতর মূল্যবান মনে হয়।

(২) ইনি পরে "Sir Arthur" উপাধি পাইয়াছিলেন।

(৩) Bengal A.S. Journal no. 145 of 1844.

(৪) আব্রহ্ম-আরাকানে এই একই বর্ণবিন্যাসে 'থেক্' এবং 'ছাক্' উচ্চারণগত বৈষম্য রহিয়াছে। অনেকেই 'ছাক্' উচ্চারণের পক্ষপাতী।

তৈন এই থেক্ বা ছাক্‌দিগেরই সহায়তায় সিংহাসন লাভ করেন। ইহার তিনশত বৎসর পরে রাজা মেংদি, শ্যাম এবং ছাক্‌দিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিয়াছিলেন। অদ্যাপি আরাকানের প্রান্তসীমায় ছাক্-সম্প্রদায় পরিদৃষ্ট হয়। তাহাদিগের আচার-ব্যবহার চাক্‌মাদিগের সহিত নানাস্থলে বিভিন্ন হইলেও, মূলত সাদৃশ্য অস্বীকার করা যায় না। এই 'ছাক্' নামটিও যেন 'চাক্‌মা' নামেরই রূপান্তরমাত্র। মিঃ রিজ্‌লীও "ছাক্—ছাক্‌মা—চাক্‌মা" রূপে মূল নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কাপ্তেন লুইন বলেন (১), "চাক্‌মা নামটী চট্টগ্রামের অধিবাসীদিগেরই দ্বারা প্রদত্ত।" কিন্তু চট্টগ্রামের জনসাধারণ অদ্যাপি 'চাক্‌মা' ও 'জুমিয়া' (২) আখ্যার পার্থক্য জানে না। মগ, ত্রিপুরা প্রভৃতিকে বাদ রাখিয়া প্রধানতঃ চাক্‌মাগণকেই অধিকাংশ চট্টগ্রাম-বাসী "জুম্যো" (জুমিয়া) নামে অভিহিত করিয়া থাকে। এমন কি, কবিবর নবীনচন্দ্র সেন "জুমিয়াজীবন" লিখিতে গিয়া এই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন, 'জুমিয়া' শব্দের টীকা দেখিলেই ইহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। অপর "চট্টগ্রামের ইতিবৃত্ত"-লেখক তারকবাবুর ভ্রম আরও স্পষ্টতর! তিনি লিখিয়াছেন "(ইয়ংথাগণ) জাতিতে জুমিয়া, ইহারা অনেকাংশে সুসভ্য; ধর্ম্মে বৌদ্ধ। চাক্‌মারাণী কালিন্দী এই সম্প্রদায়ের শীর্ষস্থানীয়া ছিলেন।" ফলতঃ জুমোপজীবী পার্ব্বত্যজাতিমাত্রকেই যে 'জুমিয়া' বলা হয়, তাঁহারা সেই ব্যাপক অর্থ গ্রহণ না করিয়া কেবল চাক্‌মা-

(১) The H.T.etc. and Dwellers therein, p. 62.

(২) জুমিয়া—যাহারা 'জুম্' করে। 'জুম্' কৃষিরই প্রক্রিয়াবিশেষমাত্র। জুমিয়াগণ প্রতি বৎসর নূতন নূতন স্থানের জঙ্গলাদি কাটিয়া তাহা জ্বালাইয়া পরিষ্কার করে। পরে একমাত্র 'দা' দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত খনন করতঃ তাহাতে ধান, কার্পাস, তিল, লাউ প্রভৃতি একসঙ্গে বপন করে এবং যখন যেটি পাকে, তুলিয়া আনে। এক বৎসর যেখানে জুম্ করা হয়, পরবর্ত্তী অন্যূন ৫।৬ বৎসরের মধ্যে সেই ক্ষেত্রে জুম করা যাইতে পারে না।

জাতিবিশেষকে বুঝাইতেই চেষ্টা করিয়াছেন। সুতরাং লুইন মহোদয়ের অনুমানের সার্থকতা কোথায়? পক্ষান্তরে ইহারা নিজে বলিয়া থাকে, তাহাদিগের আদিম বসতিস্থান 'চৈম্পানগে' বা চম্পকনগর হইতে 'চাক্‌মা' নামের উৎপত্তি। রাজ্যবিস্তারমানসে রাজপুত্র এদিকে আসিয়াছিলেন, আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। উপনিবেশ স্থাপন করিয়া রহিয়া গিয়াছেন। এযাবত যত সাক্ষ্য পাওয়া গিয়াছে, সমুদয়ই তাহাদের এই উক্তির অনুকূলে। আমরা ক্রমে ক্রমে সে সকল উপস্থিত করিতেছি। ব্রহ্মদেশে অধিবাসকালে তদ্দেশীয়েরা ইহাদিগকে (দীর্ঘ-উচ্চারণে) "ছাক্‌মা," সংক্ষেপত—'ছাক্‌' নামে অভিহিত করিয়া থাকিবে। আর কর্ণেল ফেইরি-বর্ণিত যুবরাজ কৌমিসিংহের প্রতিপত্তি-বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়াই সন্দেহ জন্মে।

এক্ষণে এই চম্পকনগর যে কোথায় অবস্থিত, তাহা নির্ণয় করাই বিষম সমস্যা! কেহ কেহ ইহাকে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের মগধ অর্থাৎ বর্ত্তমান বেহার রাজ্য নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন (১)। সেখানে ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন, খৃষ্টীয় চতুর্দ্দশশতাব্দীর শেষভাগে এই পার্ব্বত্যপ্রদেশ অধিকার করিয়া এখানে বসবাস এবং স্থানীয় অধিবাসী মগদিগের সহিত বিবাহসম্বন্ধ চালাইতে থাকেন। কিন্তু আমরা এই ভিত্তিহীন অনুমানের উপর আস্থা স্থাপন করিতে প্রস্তুত নহি। কোথায় ভাগলপুর, আর কোথায় বা পার্ব্বত্যচট্টগ্রাম—সহস্র সহস্র যোজন ব্যবধান। প্রবল পরাক্রান্ত মোগলসাম্রাজ্যের বক্ষের উপর দিয়া সম্পূর্ণ অব্যাহতভাবে চলিয়া গেল, অথচ ইতিহাসের

(১) তাঁহাদের মতে চম্পকনগর সম্ভবতঃ চীনদেশীয় পর্য্যটক ফা-হিয়ানবর্ণিত চম্পকরাজ্য। তিনি ৪২৯ খৃঃ অব্দে ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেন। বর্ণনায় আছে,—বর্ত্তমান ভাগলপুরের অনতিদূরে অবস্থিত কম্পাপুরী বা কর্ণপুরের রাজধানী—কম্পা-রা। (See also Bishop Biganelit's Life of Gandama, p. 430. 2nd Edition.)

সুস্পষ্ট আলোকের ছায়ামাত্র পড়িল না ; ইহা কি বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে ? এতদ্ভিন্ন এই চতুর্দ্দশশতাব্দীতেও যে তাহারা আরাকানে বিচরণ করিতেছিল ; তত্রত্য ইতিবৃত্তে ইহা স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায়। অপর একদলের মতে এই চম্পকনগর মালক্কা-নিকটবর্ত্তী, সুতরাং চাক্‌মাগণ মালয়বংশজ। কিন্তু ইহা কল্পনাব্যতীত তাহাদের অপর কোনও প্রমাণ নাই, অতএব ইহাও ন্যায়তঃ গ্রহণ করিতে পারি না। পরিশেষে চাক্‌মাসম্প্রদায়ের সযত্নরক্ষিত অধ্যায়িকাবিশেষের উল্লেখ দেখাইয়া বিচার নিষ্পত্তি করিতেছি। ইহারা উৎসব-আমোদে কথকদিগের প্রমুখাৎ "ধনপতি রাধামোহনের উপাখ্যান" এবং "চাটিগাঁ (১) ছাড়া" নামক পূর্ব্বপুরুষের প্রাচীন কাহিনী অতিশয় আগ্রহ এবং ভক্তিভরে শ্রবণ করিয়া থাকে ; এই দুটীতে আখ্যায়িকার গন্ধ আছে বটে, কিন্তু তাহা হইলেও ইহা হইতে যথেষ্ট ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করিতে পারা যায়। এস্থলে সংক্ষেপে মাত্র কাহিনীদ্বয়ের সার উল্লিখিত হইল। "ধনপতি রাধা-মোহনের উপাখ্যানে" আছে, "চম্পক নগরে উদয়গিরি নামে জনৈক রাজা ছিলেন"। পুনরায় সেই প্রশ্ন ! পরন্ত উপাখ্যানকার চম্পকনগরী নির্ণয়ের পথ কিঞ্চিৎ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছেন। যতদূর দেখা যায়, ইহা ত্রিপুরাদেশেরই অন্তর্গত (২)। কেন না, উপাখ্যানপাঠে জানা যায় "রাজা উদয়-গিরির দুই পুত্র, বিজয়গিরি ও চমকগিরি। দক্ষিণে মগাধীশ্বরের রাজ্য-

মতান্তর।

উপাখ্যান।

(১) প্রাচীন চাটিগাঁ হইতে বর্ত্তমান চট্টগ্রাম নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

(২) সাহিত্যবিদ্ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয়ের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে" এই চম্পকনগরীর কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কেহ কেহ বলে সেইখানেই চাঁদ-সদাগরের আবাসভূমি ছিল। তাহাদের কল্পনায় লখীন্দরের লৌহ-বাসর-ভিত্তিও তথায় দুষ্প্রাপ্য নহে। সে যাহা হউক্ তৎসম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। ১৭৪ পৃ দ্বিতীয় সংস্করণ)।

বিস্তারে বাধা দিবার নিমিত্ত বিজয়গিরি সেনাপতি রাধামোহন-সমভিব্যাহারে তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করেন। কিন্তু প্রিয়তমা পত্নী ধনপতির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে যুদ্ধযাত্রার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া রাধামোহন নিকটবর্ত্তী ত্রিপুরাপাড়ায় জয়নারায়ণ রোয়াঝার সন্নিধানে প্রতিনিধি অনুসন্ধানের জন্য গিয়াছিলেন।" চম্পকনগর অপর কোন দেশে হইলে পার্শ্বগ্রামে ত্রিপুরাপাড়া থাকিবার সম্ভাবনা কোথায়? বিশেষতঃ এই বর্ণনায় জলপথে চট্টগ্রাম আসিতে মেঘনাদরিয়ার (১) উল্লেখ আছে। তদ্দ্বারাও চম্পকনগরকে ত্রিপুরার সমীপস্থ বলিয়া চম্পকনগরের অবস্থাননির্দ্দেশ প্রমাণিত হয়। ইহা ছাড়া, বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদক মহামতি উইলসন সাহেব লিখিয়াছেন, এই ত্রিপুরা, নোয়াখালি ও আরাকান প্রদেশ লইয়া পুরাকালে সুহ্মদেশ গঠিত হইয়াছিল (২)। সুতরাং ত্রিপুরার চম্পকনগরবাসী চাক্‌মাগণের দৃষ্টি চট্টগ্রাম ও আরাকানের উপর সহজেই আকৃষ্ট হওয়া সম্ভব। এক্ষণে আমরা মুলার সাহেবের সেই ব্রহ্মপুত্রনদে আগত লোহিতিক (৩) জাতির সহিত ইহাদিগের সম্বন্ধও স্বীকার করিতে পারি। এই মতে ত্রিপুরায় তাহাদের প্রাচীন উপনিবেশ-স্থাপনও অযৌক্তিক নহে। বিশেষতঃ

---

(১) দরিয়া যাবনিক্ শব্দ, অর্থ সমুদ্র। উপাখ্যানকার মেঘনার মহান্ পরিসর দেখিয়া সমুদ্ররূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

(২) ইহা অবিশ্বাস করিবারও কারণ নাই। মহাকবি কালিদাস "রঘুবংশ মহাকাব্যে" সুহ্মদেশকে পূর্ব্বসাগরের উপকূলে তালিবনপূর্ণ শ্যামায়মান বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দিগ্বিজয়প্রবৃত্ত সম্রাট রঘু—

পৌরস্ত্যানেবমাক্রামন্ তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী।
(সুহ্মদেশং) প্রাপ তালিবন শ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ॥ ৩৪, ৪র্থ সর্গ।

(৩) "রাজমালা"-লেখক আবার এই লোহিতিক সম্প্রদায়কে হিমালয়, পূর্ব্বপ্রান্ত এবং মধ্যভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহার মতে গারো, ত্রিপুরা, কাছারী ও মণিপুরী-প্রভৃতি পূর্ব্বপ্রান্তশ্রেণীভুক্ত। সুতরাং এই চাক্‌মাগণও "পূর্ব্বপ্রান্ত লোহিতিক"-শ্রেণীভুক্ত।

শ্রীহট্টের দক্ষিণপ্রান্তে এক চাক্‌মাসম্প্রদায় অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারা আপনাদিগকে "উত্তরের চাক্‌মা" এবং বক্ষ্যমাণ জাতিকে "দক্ষিণের চাক্‌মা" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। সুতরাং শ্রীহট্টের চাক্‌মাগণকেও ইহাদের শাখাবিশেষ স্বীকার করা যায়। এবং মূল চাক্‌মাজাতিকেও নরজাতিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের সংজ্ঞায় "তিব্বতী ব্রহ্মা"-বংশসম্ভূত বলা যাইতে পারে। এক্ষণে ইহাদের বিস্তৃত পর্য্যালোচনা করা যাক।

পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যান "চাটিগাঁ ছাড়া" অর্থাৎ চট্টলবর্জ্জন আখ্যায়িকার অবতরণিকা মাত্র। ইহাতে তাহারা কিরূপে চট্টগ্রাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহার বিস্তারিত বিবরণী আছে। দুঃখের বিষয় এই ঘোরতর যুদ্ধরাশিপরিপূর্ণ বিচিত্র আখ্যান-ভাগে সময়নির্দ্দেশক কোনও সুবিধা নাই। কেবল এইমাত্র বলিতে পারা যায়, তখনও চট্টগ্রামে মগরাজার প্রভুত্ব প্রসারিত হয় নাই। অনুমান চতুর্থ কি পঞ্চম শতাব্দীর কথা হইবে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, এই "চাটিগাঁ ছাড়া" ইহাদের এত স্মরণীয় হইল কেন? ইহা হইতে চট্টগ্রামের সহিত পূর্ব্বতন ঘনিষ্ঠসম্বন্ধ প্রকাশ পায় না কি? সুতরাং ত্রিপুরাদেশে চম্পকনগরের অবস্থান বিশেষরূপে প্রমাণিত হইতেছে। "চাটিগাঁ ছাড়া"য় আছে :—

আখ্যায়িকা।

"যে সময়ে যুবরাজ যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন, ঠিক সেই সময়েই এদিকে মগরাজ অমঙ্গলাশঙ্কায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়েন। জ্যোতির্বেত্তার নিকট জানিতে পারিলেন, উত্তরে শত্রু জন্মিয়াছে। কিন্তু গুপ্তচর পাঠাইয়াও তাহার কোন সন্ধান পাইলেন না। অনন্তর বিজয়গিরি সেনাপতি রাধামোহনকে (প্রতিনিধি অভাবে) লইয়া অভিযান করেন। কালাবাঘ প্রদেশে (১) তদীয় শিবির সংস্থাপিত

(১) বর্ণনা পাঠে মনে হয়, কালাবাঘা প্রদেশ চম্পকনগর ও চট্টগ্রামের মধ্য-ভাগে—শেষোক্ত প্রদেশেরই অনতিদূরে অবস্থিত।

হইল। মগদেশ জয়ের নিমিত্ত বিপুল সৈন্য সহকারে রাধামোহনই প্রেরিত হইলেন।

পথিমধ্যে তাঁহারা সমুদ্রও পাইয়াছিলেন। এইরূপে সসৈন্যে তিনি কৈংগার-তীরে (১) আসিয়া মগরাজ-সমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। মগরাজা সন্ধি চাহিলেন না। অবশেষে যুদ্ধে পরাজিত ও বশীকৃত হন।

বিজয়গিরির অভিযান।

মগদেশ জয়ের পর রাধামোহন থ্যয়ংদেশ (২) বিজয়ের নিমিত্ত ছুটিলেন। সেখানে 'জারি পাগর্জ্যা' নামক স্থানে গিয়া সকলে বিশ্রাম লাভ করিল। ক্রমে থ্যয়ংদেশও জয় হয়। অতঃপর রাধামোহনের রাজ্যলিপ্সা এতই বাড়িয়া যায় যে, অচিরে তিনি প্রবল পরাক্রান্ত অক্সাদেশ (ব্রহ্ম) জয়ের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। কিন্তু এখানে ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। প্রথম যুদ্ধে সেনাপতি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। যাহা হউক শেষে দৈববলে অনাময় হইয়া পুনরায় দ্বিগুণিত তেজে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, অক্সারদেশও জয় হইল। তদনন্তর প্রত্যাবর্ত্তন-পথে অনায়াসেই কাঞ্চনপুর (৩) হস্তগত

রাধামোহনের ব্রহ্মজয়।

---

(১) কেবল চাক্‌মারা কেন, সমস্ত পূর্ব্ববঙ্গেই "গার" শব্দে নদীকে বুঝায়, শব্দটী বোধ হয় "গঙ্গা"নাম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

(২) থ্যয়ংজাতির আবাসস্থান। অদ্যাপি আরাকানে এই জাতি বিরল নহে। ইহাদের রমণীগণ পরমাসুন্দরী। কিন্তু সমস্ত বদনমণ্ডলে 'উল্‌কি' চিহ্নিত করিয়া অপূর্ব্ব সুষমা ঢাকিয়া রাখে। কথিত আছে, পুরাকালে অত্যাচারী মগরাজার কুদৃষ্টি হইতে অবলাগণকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ঈদৃশ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ক্রমেই সেই প্রথা চলিয়া আসিতেছে।

(৩) ইহা সম্ভবতঃ চট্টগ্রামের অন্তঃপাতী বর্ত্তমান কাঞ্চননগর হইবে। শুনিতে পাওয়া যায়, এক সময়ে আরাকান হইতে জনৈক মগাধিপতি হৃতরাজ্য হইয়া কতিপয়

করিলেন। তখন আবার পূর্ব্বদিকে কুকি (১) রাজ্য জয় করিবার ইচ্ছা হইল।

রাধামোহনের আগমনসংবাদে কুকিরাজ প্রস্তরনির্ম্মিত দুর্গে আশ্রয় লইলেন। ক্রমাগত পঞ্চদশদিবসব্যাপী যুদ্ধের পর কুকিরাজ পরাভূত হইয়াছিলেন।

দিগ্বিজয়ব্যাপার শেষ করিয়া সেনাপতি রাধামোহন যুবরাজ-সমীপে সংবাদ পাঠাইলেন। তিনি হর্ষোৎফুল্লচিত্তে কালাবাঘাপ্রদেশ হইতে চট্টগ্রামে আসিয়া উপনীত হইলে, মগরাজা পুনরায় চাক্‌মারাজ আসিতেছেন শুনিয়া শশব্যস্ত হইয়া পড়িলেন।

প্রত্যাবর্ত্তন।

সাপ্রারোইকুলে (২) রাধামোহনের সহিত বিজয়গিরির সাক্ষাৎ হয়। তখন সেনাপতি স্বদেশ-গমনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। যুবরাজ হৃষ্টান্তঃকরণে তাঁহার প্রার্থনা অনুমোদন করেন। প্রায় বারবৎসরের পর রাধামোহন স্বদেশ-প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

বিজয়গিরির দিগ্বিজয়-যাত্রার পর বৃদ্ধ পিতার পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। সিংহাসন শূন্য থাকিলে পাছে রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হয়, এই ভয়ে চমক-

---

(১) 'কুকি' আখ্যাটী পূর্ব্ববঙ্গবাসী বাঙ্গালীদিগেরই দ্বারা প্রদত্ত হইয়া থাকিবে। পরন্তু বিগত লোকগণনার রিপোর্টেও লিখিত হইয়াছে :—"The word Kuki is really a generic term used by the people of the plain to denote the hillmen, other than Tiperahs and Chakmas. (Report on the Census of Bengal, p. 420).) বাস্তবিক কুকি এই শব্দেই যেন উৎকট হিংস্রভাব সূচিত হইতেছে। কাছারবাসিগণ ইহাদিগকে "লুছাই" নামে অভিহিত করিত। ইংরেজেরা তাহাদের সেই "লুছাই" আখ্যা লইয়া "লুসাই" (Lushai) বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

(২) সাপ্রেরোইকুল ব্রহ্মদেশে। সেই দেশীয়েরা বলে, চাক্‌মাদিগের বসবাস হইতে এই নামকরণ হইয়াছিল।

গিরি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। রাধামোহনের প্রত্যাবর্ত্তন-সংবাদ পাইয়া চমকগিরি তাঁহাকে আহ্বান করিলেন; এবং জ্যেষ্ঠভ্রাতার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করেন। রাধামোহন বিজয়গিরির উপদেশানুসারে বলিলেন যে, তিনি আগামী অগ্রহায়ণ মাসে নিশ্চয় প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। তার পর চমকগিরি রাধামোহনের প্রমুখাৎ বিজিত রাজ্যসমূহের বিস্তারিত বিবরণ শ্রবণ করিলেন।

চমকগিরির সহিত সাক্ষাৎ।

এদিকে বিজয়গিরি সেবরাজ্যের শাসনশৃঙ্খলা বিধান করিয়া সেই অগ্রহায়ণমাসে স্বদেশাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু যখন কালাবাঘা প্রদেশে উপনীত হইয়া শুনিতে পাইলেন যে, অনেক দিন হইল বৃদ্ধ পিতা পরলোক গমন করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন চমকগিরিরই হস্তগত হইয়াছে; তখন তিনি কিরূপে যাইয়া কনিষ্ঠ সহোদরকে অভিবাদন করিবেন—এই লজ্জা এবং মনোক্ষোভে অধীর হইয়া আর অগ্রসর হইলেন না, তখন বড় মর্ম্মপীড়িত কণ্ঠে বলিয়াছিলেন—'যে দেশে এ হেন অবিচার, জ্যেষ্ঠভ্রাতা বর্ত্তমানে কনিষ্ঠ রাজ্য পায়, সেখানে আর যাইব না। অতএব সৈন্যগণ, চল পুনরায় ব্রহ্মদেশে ফিরিয়া যাই।' এইরূপে বহু আক্ষেপ করিয়া বিজয়গিরি ব্রহ্মদেশে সসৈন্যে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সৈন্যগণকে তত্রত্য অধিবাসীদের হইতে পত্নীগ্রহণের অনুমতি দিলেন, এবং তিনি নিজেও বিজিত রাজ্য হইতে উচ্চবংশজা রূপে-গুণে বরণীয়া মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে তাহাদের ধর্ম্ম এবং আচারপদ্ধতিগুলিও নববিভাজিত চাকমা-সমাজে পরিগৃহীত হইয়া গেল। এইরূপে চট্টগ্রাম ছাড়িয়া যাওয়ায় কবি আখ্যায়িকার নাম 'চাটিগাঁ ছাড়া' রাখিয়াছেন। কিন্তু চাকমাজাতির প্রধান মূল

বিজয়গিরির আক্ষেপ।

বংশ-সম্ভূত হইবে। পাঠক স্মরণ রাখিবেন, এই পুস্তকে তাঁহাদের সহিত কোনও সম্পর্ক থাকিবে না। ইহাতে কেবল বিজয়গিরির অনুসৃত চাক্‌মাদিগের বিবরণী লিপিবদ্ধ হইবে।

"চাটিগাঁ ছাড়া" উপাখ্যানবিশেষ বটে, কিন্তু ইহাতে কল্পনার অব্যাহত প্রভাবের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। আমি মানি, ঐতিহাসিকের আসরে আমার উপাখ্যানের আদর নাই, ছন্দঃ এবং পদমিলনের জন্য হইলেও কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি প্রয়োজন হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহারও কৈফিয়ৎ আছে। "চাটিগাঁ ছাড়া" যে ছন্দে বিরচিত, তাহার পদমিলনের নিমিত্ত কবিকে বড় একটা ভাবিতে হয় নাই; অথচ মিত্রাক্ষর। শেষ পঙ্‌ক্তিতে যাহা বর্ণনা করিতে হইবে, তাহারই অন্ত্যবর্ণবিশিষ্ট যে কোন একটি অর্থশূন্য বাক্য পূর্ব্ববর্ত্তী হয়। সে যাহা হউক, এই সুদীর্ঘ বৎসরাবলীর পরেও "চাটিগাঁ ছাড়ার" প্রমাণমূলক সাক্ষ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়। চট্টগ্রামের কমিশনরের অফিসে ব্রহ্মসম্রাট্ ভরবুমার ১৭৮৪ খৃঃ অব্দে স্বাক্ষরিত একখানি পত্র আছে। ইহা তদানীন্তন চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তার নিকট উভয় রাজ্যের মধ্যে অবাধবাণিজ্য চালাইবার প্রার্থনায় লিখিত হইয়াছিল। বাহুল্যভয়ে এস্থলে পত্রখানির মাত্র মর্ম্মানুবাদ তুলিয়া দিলাম।

ব্রহ্ম-সম্রাটের পত্র।

"চট্টগ্রাম-মোগলরাজ এবং অমরপুর-রাজ আম্বাং (১)-দামাকর্ত্তৃক আবাদিত ও অধ্যুষিত হয়। এখানে তাঁহারা চতুঃশতাধিকদুইসহস্র সাধারণ উপাসনামন্দির ও চতুর্ব্বিংশতি জলাশয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। আম্বাংদামার সিংহাসনাধিরোহণের পূর্ব্বে এই দেশ "ছত্রধারী" উপাধি-

(১) কাপ্তেন লুইনের মতে, অমরপুর—ত্রিপুরার প্রাচীন রাজধানী উদয়পুরের নামান্তর এবং যুবরাজ অর্থাৎ "দারুন" উপাধি হইতে "দামা" হইয়া থাকিবে। কিন্তু "রাজমালায়" দেখিতে পাই "অমরপুর অমরমাণিক্যের রাজধানী নিবিড় অরণ্য মধ্যে গোমতীনদীর তীরে অবস্থিত। ত্রিপুরার অন্যান্য রাজধানী অপেক্ষা অমরপুর ব্রহ্মার নিকটবর্ত্তী।"

শালী নৃপতিগণের শাসনাধীন ছিল। তাঁহারা অনেক উপাসনামন্দির প্রস্তুত এবং প্রত্যেক জাতীয় লোকদিগকে ধর্ম্মশিক্ষা দিতে যাজক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যুত ইঁহাদিগের সময়ে রতনপুর, দুর্গাদি, আরাকান, দুর্গাপতি, রামপতি, চৈদক, মাহদীণি, মানাং প্রভৃতি দেশের অধিপতি রাজা ছিরীতমাছাকের অধিকারের পূর্ব্বে এদেশের শাসনব্যবস্থা নিকৃষ্ট ছিল। তাঁহার সময়ে ন্যায়পরতা ও কার্য্যদক্ষতার সহিত শাসনকার্য্য নির্ব্বাহিত হইত, তাঁহার শাসনে প্রজাবর্গ সুখী ছিল। তদানীন্তন সাধুগণের বন্ধুত্বের দ্বারাও তিনি অনুগৃহীত হইতেন। ইহঁাদের মধ্যে বুদ্ধনামা একজন তাঁহার আবাসাভিমুখে গেলে, রাজা তৎসমীপে প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদানের নিমিত্ত যেন একজন পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া দেন। এই প্রার্থনামতে থোয়ামার্চ্চি নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই সময়ে স্বর্গ হইতে স্বর্ণ, রৌপ্য এবং বহুমূল্য প্রস্তরাদি বর্ষিত হইয়াছিল। এ সমুদয় প্রাগুক্ত ধর্ম্মযাজকের রক্ষণাবেক্ষণে ভূমধ্যে প্রোথিত ছিল। লোকে এইখানেই দেবতাগণকে পূজা করিতে আসিত। পর্য্যটক ও যাত্রীদিগের সেবার নিমিত্ত রাজা ঐ মন্দিরে ভৃত্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত রাখিয়াছিলেন। রাজা নিজে পাঁচখানি গ্রন্থপাঠেই সময় কাটাইতেন। ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ ও অসদাচার কার্য্য হইতে তিনি সতত বিরত ছিলেন, এবং তদীয় ধর্ম্মযাজকগণ হংস, পারাবত, ছাগল, শূকর, মোরগ প্রভৃতি জীবের মাংস খাইতেন না। দুষ্কর্ম্ম, চৌর্য্য, ব্যভিচার, মিথ্যা ও পানদোষ এ সময়ে একরূপ অজ্ঞাতই ছিল।

দয়া ও ন্যায়পরায়ণতার সহিত প্রজাশাসন করতঃ আমি—ছিরীতমাছাকের আইন ও রীতিনীতি যথার্থই প্রতিপালন করিয়াছি।”

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ব্রহ্মদেশীয়েরা চাক্‌মাগণকে ছাক্‌নামে অভিহিত

করিয়া থাকেন। এই ছিরীতমাছাক্ রাজা বিজয়গিরির অনতিপরবর্ত্তী উত্তরাধিকারী হইবার সম্ভাবনা। ব্রহ্মদেশের আবহাওয়ার এত পরিবর্ত্তন ঘটিতেছিল যে, নামটী পর্য্যন্ত রক্ষা পায় নাই। কোথায় উদয়গিরি, বিজয়গিরি প্রভৃতি, আর কোথায় তাঁহাদিগেরই বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন ছিরীতমা! অতঃপর আমরা এইরূপ ইরাংজ, চোপ্রু, চোতু প্রভৃতি বংশধরদিগের কথা উল্লেখ করিব। এস্থলে প্রাচীন নরপতিগণের শাসনবিধির প্রতি পাঠকবর্গের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। তাঁহারা কেবল অর্থ ও রক্তপিপাসু ছিলেন না, সঙ্গে সঙ্গে প্রজার চরিত্রশোধন ও ধর্ম্মসাধনের পক্ষেও যথেষ্ট সাহায্য করিতেন। বিশেষতঃ চাক্‌মাধীশ্বর ছিরীতমার শাসনপ্রণালী এত উচ্চস্থান লাভ করিয়াছিল যে, বহুশতাব্দী ধরিয়া শক্র রাজগণও তাহা আদর্শরূপে মানিয়া চলিয়াছেন। অনন্তর ব্রহ্মরাজ্যের চাক্‌মা-অধিপতিবর্গের শাসনবিবরণী বর্ণিত হইতেছে।

ব্রহ্মদেশের ও আরাকানের ইতিহাস।

ব্রহ্মদেশের পুরাবৃত্ত "চুইঙং-ক্য-যাং"এর মধ্যে দেখিতে পাই, বিরাট ব্রহ্মসাম্রাজ্য তিন প্রধান ভাগে বিভাজিত ছিল। এক ভাগের অধিপতি ব্রহ্মরাজ স্বয়ং, অপর দুই অংশ চাক্‌মা ও মগরাজার শাসনাধীনে ছিল বলিয়া কীর্ত্তিত। এতদ্ভিন্ন ইহাতে চাক্‌মাগণসংক্রান্ত বিশেষ কোনও ঘটনার উল্লেখ নাই। অন্ততঃ "দেঙ্গ্যাওয়াদি—আরেদফুং", "আরাকানকাহিনী" আমাদিগের প্রধান প্রামাণ্যগ্রন্থ। আরাকানাধীশ্বরের দিগ্বিজয়-বর্ণনায় ইহা নানা দেশের তথ্যে পরিপূর্ণ। আমাদের দেশীয় ইতিহাসের সহিত দুএকস্থলে ইহার সামঞ্জস্য না থাকিতে পারে, কিন্তু বর্ত্তমান প্রসঙ্গে তদীয় সাক্ষ্যে কোন ত্রুটি পাওয়া যায় না। এই সভ্যতার প্রদীপ্তালোকেও নিরপেক্ষ বর্ণনা পাইবার বড় আশা নাই। একই দৃশ্য ভিন্ন ভিন্ন চস্মায় বিভিন্নবর্ণে প্রতিফলিত

হইয়া লিপিবদ্ধ হয়, আর হতভাগ্য দেখিতে দেখিতে ভ্রান্ত, পড়িতে পড়িতে উদ্‌ভ্রান্ত এবং ভাবিতে ভাবিতে প্রভ্রান্ত হইয়া মজিয়া রহে "অন্ধের হস্তী-দর্শন" কাহিনী বোধ করি অনেকেই অবগত আছেন। সুতরাং স্বরূপ তত্ত্ব পাইতে হইলে, আমাদের কর্ত্তব্য সমস্তই একীভূত করিয়া একটি অভিনব সংগ্রহ গঠন করিতে হয়। সুখের বিষয় আজকাল এই শ্রেণীর দুইচারিখানি পুস্তক বাঙ্গালাতেও দেখা দিয়াছে, তাহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

ঐতিহাসিক রহস্য।

"দেঙ্গ্যাওয়াদি আবেদফুং"তে ৪৮০ মগাব্দে খৃষ্টীয় ১১১৮-১৯ সনে চাক্‌মাদিগের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পরিদৃষ্ট হয়। এ সময়ে পেঁগু (আধুনিক পেগু) দেশে আলংচিছুনামা জনৈক রাজা ছিলেন। পশ্চিমের বাঙ্গালীদিগের সহিত মিলিত হইয়া চাক্‌মাগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ উপস্থিত করে। পেঁগোরাজ স্বীয় প্রধান মন্ত্রী কোরেঙ্গ্রীকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়া যুদ্ধার্থ প্রেরণ করিলেন। তিনি যুদ্ধস্থলে উপনীত হইলে, একটা সারসপক্ষী একখানি মৃতপ্রাণীর চর্ম্ম মুখে লইয়া তাঁহার সম্মুখে পতিত হইল; তিনি তাহাকে ধরিয়া রাজার শিবিরে লইয়া গেলেন; এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, এই সারস—বাঙ্গালী, ও চর্ম্মখানি—চাক্‌মা, উভয়ের মিত্রতা ঘটিয়াছে। কিন্তু আমাদের এই যুদ্ধে নিশ্চয়ই বাঙ্গালী ও চাক্‌মাগণ এই সারসের ন্যায় বশ্যতা স্বীকার করিবে। রাজা মন্ত্রীর এ হেন যুক্তিগর্ভ আশ্বাসবাক্যে অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া একটা হস্তী উপহার প্রদান করেন। অনন্তর হঠাৎ চতুর্দ্দিকে নানা অশুভ লক্ষণ দেখা দিল, পবিত্র "মহামুনিমূর্ত্তি" (১) স্বেদসিক্ত হইলেন; ঘন

চাক্‌মা ও বাঙ্গালী।

(১) বুদ্ধদেব জন্মস্থান কপিলাবস্তুনগরে "শাক্যমুনি," লঙ্কায় "চন্দ্রমুনি" (চাঁইদামুনি) এবং ব্রহ্মদেশে বিশেষতঃ আকিয়াবে "মহামুনি" আখ্যায় অভিহিত ও পূজিত। প্রাগুক্ত মূর্ত্তিদ্বয় যথাসম্ভব স্বাভাবিক অর্থাৎ সাধারণ মনুষ্যেরই মত।

ঘন অশনিনিপাত, অকালবৃষ্টি, বন্যায় সমন্তাৎ হাহাকার পড়িয়া গেল। রাজা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া এই অমঙ্গলশান্তির নিমিত্ত পুরোহিতকে শতমুদ্রা প্রদান করিলেন। এই ঘটনার বহুকাল পরে আনালুঙ্কা-নামক পেগুরাজার শাসনসময়ে পুনরায় বাঙ্গালী ও চাক্‌মাগণ বিদ্রোহী হয়। রাজা পঞ্চাশ হাজার সৈন্য লইয়া দাঙ্গাজিয়াকে সেনাপতি করিয়া পাঠাইলেন। দাঙ্গাজিয়া যাত্রা করিয়া সম্মুখে দেখিলেন, একটী বক ও একটী কাক ঝগড়া করিতেছে, অবশেষে বক কাকের ডানা ভাঙিয়া দিল। তিনি রাজার নিকট আসিয়া ইহা বিবৃত করিলেন। মন্ত্রী বুঝাইয়া দিলেন, এই কাক বাঙ্গালী এবং বক আমরা। ইহাদ্বারা সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে, এই যুদ্ধে আমাদের জয়লাভ নিশ্চিত। সেনাপতি অমিত-উৎসাহে যুদ্ধারম্ভ করিলেন। পাঁচদিন অবিরাম যুদ্ধের পর বাঙ্গালী ও চাক্‌মাগণ পলায়ন করে"।

অনন্তর কুতুবদিয়ার উত্তরে বাঙ্গালীগণ এবং আরাকানের অন্তর্গত ক্রিন্দেন পাহাড়ে চাক্‌মাগণ আবার প্রবল হইয়া উঠিল। আরাকান রাজার দুই মন্ত্রী পরামর্শ স্থির করিলেন যে, বাঙ্গালী ও চাকমাগণ যাহাতে মিশিতে না পারে তজ্জন্য আমাদিগকে সাবধান থাকিতে হইবে। বাঙ্গালীদিগকে জয় করিতে পারিলে চাক্‌মাগণকে বশে আনিতে কোন কষ্ট হইবে না। কিন্তু বাঙ্গালীরা বেগতিক দেখিলেই পলাইয়া যায় এবং প্রায়শঃই অশান্তি উৎপাদন করে। সুতরাং যেরূপে তাহাদিগের সমূহ বল বিধ্বংস হয় সেই কৌশল খেলিতে হইবে।

কিন্তু মহামুনিকে দেখিলে শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে। উচ্চতায় যেন আকাশ ছুঁইয়াছে, পরিধানে কপিলবস্ত্র, ধ্যানস্তিমিত নয়নযুগল, নবদ্বারের বৃত্তি নিরোধ—নিবাত-নিষ্কম্প—সাধনাতৎপর সেই বিরাটমূর্ত্তি বিরাটভাবের সূচনা করে। চট্টগ্রামেও এতদনুকরণে দুইটী মহামুনিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে, যথাস্থানে বিবৃত

এই নিমিত্ত পঞ্চসহস্র 'বালাম নৌকা' (১) প্রস্তরপূর্ণ করিয়া একদা নিশাভাগে বাঙ্গালীদের জাহাজাদি চলিবার পথে ডুবাইয়া রাখা হয়। বর্ত্তমান মাতামুড়ি নদীর মোহনায় চান্দাজা ও মুখ্যংজা নামক সেনাপতিদ্বয়ের অধীনে দশসহস্র সৈন্য থাকে। অন্যদিকে প্রকাণ্ড বংশ-ভেলায় বারুদ, গোলা এবং বহুসংখ্যক সৈনিক পুত্তলিকা স্থাপন (২) করিয়া ভাঁটার সময় ছাড়িয়া দেওয়া হয়। বাঙ্গালীরা মনে করিল,

বাঙ্গালী-বিজয়।

ঐ বুঝি মগসৈন্য আসিতেছে। তাহারা অনতি-বিলম্বে জাহাজে চড়িয়া গোলাবর্ষণতৎপর হইল। ভেলা যতই নিকটতর হইতেছিল, তাহারা আরও অধিকরূপে গোলা-ক্ষেপণ করিতে লাগিল। পরিশেষে এই গোলার অগ্নিতেই ভেলাস্থিত বারুদ-গোলাদি জ্বলিয়া সসৈন্যে বাঙ্গালীদিগের জাহাজ বিনষ্ট হইয়া গেল। এইরূপে অতি সহজেই বাঙ্গালী-বিজয় হইয়া যায়। পক্ষান্তরে চাক্‌মারাজ নিরুপায় দেখিয়া মগরাজার অধীনতাস্বীকারপূর্ব্বক বহু-মূল্য উপঢৌকন প্রেরণ করেন। মন্ত্রী মগরাজাকে বুঝাইয়া দিলেন, চাক্‌মারাজার সহিত সখ্যতাস্থাপনে কোন অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। বাঙ্গালীদিগের কূটবুদ্ধিতেই চাক্‌মারাজ ভ্রমে পড়িয়াছিলেন।

৬৯৫ মগাব্দে (১৩৩৩-৩৪ খৃঃ অঃ) আরাকানাধিপতি মেঙ্গাদি (৩) সমীপে লামুনছগ্রী নামা জনৈক দূত আসিয়া সংবাদ দিলেন, উচ্চব্রহ্মের চাক্‌মারাজা নানা উপদ্রব আরম্ভ করিয়াছেন। এই

---

(১) এই নৌকাগুলি আকারে সুবৃহৎ। এক এক নৌকায় ৫।৬ শত মণ বোঝাই ধরে। সমুদ্রপথেই প্রায় যাতায়াত করিয়া থাকে। চট্টগ্রামেও ইহার প্রচলন যথেষ্ট।

(২) শুনা যায় চীন-জাপান-যুদ্ধে সুচতুর জাপানীগণ এইরূপ কৃত্রিম সৈন্য স্থাপন করিয়া অহিফেণ-বিভোর চৈনিকগণকে প্রতারিত করিয়াছিলেন।

(৩) এই মেঙ্গদি পরিশেষে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

সংবাদে তিনি প্রধানমন্ত্রী (কোরেঙ্গ্যী) রাজাঙ্গ্যাছাংগ্রার অধীনে দশসহস্র সৈন্য দিয়া চাক্‌মারাজার বিরুদ্ধে পাঠাইলেন। পরে রিজার্ভ হইতে আরও বিংশসহস্র সৈন্য তাঁহার সাহায্যার্থে দিলেন। কিন্তু ছাংগ্রাই আরও অনেক সৈন্য সংগ্রহ করিয়া তংথংজার শাসনকর্ত্তা ত্রিজুচুর অধীনে দশহাজার এবং তঙ্গুর শাসনকর্ত্তা রেমাচুর সঙ্গে দশহাজার সৈন্য দিয়া মংক্রুমের পথে, জান্দোয়াজার শাসনকর্ত্তা ছাদোয়ংএর তত্ত্বাবধানে দশহাজার দিয়া ছাব্রংকামার পথে, দালাকের শাসনকর্ত্তা কচুঙের সহিত দশহাজার সৈন্য দিয়া দালার পথে, রুজাঙুরং নামক শাসনকর্ত্তাকে দশহাজার সৈন্য দিয়া বচ্চারুইর পথে, মাইয়ং শাসনকর্ত্তা খেচুকে দশ হাজার এবং চিথোংজার শাসনকর্ত্তা লাচুইর অধীনে দশ হাজার সৈন্য দিয়া ছালোক্যোর জলপথে প্রেরণ করেন। মন্ত্রী নিজে বিশ হাজার রিজার্ভ সৈন্য, পঞ্চাশ হাজার অপরাপর সৈনিক এবং ত্রিশ হাজার বাঙ্গালী কুলী সমভিব্যাহারে চানীর পথে যাত্রা করিলেন। এইরূপে প্রত্যেকেই যথাস্থানে প্রস্তুত হইয়া রহিলেন।

চাকমারাজার বিরুদ্ধে অভিযান।

এতদ্ভিন্ন বলিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তংথংজার শাসনকর্ত্তার নিকটেই পেগো (বর্ত্তমান পেগু) রাজ্য থাকিবে। পেগুরাজ বাধা দিতে চাহিলে তোমরা বলিবে "আমরা যুদ্ধ করিতে আসি নাই; মগরাজ মিত্রতাস্থাপনের নিমিত্ত এক পরমা সুন্দরী রমণী উপহার লইয়া আমাদিকে পাঠাইয়াছেন।" পরে তোমরা স্ত্রীলোকটীকে সুসজ্জিত করাইয়া দেখাইও। দালার পথযাত্রী ক্যচুংকেও এইরূপে শ্যামরাজাকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত উপদেশ দেওয়া হইল। বলা বাহুল্য তাঁহাদের সঙ্গে এক একটী সুন্দরী রমণীও দিয়াছিলেন। অনন্তর মন্ত্রীপ্রবর ইহাও জানাইয়া দিলেন যে, তিনি স্বয়ং চাক্‌মারাজার রাজধানী (উচ্চব্রহ্মের) মইচাগিরি আক্রমণ

পাশবিক কৌশল।

করিবেন, সুতরাং উচ্চ ও নিম্ন ব্রহ্মের সকলে সাবধান থাকিবে। যখন যাহা ঘটে, যেন অবিলম্বে তাঁহার কাছে সংবাদ প্রেরিত হয়।

মন্ত্রী ছাংগ্রাই তংদাম্রু নগরে উপনীত হইয়া চান্দাই নামা জনৈক শাসনকর্ত্তাকে একখানি পত্রসহ চাক্‌মা-রাজ-দরবারে দূতরূপে পাঠাইলেন। পত্রে উল্লিখিত হইল, মগরাজা এক পরমা রূপবতী যুবতীর সহিত তাঁহাকে প্রেরণ করিয়াছেন। চান্দাই নিজমুখেও এতাদৃশ বিবরণী বেশ সাজাইয়া-গুছাইয়া বলিলেন। চাক্‌মারাজা ইহাতে বিশেষ পরিতুষ্ট হইয়া ছান্দাইকে যথোচিত পুরস্কৃত করিলেন। এবং প্রধানমন্ত্রীর নিমিত্ত একটী হস্তী, একখানি স্বর্ণ-হার, একখানি সুবর্ণ সাঁতি, দুইটি ঘোড়া, সুবর্ণ-মণ্ডিত রেকাব ও জিন, এবং একটি সোণার "থোক্‌-দান" (১) পারিতোষিক লইয়া স্বীয় মন্ত্রী ব্রাচ্‌মীকে পাঠাইলেন।

চাক্‌মা-রাজার পুরস্কার।

ব্রাচ্‌মী আসিতেছেন শুনিয়া ছাংগ্রাই সৈন্যবাহিনী পোকন্দার পাহাড়ে লুকাইয়া রাখিলেন, নিজে মাত্র কয়েকজন লোক লইয়া রহিলেন। ব্রাচ্‌মী আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহাকে এক সুন্দরী রমণী দেখান হইল। অনন্তর এই যুবতীকে লইয়া যাইতে লোকজন পাঠাইবার নিমিত্ত পত্র দিয়া ব্রাচ্‌মীকে বিদায় করিলেন। ব্রাচ্‌মী প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাজার কাছে সুন্দরীর অলৌকিক রূপলাবণ্য বর্ণনা এবং ছাংগ্রাইএর কূটনীতিপ্রসূত পরিচয়ানুসারে এই যুবতী যে মগরাজ মেঙ্গদির সহোদরা তাহাও জ্ঞাপন করিলেন। পরিচয় শুনিয়া চাক্‌মারাজা আরও অহ্লাদিত হন, এবং বিশেষ আড়ম্বরের সহিত রাজসহোদরাকে আনয়নের জন্য অনেক লোকজন পাঠাইলেন। মন্ত্রী ছাংগ্রাই এই রমণীর সহিত একশত হস্তীও চাক্‌মারাজাকে উপহার প্রেরণ করিতে ঢাকার শাসনকর্ত্তা রেয়ংকে দশহাজার সৈন্য লইয়া প্রেরণ করেন।

(১) থোক্‌দান—"থু থু" ফেলিবার পাত্রবিশেষ।

রেয়ংকে গোপনে বলিয়া দিলেন, চাক্‌মারাজা নৃত্যগীতাদি অতিশয় ভালবাসেন, মাদকসেবীর ন্যায় অন্যদিকে দৃষ্টি থাকে না। সুতরাং সুযোগ পাইলেই আপন সুবিধা করিয়া লইবে। পরে "কাঁইচার" (১) শাসনকর্ত্তা ও ওয়াণ্ট্‌বোর সঙ্গেও দশসহস্র সৈন্য দিয়া পশ্চাদ্দিগ্‌ হইতে আক্রমণের নিমিত্ত পাঠাইলেন।

এদিকে রজনীসমাগমে চাক্‌মারাজ ইয়াংজ অনললুব্ধ পতঙ্গপ্রায় প্রমোদনিকেতনে নৃত্যগীতাদিতে প্রমত্ত আছেন, এমন সময়ে, রেয়ং যুবতীকে আনিয়া তদীয় করে অর্পণ করিলেন। রাজা অতিশয়

মোহজাল।

আনন্দের সহিত যুবতীকে পার্শ্ববর্ত্তী আসনে উপবেশন করাইয়া পুনরায় আমোদ-প্রমোদে মগ্ন হইলেন। রাত্রি প্রায় বারটার সময় রেয়ং চতুর্দিকে আক্রমণ করেন, ওয়াণ্ট্‌বুও পশ্চাৎভাগের জঙ্গলপথে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পরন্তু তাঁহাদিগকে কোন যুদ্ধক্লেশ পাইতে হয় নাই। অতি সহজেই সেখানে চাক্‌মারাজ ইয়াংজ এবং মধ্যমপুত্র চক্রু ও কনিষ্ঠপুত্র চতুকে বদ্ধ করিয়া মইছাগীরির পর্ব্বতাকীর্ণনগরমধ্যবর্ত্তী রাজপ্রাসাদ অবরোধ করেন। সেখানেও বিনাক্লেশে যুবরাজ চজুং, রাণীতিনজন, দুই রাজকন্যা এবং

ফাঁদে বন্দী।

দাসদাসীগণকে বন্দী করিলেন। অতঃপর মন্ত্রিপ্রবর ছাংগ্রাই ৬৯৫ মগাব্দের (বাঙ্গালা ৭৪০ সাল) ২রা মাঘ চাক্‌মারাজা এবং তদীয় তিনরাণী, তিনপুত্র, দুইকন্যা ও দাসদাসী-দিগের সহিত রেয়াংকে মগরাজ মেঙ্গাদিসমীপে পাঠাইয়া দেন। এইরূপে চাক্‌মারাজ্য অতি সহজেই মগরাজার করতলগত হইল। অবশেষে ১০ই মাঘ বিজিত রাজ্য হইতে পঞ্চাশটি হস্তী, কুড়িটি গয়াল,

---

(১) চট্টগ্রামের কর্ণফুলী নদীর কিয়দংশ কাঁইচা বা কাঞ্চীনামে কথিত। সম্ভবতঃ এস্থলে চট্টগ্রামের শাসনকর্ত্তাকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অপরিমিত স্বর্ণ-রৌপ্য এবং দশসহস্র চাক্‌মা প্রজা লইয়া প্রধানমন্ত্রী নিজেও স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

মন্ত্রীবর রাজাজ্ঞা ছাং‌গ্রাইর কর্ম্মদক্ষতায় অতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া আরাকানাধিপতি মেঙ্গাদি তাঁহাকে "মাহা-উছা-ওয়ারা" অর্থাৎ মহা-প্রাজ্ঞ খেতাব ও একখান স্বর্ণমণ্ডিত পাল্কী পুরস্কার প্রদান করেন; এবং হস্তীর উপর চড়িয়া যাতায়াতের অনুমোদন করিলেন। ইহা ছাড়া তাঁহার পুত্র অংজাউর সঙ্গে চাক্‌মারাজার কনিষ্ঠাকন্যার বিবাহ দিলেন। জ্যেষ্ঠাকন্যা চমিখাঁইকে মেঙ্গাদি নিজেই রাখিয়া দেন। অনন্তর চাক্‌মারাজ ইয়াচ্‌কে আরা-কানের অন্তঃপাতী ক্যমুছা নামক স্থানের ক্যকাজাতির আধিপত্য অর্পণ করেন। তাঁহার জ্যেষ্টপুত্র চজুং ও কনিষ্ঠপুত্র চোফ্রুর হস্তে যথাক্রমে কিঠজেদা ও মিঞ্চা দেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব দেওয়া হয়। এবং কনিষ্ঠপুত্র চতুকে কাচ্‌জা নামক স্থানের জলকরতহসীলভার দিয়া নিকটে রাখিলেন। পরন্তু চাক্‌মা-রাজপুত্র তিনজনেই মগরাজার বিশেষ তত্ত্বাবধানে রহিলেন। অপর দশ সহস্র চাক্‌মা প্রজাকে আরাকানের অন্তঃর্গত এংখ্যাং এবং 'ইঙ্গংখ্যাং' নামক স্থানে বাস করিবার অনুমতি দেওয়া হইল, সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের পূর্ব্বতন উপাধি পরিবর্ত্তিত করিয়া "দেংনাক" আখ্যা প্রদান করিলেন।

মগরাজার অনুগ্রহ।

দেংনাক জাতির সৃষ্টি।

এতাদৃশ অধীনতায় জীবনযাপন রাজপুত্রত্রয়ের অসহনীয় বোধ হইতে লাগিল। ৭০৫ মগাব্দে (১৩৪৩-৪৪ খৃঃ অঃ) মেঙ্গদি লিম্‌ব্রু যাত্রা করিলে, তাঁহারা তিনভ্রাতাই একত্রযোগে পোকন্দাও পার হইয়া উচ্চব্রহ্মে পলাইয়া গেলেন। মগরাজা ইহা শুনিয়াও কোন উচ্চবাচ্য করিলেন না। অনন্তর জ্যেষ্ঠভ্রাতা চজুং ভূতপূর্ব্ব বিশিষ্ট প্রজাগণকে লইয়া মংজাত্র

চাক্‌মা-রাজপুত্রের পলায়ন।

নামক স্থানে রাজত্ব আরম্ভ করেন। মধ্যম ভ্রাতা চোফ্রু, ক্যজম রাজার নিকট হইতে "মংরেণো" খেতাপ এবং প্রুমরাজ্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন। কনিষ্ঠ চতু, চাথ্যং নামক রাজার অধীনে থাকিয়া ক্রমে ৭২৪ মঘিতে (১৩৬২-৬৩ খৃঃ) "তারাঙ্গা" উপাধি ও আমাম্রু দেশের শাসনভার লাভ করেন"।

ইতিহাসই যদি প্রকৃষ্ট প্রমাণ হয়, তাহা হইলে স্পষ্টতঃ পরিলক্ষিত হইতেছে, উচ্চব্রহ্মের মইচাগিরিতে চাক্‌মারাজার প্রাচীন রাজধানী ছিল। তথায় তাঁহার প্রাধান্যেরও বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। নতুবা তাঁহাকে দমনের নিমিত্ত আরাকানাধিপতির সুচতুর মন্ত্রী রাজাঙ্গ্যা ছাংগ্রাই প্রায় দুইলক্ষ সৈন্য লইয়া ও তাদৃশ কুরুচিপূর্ণ প্রতারণা খেলিতে গেলেন কেন? ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়াছি কতকগুলি চাক্‌মা বাঙ্গালীদিগের সহিত মিলিত হইয়া মগরাজার বিরুদ্ধে বারম্বার উপদ্রব করিয়াছে। ইহাদিগের সহিত শেষোক্ত চাক্‌মারাজার সম্বন্ধ কতদূর ছিল, তাহার উল্লেখ নাই। তবে অরাকানের সীমান্তপ্রদেশে বাঙ্গালীর মতির সন্নিধানেই যে কতিপয় চাক্‌মার বাস ছিল—তাহা নিশ্চিত। আর ইহারাই মগরাজাকর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ প্রপীড়িত হইয়া মাইচাগিরির অভ্যুদিত বল পরিপুষ্ট করিয়াছে, তাহাও অসম্ভব নহে। "চঁইজুং-ক্য-থাং"এ ব্রহ্মদেশে চাক্‌মারাজ্যখণ্ডের উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাহার কোন সীমানির্দ্দেশ নাই। মাইচাগিরিই বোধ হয় সেই রাজ্যের রাজধানী ছিল। অনুমান, অনেক স্থলে সত্যের আবিষ্কার করিয়া থাকে, "পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ" চিরপ্রচলিত নীতি।

শ্রীসতীশ চন্দ্র ঘোষ।

মহীশূর-ভ্রমণ।

(২)

আহারের পর ঘণ্টাদুয়েক বিশ্রাম করে একখানা ক্রহাম ঠিকা-গাড়ী করে বন্ধুর সহিত একটু বেড়াতে বের হয়ে পড়াগেল। এখানে কলিকাতার মত পাল্কিগাড়ী একেবারেই নেই। ভাড়াগাড়ী এখানে ক্রহাম, ভিক্টোরিয়া ও ঝিট্কা। ঝিট্কাজিনিষটা যে কি, তা যাঁরা দক্ষিণভারতে না গেছেন, তাঁদের বোঝান একটু শক্ত। আমাদের দেশের পল্লীগ্রামের ছঁইওয়ালা গরুর গাড়ী যদি অপেক্ষাকৃত অনেকটা ছোট হত, ও তাতে একযোড়া অতি নিকৃষ্টরকমের স্প্রীং থাকত, আর সেটাকে একটা ছোট অথচ ক্ষিপ্রগামী ঘোড়ায় টানত, তাহলেই সেটা অনেকটা মহাশূরীঝিটকার মত দেখতে হত। কথাটা যে খুব পরিষ্কার বোঝান গেল, তা আমি মনে করি না। বঙ্গদেশীয় আমার একটি রহস্যপ্রিয় বন্ধু আমাদের দেশের গরুর গাড়ীর সহিত মহীশূরাঝিটকার এই জটিল উপমাটি শুনে একটি বেশ মজার গল্প বলেন। কোন এক অনিশ্চত রাজ্যে হবুচন্দ্র নামে এক বিখ্যাত রাজা ছিলেন তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী গবুচন্দ্র তাঁর মন্ত্রী ছিলেন। উক্ত রাজ্যে একদা একটি শূকর দৃষ্ট হওয়ায়, উক্ত জীবটি কি, এই গুরুতর সমস্যা-মীমাংসার ভার মন্ত্রিবরের উপর ন্যস্ত হয়। অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার দ্বারায় মন্ত্রিবর নির্দ্ধারণ করেন যে, উহা নিশ্চয়ই কোন মূষিক অতিভোজনে পুষ্ট হয়েছে, অথবা কোন হস্তী নিরাহারে কৃশ হয়েছে। বন্ধুর গল্পটি আমার পক্ষে নিতান্ত কষ্টদায়ক ও নিষ্ঠুর হলেও উপস্থিত ক্ষেত্রে কিন্তু উহার এ প্রযোজ্যতার বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য কিছুই নেই। তবে কথা এই যে, মহাশূরী ঝিট্কাবস্তুটা যে কি, তা আর-কোনওপ্রকারে বোঝান আমার দ্বারা একেবারে অসম্ভব।

আমরা ঘণ্টাদেড়েকের মধ্যে বেড়ায়ে বাড়ী ফিরলাম। তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়েছে। কয়েক বৎসর হইল ব্যাঙ্গালোরের রাস্তায় রাত্রে বৈদ্যুতিক আলোকের ব্যবস্থা হয়েছে। ব্যাঙ্গালোর হতে প্রায় ৬৬ মাইল দক্ষিণে শিবসমুদ্রনামক স্থানে কাবেরী নদীর বিখ্যাত জল-প্রপাত। এই প্রপাতের জল-শক্তির দ্বারা সেখানে তড়িৎপ্রস্তুতকারক একটি ডাইনামো চালিত হয়। একপয়সা কয়লার খরচ নেই; কাবেরীর জল বিনা বাক্যব্যয়ে দিবারাত্রি অবিশ্রান্ত ব্যাগার খেটে দিচ্ছে। ব্যাঙ্গালোরে রাস্তায় আলো দিবার জন্য, আর কোলারে সোণার খনিতে কুলীর কাজ করিবার জন্য, এই স্থান হতে তড়িৎ প্রস্তুত করে বরাবর ব্যাঙ্গালোরে ও কোলারে পাঠান হয়। ব্যাঙ্গালোরের রাস্তার বৈদ্যুতিক আলো, কলিকাতার হাবড়াপুলের বা হ্যারিসন-রোডে পূর্ব্বে যে আলো ছিল, তার তুলনায় অত্যন্ত হীন। ব্যাঙ্গালোরের রাস্তার সেগুলো আর্ক লাইট নয়, সমস্তই ইন্‌কেনডিসেণ্ট বাল্‌ব। সেগুলো আর্ক লাইট হতে অপেক্ষাকৃত কিছু হীনপ্রভ হলেও তাদের ন্যায় উচ্ছৃঙ্খল ও কৌতুকপ্রিয় নহে—থেকে থেকে নৃত্য করা বা নিবে যাওয়ার গোলমালটা একেবারেই নেই।

বাড়ী ফিরে গরম জলে ও সাবানে মুখ-হাত ধুয়ে বেশ স্নিগ্ধ হওয়া গেল। এঁরা যেরকম হিন্দু, তাতে সাবান ব্যবহার করতে আমার প্রথমে একটু "কিন্তু" বোধ হয়েছিল; যাহোক পরে টের পেলুম যে, সাবানটা এঁদের মধ্যে অনেকটা চলিত হয়ে এসেছে। সাবানটা চলিত হলেও কিন্তু অধঃপতিত বঙ্গবাসীদের মত তাঁদের মধ্যে এই বিজাতীয় দ্রব্যটা জীবনধারণের জন্য একটি অত্যাবশ্যক বস্তু বলে এখনও গণ্য হয় না। স্ত্রীলোকেরা সাবান মোটেই ব্যবহার করেন না—উচ্চশ্রেণীর স্ত্রীলোকেরাও নয়। পুরুষদের ভিতরেও খুব কম ব্যবহার। যেরকম গরমজলের ব্যবস্থা, তাতে আমার মনে হয় যে,

এঁদের গায়ের ময়লা তাড়াবার জন্ত সাবানের দরকারই হয় না। হাত-মুখ ধুয়ে একগ্লাশ কফি খেয়ে অলসভাবে ইজিচেয়ারে শুয়ে বন্ধুবরের সহিত মহীশূরীয় আচারসম্বন্ধে অত্যন্ত পিটতাফরানভাবে গবেষণাপূর্ণ একটি ঔপমিক মন্তব্যপ্রকাশের অবতারণা করছি, এমন সময়ে, দুইতিনটি মহীশূরী ভদ্রলোক এসে মাতৃভাষায় বন্ধুবরের সহিত কলবর আরম্ভ করে দিলেন। পরে শুনলুম তাঁরা আমার সঙ্গেই আলাপ কর্ত্তে এসেছেন। আমার সহিত বন্ধু-কর্ত্তৃক বিলাতী ধরণে যথাবিহিত পরিচিত হয়ে, ভদ্রলোকগুলি বাঙ্গলাদেশসম্বন্ধে নানাপ্রকার প্রশ্ন করে আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুল্লেন। বাঙ্গলাটা নিজের দেশ হলেও বাঙ্গলাসম্বন্ধে অনেক খবর যে আমার জানা নাই, এই সংবাদটা সেই অনুসন্ধিৎসু মহীশূরবাসীদের প্রশ্নগুলি রূঢ়ভাবে এই প্রথম জানায়ে দিল। যথাসাধ্য প্রশ্নগুলির উত্তর দিলুম ও বাকি প্রশ্নের মীমাংসার জন্ত হণ্টারসাহেব-প্রণীত বহু 'ভলুম'-বিশিষ্ট Statistical Account of Bengal নামধেয় গ্রন্থগুলি অনুসন্ধান করতে পরামর্শ দিলুম গোলমাল দেখে তাঁরা বাঙ্গলাদেশ ছেড়ে দিয়ে বাঙ্গলার স্বদেশী আন্দোলন ও 'বন্দে মাতরম্'কে ধরলেন। দেখলুম স্বদেশী আন্দোলনের জন্ত বাঙ্গালীর উপরে এঁদের সত্যসত্যই যেন একটা ভক্তির উদয় হয়েছে—যেন এই দিনকতকের মধ্যে বাঙ্গলী একটা Nation হয়ে পড়েছে। ভদ্রলোকগণের মধ্যে একজন মার্কিণ-ফেরতা মহীশূরী ছিলেন। লোকটি আমার বন্ধুর সহপাঠী বন্ধু। ৫ বৎসর কি ৬ বৎসর পূর্ব্বে মহীশূর-গভরমেণ্টের খরচায় মার্কিণে বিদ্যুতের কাজ শিখতে যান। সেখান থেকে ইলেক্ট্রিক ইঞ্জিনিয়ার হয়ে এসে উপস্থিত মহীশূর-গভরমেণ্টের অধীনে ব্যাঙ্গালোরের ট্রেন্সফরমার হাউসে অধ্যক্ষতা করছেন। বাঙ্গালীর জাতীয়তা সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস, তাঁহার স্বদেশীয়দের বিশ্বাস হইতে কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন। ইনি মার্কিণ

হতে যে শুধু বিদ্যুতের কাজ শিখে এসেছেন তা নয়, জোনাথন-খুড়ার সন্দেহবাদটাও অভ্যাস করে এসেছেন। এঁর কুটপ্রশ্নগুলির উত্তর দিতে আমার প্রাণটা ওষ্ঠাগত হয়েছিল। "বাঙ্গলা বিভাগ হয়ে কি ক্ষতি হয়েছে, এখন বাঙ্গলার নেতা কারা, তাঁদের ঠিক নেতা বলা যায় কি না, প্রত্যেক নেতার দায়িত্বজ্ঞানের পরিমাণটা বেশ মানানসই কি না, স্বদেশী আন্দোলনের ভিত্তিটা অর্থবিজ্ঞানশাস্ত্রের বিধিব্যবস্থার উপর স্থাপিত কি না, ঐ আন্দোলনের সার্থকতা-সম্পাদনের জন্য কি কি উপায় অবলম্বন করা হয়েছে, মুসলমান-সম্প্রদায়ের সহানুভূতিটা কেনই বা পূর্ণমাত্রায় পাওয়া যাচ্ছে না, এই জাতীয় আন্দোলনে স্কুলকলেজের ছাত্রেরা ঠিক কোন্ স্থানটা অধিকার করেছে এবং ঠিক সেই স্থানটা উপস্থিত ক্ষেত্রে তাদের অধিকার করা উচিত কি না?" ইত্যাদি নানারকমের হাড়-জ্বালানে প্রশ্নের দ্বারা এই জাতীয়গৌরবটার উপর একটা রীতিমত আক্রমণ আরম্ভ করে দিলেন। সব প্রশ্নের উত্তর কারণবিশেষে একটু লজ্জাকর বলে জাতীয়গৌরব-রক্ষার্থে সে দিকে না গিয়ে আমি আন্দোলনসম্বন্ধে ইউরোপীয় ও মার্কিণদেশীয় নজীররূপী ব্রহ্মাস্ত্রসকল নিক্ষেপ করতে লাগলুম। ভদ্রলোকটি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র না হলেও যেন একটু ধাঁধাঁ খেয়ে ক্ষণকালের জন্য একেবারে নির্ব্বাক হয়ে রইলেন। আমিও সেই অবকাশে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলুম। ক্রমে নানা প্রসঙ্গের আলোচনায় রাত্রি অধিক হওয়ায় ভদ্রলোকগুলি আমাকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে ও সন্ধ্যাটা যে বেশ সদ্ব্যয় হয়েছে তাহা প্রকাশ করে বিদায় হলেন—আমিও বাঁচলুম। শীঘ্রই আহার প্রস্তুত হল। অপর্য্যাপ্তপরিমাণে ঘি রাত্রিতেও এদের ভাতের পাতে না হলে চলে না। তাছাড়া দেখলুম খিচুড়ি, একরকম পোলাওজাতীয় জিনিষ ও রকমারি হিন্দুস্থানী পুরীর মত কি সব প্রস্তুত হয়েছে। পরে জানলুম যে, এঁরা সাধারণতঃ প্রত্যহ

এসব ব্যবহার করেন না ; এ সব বাহুল্য শুধু আমার জন্যই করা হয়েছে। আমাদের ভাতের পাতে যেমন পলায় করে ঘি পরিবেশন করিবার রীতি আছে, এখানেও সেইরূপ ; তবে অধিকন্তু রুটীর পাতেও ঘি-পরিবেশন প্রচলিত। পুরীগুলি পাতে দিবার পরই প্রত্যেক পুরীর উপর ২।৩ চামচে ঘি ঢেলে দেওয়া হইল। আহার শেষ হবার সময় সেই অনিবার্য্য 'রসম্' ও দই এসে উপস্থিত হল। পোলাওই খাও আর পুরীই খাও, শেষে রসম্ দিয়ে ও পরে দই দিয়ে মেখে সপ্ সপ্ শব্দ করে চারটি ভাত না খেলে এঁদের কিছুতেই তৃপ্তি হয় না।

খাওয়া শেষ করে বসবার ঘরে ফিরেই দেখি, একটি ছোট খাটের ওপর আমার বিছানা তৈরী রয়েছে। পাশবালিশ নেই দেখে আমারা কিছু আতঙ্ক উপস্থিত হল। এরা কি পাশবালিশও ব্যবহার করে না না কি ? তাহলেই ত গেছি। আমার বিশ্বাস ছিল যে, আর্য্যজাতির ভিতর ঐ গোমাংসভোজী পেণ্টালুন-পরা ইউরোপীয়গুলো ছাড়া সকলেই পাশবালিশের মহিমা বোঝেন। যাহোক, পাশবালিশ না পেলে নিদ্রাবিহীন হয়ে রাত্রিটি যে যাপন করতে হবে, তা বেশ বুঝতে পারলুম। কারণ জন্মাবধি যে জিনিষটাতে অভ্যস্ত হয়ে এসেছি সেটার অভাবে যে বিশেষ একটু গোলযোগ ঠেকিবে এটা বোঝা এমন কিছু শক্ত কাজ নয়। সুতরাং পাশবালিশের কথাটা বন্ধুবরকে জিজ্ঞেস করতে বাধ্য হলুম। পাশবালিশের তেমন সুবিধাজনক ইংরাজী জানা নেই, কাজেই side pellow বলে তরজমা করে ফেলা গেল। যা মনে করেছি তাই। side pellow শুনেই বন্ধুবরের চক্ষু একেবারে ছানাবড়ার আকার ধারণ করল। তাঁর উর্দ্ধতন চতুর্দ্দশপুরুষের মধ্যে কেহই নাকি side pellowর নামও শোনেন নাই। তাঁর পূর্ব্বপুরুষেরা side pellowর নাম না শুনলেও আমার বড়-একটা ক্ষতি ছিল না। কিন্তু বন্ধুবর যে ঐ জাতীয় বালিশের কোন খবর রাখেন না, এই

ঘটনাটা তাঁর অতিথি হওয়াতে উপস্থিত ক্ষেত্রে আমার পক্ষে বড়ই মারাত্মক হয়ে উঠল। খয়েরশূন্য পান বরং বরদাস্ত হয়, সন্দেশ-রসগোল্লার ও মাছ-মাংসের বিরহটাও না হয় দিন কতক সহ্য যায়, কিন্তু তা বলে এই তিনদিন অবিশ্রান্ত ট্রেনে আসার পর পাশবালিশ অভাবে ডাহা রাত্রিজাগরণটা একেবারেই অসহনীয়। শেষে অনেক বাকবিতণ্ডা ও হাস্যপরিহাসের পর অনন্যোপায় হয়ে ২।৩ টি মাথার বালিশ লম্বালম্বি রেখে তাতে আমার সঙ্গের কম্বলটা জড়ায়ে দ্বিতীয় বিশ্বকর্ম্মার ন্যায় এক অভিনব পাশবালিশ সৃষ্টি করে ফেলা গেল। পাশবালিশ দেখে ও কিরূপে সেটা ব্যবহার করতে হয় শুনে, বন্ধুবরের হাস্যের স্রোত অসংযত হয়ে একেবারে দিগন্তপ্লাবনে উদ্যত হল—একেবারে অপ্রতিহত প্রবাহ। আমার মনে হল, সে হাসি বুঝি আর কখনও থামিবে না। কোনও প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষকে এরূপ আন্তরিক হাসি হাসিতে আমি ইতপূর্ব্বে আর কখনও দেখি নাই। বিধাতার কি আশ্চর্য্য সৃষ্টিকৌশল! সামান্য পাশবালিশের মধ্যে যে এতটা হাসির জিনিষ গুপ্তভাবে অবস্থান করছে, এই আটকোটি বঙ্গসন্তান এখন তার কোন খোঁজই পায় নাই। হাসি কতকটা সংযত হলে বন্ধুবর "শুভ রজনী ইচ্ছা" করে শুতে গেলেন।

পরদিন ভোর ৫টার সময়েই বন্ধুবরের উৎপাতে শয্যাত্যাগ করতে হল। মুখ ধুইবার জন্য একটি ছোট রূপার ঘড়ার মত এক পাত্রে গরম জল এসে উপস্থিত হল। গরম জলটা এখানে দিবারাত্রিই প্রস্তুত থাকে। শুনলুম মহীশূরে সামান্য গৃহস্থের বাড়ীতেও স্নানের ঘরে একটি করে প্রকাণ্ড হাঁড়া স্থাপিত থাকে ও প্রায় সমস্ত দিনই রাবণের চুলির মত সেটার নিচে আগুন জ্বলে। বনজঙ্গলেরও অভাব নেই। স্নান থেকে আরম্ভ করে কাপড়-কাচা বাসন-মাজা পর্য্যন্ত ঐ গরম জলে সম্পন্ন হয়। বাঙ্গলায় গৃহস্থের বাড়ীতে ভোরে উঠেই যেমন উনান-ধরান

হয়, এখানে মেয়েরা প্রাতে উঠেই স্নানের ঘরে ঐ হাঁড়ার নিচে সর্ব্বপ্রথম অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করেন। বন্ধুবর বলেন যে, মহীশূরপ্রদেশের জলবায়ুর জন্যই নাকি সর্ব্বদাই ঐ রকম গরম জল ব্যবহার করতে হয়। আমি কিন্তু সে যুক্তিটার অর্থ বুঝতে পারি নাই, কারণ অক্টোবর ও নবেম্বর মাসে যা দেখেছি তাতে আমার বোধ হয়, মহীশূরে এমন কিছুই শীত হয় না, যার জন্য ঐ রকম বিদ্‌ঘুটে গরম জল ব্যবহারের আবশ্যকতা হতে পারে। আমার মুখধোয়া শেষ হলে একটি ভৃত্য একখানি রূপার থালা করে নানাবিধ ফল ও দুই গেলাশ কফি এনে হাজির করল। বঙ্গদেশ অপেক্ষা এখানে সচরাচর রূপার বাসন অনেক অধিক প্রচলিত। বাঙ্গলায় রূপার বাসনটা যেমন অনেকটা কেবল 'বড়মানষি' দেখাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, এখানে কিন্তু ঠিক সে রকম নয়। শুনলুম যে এখানে পিতলকাঁসার গেলাশ ও বাটী মুখে ঠেকলেই উচ্ছিষ্ট হয়, এবং এখানকার প্রচলিত আচার-অনুসারে তাকে শোধন করবার জন্য তেঁতুল, বালি ও গরম জল দিয়ে মাজতে হয়। রূপাটা কিন্তু ভারতবর্ষের শ্বেতবর্ণ ইংরাজদের মত এই কঠিন আইন হতে একেবারেই বিমুক্ত। রূপার গেলাশ-বাটির আইন স্বতন্ত্র। উচ্ছিষ্ট হলে মাজতে হয় না, একটু ধুয়ে নিলেই চলে। এই জন্য 'বড়মানষি' দেখান ছাড়া অনেকটা সুবিধা বলেও রূপার বাসনটা এখানে সচরাচর অল্পবিস্তর ব্যবহার হয়।

এখানে আপেল ও অনেকরকম বিলাতী ফল যেরূপ সুন্দর উৎপন্ন হয়, সমগ্র ভারতবর্ষে আর কোথাও সেরূপ হয় কি না সন্দেহ। এখানকার আমও শুনলুম খুব উৎকৃষ্ট। 'বাদাম' নামে একরকম আম এখানে আছে, বন্ধুবরের মুখে তার সুখ্যাতি ধরে না। দুঃখের বিষয় অসময় বলে নিজে সেটা চেখে আসতে পারলুম না। শোনা যায় যে, এই মহীশূরপ্রদেশটাই যে পুরাকালে রামায়ণ-উল্লিখিত কিষ্কিন্ধ্যারাজ্য ছিল, সে সম্বন্ধে নাকি অনেক প্রমাণ আছে। অন্য কি প্রমাণ আছে জানি না, তবে যে এত দেশ থাকতে মহীশূরেই ভাল আমের এত

প্রাদুর্ভাব, আমার মতে ইহা একটা গুরুতর প্রমাণ বলে গণ্য হওয়া উচিত। মহাত্মা পবননন্দন রাবণের মধুবন লুট করে অমৃতফলগুলি উদরসাৎ করবার সময় যখন সাগরপারে আঁটি ছড়াতে আরম্ভ করেন, তখন ভাল ভাল আমের আঁটিগুলি যে স্বদেশের দিকেই ছুঁড়েছিলেন তার আর সন্দেহ কি ?

একগেলাশ কফি ও কিছু ফল উদরস্থ করে সহর দেখতে বের হওয়া গেল। ব্যাঙ্গালোরসহরটা মোটামুটি দেখে খুবই সুখী হলুম। সমস্ত মহীশূরপ্রদেশটাই প্রায় ৩০০০ ফুট উচ্চ একটা প্রকাণ্ড অধিত্যকা —সুন্দর সুন্দর স্বাভাবিক দৃশ্যাবলীরও অভাব নেই। ব্যাঙ্গালোর সহরের অবস্থানটাও খুব সুন্দর বলে সহরটি বড়ই সুশ্রী দেখতে। যাকে আমরা জমকাল সহর বলি, এ তা নয়। কাছাকাছি ঘেঁসাঘেঁসি বাড়ীর ভীড় বা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী এখানে একেবারে নেই বল্লেও হয়। ছোট ছোট বাড়ীও সমস্তই কলকাতার বারণ কোম্পানীর টালির মত লাল ম্যাঙ্গালোর টাইল দিয়ে ছাওয়া। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ড, সমস্ত রাস্তাই একটু-আধটু ঢেউখেলানে ও চারিদিকে অধিত্যকার দৃশ্যাবলী। এই সমস্ত মিলে সহরটাকে বড়ই সুন্দর করেছে। সহরটা প্রকাণ্ড ও জমকাল নয় বটে, কিন্তু এর বেশ একটি আর্টিষ্টিক সৌন্দর্য্য আছে। শুনলুম সহরটা পূর্ব্বে এত ভাল ছিল না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এখানে প্লেগের প্রকোপ হওয়াতেই মহীশূরগবর্ণমেণ্ট হতে সহরটার অনেক উন্নতি করা হয়েছে। সেই সময় ব্যাঙ্গালোরের আয়তনও চারিদিকে অনেক বৃদ্ধি করা হয় এবং এর স্বাস্থ্যের ও সৌন্দর্য্যের তদবধি অনেক উন্নতি হয়েছে। ব্যাঙ্গালোরের "লালবাগ"-নামক বটানিকেল গার্ডেনটী একটি দেখবার জিনিষ। শোনা যায়, দুর্দ্ধর্ষ হায়দার আলিই নাকি প্রথমে এই বাগানটি করেছিলেন ; এখন কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ বিলাতী ধরণে পরিবর্ত্তিত হয়েছে। কলকাতার বটানিকেল গার্ডেনের মত

ল্যাণ্ডস্কেপ গার্ডেনিং সেখানে না থাকলেও 'লালবাগের' একটা বিশেষ স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য আছে, যা কলকাতার শিবপুরের বাগানে একেবারেই নেই। ফিরাস অর্কেডস লাইকোপোডিয়ামস যা কলকাতার অঞ্চলে কাচের ঘরের ভিতর ছাড়া কিছুতেই ভাল তৈরী হয় না, ব্যাঙ্গালোরে সেগুলো সামান্য যত্নে গাছঘরের বাইরেও মোটামুটি বেশ উৎপন্ন হয়। ক্রোটাস্ ও পাম জাতীয় গাছের যেরকম রং দেখলুম আমার মনে হয় কলকাতা অঞ্চলে কাচের ঘরের ভিতর রাখলেও তাদের ওরকম সুন্দর রং হয় কি না সন্দেহ। তা ছাড়া বাগানটি বড়ই সুন্দররূপে রক্ষিত; শুনলুম উহা একজন উপযুক্ত ইংরাজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তত্ত্বাবধারণে আছে।

বটানিকেল গার্ডেন দেখে আমরা মহারাজের ব্যাঙ্গালোরের নূতন প্রাসাদ দেখতে গেলাম। মহারাজা এখন মহীশূরসহরে আছেন বলে ব্যাঙ্গালোর-প্রাসাদ দেখবার অনুমতি পেতে কোন কষ্ট হল না। মহারাজের এখানকার প্রাসাদও 'লালবাগের' ঐ ইংরাজ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের তত্ত্বাবধারণে রক্ষিত। লোকটি খুবই ভদ্রতা প্রকাশ করে এককথায় সমস্ত প্রাসাদ দেখবার অনুমতিপত্র লিখে দিল। ঠিক বলতে গেলে মহীশূররাজ্যের দুইটা রাজধানী। একটি মহীশূর, অপরটি ব্যাঙ্গালোর। মহারাজা উভয়স্থানেই বৎসরের মধ্যে কয়েক মাস করে বাস করেন। অনেক পুরাতন বলে সাধারণতঃ মহীশূরসহরটা এখনও মহীশূররাজের প্রধান রাজধানী বলে গণ্য হয়। মহীশূর-গভরমেণ্টের প্রধান প্রধান আপিস-আদালত কিন্তু প্রায় সমস্তই ব্যাঙ্গালোরে অবস্থিত। তা ছাড়া ব্যাঙ্গালোরে অনেক ইংরাজের বাস বলে মহীশূর অপেক্ষা ব্যাঙ্গালোরের প্রাধান্যটা ক্রমেই অধিক হয়ে পড়্‌তেছে। বর্ত্তমান হিন্দুরাজার পূর্ব্বপুরুষদের স্মৃতি কতকটা মহীশূরের সঙ্গে জড়িত থাকলেও অপেক্ষাকৃত আধুনিক ব্যাঙ্গালোরকেই রাজপরিবারগণ ক্রমে

রাজধানীতে বরণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ, ইংরাজের পছন্দের উপর ভারতবাসীদের মতামত চলে না, ইংরাজ ঊনবিংশশতাব্দীর পরশপাথর—যা ছোঁয় তাই সোণা হয়। যাহোক মহীশূরের মত ব্যাঙ্গালোরটি বহুপুরাতন সহর না হইলেও ইংরাজরাজ্যের সময় অনেক যুদ্ধবিগ্রহ ঘটনায় মহীশূররাজ্যের আধুনিক ইতিহাসে এর খুবই প্রসিদ্ধি। ব্যাঙ্গালোরের পুরাতন ঐতিহাসিক তত্ত্ব লয়ে এখন মাথা ঘামাইবার বিশেষ আবশ্যকতা নেই, তবে এর অপেক্ষাকৃত আধুনিক ইতিহাস-সম্বন্ধে দুএকটা কথা এখানে বল্লে কোন ক্ষতি নেই। শোনা যায় ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে মহীশূরের হিন্দুরাজা তাঁর সেনাপতি হায়দারকে দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রীয়দের বিরুদ্ধে অসাধারণ বীরত্বসহকারে যুদ্ধ করার জন্য পারিতোষিকস্বরূপ ব্যাঙ্গালোরের কেল্লা ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশটি দান করেন। কৃতজ্ঞতাপরায়ণ সেনাপতি এই দুধকলা পেয়ে পুষ্ট হল বটে, কিন্তু পোষ মানিল না। এই কেল্লাটি পাওয়ামাত্র দূরদর্শী হায়দার উহা সুন্দররূপে মেরামত করে ও উহার অন্যান্য অনেক উন্নতিসাধন করে নিজের প্রভুর উপর শীঘ্রই সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করবার উপায় করে নিল। কৌতুকপ্রিয় বিধাতার এ এক মন্দ কৌতুক নয়! প্রভুর বিপক্ষে ষড়যন্ত্রের সময় প্রভুদত্ত ব্যাঙ্গালোরের এই কেল্লাটি নিরাপদ হইবার একটি স্থান ছিল। কেল্লাটি ব্যাঙ্গালোরে এখনও বর্ত্তমান রয়েছে। কর্ম্মবীর হায়দার অতি অল্পসময়ের মধ্যেই রাজ্যে সর্ব্বেসর্ব্বা হয়ে উঠলেন। সাক্ষীগোপাল রাজা ও তাঁহার অকর্ম্মণ্য হিন্দুমন্ত্রিগণ এই হীনকুলোদ্ভব যবনসেনাপতির কর্তৃত্বে বিরক্ত হয়ে হায়দারের নিপাতসাধনের জন্য একটি ষড়যন্ত্র করেন। অমানুষিক মানসিক বল ও পুরুষকারের দ্বারা হায়দার ষড়যন্ত্রকারীদের বিধ্বস্ত করে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে রাজ্যশাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন।

হায়দার আলি অজানিত বংশোদ্ভব হলেও নিজে একটা মানুষ

ছিলেন। তাঁর খোঁচা খেয়ে বৃটিশসিংহেরও গাঁক গাঁক ডাক ছাড়তে হয়েছিল। হায়দারের বীরত্বকাহিনী সকলেরই জানা আছে, অতএব তা নিয়ে এখন আর পুঁথি বাড়াবার দরকার নেই। মহীশূররাজ্যের যা কিছু গৌরব, সবই সেই হায়দারের সৃষ্টি এবং ব্যাঙ্গালোরের এই কেল্লাটি তখন হতেই ইতিহাসের নিকট খুব পরিচিত। হায়দার ও তাঁর পুত্রের রাজ্যকালে শ্রীরঙ্গপটম্‌টা রাজধানী বলে গণ্য হলেও তাঁদের বেগমরা প্রায় সর্ব্বদাই এই ব্যাঙ্গালোরের কেল্লার মধ্যবর্ত্তী প্রাসাদে বাস করতেন। দূরদর্শী বৃদ্ধ হায়দারের মৃত্যুর পর তাঁর হিন্দু ও ইংরাজদ্বেষী বেয়াল্লিশকর্ম্মা পুত্রটি নিজে মহাবীর হলেও পিতৃকৃত এই বিশাল রাজ্যটি দূরদর্শিতার অভাবে জলাঞ্জলি দেন। ১৭৯১ সালে লর্ড কর্ণোয়ালিস ব্যাঙ্গালোরের এই কেল্লাটি টিপুর নিকট হইতে মার ধর করে কেড়ে লন। তার পর ১৭৯৯ সালে টিপুসুলতানের পতন হলে ইংরাজবাহাদুর মহীশূরের হিন্দুরাজাদের বংশধর একটি চতুঃ-বর্ষীয় বালককে সিংহাসনে বসান ও শ্রীরঙ্গপটমে একটি বৃটীশ ফৌজের আড্ডা স্থাপিত করেন। পরে শ্রীরঙ্গপটম সৈনিকদের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর বলে সাব্যস্ত হওয়ায় ১৮১১ সালে অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর ব্যাঙ্গালোরে ঐ আড্ডাটি উঠায়ে আনা হয়। ব্যাঙ্গালোরসহরটি তখন হইতে প্রাধান্যলাভ করতে আরম্ভ করে। পুরাতন হিন্দুরাজাদের বংশধর এই বালকটি মহীশূরের যে সিংহাসনকে অমিতপরাক্রম হায়দার অনুপমেয় পুরুষকার দ্বারা ভুবনবিখ্যাত করেছিলেন, তার উপর ইংরাজকর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়ে দুগ্ধ ও ঘৃতের সহায়তায় শশিকলার ন্যায় বর্দ্ধিত হতে লাগলেন ও পরে বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে স্বয়ং রাজ্যভার গ্রহণ করে অমার্জ্জনীয় বিলাসিতা ও রাজকুলের এক গালে চূণ অপর গালে মসী লেপন করতে আরম্ভ করে দিলেন। শেষে বৃটীশ গভরমেণ্ট তাঁকে সিংহসনচ্যুত না করলেও শাসনভার তাঁর নিকট হতে কেড়ে নিয়ে উহা কয়েকজন ইংরাজ

কমিশনারের উপর ন্যস্ত করতে বাধ্য হন। তদবধি ব্যাঙ্গালোরেই প্রধান প্রধান অফিস সকল প্রতিষ্ঠিত হয়ে মহীশূররাজ্যের শাসন-বিভাগের রাজধানী বলে গণ্য হয়ে আসছে।

যাহক, আমাদের গাড়ী শীঘ্রই মহারাজের প্রাসাদের সম্মুখে এসে উপস্থিত হল। রাজবাটীর একজন কর্ম্মচারী আমাদের সঙ্গে করে যথেষ্ট সৌজন্যসহকারে প্রাসাদটি দেখাতে লাগলেন। রাজবাটীর চতুর্দ্দিকের বাগানটি বড়ই সুন্দর। প্রাসাদটী দ্বিতল ও প্রস্তরনির্ম্মিত। বহির্ভাগটা ইংলণ্ডের উইণ্ডসর-কেসেলের আদর্শে প্রস্তুত হয়েছে। আসবাবপত্তরও সমস্ত বিলাতী ধরণের। পাথরের টেবিল, চেয়ার, কোচ্, সোফা, আয়না, পরদা প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ—সমস্তই বিলাতী ধরণের দেখে যেন একটু কষ্টবোধ হল। ভারতবর্ষীয়দের এই অর্থশূন্য যথেচ্ছ অনুকরণটা বড়ই লজ্জাকর। অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠজাতির অনুকরণ, উন্নতির জন্য কতকটা বাঞ্ছনীয় হতে পারে, কিন্তু সে অনুকরণের প্রথা স্বতন্ত্র। সেরূপ অনুকরণ বড় সহজসাধ্য নহে। শ্রেষ্ঠজাতির গুণানুকরণ করে অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্টজাতির উহা সম্পূর্ণ আয়ত্ত করবার ক্ষমতা থাকা চাই।—তা না হলে ইংরাজের মত ঘর সাজায়ে সাহেবীধরণে বাঁকা ইংরাজীবুলি বলে যদি ইংরাজ হবার ভরসা থাকত, তাহলে অনুকরণপ্রিয় বানরও মনুষ্যানুকরণে অচিরাৎ মানুষ হতে পারত। প্রাসাদটি অতীব সুন্দর হলেও উহার আপাদমস্তক বিলাতীয় ধরণে গঠিত ও সজ্জিত দেখে ভূতপূর্ব্ব মহারাজের রুচির প্রশংসা করতে পারলুম না। মুখফুটে সেখানে কোন কথাও বলতে পারলুম না, কারণ বাঙ্গালীদের এই বানরোচিত অনুকরণপ্রিয়তার কলঙ্কটা এত অধিক যে, বাঙ্গালী হয়ে সে কথা না উত্থাপন করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য মনে করলাম। বঙ্গদেশের সামান্য জমিদারেরা খাস কলিকাতাসহরে গলির ভিতর কেসেল প্রস্তুত করায়ে যদি গৌরবান্বিত হতে পারেন, তাহলে

মহীশূরের মত একটি রাজ্যের অধিপতির উইণ্ডসর কেসেলের আদর্শে স্বরাজ্যে একটি প্রাসাদ প্রস্তুত করায়ে গৌরবান্বিত হবার বাসনাটা সম্পূর্ণই মার্জ্জনীয় হতে পারে। সে বিষয় কিছু উচ্চবাচ্য না করে আমরা অন্দরমহল দেখতে গেলাম। মহারাণীর বসবার ঘরটি বড়ই সুন্দর ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে করি। মহাকবি কালিদাসের শকুন্তলানাটকের ঘটনাগুলি তৈলচিত্রে ঘরের ছাদটাতে চিত্রিত রয়েছে। চিত্রগুলি দেখে সূর্য্যমুখীর সেই শয়নকক্ষের কথা আমার মনে হয়েছিল। চিত্রগুলি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও নির্দ্দোষ না হলেও নিন্দনীয় নহে। ঘরগুলিতে ফটোগ্রাফ ও অন্যান্য তৈলচিত্রেরও অভাব নেই। প্রায় অধিকাংশ ছবিই বর্ত্তমান মহারাজা, মহারাণী ও মহারাজার স্বর্গীয় পিতার; তা ছাড়া মহীশূরের ভূতপূর্ব্ব ইংরাজ রেসিডেণ্টদিগেরও যথেষ্ট প্রতিমূর্ত্তি বর্ত্তমান। সমস্ত প্রাসাদ দেখা শেষ হলে ভৃত্যদের কিছু পারিতোষিক দিয়ে আমরা বাড়ী ফিরলুম। ফিরবার সময় ব্যাঙ্গোলোরের ঘোড়দৌড়ের মাঠ ও কাবনপার্ক দেখলুম। ক্রীকেটখেলার মত ঘোড়দৌড় ও তদানুষঙ্গিক জুয়াখেলাটাও ইংরাজদের একটি জাতীয় নেশা—ইংরাজী সভ্যতার একটা প্রধান অঙ্গ বল্লেও হয়। সভ্যতা-লাভেচ্ছু স্বাধীন নরপতিগণও যথাবিহিত এই সভ্যতাটিতে দীক্ষিত হয়েছেন। ঘোড়দৌড়ের মাঠের ভিতর প্রকাণ্ড একটি গোলোক খেলিবার মাঠ প্রস্তুত হয়েছে। শুনলুম, মাঠটি ষ্টেটের সম্পত্তি, স্বর্গীয় মহারাজা নাকি অনুগ্রহ করে ইংরাজদের ব্যবহারের জন্য সেটা ছেড়ে দিয়েছেন। এই সাত্ত্বিক দানটা মহারাজ যে কেবল ইংরাজদের উপর স্নেহপরবশ হয়েই করেছেন, তা আমার বোধ হয় না। ইংরাজপ্রীতির সহিত উক্ত দানের প্রবৃত্তিদায়ক অন্য কারণও ছিল।

যাহোক আমরা বেশ পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরলুম। স্নানাহারের পর সম্পূর্ণরূপে শ্রান্তিদূর হলে, পান চিবাতে চিবাতে ঘরে বসে যাকে

কথিত ভাষায় রাজা-উজীর-মারা বলে, আমরা সেই গুরুতর কার্য্যটিতে প্রবৃত্ত হলাম। মহীশূর-গভরমেণ্টের বর্ত্তমান অবস্থা ও উহার শাসন-প্রণালী হতে আরম্ভ করে বর্ত্তমান মহারাজের স্বকীয় আচারব্যবহার পর্য্যন্ত সমস্তই আলোচিত হতে লাগল। বন্ধুবরের মুখে মহীশূর গভরমেণ্টের ও মহারাজের সুখ্যাতি ধরে না। তাঁহার মতে বর্ত্তমান মহীশূরগভরমেণ্টটাই নাকি ভারতের অন্যান্য স্বাধীনরাজ্যের আদর্শ হওয়া উচিত—বরোদাও নাকি শাসনপ্রণালীসম্বন্ধে এর নিকট অনেক শিক্ষা করতে পারেন। বেশ বুঝতে পারলুম যে, বন্ধুবর স্বদেশপ্রেমে এত অন্ধ হয়েছেন যে, স্বদেশের গভরমেণ্টসম্বন্ধে নিরপেক্ষ ও যথাযথ মতপ্রকাশে একেবারেই অক্ষম। তা হলেও কিন্তু বন্ধুটি এত বিষয়ে সংবাদ রাখেন যে, তাঁহার মতামতগুলা একটু অতিরঞ্জিত হলেও উহা আমার বড় সরস লাগছিল। সুতরাং প্রসঙ্গটা চাপা না দিয়ে বরং 'উস্কায়ে' দিতে লাগলুম। বন্ধুর যেরূপ উদ্যম তাতে তাঁকে উস্কান খুব সহজ—শেষে থামানটাই শক্ত। এসম্বন্ধে পাঞ্চের একটি গল্প আমার মনে পড়ল—দুইটি উচ্ছৃঙ্খল জনবুল ইংলণ্ডে এক শৌণ্ডিকালয়ে মদ্য পান করতে গিয়েছিলেন। বন্ধুদ্বয়ের মদ্যপানে ও গল্পগুজবে রাত্রি অধিক হয়ে পড়ায় উভয়ের মধ্যে একজন বড়ই ব্যস্ত হয়ে পড়েন। বাড়ী গিয়ে প্রচণ্ডা স্ত্রীর নিকট কি কৈফিয়ৎ দেবেন, ঠিক করতে না পেরে দিশেহারা হয়ে তাঁর মদোন্মত্ত বন্ধুটিকে জিজ্ঞেস করিলেন "I say, John, what are you going to say to your wife?" জন বলিল "No fear, I shall mutter 'good morn' or some such thing and she shall say the rest." বন্ধুবরকেও আমার বেশী কিছু বলতে হল না। দুই একটা কথা জিজ্ঞেস করতেই তিনি মহীশূররাজ্যের আদ্যোপান্ত খবরগুলা আমাকে অনর্গল শুনাতে লাগলেন। তাঁর মতামতগুলি এখানে উল্লেখ করে পুঁথি বাড়ায়ে কোন ফল নেই। তবে মোটকথা আমার এই বোধ হয় যে, ভারতের অন্যান্য অনেক স্বাধীনরাজ্য অপেক্ষা অনেক হালফেসানে ও সুন্দররূপ পরিচালিত। ইহার কারণটি আমার খুব সহজ বলে মনে হয়। টিপুসুলতানের পতনের পর হতে যে সমস্ত হিন্দুরাজা মহীশূর-সিংহাসনের জন্য ইংরাজের ইম্পিরিয়াল পলিসির দ্বারা নির্ব্বাচিত

হয়েছিলেন, তাঁহারা অনেকেই শিশু ও নাবালক বিধায় বহুদিন এই রাজ্যটি বৃটিশগভরমেণ্টের তত্ত্বাবধারণে ছিল। এই সময় রাজ্যটির শাসনপ্রণালী কোন রাজার উচ্ছৃঙ্খলতায় এবং যথেচ্ছাচারিতায় বাধা প্রাপ্ত না হয়ে বৃটিশধরণেই প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ক্রমে মহীশূরগভরমেণ্টটি ইংরাজগভরমেণ্টের মত বিধিবদ্ধ হয়ে সুন্দর ও সরল হয়ে উঠেছে। স্বরাজ্যের গভরমেণ্টের সহিত মহারাজের বড় একটা সংস্রব নেই। রাজকোষে মহারাজের হস্তার্পণ করবার ক্ষমতা একেবারেই নেই। খাও-দাও নেচে বেড়াও—বস্। তার অধিক আর কিছু করবার যো নেই। মহারাজার নিজের টাকা ষ্টেটের টাকা হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁর যে ৭৷৮ লক্ষ টাকা নিজের মাসহরা আছে, তা হতেই নিজের সমস্ত খরচ চালাতে হয়। যা কিছু সখ ও মড়মানষি ঐ টাকার মধ্যেই সারতে হয়। বিশেষ কোন ঘটনায় মহারাজের এই নিজের মাসহরাটিতে কিছু অধিক টান ধরলে ষ্টেট কাউন্সিল মঞ্জুর করায়ে তবে তিনি রাজকোষ হতে টাকা নিতে পারেন। শুনলুম, যখন ভারতের বিধাতাপুরুষ বড়লাটেরা এই সমস্ত রাজ্যগুলিতে পদার্পণ করে কৃতার্থ করেন, তখন তাঁদের অভ্যর্থনার জন্য আলাহিদা টাকা মঞ্জুর করা হয়। কারণ এই সব বিলাতী মনসাপূজার যে রকম খরচ তাতে মহারাজের নিজের টাকায় থই পায় না। এখানকার আইন-কানুন সমস্তই ভারতগভরমেণ্টের মত। ভারতগভরমেণ্টের অনুমতি ব্যতীত বিশেষ কোন নূতন আইন করিবার ক্ষমতাও শুনলুম মহীশূর গভরমেণ্টের নেই। ভারতের অন্যান্য স্বাধীন বা করদ রাজ্যের তুলনায় মহীশূররাজ্যটি অতীব বিশাল। বোধ হয়, নিজামের রাজ্য ছাড়া এতবড় রাজ্য ভারতে আর নাই। ইহার আয়তন ৩০ বর্গমাইলেরও অধিক এবং বাৎসরিক আয় প্রায় ১ কোটী ১০ লক্ষ টাকা, তবে ইংরাজকে প্রায় সাড়ে ২৪ লক্ষ টাকা বাৎসরিক কর দিতে হয়।

শ্রীযতিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

শিরী-ফরীদ।

তৃতীয় দৃশ্য।

মুস্তাফা ও ফরীদ।

চীনদেশীয় একটী পার্ব্বত্য নিভৃত স্থান। একটী ক্ষুদ্র গিরি-নির্ঝর-পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র জীর্ণকুটীর। লতাগুল্মে কুটীরটী আচ্ছন্ন। দ্বারটী পর্য্যন্ত লতায় ঢাকিয়া কুটীরটীকে কুঞ্জের আকারে পরিণত করিয়াছে। দেখিলেই বোধ হয়, যেন গৃহখানি পরিত্যক্ত। বন-লতাচ্ছন্ন গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ কেবল এখনও পর্য্যন্ত স্বভাবজ উদ্ভিদের পূর্ণগ্রাসে পতিত হয় নাই। স্থানে স্থানে অনাবৃত পথরেখায় এখনও পর্য্যন্ত সে স্থান মনুষ্যের গমাগম সূচিত করে।

সময় সন্ধ্যা। স্থান পূর্ব্বোক্ত প্রাঙ্গণ। সেইস্থানে এক বৃদ্ধ এক মলিনবেশী যুবকের সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। বৃদ্ধের নাম মুস্তাফা, চীনদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর ও চিত্রকর। যুবকের নাম ফরীদ—মুস্তাফার প্রিয়শিষ্য।

একবৎসর এই নির্জ্জনদেশের কুটীরে বসিয়া ফরীদ একটী মূর্ত্তি গড়িতেছিল। এই একবৎসর মুস্তাফা ফরীদের দর্শনলাভে বঞ্চিত ছিলেন। কুটীরের নিকট বারম্বার যাতায়াত করিয়াও তিনি প্রিয় শিষ্যের সন্ধান পান নাই। বহুবার ফরীদকে সম্বোধন করিয়াও কুটীরা-ভ্যন্তর হইতে কোনও উত্তর পান নাই। এই একবৎসরে কুটীর জীর্ণ হইয়াছে। কুটীর পরিত্যক্তবোধে মুস্তাফা বহুদিন সেখানে আসেন নাই। মায়ার টানে বহুদিন পরে জীর্ণকুটীরটীকে দেখিতে আসিয়া বৃদ্ধ, ফরীদের সন্ধান পাইয়াছেন।

মুস্তাফা। পুত্র বল, শিষ্য বল, বৃদ্ধের সম্বল
বল, একমাত্র তুমি সে আমার। বাপ্
এমন নিষ্ঠুর তুমি,—উদাস হইয়ে
আপনার মনে কোথা রও, কোথা থেকে
কোথা যাও, আমি বৃদ্ধ খুঁজিয়া না পাই।
বিশ্বমাঝে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তুমি কারুকর
বিশ্বের সৌন্দর্য্যে ভরা তোমার অন্তর।
তার মাঝে হেন নিষ্ঠুরতা! তোরে যদি
না হেরি বালক, পলকে প্রলয় হেরি।
বার্দ্ধক্যশীতার্ত্ত আমি, তোর আগমন
তায় মলয়পবন—বাপ্! তুই যদি
দূরে দূরে রবি, আমি কোথা যাই!

ফরীদ। আমি কোথা গেছি গুরু?

মুস্তাফা। এত শিক্ষা পেলি, তোর
ওস্তাদে হারালি—এখনো সে এত ধরে
অহঙ্কার, দুনিয়ার মালিক যে জন
সেও যদি চিত্রাঙ্কন দেখে, পায়ে এসে
পড়ে লোটাইয়া, পৈগম্বর করে জ্ঞান।
তাহার সাক্রেত তুই। তোরে শিক্ষা দিতে
প্রাণে মোর যত কিছু ছিলরে কল্পনা
মুক্ত করে দিছি। নিজে ভাবশূন্য হয়ে
সাজায়ে দিয়েছি তোর প্রাণ। এত শিক্ষা
পেলি, ওস্তাদে হারালি!—এতই নিষ্ঠুর
তুই!—ফরীদ ফরীদ! এতই কঠিন

দিতে বাজে তোর বুকে ? হতভাগা, গুরু-
অবহেলা-কার্য্যে মঙ্গল কি হয় ! বাপ্ !
বল্ কোথা ছিলি বল্, ওস্তাদের পরে
হয়েছে কি অভিমান ?

ফরীদ। বিষম যন্ত্রণা !
আমি কোথা যাব !—এই কুটীরেই আছি
দিবানিশি।

মুস্তাফা। কুটীরেই আছি !—জ্ঞান মূর্খ
কার সঙ্গে কহিতেছ কথা ?

ফরীদ। গুরু সঙ্গে।

মুস্তাফা। শুধু গুরু ? পিতা, মাতা, ভাই, বন্ধু, গুরু,
সহচর-অনুচর—সব আমি তোর।
শুধু কি গুরু রে হতভাগা ?

ফরীদ। সব তুমি—
স্বর্গ হজরত তুমি আমার ঈশ্বর।

মুস্তাফা। তবে বল্ কোথা ছিলি ?

ফরীদ। এই ঘরে ছিনু।

মুস্তাফা। ফের এই ঘরে !—বড় বেইমান তুই,
অথবা বাতুল। ফরীদ ফরীদ ক'রে
প্রতিধ্বনি তুলে কাঁপায়ে দিয়েছি ঘর।
ফরীদ ফরীদ ক'রে করিয়া চীৎকার,
এই দ্বারে আঘাত করেছি শতবার।
ফরীদ ফরীদ ক'রে গিয়াছি নগরে।

ফরীদ ফরীদ ক'রে গ্রাম হতে গিছি
গ্রামান্তরে। ফরীদ ফরীদ ক'রে, ফের
ফিরে এসেছি হেথায়। চীৎকারে আবার
কাঁপায়েছি ঘর, পবনে তুলেছি ঝড়,
বিষম চীৎকারে আকাশ ভাঙিয়ে দিছি,
তারা গেছে খসে। নরাধম বেইমান!
ওস্তাদ-সম্মুখে মিথ্যা কথা! বল্ কোথা
ছিলি?

ফরীদ। এই ঘরে।

মুস্তাফা। ফের এই ঘরে! হতভাগা,
বৃদ্ধ হইয়াছি বলে গেছে কি নয়ন!
জ্ঞান গেছে করেছ নিশ্চয়! দূর হোক্—
আর তোর মুখ দেখিব না।

ফরীদ। কেন গুরু?
অপরাধ কি করেছি শ্রীচরণে? (হস্তধারণ)

মুস্তাফা। ছাড়—
আর আমি তোর নাম মুখে আনিব না।

ফরীদ। আগে বল কিবা অপরাধ?

মুস্তাফা। অপরাধ—
নিমকহারাম যেই, তারে কি বুঝাবে,
অপরাধ? গুরুর সম্মুখে মিথ্যা ক'তে
যার অঙ্গ কাঁপিল না, তারে কষ্ট দিতে

যার সরম হ'ল না, তারে কি বুঝাব
অপরাধ! যেথা ছিলি, চলে যা সেথায়।
তুই যদি না হলি আমার, তবে কেন
বার্দ্ধক্যের নিত্য নবযন্ত্রণার ভর।
অনিশ্চিত অতিদীর্ঘ মূহর্ত্ত আমার
আবার পূরাই তোর চিন্তা-যন্ত্রণায়।

ফরীদ। কেন বৃথা কর তিরস্কার! মিথ্যা নাহি
কই, মিথ্যা কহিতে না জানি। মিথ্যাবাদী
দরশনে, ছায়াস্পর্শে, ঘৃণা করি আমি।
যদিই বা ভুলে মিথ্যা কই, সে কি কব
তোমার সম্মুখে! পিতৃমাতৃহীন আমি।
পথ হ'তে আনি কুড়াইয়া, আত্মহারা
মায়াবশে স্বকার্য্য ভুলিয়া, চক্ষুজলে
করাইয়া স্নান, এ অজ্ঞাতকুলশীলে
বক্ষে দেছ স্থান। পুত্রত্বে বরেছ তায়।
মহাশিক্ষা দিয়াছ আমারে, অন্যকথা
কি বলিব, কেহ যা না করে, হেন কার্য্য
করিয়াছ। হৃদিভাণ্ডে যা ছিল, দিয়াছ।
এতটুকু করনি গোপন। জানি আমি,
ভাস্কর্য্যে দ্বিতীয় তুমি রাখনি আমার—
তুলিয়াছ তোমারো উপরে। যদি মিথ্যা
কই পিতা, সে কি কব তোমার সম্মুখে?

মুস্তাফা। করিলি কি বিধাতা নির্দ্দয়! যে সময়
বড় আশা বুকে বেঁধে আমি গরীয়ান—

তুলনায় সম্রাটে ফকীর হেরি,—হায় !
সে সময় বুকভেঙে সব আশা দিলি
গুঁড়াইয়া !—ফরীদ ফরীদ, কি করিলি !
বৃদ্ধমুস্তাফার শিরে অশনি হানিলি !
এত যত্ন, এত চেষ্টা, জাহান্নমে দিলি !
এত শিক্ষা শিখে শেষে পাগল হইলি !

ফরীদ। মিথ্যাবাদী অথবা উন্মাদ, জ্ঞানহীন
কিছু নই। আছে দিব্যজ্ঞান। দিব্যজ্ঞানে
ছিনু আমি ঘরে।

মুস্তাফা। ফের—ফের ওই কথা !
তবে রে নচ্ছার ! (প্রহার) তুই সত্যবাদী, আর
মিথ্যাভাষী গুরু তোর ! ফরীদ ফরীদ
ক'রে, স্বরভঙ্গ হইল আমার—তবু
ঘরে ছিলি !

ফরীদ। কেন গুরু প্রহর আমারে ?
কেন এত অবিশ্বাস ? যে জ্ঞানে সম্মুখে
দেখি গুরুরে আমার, যে জ্ঞানে উপরে
দেখি শ্রেণী তারকার, যে জ্ঞানে বুঝিতে
নারি ব্যাপার তোমার, সেই জ্ঞানে ছিনু
আমি ঘরে।

মুস্তাফা। (হাস্য) বুঝেছি বুঝেছি—এতক্ষণ
সমস্ত বুঝেছি। (গায়ে হাত বুলাইয়া) ফরীদ ফরীদ ! বাপ !

সময়ে কি অসময়ে, গুরুর, পিতার,
শিষ্যে-পুত্রে তিরস্কারে আছে অধিকার।
অভিমান করিলে কি বাছাধন? ভাল,
করেছিস্ করেছিস্,—আমারে গোপন
কেন? মুস্তাফা কি বাধা দিবে! তোর সুখে
ঈর্ষায় মরিবে? সেই ভয়ে
করেছ গোপন? চল্ চল্—দেখি চল্।
কোথা হতে আনিলি তাহারে? কোন দেশে
ঘর? চল্ চল্—লজ্জা কেন! আমি আছি
বলেছিস্ তারে? না, না হতভাগা তাও
বুঝি করেছ গোপন!

ফরীদ।　　　কাহারে আনিব?
কার ঘর কোন দেশে! লজ্জা কার তরে?
কারে কি বলিব, কি কার্য্য করেছি আমি?
কি তোমারে করিব গোপন!

মুস্তাফা।　　　(হাস্য) কি করেছ!—
যা করিলে নর, আগে গুরুজনে করে
সঙ্গোপন। কি করেছ!—যা করিলে, এক
ক্ষুদ্রপলে বছর উড়িয়া যায়। সারা
জীবনের কার্য্য মুহূর্ত্তে মিলায়। বাপ!
কি করেছ!—যা করিলে মাতঙ্গ মূষিক
হয়, সিংহ মৃগভয়ে লুকায় বিবরে,
দিনকর তড়াগে ডুবিয়া মরে, গিরি
গলে হয় স্রোতস্বিনী। তাই করিয়াছ

যা করিলে মিথ্যা পায় সত্যের আদর।
ভুলের ওজন হয় প্রতিষ্ঠার সনে।

ফরীদ। কি বলিছ, একবিন্দু বুঝিতে না পারি।

মুস্তাফা। ভাল কথা ভুলে গেছি, সে কার্য্য যে করে,
সব বুঝে বুঝিতে না পারে রঙ্গ তার।
বাপ, তোরে সংসারী দেখিয়া যদি মরি
এর পর আনন্দ কি আছে! তবে লজ্জা
কেন? করে লজ্জা! বর্ণে বর্ণে সৌন্দর্য্যের
শিখায়েছি জ্ঞানে। দর্পণে তুলিয়া দিছি
উলঙ্গপ্রকৃতি। ভাস্কর্য্যকৌশল যত,
সকলি সুন্দর তুমি শিখেছ, সন্তান।
নাসিকার কতটা কুঞ্চনে, নয়নের
কি প্রকার ঠারে, অপাঙ্গে ভ্রূভঙ্গে লাস্যে
কোথা কি সুন্দর, মালিন্যে রোদনে হাস্যে
বিম্বোষ্ঠ-কম্পনে, বদনে কোথায় টোল
খায়, কোথা টীপ, কোথা তিল, কোথা
জড়ুলি আঁকিলে সোন্দর্য্য উথলে যায়,
শিখায়েছি সমস্ত তোমায়। বাপধন,
প্রণয়িনী পেয়ে, মুহূর্ত্তে কি সব ভুলে
গেলি! আহা! কতই সৌন্দর্য্যজ্ঞান তোর—
তুই যারে করেছিস্ হৃদয়-ঈশ্বরী,
সে কত না হবেরে সুন্দর! চল্ বাপ্
দেখাবি আমায়।—ওকি, হাসিলি যে?

ফরীদ।

মুস্তাফা।   ক্ষমা কিরে! প্রণয়িনী
তোর, মোর আদরের পুত্রবধু. মোরে
দেখাবি না! আমি তার মুখ দেখিব না!—
দেখে দুটো আশিষ দিব না! ভয় নাই—
আর না করিব তিরস্কার।

ফরীদ।   (হাস্য) প্রণয়িনী!
কি বলিলে গুরু!—প্রণয়িনী?—সে আমার
প্রণয়িনী?

মুস্তাফা।   হাঁ, হাঁ, প্রণয়িনী। যৌবনের
বসন্ত-উচ্ছ্বাসে, নিত্যনব তিল তিল
কামনাসঞ্চারে হৃদয় ভরিয়া গেছে।
তিল তিল বর্ণের সংযোগে, আঁকিবারে
তিলোত্তমা যৌবন আপনি ধরে তুলি।
সে সুন্দর সৌন্দর্য্যের শীতল ছায়ায়
জীবনের উষ্ণসাধ গেছে মিলাইয়া।

ফরীদ।   সম্বৎসর সে মূর্ত্তি করেছি ধ্যান। সে কি
মোর প্রণয়িনী! তাই বুঝি হবে! নহে
গুরুবাক্য কর্ণে কেন পশেনি আমার।
গুরুদেব ক্ষমা কর মোরে। ভেবেছিনু
এমন সৌন্দর্য্য আমি দেখাব তোমায়,
সহস্রসুন্দরীস্রষ্টা তুমি কারুকর,
তোমারো তা পড়েনি নয়নে। অজ্ঞ আমি—
জ্ঞানশূন্য, গুরু হ'তে উচ্চ হব, এই

অহঙ্কারে অন্ধ আমি—সৌন্দর্য্য দেখিতে
ভুলে গেছি।—গুরুদেব, ক্ষমা কর মোরে।
তিল—তিল! পিতা, কোথা তিল র'লে হয়
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী? নবনীত অঙ্গ যার,
বর্ণ যার কষিত-কাঞ্চন, চাঁদ সনে
মাখামাখি, অরুণকিরণে গুচ্ছে-গুচ্ছে (অলক দেখাইয়া)
কাদম্বিনী—এখানে-সেখানে সংসর্পিত
অলকের দামে, কামের আকাঙ্ক্ষাভরা
বদন যাহার, বল কোথায় থাকিলে
তার তিল, সে সুন্দরী অতুল্যা ভুবনে?

মুস্তাফা। উলঙ্গসৌন্দর্য্য আঁকে নিষ্কাম যে জন।
সে রূপদর্শন, বাপ, ভক্তের সাধনা।
আমি ক্ষুদ্রপ্রাণী—মানযশ-আকাঙ্ক্ষায়,
অন্ধ কামনায়, লালসায় আত্মহারা,
হেলায় করেছি নষ্ট সোণার যৌবন।
সে সৌন্দর্য্য দেখা ভাগ্যে ঘটেনি আমার।
কামীর সৌন্দর্য্যজ্ঞান যেমন সম্ভবে
তাই তোরে বলি।—সুগভীর নাভিকূপ-
তীরে, তৃষ্ণার মিটাতে সাধ, যে সময়
অতৃপ্ত উন্মত্ত আঁখি—চারিধারে চেয়ে
স্তূপাকার সাধ মেখে, রাশি রাশি
জ্বালা জড়াইয়ে—কটাক্ষ-অমৃতস্রোতে
ভাসাতে আপন, ঊর্দ্ধশ্বাসে উধাও সে
গিরিপথে যায়, সেই কনক-অচল-
শৃঙ্গ মাঝে, সেই তুষার-মসৃণ পথে,

চলিতে চলিতে ক্লান্ত, তার বিশ্রামের
হয় প্রয়োজন। কামের আসন সম
সেথা এক তিল।

ফরাদ। সেথা তিল! সেথা কই
তিল! তিল শুধু উরুদেশে, আর তিল
কম্বুকণ্ঠে, আর তিল অধরের ধারে।
আর!—'কনক কমল মাঝে' স্থির যেথা
'কাল ভুজঙ্গিনী' 'খঞ্জন' ধরিবে ব'লে
বসে আছে স্থির, সেই ফণিনীর ফণা
নারী যাহে ত্রিনয়না, এত-বড় তিল।
হৃদিমাঝে তিল! ছিছি! লজ্জায় কাঁচলি
দিয়ে ঢেকেছি তাহারে! (বেগে প্রস্থান।)

মুস্তাফা। কি হ'ল কি হ'ল!
ফরাদ যে উন্মাদের মত গেল! মূর্খ!
প্রণয়িণীরূপমোহে এতই তন্ময়—
আমারে ভুলিয়া গেলি! তবে রোস, তোর
তেজ ভেঙে দিব। আনিব সুন্দরীচিত্র—
যার তুলনায়, তোর প্রেয়সী রূপসী,
প্রেতিনী দেখাবে। তিল, তাল হবে—এক
দণ্ডে প্রেমনেশা ভেঙে যাবে। ধরামাঝে
অতুলনা শিরীরে দেখিলে, মুহূর্ত্তেকে
ঘুচিবে প্রেমের সাধ। প্রিয়ারে ত্যজিয়া
পাগল হইয়া হবে ঘুরিতে সংসার।

পাছে লোকে আমা হ'তে উচ্চস্থান তোরে
করে দান, তাই এতকাল তার ছবি
করেছি গোপন। আজ তোর গর্ব্বমুণ্ড
চূর করে দিব, গুরুঅবহেলাফল
হাতে-হাতে দিব। সেই ছবি দেখাইব।

[ক্রমশঃ]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

পঞ্জাবে প্রতাপাদিত্য-উৎসব।

গত ২৫শে বৈশাখ মঙ্গলবার বৈশাখীপূর্ণিমায় বাঙ্গালীবীর মহারাজা প্রতাপাদিত্যের রাজ্যাভিষেকতিথি-উপলক্ষে লাহোর চিফ্ কোর্টের উকিল শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরিমহাশয়ের বাসভবনে "প্রতাপাদিত্য-হোম" সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। এই উৎসব-উপলক্ষে কোন আড়ম্বর করা হয় নাই; তথাপি পাঞ্জাবের গণ্যমান্য প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। বাহিরে খোলা জায়গায় যজ্ঞকুণ্ড প্রস্তুত হয়। যজ্ঞকুণ্ডের চারিদিকে সতরঞ্চি বিছাইয়া দেওয়া হয়। যখন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাগড়ী মাথায় এক এক বিশালবপু মনুষ্যেরা সতরঞ্চির উপর বসিয়া গেলেন, তখনকার দৃশ্যটি আমার চোখে বড় সুন্দর লাগিল। বাস্তবিক, পাঞ্জাবীদের জন্মভূমির এমনই গুণ যে, ইহাঁদের দেখিলে প্রত্যেককেই একএকটী বীরপুরুষ বলিয়া মনে হয়। ইহাঁরা যে বীরপুরুষ সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি? অতি পুরাকাল হইতেই পাঞ্জাব বীরপ্রসবিনী এবং বীরত্বের লীলাভূমি বলিয়া পরিচিত। ব্রিটীশ গবর্ণমেণ্টের অধিকাংশ সৈন্যই এদেশী। এখনও ইহাকে "sword-hand of India" বলে। এ জাতি কিরূপে পরাধীন হইল, তাহাই আমার বিস্ময়কর ঠেকে। পাঞ্জাবের ইতিহাস মনোযোগের সহিত অধ্যয়ন করিলে সমস্ত ভারতবাসীর শিক্ষালাভ হইবে, ইহাই আমার বিশ্বাস।

সন্ধ্যা ৬৷৷৹ ঘটিকার সময় উৎসব আরম্ভ হয়। প্রথমতঃ দীর্ঘশ্মশ্রু-ধারী পলিতকেশ বৃদ্ধপুরোহিত উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্রপাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং তাঁহার মুখ হইতে "স্বাহা" ধ্বনি নির্গত হইতে না হইতেই উপস্থিত ভদ্রমণ্ডলী ঘৃত, অগরু, চন্দনপ্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য

সাগ্রহে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। চারিপাঁচজন পাঞ্জাবী ব্রাহ্মণবালিকাও উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারাও পুরোহিতের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া বাঙ্গালীবীরের উদ্দেশে আহুতি প্রদান করিতেছিলেন। বাঙ্গালীবীরের উৎসবে ইঁহাদের ঈদৃশ আগ্রহ এবং উৎসাহ দেখিয়া অপার আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। উৎসব আরম্ভ হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই আকাশে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হওয়াতে যজ্ঞস্থল এক অনির্ব্বচনীয় ভাব ধারণ করিল। কিন্তু এই আনন্দটুকু বেশীক্ষণ উপভোগ করিতে পারি নাই। হঠাৎ মানসপটে অতীতের একটী গভীর স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। প্রায় সার্দ্ধ তিনশতবৎসর পূর্ব্বে এমনই একদিনে বঙ্গদেশে কি আনন্দের ফোয়ারা ছুটিয়াছিল! বঙ্গদেশের দ্বাদশভৌমিক এবং হিন্দু, মুসলমান ও খৃষ্টান প্রভৃতি প্রজাবর্গ পরস্পর প্রেমালিঙ্গনে আবদ্ধ হইয়া ধূমঘাটে সমাগত হইয়াছিলেন। সেদিন ধূমঘাট কিনা অপূর্ব্বশোভা ধারণ করিয়াছিল। সেদিন চাঁদ যেরূপভাবে উঠিয়াছিল, এবারও ত ঠিক্ সেরূপভাবেই উঠিয়াছে। কিন্তু সেদিনে আর এদিনে কত তফাৎ? এখন সে প্রতাপ নাই, সে দ্বাদশভৌমিক নাই, সে বাঙ্গালী নাই, সে বঙ্গভূমি নাই, সে ধূমঘাট আর 'ধূম'-ঘাট নাই। সে প্রতাপ মাতৃভূমির জন্য প্রাণোৎসর্গ করিয়া এখন অক্ষয়-স্বর্গভোগ করিতেছেন। যে প্রবলপরাক্রান্ত দ্বাদশভৌমিক সমগ্র বঙ্গদেশ শাসন করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে সকলে মিলিয়া বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে নিজেদের রক্ষা করিতেন, এখন তাঁহাদের নামমাত্রও বিলুপ্ত হইয়াছে। যে ধূমঘাট একদিন বঙ্গদেশের রাজধানীরূপে সুরম্য হর্ম্ম্যাদি এবং বিবিধ কলকারখানায় পরিপূর্ণ ছিল; কালের আবর্ত্তনে আজ তাহা ভীষণ জঙ্গলাকীর্ণ এবং ব্যাঘ্রাদি হিংস্রজন্তুর আবাসভূমিতে পরিণত। যে বাঙ্গালী একদিন শৌর্য্যে-বীর্য্যে, শিল্পবিদ্যায় এবং কলে-কৌশলে সমগ্র জগতের বরণীয় ছিল, আজ তাহারা কিনা সামান্য

উদরান্নসংস্থানের জন্ত কত পদাঘাত ও লাঞ্ছনা ভোগ করিতেছে এবং তাহাদের এতদূর অবনতি হইয়াছে যে, তাহারাই নিজে ইতিহাস লিখিতেছে যে যখন বখতিয়ার খিলিজী কেবলমাত্র সপ্তদশজন অশ্বারোহী লইয়া বঙ্গের তৎকালীন রাজধানী গৌড়নগর আক্রমণ করেন, তখন গৌড়ের রাজা বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেন দুর্গের গুপ্তদ্বার দিয়া পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচান। ইহা আমাদের অবনতির পরাকাষ্ঠা ছাড়া আর কিছুই নহে। একদিন একটী পঞ্জাবী বন্ধু—তিনি স্বয়ং গবর্ণমেণ্টের অশ্বারোহী সৈন্তদলভুক্ত—আমায় জিজ্ঞসা করিয়াছিলেন "বাঙ্গালীরা কেরাণীগিরী এত ভালবাসে কেন? তাহারা সৈন্তবিভাগে চাকুরী করিতে যায় না কেন? তাহাদের কি সাহস নাই, না অল্পবেতন বলিয়া সে চাকুরী করে না।" আমি উত্তর করিলাম "বাঙ্গালী গোলামী করিতে করিতে এখন এরূপ হইয়াছে যে, কেরাণীগিরী ছাড়া আর তাহাদের গত্যন্তর নাই। আর বাঙ্গালীর যে সাহস নাই, সেটা অনেকটা সত্য। কিন্তু থাকিবে কোথা হইতে? একটা শক্তির যদি উপযুক্ত ব্যবহার করা না হয়, কিম্বা ব্যবহার করিবার ক্ষেত্র না থাকে, তবে আর সে শক্তি বজায় থাকে কিরূপে? তাহাতে যে মারীচা ধরে, এবং ক্রমশঃ ক্ষয় পাইতে আরম্ভ করে। বাঙ্গালী যদিও এখন কেবল মসীজীবী কিন্তু তাহারা একদিন অসিজীবী ছিল। ভারতে ইংরাজরাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইভ্ বীরশ্রেষ্ঠ বলিয়া খ্যাত। পলাশীপ্রাঙ্গণে বাঙ্গালী সেনাপতি মোহনলাল এবং মীরমদনের সহিত যুদ্ধে তাঁহাকেও জয়ের আশা ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আমি জিজ্ঞাসা করি, এই সব যুদ্ধে কি আপনাদের পাঞ্জাব হইতে সৈন্য লওয়া হইয়াছিল? ভীরু বাঙ্গালীই তখন যুদ্ধ করিতে জানিত, বন্দুকের শব্দে মূর্চ্ছা যাওয়ার ভয়ে কাণে আঙ্গুল দিত না। বঙ্গদেশ একদিন অর্ণবপোত এবং যুদ্ধতরীনির্ম্মাণের জন্ত বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। এমন কি,

তুরস্কের সুলতানের জন্য প্রত্যেক বৎসর বঙ্গদেশ হইতে বহুসংখ্যক জাহাজ প্রস্তুত হইয়া তুরস্কে যাইত। আলেক্‌জেণ্ড্রিয়ার (Alexandria) জাহাজ অপেক্ষা এইগুলি অনেক সুলভ ও সুদৃঢ় হওয়াতে সেখানে খুব সমাদৃত হইত। "তবে এখন—অনভ্যাসে বিদ্যা হ্রাস পায়।"

* * * * *

প্রতাপ, তোমার স্বর্ণসিংহাসন হইতে এখন একবার মর্ত্ত্যের দিকে চাহিয়া দেখ, বাঙ্গালীর সুপ্তি কাটিতেছে। অমানিশার শেষে, পূর্ব্বদিকে নব অরুণের জ্যোতিঃ দেখিয়া তাহারা জাগিয়াছে। বাঙ্গালীই প্রথম দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিল, তাহারাই এখন শৃঙ্খলমোচনের পথপ্রদর্শক। তাহাদের লুপ্তশক্তি পুনরুদ্ধারের জন্য তাহারা কোমর-বাঁধিয়া জাগিয়াছে। ঐ দেখ, তাহাদের ঘর হইতে বিদেশী জিনিষ পুরীষবৎ পরিত্যক্ত হইতেছে। তাহারা লজ্জানিবারণের জন্য এখন আর মাঞ্চেষ্টারের দ্বারে উপস্থিত হইবে না। তাহারা নিজেদের দেশে কাপড় তৈরী করার জন্য কল বসাইতেছে এবং তাহাদের ললনাগণ আবার ঘরে-ঘরে চরকা দিয়া সূতা কাটিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের পূজাপার্ব্বণাদি এখন আর লিভারপুলের অস্পৃশ্য ও অখাদ্য চিনি ও লবণে কলুষিত হইতেছে না। ঐ শুন, "বন্দেমাতরম্"ধ্বনি করিতে করিতে তাহারা এক জাতীয়-পতাকার নীচে একত্র হইতেছে এবং সমস্ত ভারতবাসী তাহাদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে যোগ দিয়াছে। ঐ দেখ, চট্টগ্রাম হইতে আবার জাহাজ বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়া পক্ষবিস্তার করিয়া চলিয়াছে। পূর্ব্বে হিন্দু-মুসলমানে বিদ্বেষ ছিল, কিন্তু এখন হিন্দুমুসলমান পরস্পর গলাগলি করিয়া এক জাতীয়জীবন গঠন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রতাপ, মোহের ঘোরে বাঙ্গালীরা এতদিন তোমায় ভুলিয়াছিল। এখন মোহ-ঘোর কাটিয়াছে, এখন আর তাহারা তোমাকে ছাড়িবে না। তোমাকে ভক্তিডোরে বাঁধিয়া রাখিবে। ঐ দেখ, বাঙ্গালীরা ঘরে ঘরে তোমার

পূজার আয়োজন করিতেছে। সুদূর পঞ্জাবেও তোমার পূজা আরম্ভ হইয়াছে। এমন কি, পাঞ্জাবী বালিকারা পর্য্যন্ত তোমার উদ্দেশে ভক্তিভাবে আহুতি প্রদান করিতেছে। প্রতাপ, এখন একবার তোমার প্রিয়সখা শঙ্কর ও সূর্য্যকান্তকে সঙ্গে করিয়া এই মর্ত্ত্যভূমে আবির্ভূত হও। বাঙ্গালীরা এখন তোমাকেই চায়। তুমি তাহাদিগকে অভয়বাণী দাও এবং আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার মত তাহারাও মাতৃভূমির সেবায় প্রাণোৎসর্গ করিতে পারে।

*   *   *   *   *

এই উৎসবে লাহোরপ্রবাসী কয়েকজন বাঙ্গালীও তাঁহাদের ছেলেমেয়ে লইয়া উপস্থিত ছিলেন। দেখিলাম, একজন আধুনিক বাঙ্গালীযুবক গলে রুদ্রাক্ষের মালা পরিয়া সভায় উপস্থিত রহিয়াছেন। আহুতির সময় তাঁহার ভক্তিবিভোর ভাব সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছিল। অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম তিনি পূজনীয়া শ্রীমতী সরলা দেবীর স্বপ্নের প্রেরণায় উদ্দীপিত।* আহুতিপ্রদান শেষ হইলে

* "গতরাত্রে আমি স্বপ্নে দেখিলাম, আমার দেশের বালকেরা এক মহাযজ্ঞকুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে বসিয়া আছে। তাহাদের সকলেরই পরিধান—ভিতরে কৌপীন, বাহিরে কণ্ঠ হইতে পাদপর্য্যন্তবিস্তৃত স্বদেশী কালকম্বলের একটী আলখাল্লা, এবং গলায় রুদ্রাক্ষের জপমালা। পুরোহিত—দেশের জনৈক নেতা—মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিতেছেন এবং তাঁহার ওষ্ঠ হইতে স্বাহাধ্বনি নির্গত হইতে না-হইতে কম্বল ও কৌপীনধারী দেশব্রত বঙ্গের শিশু ও যুবকেরা অগ্নির ক্ষুধা তৃপ্ত করিতেছে। ঘৃত ও সুগন্ধি সামগ্রীর সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সংকল্পে আত্মজীবন, ধন ও মান আহুতি দান করিতেছে।

উহাদের কম্বলপরিধানের কারণ বুঝিলাম—কম্বল সর্ব্বাপেক্ষা সস্তা, মুটেমজুরও কম্বল কিনিতে পারে, দেশের সন্তানের মধ্যে ধনী-নির্ধন-ভেদ রাখা হইবে না। গরীব হইতে গরীবও যে বস্ত্র কিনিতে পারে, সেই বস্ত্র আপাততঃ দেশের হিতব্রত সকলেরই জন্যে হউক; তাহা ছাড়া সমস্ত দেশই এখন গরীব, প্রত্যেক সন্তান নিজব্যয় সংক্ষেপে করিয়া যাহা কিছু বাঁচাইতে পারে দেশের হিতকর কোন কার্য্যে বা জাতীয়-ধনভাণ্ডারে তাহা সঞ্চিত করা হউক—এই উদ্দেশ্যে অগ্নিহোত্রী বালকেরা কম্বল ও কৌপীন তাহাদের অঙ্গের আভরণ করিয়াছে। জপমালা—"বন্দেমাতরম্" জপের

পর লাহোর ডি,এ,ভি, কলেজের ছাত্রেরা "গদ্‌কা" খেলা দেখাইয়াছিল। তার পর কয়েকটী বাঙ্গালী বালকবালিকা মিলিয়া "কত কাল পরে, বল ভারত রে" গানটী অতি সুমিষ্টস্বরে গাহিল। পরে লাহোরের একজন উকিল পঞ্জাবের নিম্নলিখিত প্রসিদ্ধ জাতীয়সঙ্গীতটী গাহিয়াছিলেনঃ—

"সারে জাহাঁসে আচ্ছা হিন্দোস্তাঁ হামারা
হাম্ বুল্‌বুলে হ্যায় ইস্‌কি ইয়ে গুল্‌সিতাঁ হামারা।
গুরবৎ মে হোঁ আগর হম্ দিন রহতা হ্যায় ওত্‌নমে
সম্‌ঝো ওহিঁ হামোভ দিল হো জাহাঁ হামারা।
পরবৎ ও সরসে উঁচা হম্‌সায়া আস্‌মাঁকা
ও যন্ত্রী হামারা ও পাশবাঁ হামারা।
গোদিমে খেল্‌তী হ্যায় ইস্‌কে হাজারোঁ নদীয়াঁ
গুলশন্ হ্যায় জিস্‌কে দম্‌সে রশ্‌কে জনাঁ হামারা।
অ্যায় আবে রোদে গঙ্গা ওদিন হ্যায় ইয়াদ হামকো
উৎরা তেরে কিনারে যব কারবাঁ হামারা।

মালা ; তাহা রুদ্রাক্ষগঠিত এইজন্য যে, রুদ্রভাব যেন তাহাদের কখন ত্যাগ না করে, ক্লেশসহিষ্ণুতা যেন প্রাণবায়ুর ন্যায় তাহাদের সঙ্গী হয়—তাহা নিয়ত স্মরণ করাইবার জন্য।

স্বপ্নে জানিলাম, সেদিন বৈশাখীপূর্ণিমা, বঙ্গের বীর রাজাপ্রতাপাদিত্যের বার্ষিকোৎসবতিথি, এবং তাঁহারই বিক্রম ও বীরত্বের সম্মানার্থ বঙ্গসন্তানগণের এই পৌর্ণমাসী হোমের আয়োজন।

মুহূর্ত্তমধ্যে শুনিলাম কোন অশরীরীবাণী আমাকে আদেশ করিল—"উঠ, বঙ্গদেশে যাত্রা কর। বিলাসবৈভব ছাড়িয়া দুঃখিনী মাতার দুঃখিনী কন্যার মত যাও। বৈশাখীপূর্ণিমার দিনে সেখানে তোমার প্রয়োজন আছে। বন্দে মাতরম্! * * * * *" শ্রীমতী সরলা দেবী। সঞ্জীবনী ২০ শে বৈশাখ, ১৩১৩।

মজ হব নেই শিখাতা আপসমে বৈর রাখ্না

হিন্দি হাঁয় হম্ ওতন হ্যায় হিন্দোস্তাঁ হামারা।

ইউনান্ ও মিশর্ ও রোমা সব মিট্ গয়ে জাহাঁসে

অব্তক্ মগর হ্যায় বাকী নামো নিশাঁ হামারা।

কুছ্ বাৎ হ্যায় কি হস্তি মিট্তি নেহি হামারি

সদিয়োঁ সে আস্মা হ্যায় না মেহের বাঁ হামারা।

ইক্বালে আপনা মেহরম্ কোই নেই জাহাঁমে

মালুম্ হ্যায় হামিকো দর্দে নেহাঁ হামারা।"

ইহার অর্থ :—

"সারা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমাদের হিন্দুস্থান; আমরা ইহার বুল্বুল্ এবং ইহা আমাদের পুষ্পোদ্যান।

যদি কখনও বিদেশে থাকি তখনও আমাদের মন মাতৃভূমিতে থাকে; বুঝিয়া লও, মন আমাদের যেখানে আমরাও সেখানে।

এই পর্ব্বত (হিমালয়) সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ, ইহা আকাশের প্রতিবেশী; ইহাই আমাদের শান্ত্রী এবং ইহাই আমাদের পাহারা।

ইহার (হিন্দুস্থানের) কোলে সহস্র সহস্র নদী খেলা করিতেছে, যাহার জন্য আমাদের এই পুষ্পবন স্বর্গেরও হিংসার কারণ।

হে গঙ্গার পবিত্রবারি! যেদিন আমাদের অশ্বারোহী বণিকেরা প্রথম তোমার তীরে অবতীর্ণ হয়, সেদিন আমাদের মনে আছে।

ধর্ম্ম আমাদিগকে পরস্পরে বৈরী না রাখিতে শিক্ষা দেয়; আমরা সকলেই হিন্দী (হিন্দুস্থানবাসী), আমাদের মাতৃভূমি হিন্দুস্থান।

গ্রীস্, মিশর এবং রোম্ পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু আমাদের নাম ও নিশানা আজও বর্ত্তমান আছে।

আমাদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত না হইবার কিছু কারণ আছে; যদিও শত শত শতাব্দী হইতে অদৃষ্ট আমাদের প্রতি বিমুখ।

হে একবাল (কবি)! এই পৃথিবীতে আমাদের আর বন্ধু নাই, আমাদের গুপ্তবেদনা কেবল আমরাই জানি।"

একটি ভজনমণ্ডলী-কর্ত্তৃক আরও অনেক গান গীত হইল।

সর্ব্বশেষে একটী চারিবৎসরের পাঞ্জাবী শিশু তার স্বাভাবিক অস্ফুটস্বরে—"হর হর হর জয় হিন্দুস্থান"! "হরে মুরারে হিন্দুস্থান"! "নমো হিন্দুস্থান"! ইত্যাদি গাহিয়া উপস্থিত জনমণ্ডলীকে মাতাইয়াছিল। রাত্রি প্রায় ৯ ঘটিকার সময় উৎসব সমাপন হয়।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ধর।

কাঙালিনী।

কেরে অশ্রুসিক্তা বসনাঞ্চলে!
চঞ্চল নীলনয়নোৎপলে!
তস্কর-চিরভোগ্যা;
কেন, রাজার দুয়ারে মরিস্ ঘুরিয়া,
রাজার স্বপনে থাকিস্ ডুবিয়া,
ওরে, তুই কি রাজার যোগ্যা?
নিত্য নূতন ভূষালঙ্কৃতা,
লতিকাপ্রসূন তীরশোভিতা,
জাহ্নবীপূত যমুনাধৌত
নির্ম্মল তোর করুণা।
তোর কিসের লাগিয়া দহিয়া দহিয়া
সন্তাপে হৃদি মলিনা?
আজি সাজে কি তোমার মণিমুকুতার মালা,
ভিখারী তোমার কোলের ছেলে—
ভিখারিণী তুমি বালা।
কেন কেন মিছে কণ্টক তাহে গাঁথা?
কোমল শ্যামল হৃদয় তোমার—
ফুলের বিছানা পাতা।
কেন নিমিষে নিমিষে বেত্র-শাসনে
জ্বলিবে গো যেথা সেথা?
ওরা চাহিবে কি তব পানে?

শেষে, দুয়ার ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া
ফিরিবে গো অভিমানে।
শুধু অকূল আঁধার দুঃখ-পারাবার
উথলি উথলি বহিবে তোমার ধ্যানে।
এসো ফিরে এসো, পাখীরা শুনাবে গান।
নির্ঝর'দকে করিবে স্নান।
কিসের তব গো ব্যথা ?
আর্য্যাপূজিতা বনবাসিনী—
স্বর্ণ অরুণ লোকহাসিনী,
এসো এসো ফিরে ;—
স্বর্গে ঘোষিবে দুন্দুভি তব
জ্ঞান-গরিমা-কথা।
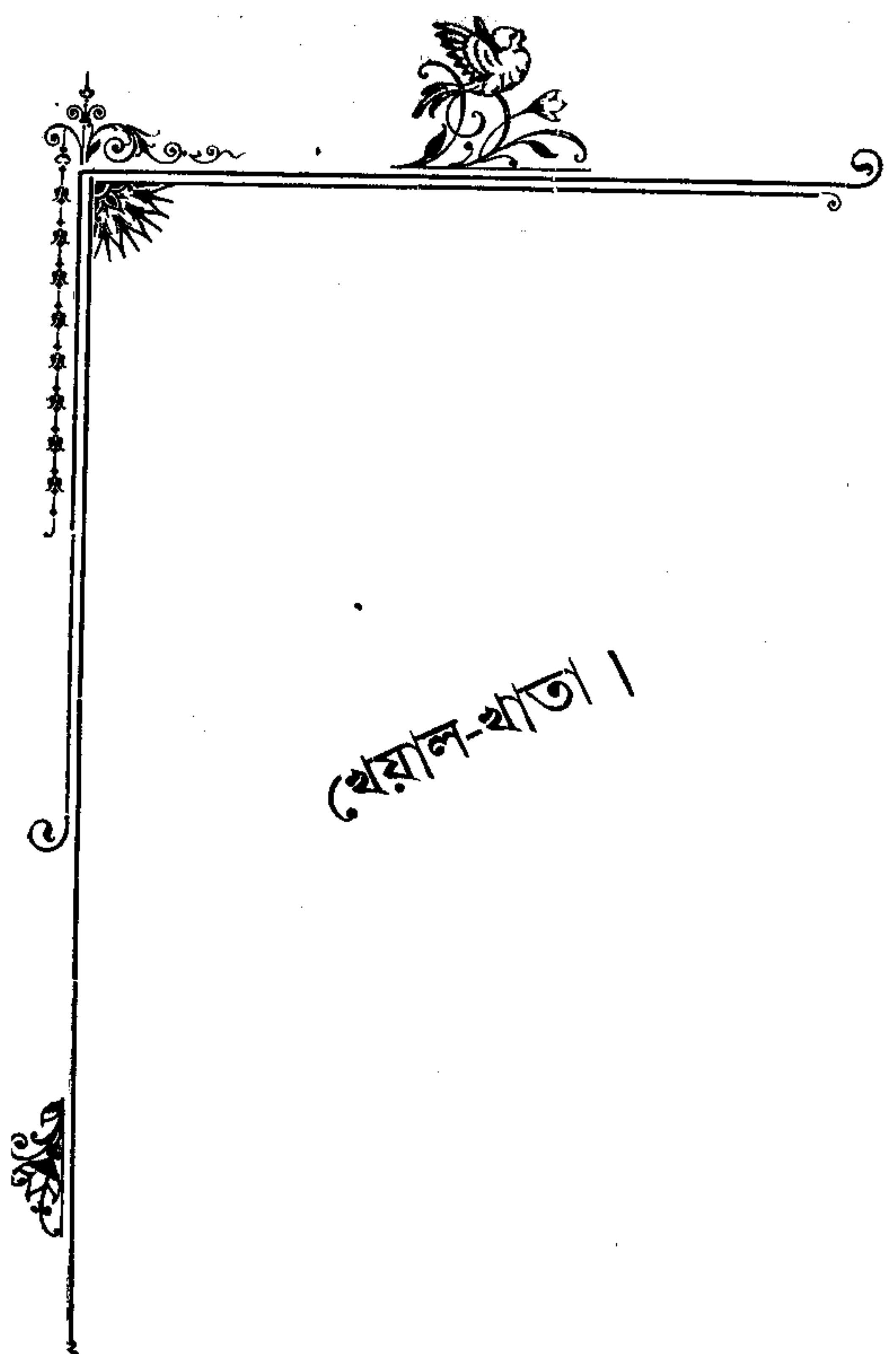
শ্রীহরিশ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

———

খেয়াল-খাতা।

সমালোচন-খেয়াল।

শ্রীযুক্ত বেণোয়ারীলাল গোস্বামী একজন সুপরিচিত কবি। তিনি একখানি কাব্য লিখিয়াছেন,—তাহার নাম দিয়াছেন "খিচুড়ী"। পড়িয়া দেখিলাম, তাহা "খিচুড়ী" না হউক, "জীবিত-মৎস্যের ঝোল" বটে। অর্থাৎ বহুসংখ্যক সুপ্রসিদ্ধ অপ্রসিদ্ধ জীবিত বাঙ্গালীকে কলম-বঁটিতে তিনি হত্যা করিয়া বঙ্গের সর্ষপতৈলে ভাজিয়া, শ্লেষের মরিচ-বাটনা দিয়া বঙ্গীয় পাঠকগণের জন্য ঝোল রাঁধিয়াছেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের "দুর্ব্বাসা"-নামক সঙ্গীত একটু পরিবর্ত্তিত করিয়া বলা যাইতে পারে—

কলিকালে আছে শুনি,
বেণোয়ারী নামে খুনী,
(যদিও) মাথায় নাহিক জটা—
(তার) মেজাজ বেজায় চটা—
দাড়িগুলো ছাঁটাছোঁটা—
ওগো তবু সে যে বড় গুণী।

পারে না বটে, লিখিতে কবিতা, অমুক ও অমুকের চাইতে,
পারে না বটে, অমুকের মত বাজাতে নাচিতে গাইতে,
কিন্তু সে যে মহারোষে
বিনা কারু কিছু দোষে
গালি দেয় ভারি কোসে,
আহা, সে গালির কি বাঁধুনি!

বেণোয়ারীবাবুর গালির বাঁধুনি আছে। ইচ্ছা ছিল, একটু নমুনা তুলিয়া গালির বাঁধুনি দেখাই। কিন্তু ভয় করে। শুনিয়াছি কচিৎ যে দুইচারিজনকে বেণোয়ারীবাবু এ গ্রন্থে গালি দেন নাই, তাঁহারা

কবির উপর হাড়ে চটিয়া গিয়াছেন। আমি যদি দুইচারিজনকে প্রদত্ত গালি এখানে উঠাইয়া দেখাই, তবে বক্রী গালিভোক্তারা নিশ্চই indignation meeting করিয়া আমার কার্য্যের প্রতিবাদ করিবেন। তবে, এ পুস্তকে যেমন লোককে নাম ধরিয়া ধরিয়া গালি দেওয়া আছে, তেমনি আবার স্থানে স্থানে শ্রেণীবিশেষকেও লক্ষ্য করা হইয়াছে। এস্থানে তাহাই একটা তুলিয়া দেখাইলে ক্ষতি নাই। বর্ত্তমানকালের বধূগণের সম্বন্ধে কবি বলিয়াছেন—

লজ্জাসরম, হিন্দুধরম,
এরা ত সব প্রাচীন অতি,
এদেরি বক্ষে হানিয়া ছুরিকা
ফিরাইছে সব নারীর মতি।
মাধুরীঘেরা স্বভাবধীরা
মৃদুভাষিণী কামিনী।
সেমিজ পিন্ধি মুখরা ভূত্বা,
চলু চঞ্চলগামিনী।
শাশুড়ী সঙ্গে করিছে তর্ক
নাড়িয়া নাড়িয়া হস্ত,
ঈষৎ কথায় শুদ্ধ ভাষায়
বুড়ীটা হতেছে ত্রস্ত।
দৌপদীর ছিল পাঁচটি সোয়ামী,
রাঁধিত সে পরিপাটী—
তাই
কি জানি কি হয়, এই মনে করি
এঁরা ডালেতে দেন না কাঠি।

এদের
New edition বউগুলো সব
এক ছাঁচেতে ঢালা,
রূপের আগুনে কর্পূর দিয়ে
জন্মকে করেছে আলা।
ইত্যাদি।

পুস্তকের দুই একটি ত্রুটি এখানে উল্লেখ করিব। প্রথম, গালিত ব্যক্তিবর্গের একটি বর্ণানুক্রমিক সূচী নাই। হয়ত, আপনার হাতে বইখানি পড়িল,—আপনাকে গালি দেওয়া হইয়াছে কি না জানিবার জন্য সমস্ত বইখানি আপনাকে পাঠ করিতে হইবে। সূচী থাকিলে, চট্ করিয়া আপনি নিজের নাম আছে কি না খুঁজিয়া বাহির করিয়া ফেলিতে পারিতেন। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন প্রসিদ্ধ ব্যক্তিকে যথেষ্ট গালি দেওয়া হয় নাই। ধরুন, সুরেন বাঁড়ুয্যেকে মাত্র বলা হইয়াছে—

এদের
সুরেন বন্দ্যো যেমনি বক্তা
তেমনি sincere,
ম্যাটসিনি-দুধ আওটা করে
বার করেছেন সার।

অথচ অনেক রামা-শ্যামাকে একপাতা ধরিয়া গালি দেওয়া হইয়াছে। সুরেন্দ্রবাবুর প্রতি এ কার্পণ্য কেন?—এইরূপ আরও আছে।

তৃতীয়তঃ—প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের মধ্যে কেহ কেহ বাদ পড়িয়াছেন। তাঁহাদের নাম প্রকাশ্যভাবে উল্লেখ করিয়া তাঁহাদের মনোবেদনা জন্মাইতে ইচ্ছা করি না। এখানে কেবল একজন মাত্র এরূপ গালি-

বঞ্চিতের নাম করিব। বাবু বেণোয়ারীলাল গোস্বামীকে কোনও গালি দেওয়া হয় নাই। শুনিতে পাই, বাঙ্গলাদেশে গালি যেরূপ বিক্রয় হয়, এমন আর কিছুই হয় না। সুতরাং অনুমান করিতে পারি, "খিচুড়ী"র দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্রই যন্ত্রস্থ হইবে। দ্বিতীয় সংস্করণে এই দোষগুলি পরিহার করিলেই গ্রন্থখানি "পোলাও" হইয়া দাঁড়ায়।

কথিত আছে, কাব্যে কবির হৃদয়ের পরিচয় পরিস্ফুট হয়। বেণোয়ারী বাবু দ্বিপদ মনুষ্যকে গালি দিয়া "ভূত ভাগাইয়া" দিয়াছেন, কিন্তু গ্রন্থের একস্থানে চতুষ্পদ প্রাণীর প্রতি তাঁহার যথেষ্ট প্রেমের পরিচয় আছে। "বিশ্রাম" নামক সর্গ আরম্ভ করিয়া লিখিয়াছেন—

তোম তা না না না তোম তা না না না
ঘোড়ায় ডাকে চিঁহি,—
ঐ যে কি বল্‌তে কি বল্লাম
সুর হয়েছে মিহি।

ব্যাপারটা একবার বুঝুন। কবি, প্রাতঃকালে চা-পান করিয়া কবিতা লিখিতে বসিয়াছেন। মৃদুমন্দ বসন্তানিল উন্মুক্ত গবাক্ষপথে আসিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পুষ্পবাস মাখাইয়া দিতেছে। এমন সময়, বাহিরে, বাগানে একটা ঘোড়া আসিয়া উক্তপ্রকার বিকৃতরব করিল। যখন কবির কবিতাবধু, প্রভাতের মৃদুশীতল আলোকে, অল্পে অল্পে মুখাবগুণ্ঠন উন্মোচন করিতেছেন,—এমন সময় ঘোড়ায় ডাকে চিঁহি! —কাহার ঘোড়া? কোথা হইতে আসিল? চিঁহি করিবার সে কি আর অন্য সময় পাইল না? পাঠক, আপনি আমি হইলে কি করিতাম? আমরা কি ক্রোধসম্বরণ করিতে পারিতাম? কখনই না। চাকর ডাকাইয়া, ঘোড়াকে উত্তম-মধ্যম প্রহার দিয়া, নিশ্চয়ই খোঁয়াড়ে পাঠাইয়া দিতাম। কিন্তু কবি তাহা করিলেন না। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীয় কাব্য মধ্যে তাহাকে স্থান দান করিয়া তাহাকে অমর

করিলেন। ঘোড়া না হইয়া গাধা হইলে বেণোয়ারীবাবু বোধ হয় তাহাকে আরও অধিক সমাদর করিতেন। ধন্য কবির স্বজাতিপ্রেম! অহো, আমরা দ্বিপদ হইয়া জন্মিয়াছি বলিয়াই কি তাঁহার নিকট এত অপরাধী?

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

মানুষ-বলীবর্দ্দ।

(১)

ইদানীং দুএকজনকে বিদেশী দ্রব্য কিন্‌তে বারণ করলে তারা বলে—"মশায়, ও আপনার স্বদেশী টিঁক্‌লনা। দিনকতক আমরাও করেছি। এখন দেখি, লোকের আর সেরূপ উৎসাহ নেই, সেরূপ নিষেধ করবার প্রবৃত্তি নেই। তাই আপনার স্বদেশী ছেড়ে দিয়েছি।" এর জবাব জুটে গেল, একদিন একজোড়া গাড়ীটানা বলদ দেখে। ঐ বলদগুলো যতক্ষণ মার খায়, কি গাড়োয়ানের গাল খায়, কি তাড়াবার শব্দ শোনে, ততক্ষণ চলে। আবার ওসবের অভাব হলে, হয় অপথে যায়, না হয় একেবারে থামে। আবার সেগুলো জোটে তবে চলে। এরাও ঠিক ঐ রকম। নিজেরা চলবেন না—তুমি তাড়াও সোজা পথে যাবেন, না হলে অপথে।

ফুলার-চাঁদ।

(২)

সে দিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে চাঁদ দেখছি। দেখ্‌তে দেখ্‌তে মনে হল, আজকের এই চাঁদ যদি ফুলার সাহেব দেখে, তবে বোধ হয় সে

তাই চাঁদ আলো পায়। অথচ লোকে সূর্য্য অপেক্ষা চাঁদকে বেশী ভালবাসে, আদর করে। সেরূপ কর্জ্জন-সূর্য্যের তাপে তপ্ত ও আলোয় আলোকিত ফুলারও ত লোকের সহিত ভাল ব্যবহার করে চাঁদের মত হতে পারে।

শ্রীপাগল।

ফুলার-বদ্যি।

(৩)

রোগ যত পুরাতন হয়, ততই দুশ্চিকিৎস্য ও দুরারোগ্য হইতে থাকে। তখন সামান্য ডাক্তার কিম্বা কবিরাজে সেই রোগ অপনোদন করা দূরে থাকুক, কি রোগ তাহাই নির্ণয় করিতে পারে না। দু এক জনে আন্দাজী মুষ্টিযোগের ব্যবস্থা করে; তাহাতে কোনই ফল হয় না। কিন্তু কোন পাকা বদ্যির হাতে পড়লে বদ্যি বুঝেন—রোগ যত কঠিন, ঔষধও তদনুপাতে কড়া হওয়া চাই। যে গরল এক ফোঁটামাত্র শরীরে যাইলেই মুহূর্ত্তমধ্যে প্রাণবিনাশ হয়, রোগবিশেষে তাহাই অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে।

বাঙ্গালী অনেক দিন যাবৎ গোলামীরোগে ভুগিতেছে। রোগের যাতনায় তাহারা ক্রমশঃ জ্ঞান হারাইতেছিল এবং মৃত্যুপথে অগ্রসর হইতেছিল। এমন সময় কর্জ্জনের হস্তে চিকিৎসার ভার অর্পিত হয়। কিন্তু সার্জ্জন কর্জ্জন রোগনির্ণয়ে সমর্থ হইয়াও তদুপযুক্ত ঔষধের ব্যবস্থা করিতে পারিল না। তাহার সার্জ্জারী-জ্ঞান চেরাচিরির বেশী কুলায় নাই; তাহাতে বড় বেশী ফললাভও হয় নাই। শেষে উপযুক্ত শিষ্যের হস্তে চিকিৎসার ভার ন্যস্ত করিয়া কর্জ্জনকে বিদায় লইতে হইল। এবার সাকরেত ওস্তাদকে পরাস্ত করিয়াছে। ধন্বন্তরীর

বরপুত্র ফুলারবন্থি চিকিৎসার ভার লইয়াই রোগ ঠিক করিয়া ফেলিল। আর কথা কি, যেমন রোগ নির্ণয় করা, অমনি ঔষধের ব্যবস্থা। ধন্বন্তরীর অমোঘ "পাঁচন"—গুর্খাসেনা, পিউনিটিভ পুলিস, স্পেশেল কনষ্টেবল, সার্কুলার এবং রেগুলেশন-লাঠি—প্রযুক্ত হইল। ফল হাতে-হাতেই—প্রয়োগমাত্রেই মোহনিদ্রা অপনোদন এবং সম্পূর্ণ চৈতন্যলাভ।

শ্রীস্বদেশী।

যাদুকর।

(৪)

কালোঘরে আলোকের দীপ্তি ম্লান হইয়া যায় জানিয়া, পাশ্চাত্য যাদুকরেরা (magicians) তাহাদের রঙ্গমঞ্চ (stage) কালবনাতে আবৃত করিয়া দর্শকের দিক মাত্র মুক্ত রাখিয়া দুইটি উজ্জ্বল আলোক দর্শকদিগের চোখের উপর রাখিয়া দেয়। ইহাতে দর্শকদিগের ধন্ধপ্রাপ্ত চক্ষু শুধু বাজিকরকে দেখে, তাহার পশ্চাতে সঙ্গীরা (assistants) তাহাকে যে কি প্রকারে সাহায্য করিয়া একটা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার সংঘটিত করে, তাহা কিছুই দেখিতে বা বুঝিতে পারে না।

আমাদের ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট আজকাল এমনি যাদুকরী নীতিই অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহাদের administration-রূপ রঙ্গমঞ্চ policyর কালরঙে ঢাকিয়া শূন্যবাণী ও মিথ্যা আশারূপ দুইটি বড় উজ্জ্বল আলোক আমাদের চক্ষের সমক্ষে ধরিয়া দিব্য দৃষ্টিবিভ্রম উপস্থিত করিতেছেন। সে আলোকে যাদুকরকে যেন বেশ দেখা যায়,—বুঝা যায় সকল দিকেই সাফাই, কিন্তু পশ্চাতে যে গূঢ় কৌশল লুক্কায়িত থাকে তাহা সঙ্গীরা ছাড়া আর সকলেরই অদৃষ্ট!

প্রভাত।

জগৎ ছাড়িয়া কোথা গিয়াছে বিষাদ,
আনন্দের শিশু শোভে ধরণীর কোলে ;
রবির কিরণ হ'তে ক্ষরিছে প্রসাদ,
তরু' পরে গান-মাখা পাতাগুলি দোলে ;
জগতের শিবকল্পে আঁধার স্বজিয়া
প্রকৃতি বসিয়াছিল চিন্ময়ীর ধ্যানে,
মনোরথ সিদ্ধ বুঝি হয়েছে বলিয়া
প্রভাতের হাসি আজি প্রসন্নবয়ানে !
কে যেন কহিছে ধীরে হ'তে কার্য্যশীল,
কে যেন স্বজিছে মনে মধুর কল্পনা,
আলসে জীবন দিয়া ছুটিছে অনিল,
পলাইছে বিশ্ব হ'তে নরের যাতনা।
প্রাণনাথ, এত হর্ষ গঠেছ যা দিয়া
তাই দিয়া পূর্ণ করে' রাখ এই হিয়া।

শ্রীবেণোয়ারীলাল গোস্বামী।

শিখ-স্বাধীনতা।

(প্রথম প্রস্তাব।)

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

নজিবুদ্দৌলা সেনাপতি সূর্য্যমলকে মরণের কোলে ডালি দিয়া জাঠ-সমরে বিজয়লক্ষ্মী প্রাপ্ত হন। কিন্তু ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে উজীর স্বয়ং পরলোকগত সেনাপতির পুত্রকর্ত্তৃক দিল্লীনগরে অবরুদ্ধ হন, এবং ভরতপুররাজ্যের উত্তরাধিকারী বহুসংখ্যক শিখ ও মারাঠা অনুচরসহ রাজশক্তির প্রতি অঙ্গুষ্ঠপ্রদর্শন করিতে থাকেন। শিরহিন্দ্ হস্তচ্যুত হওয়ায়, আহম্মদশাহকে সপ্তমবার যমুনা উত্তীর্ণ করায় এবং নজিবুদ্দৌলার দুরদৃষ্ট, তাঁহাকে যমুনার নিকটবর্ত্তী স্থানে লইয়া যায়। কিন্তু দিল্লীর অবরোধ উঠাইয়া লওয়া হইলে, আবদালী শিরহিন্দ্ উদ্ধারের কোনওপ্রকার আয়োজন না করিয়াই তাড়াতাড়ি প্রতি-নিবৃত্ত হন। তিনি কেবল নিজ প্রতিনিধিস্বরূপ পাতিয়ালার আল্‌হা-সিংকে উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা স্বীকার করিয়াই সন্তুষ্ট হন। শিখ-ইতিবৃত্তপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, আবদালী এ যাত্রা অক্ষতদেহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিয়াছিলেন না। অমৃতসরের নিকট তাঁহার সহিত শিখগণের এক লোমহর্ষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। যুদ্ধ নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বেই আফগানসেনা দ্রুতগতিতে পলায়ন করে। শিখসৈন্য সহজেই লাহোরের শাসনকর্ত্তা কাবুলিমলকে বিতাড়িত করিয়া, পূর্ব্ব-বৎসরের শিরহিন্দপ্রদেশবণ্টনের ন্যায় জেলাম হইতে সাত্‌লেজ পর্য্যন্ত সমস্ত দেশ, সর্দ্দার ও অনুচরগণমধ্যে বিভাগ করিয়া লইল। অসংখ্য মস্‌জিদ নির্ম্মূল হইল এবং বন্দী আফগান-কর্ত্তৃক ঐ সকল মসজিদের ভিত্তিমূল শুকররক্তে ধৌত করা হইল। অতঃপর সর্দ্দারগণ অমৃতসরে

মিলিত হইয়া নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং নিজেদের মুদ্রা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করেন। মুদ্রায় লিখিত লিপির মর্ম্মানুবাদ এই যে,—"গুরুগোবিন্দ নানকের নিকট হইতে ভেগ্, তেঘ্ এবং ফতেহে প্রাপ্ত হইয়াছেন।"*

ইহার পর দুইবৎসর শিখগণ নিরুপদ্রব ছিল। এই অল্পসময়, তাহারা স্বাধিকারের সীমা এবং নিজ শক্তি ও ক্ষমতানির্দ্ধারণে ব্যয় করে। প্রত্যেক শিখই মুক্ত। কেহই সামান্য বলিয়া বিবেচিত হইত না। সকল শিখেরই উদ্দেশ্য এক ছিল, কিন্তু সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায় একরকম ছিল না; ভিন্ন ভিন্ন দলে ভিন্ন ভিন্ন পন্থা অবলম্বিত হইত। 'শর্‌বৎখাল্‌সা' (শিখজাতি) প্রতিবৎসর রাম-উৎসবের সময় অমৃতসরে একত্রিত হইয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিত। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার ইহাই উৎকৃষ্ট সময়। কারণ, এই সময় বর্ষাঋতুর অবসান হয়, বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা থাকে না। এইরূপ মিলিত হইয়া তাহারা নানারূপ ধর্ম্মকর্ম্মের আয়োজন করিত। তাহার উদ্দেশ্য এই যে, পবিত্র-পুণ্যতীর্থে দেবতাসমক্ষে যে প্রতিজ্ঞা করা যায়, লোকে সে প্রতিজ্ঞা সহসা ভঙ্গ করিতে সাহসী হয় না। সুতরাং নিজের স্বার্থত্যাগ করিয়াও শিখগণকে স্বদেশ ও স্বজাতির কল্যাণকামনায় ব্যাপৃত থাকিতে হইত। এই সম্মিলনাকে 'গুরুমুট্টা' বলা হইত, অর্থাৎ গুরুগোবিন্দের নির্দ্ধারিত পদ্ধতিক্রমে তাহারা উপদেষ্টৃগণের নিকট হইতে জ্ঞান ও উপদেশ লাভার্থে একত্রিত হইয়াছে। এজন্য গুরুমুট্টাশব্দে সাধারণতঃ গুরুর

---

* এই টাকাকে 'গোবিন্দসাহী' মুদ্রা বলা হইত। ভেগ, তেঘ এবং ফতেহের অর্থ—অনুকম্পা, ক্ষমতা এবং দ্রুত-উন্নতি। রণজিৎসিংহের সময়ের মুদ্রায় লিখিত হইত,—"Deg, wuh Tegh, wuh Futhe, wuh nusrut be dirung yaft, uz Nanuk Gooroo Govinda Sinha." কানিংহাম ও ব্রাউনীর ইতিহাস দ্রষ্টব্য।

উপদেশ বুঝাইত। ম্যাল্‌কল্‌ম্‌ এবং ব্রাউন্‌ লিখিয়াছেন যে, গুরুমুট্টা-সভা গোবিন্দের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইত, কিন্তু তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অবশ্য, গোবিন্দের আদেশের ভাবার্থ এবং তৎসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থার পর্য্যালোচনা করিয়া বুঝা যায় যে, গুরুতর কার্য্যনির্ব্বাহকল্পে ঐরূপ ধর্ম্মসভার অধিবেশন শিখবিধিসঙ্গত। এই সভায় যে সকল শিখসর্দ্দার মিলিত হইতেন, তাঁহাদের কেহ কাহারো অধীন হইতেন না এবং প্রত্যেক দলপতির আদেশ তদীয় অনুচরগণ বিনাওজরে পালন করিত। কিন্তু সার্ব্বজনিক আইনস্বরূপ একপ্রকার সামরিক বিধান প্রত্যেক দলের প্রত্যেক ব্যক্তিই অবনতমস্তকে মান্য করিয়া চলিত। সম্মিলিত দলপতিগণ যুদ্ধলব্ধ দ্রব্যসামগ্রী নিজেদের মধ্যে সমান অংশে বিভাগ করিয়া লইতেন। প্রত্যেক বিভিন্ন দলপতি এই অংশ আবার তাঁহাদের নির্দ্ধারিত রীত্যনুযায়ী স্বদলের প্রত্যেকের মধ্যে বণ্টন করিতেন। যে সকল দেশ শিখগণ জয় করিয়াছিল, অথচ প্রকৃতপক্ষে তাহাতে বসবাস করিত না, সেই সকল দেশ হইতে 'রাক্‌খী' (Rakhee) নামক একপ্রকার কর সংগৃহীত হইত। এই কর দ্বারা শিখরা দেশের মোট উৎপন্নের পঞ্চমাংশ হইতে অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত আদায় করিত। মারাঠাগণের 'চৌথের' (চতুর্থাংশ) সহিত ইহার তুলনা হইতে পারে। এই উভয়শব্দেরই ফলিতার্থ—রাজকর বা রাজস্ব (tribute)। অংশ-বণ্টনে প্রাপ্তবস্তুর পরিমাণ সময় সময় এমনি অল্প হইত যে, দুইজন কি তিনজন অথবা দশজন শিখ একগ্রামের মালিক হইত, অথবা এক গ্রামের একটী রাস্তার গৃহকর-আদায়ে স্বত্ববান হইত। বণ্টনের এবম্প্রকার নিয়ম থাকিলেও কার্য্যকালে প্রায়ই তাহার ব্যবহার হইত না। কারণ, শিখগণের ভূমির দখলসম্বন্ধে 'earth-born' বলা হইত এবং অধিকাংশ শিখই এমন ভূমি দখল করিত যে, তাহার

উৰ্দ্ধতন অধিকারী বা দেশের শাসনকর্ত্তার পরিবর্ত্তনসংঘটনের সহিত তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া উঠিত। সুতরাং দেশের শাসনক্ষমতা-পরিবর্ত্তনে এইপ্রকার শিখরা কাহারো প্রজা বা কোন feudal সর্দ্দারের বৃত্তিভোগী হইত না। তাহারা ইচ্ছানুসারে নিজের স্বত্ব হস্তান্তর করিতে পারিত। এমন কি, নিজেই সর্দ্দাররূপে পরিচিত হইয়া খাল্‌সার নামে নূতন ভূমি সংগ্রহ করিতে সক্ষম ছিল। এইরূপ বিধি-ব্যবস্থা আলোচনা করিলে অনুমিত হয় যে, দলপতি বা ক্ষমতাশালি-গণের আজ্ঞা সর্ব্বথা প্রতিপাল্য এবং তাহারা সর্ব্বদা সাধ্যানুসারে অধিকার বাড়াইতে ব্যস্ত। অথচ জাতীয় একতাশক্তির দ্বারা সুরক্ষিত থাকায়, অপরকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা তাহাদের ছিল না। প্রত্যেক শিখেরই ধারণা ছিল যে, তাহারা ঈশ্বরের অনুগৃহীত এবং এই মতাবলম্বী সকলেই প্রাচীন মতানুযায়ী খাল্‌সা (Mystic Khalsa) হইতে স্বতন্ত্র ছিল।

শিখগণ নানা দলে বিভক্ত হইলেও তাহাদের উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষা, প্রয়োজন, সমস্তই এক। প্রয়োজনের সময় তাহারা সকলেই একত্রিত হইয়া গুরুর উপদেশানুযায়ী কার্য্যক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইত। তাহাদের এই যে একতা, বিভিন্নদলের মধ্যে এই যে ঐক্যভাব, এককথায় ইহাকে 'মিশল্'-(misl—সকলেই এক)-নামে অভিহিত করা হইত। মিশ্‌ল আরবী কথা, আরবী 'মাশ্‌লুহাট'শব্দ হইতে উৎপত্তিলাভ করিয়াছে। শেষোক্ত শব্দের অর্থ—সশস্ত্র ও সমরনিপুণ পুরুষ। কানিং-হাম মহোদয় বলেন যে, ভারতবর্ষে মিশ্‌ল অর্থে কাগজের ফাইল বা কোন পদার্থ পর্য্যায়ক্রমে সাজাইয়া রাখা বুঝায়। শিখদের এই মিশ্‌ল একজন সর্দ্দারের আদেশে পরিচালিত হইত। এই দলপতির বিশেষ কোন সংজ্ঞা ছিল না। সামান্য একটী দলের অধিপতি যে অভিধানে অভিহিত হইত, মিশ্‌লের অধিপতিও সেই সামান্য সর্দ্দারপদবীতে

অভিহিত হইতেন। প্রতি গ্রামে বা জেলায় এইরূপ একটী করিয়া মিশ্‌ল ছিল এবং সেই গ্রাম বা জেলা, কিম্বা তাহার প্রথম অধিনেতার নামানুযায়ী, এই সকল মিশ্‌ল অভিহিত হইত। শিখদিগের এইরূপ বারটী মিশ্‌ল ছিল। যথা,—(১) ভাঙ্গী; এই দলের অধিকাংশ শিখই ভাঙ্গনামক মাদকদ্রব্যসেবনে অনুরক্ত ছিল। রাজপুতদিগের মধ্যে যেমন অহিফেনসেবন, ইংরেজগণের মধ্যে যেমন সুরাপান অবাধ-প্রচলিত, এই দলের শিখরাও তেমনি অধিকমাত্রায় ভাঙ্গ সেবন করিত। 'সিদ্ধি খেলে বুদ্ধি বাড়ে' এই প্রবাদবাক্য এতদ্দেশে প্রচলিত থাকিলেও, প্রকৃতপ্রস্তাবে অত্যধিকমাত্রায় ভাঙ্গসেবনে স্বাস্থ্যনাশ ও বুদ্ধিনাশ উভয়ই সংঘটিত হয়। (২) নিশানী; ইহারা পতাকা বহন করিত। (৩) সুহিদ ও নেহাং; ধর্ম্মযুদ্ধে নিহত ও অদ্ভুতকর্ম্মা শিখগণের বংশধরগণ দ্বারা এই দল চালিত হইত। (৪) রামঘরিয়া; অমৃতসরের রামরাওনা (শিখদিগের মতে ইহা ভগবানের দুর্গ) হইতে আখ্যাপ্রাপ্ত। সূত্রধর জসি-কর্ত্তৃক রামরাওনী রামঘর (Fort of the Lord) আখ্যা প্রাপ্ত হয়। (৫) সুকিয়া; লাহোরের দক্ষিণে ঐ নামধেয় একখানি গ্রাম হইতে উদ্ভূত বলিয়া তদ্দেশের নামানুসারে আখ্যাত। (৬) আলুহুলওয়ালায়া; ভবিষ্য শিখ-স্বাধীন রাজ্যের প্রকাশক জসি, যে গ্রামে থাকিয়া তাঁহার মদ্যব্যবসায়ী পিতার কার্য্যে সহায়তা করিতেন, সেই গ্রামের নাম হইতে এই দলের নামকরণ হয়। (৭) ঘুনিয়া বা কুনিয়া; (৮) ফইজুলপুরিয়া বা সিংপুরিয়া; (৯) সুকারচুকিয়া এবং (১০) দুলেল্‌ওয়ালীয়া;—এই চার দলের দলপতির বাসগ্রামের নামানুযায়ী মিশ্‌লের নামকরণ হইয়াছে। (১১) ক্রোরীসিংহীয়া; ইহাদের তৃতীয় দলপতির নামানুসারে অভিহিত। এই দলকে পাঞ্চ্‌গর্‌হীয়াও বলা হইত; শেষোক্ত নামটী তাহাদের প্রথম দলপতির। (১২) পুল্‌কীয়া; আল্‌হাসিংহের বংশীয়গণের

নামানুসারে অভিহিত হইত। কাপ্তেন মারের গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম শিখ-মিশ্‌লের এই পর্য্যায়ক্রম প্রকাশিত হয়। স্যর ডেভিড্ অক্‌টারলনী ব্যতীত অপর কোন লেখক ইহার উল্লেখ করেন নাই। অক্‌টার-লনীর মতে মিশ্‌লশব্দে বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় বা দল না বুঝাইয়া জাতি বুঝাইত।

পুলকীয়া ব্যতীত অপর সমস্ত মিশ্‌ল পাঞ্জাব বা সাতলেজের উত্তর-প্রদেশ হইতে উদ্ভূত হয়। শিরহিন্দ হইতে শিরসা পর্য্যন্ত প্রদেশের সাধারণ সংজ্ঞা 'মালোয়াসিং'। ইহাদের হইতে বিভিন্ন বুঝাইবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত মিশ্‌লের শিখগণকে 'মান্‌ঝাসিং' বলা হইত। ফই-জুলপুরীয়া, আলুহুলওয়ালীয়া এবং রামঘরিয়া দল সর্ব্বপ্রথম মান্‌ঝা হইতে উন্নতির সোপানে আরোহণ করে। কিন্তু ভাঙ্গিগণ শীঘ্র অতিশয় প্রাধান্যলাভ করে এবং তদনুরূপ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে। কুনিয়াগণও প্রায় তাহাদের ন্যায় শক্তিসামর্থ্যশালী হইয়াছিল; ইহারা ফইজুল-পুরীয়াদের এক শাখা মাত্র। মালোয়াতে পুলকীয়াগণ সর্ব্বদাই পাতিয়ালাশাখার প্রাধান্য স্বীকার করিত। আহম্মদশাহ আবদালী-কর্ত্তৃক আলুহাসিং উপাধি দ্বারা সম্মানিত হওয়ায় তাহাদের এই প্রাধান্য। শক্তিসামর্থ্যে ইহারা ভাঙ্গীদের নীচেই পরিগণিত হইত। নিশানীয়া ও সুহিদ দলকে প্রকৃতপ্রস্তাবে মিশ্‌ল বলা যায় না।* সুকিয়ারা কখনও প্রাধান্যলাভে সক্ষম হয় নাই এবং ফইজুলপুরীয়ার শাখা দুলেল্‌ওয়ালীয়া শিরহিন্দ্ অধিকার করিয়াই সন্তুষ্ট ছিল। ইহারা যশঃসম্মানে বঞ্চিত না হইলেও, কখনও অপরের উপর প্রাধান্যবিস্তার করিতে পারে নাই।

ভাঙ্গীদের অধিকার, লাহোর ও অমৃতসরনগরের উত্তর হইতে জেলামনদীর তীর পর্য্যন্ত এবং তৎপর নদীর নিম্নদিক দিয়া বিস্তৃত হয়।

* Vide Cunningham.

কুনিয়াগণ অমৃতসর হইতে গিরিপ্রদেশ পর্য্যন্ত অধিকার করে। সুকার-চুকিয়াগণ ভাঙ্গীদের দক্ষিণে চেনাব হইতে রাভীর মধ্যে অবস্থান করিত। সুকিয়ারা লাহোরের দক্ষিণ-পশ্চিম রাভীর তীর অধিকার করিত। বিয়া এবং সাতলেজের দক্ষিণতীরভাগ ফইজুল্‌পুরীয়াদের অধিকারে ছিল। আলুহলওয়ালীয়ারা পূর্ব্বোক্ত নদীর বামতীরে অবস্থান করিত। তুলেল্‌ওয়ালীরা আপারসাতলেজের দক্ষিণতীর অধিকারে রাখিয়াছিল এবং রামঘরিয়াগণ শেষোক্ত দুইটীর মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বতের দিকের ভূভাগ আয়ত্বাধীন করিয়াছিল। ক্রোরীসিংহীরা জালান্ধার-ধোয়াবে ভূমি প্রাপ্ত হয়। পুলকীয়াগণ সাতলেজের দক্ষিণ সুনাম ও ভুটিণ্ডাগ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানের অধিবাসী। সুহিদ ও নিশানিগণের সম্ভবতঃ কোনও গ্রাম অধিকারে ছিল না। এই দুই মিশ্‌ল, ভাঙ্গী, আলুহলওয়ালীয়া, তুলেল্‌ওয়ালা, রামঘরিয়া এবং ক্রোরী সিংহীয়াদের সহযোগে শির্‌হিন্দ্‌ আক্রমণ করতঃ সাতলেজের দক্ষিণস্থ প্রদেশ এবং ফিরোজপুর হইতে কার্‌নাল্‌ পর্যান্ত গিরিপুঞ্জের নিম্ন-ভাগস্থ ভূভাগ, নিজ নিজ দলে বিভাগ করিয়া লয় এবং তাহাদের সহযোগী পুলকিয়াদিগকে তাহাদের মালোয়ার অধিকারের নিকটবর্ত্তী শির্‌হিন্দ ও দিল্লীর মধ্যস্থিত প্রদেশ প্রদান করে।

শিখসৈন্যের প্রকৃত সংখ্যা এবং প্রত্যেক মিশ্‌লে কত করিয়া সৈন্য ছিল, তাহা ঠিক করিয়া বলিবার উপায় নাই। ১৭৮৩ খৃঃ অব্দে ফর্‌ষ্টার লিখিয়াছেন যে, শিখসৈন্যের সংখ্যা ৩০০,০০০ এবং ব্রাউন প্রায় ঐ সময়েই গণনা করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, ৭৩,০০০ অশ্বারোহী এবং ২৫,০০০ পদাতিক শিখসৈন্য ছিল। অধুনা বিলুপ্ত-প্রায় কাপ্তেন ফ্রাঙ্কিলেনপ্রণীত শাহ-আলমনামক পুস্তকে ২৪৮,০০০ অশ্বারোহী শিখসৈন্যের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। শাহআলমগ্রন্থ, পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থদ্বয় হইতে প্রায় কুড়িবৎসর পরে বিরচিত। ফ্রাঙ্কিলেনের

জীবনচরিত-রচয়িতা জর্জ্জ টমাস্ বলেন, ৬০,০০০ অশ্বারোহী এবং ৫০০০ পদাতিক শিখ ছিল এবং জর্জ্জ টমাসের জীবনী-রচয়িতা বলেন যে, কার্য্যক্ষেত্রে শিখগণ ৬৪,০০০ হাজারের উর্দ্ধসংখ্যক সৈন্যের সাহায্য প্রাপ্ত হইত না।* এইরূপ বিবিধ গ্রন্থকার শিখসৈন্যের বিবিধসংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। শিখসৈন্যসংখ্যার এইরূপ তারতম্য দৃষ্টিগোচর হইলেও ভাঙ্গিগণকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী এবং নুকিয়া ও সুকারচুকিয়াগণকে সর্ব্বনিম্নশ্রেণীর বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ভাঙ্গিদলে প্রায় কুড়িহাজার সৈন্য ছিল এবং তাহাদের অধিকৃত প্রদেশ অতি বিস্তীর্ণ ছিল। শেষোক্ত দলের সৈন্যসংখ্যা মাত্র দ্বিসহস্র এবং যুদ্ধের সময় ইহারও অল্পসংখ্যক সৈন্য উপস্থিত থাকিত। শিখগণের অধিকাংশই দুর্দ্ধর্ষ অশ্বারোহী ছিল। ম্যাচ্লক্-(Match lock)-পরিচালনের দক্ষতার সহিত শিখসেনার দ্রুত উন্নতি সাধিত হইত। এই দক্ষতা, তাহারা না কি, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হয়। তাহাদের হস্তে তীর, সাংঘাতিক অস্ত্ররূপে বিবেচিত হইত। পদাতিকসৈন্য দুর্গাভ্যন্তরে নিযুক্ত থাকিত ও মিশ্‌লের অনুসরণ করিত। এই অনুসরণকারীরা লুণ্ঠনব্যাপারে অশ্ব প্রাপ্ত হইলেই বা লুণ্ঠনলব্ধ অর্থ হইতে অশ্ব ক্রয় করিতে পারিলেই, অশ্বারোহিসৈন্যশ্রেণীভুক্ত হইত। প্রাথমিক শিখগণ কামান ব্যবহার করিত না। শিখগণের মধ্যে অতি ধীরে কামানব্যবহারপ্রথা প্রচলিত হয়। কারণ, ইহাতে অধিক ব্যয় হইত। জর্জ্জ টমাস্ বলেন, ১৮০০ খৃষ্টাব্দে শিখগণের মাত্র ৪০টি কামান ছিল।

পূর্ব্বোক্ত শিখসম্প্রদায় ব্যতীত অপর একশ্রেণীর শিখ ছিল— যাহারা শাসনকর্ত্তার সর্ব্বপ্রকার ক্ষমতার প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শনপূর্ব্বক শিখধর্ম্মের জ্বলন্ত অনুশাসন পালন করিতে তৎপর ছিল। ইহাদিগকে ‘আকালী’ বলিত। আকালীরা স্বয়ং ভগবানের সৈন্য বলিয়া পরিচিত

ছিল, ইহারা নীলবর্ণের পরিচ্ছদে বিভূষিত এবং হস্তে পিত্তলবলয় পরিধান করিয়া গোবিন্দসিংহের অনুরূপ ধর্ম্মপদবীর দাবী করিত। শিখগুরু, শিখমণ্ডলীকে ধর্ম্মরক্ষার্থে সমস্ত পরিত্যাগ করিতে, গার্হস্থ্য-ধর্ম্মে উদাসীন হইয়া সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিতে, উপদেশ দিতেন। আকালীগণ গুরুপদবাচ্য হইবার অভিলাষে গৃহসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সামরিককার্য্যে নিপুণতালাভের চেষ্টা করিত। বিনম্র এবং বিনয়ী আকালীগণ মন্দিরের সামান্য হীনতর কার্য্য পবিত্রতম বোধে সম্পন্ন করিয়া যতিধর্ম্মের সুখানুভব করিত। কিন্তু অপর উৎসাহশীল দুর্দ্ধর্ষ আকালীগণ সময় সময় অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া অমৃতসরের রক্ষক-রূপে দণ্ডায়মান, অথবা অন্ধ আবেগের বশবর্ত্তী হইয়া যত্র-তত্র গমন করিত এবং কখনও বা তরবারির সূক্ষ্মাগ্রভাগে হস্তস্থাপনপূর্ব্বক-ভিক্ষা প্রার্থনা করিয়া প্রাত্যহিক খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করিত। তাহারা কতকটা উপদেষ্টার আসন গ্রহণ করিয়াছিল। কখনও কোন দলপতিই নিজ ত্রুটীর জন্য তাহাদের হস্তে নিগ্রহভোগ করে নাই, তত্রাচ সকল দলপতিই তাহাদিগকে ভয় ও সম্মান করিয়া চলিত। কেহ তাহাদিগকে অপমানিত করিলে বা সাধারণের অনিষ্টা-জনক কোন কার্য্য করিলে, ইহারা অপরাধীর সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া তাহার অপরাধের শাস্তিবিধান করিত। রণজিৎসিংহের প্রভুত্বলাভের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আকালীগণ এবম্প্রকারে তাহাদের অধৈর্য্য চিত্তের চরিতার্থতাসাধন করিয়াছে। রণজিতের ন্যায় ক্ষমতাশালী, বুদ্ধিমান ও সুনিপুণ দলপতিকেও এই দোর্দ্দাণ্ড এবং কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত আকালীগণকে নির্বীর্য্য করিতে প্রভূত প্রয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল।

ম্যাল্‌কল্‌ম্‌মহোদয় লিখিয়াছেন যে, গুরুগোবিন্দকর্ত্তৃক এই আকালী-সম্প্রদায় গঠিত হয়। কিন্তু গোবিন্দের লিখিত কোন বিবরণেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহারা এমন গোঁড়া

ছিল যে, তাহাদের মতে প্রত্যেক শিখই কোন-না-কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে এবং যে গৃহপরিত্যাগ করতঃ চিরসৈনিকবৃত্তি অবলম্বন না করিবে, তাহাকেও কোনপ্রকারে স্বদেশের হিতার্থে কার্য্যে নিযুক্ত হইতে হইবে। এই মতের প্রভাবেই ম্যাল্‌কল্‌ম আকালীগণকে সাতলেজের সমতলক্ষেত্র হইতে কীর্ত্তিপুর পর্য্যন্ত প্রদেশে, এমন কি, দুরধিগম্য গিরিপুঞ্জ মধ্য দিয়াও সৈনিকগণের গমনাগমনের রাস্তানির্ম্মাণ বা পুনঃসংস্কারকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে দেখিয়াছেন। আকালীরা সংসারের সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিত। কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে তাহাদের নিমিত্ত খাদ্য ও পরিধেয় রাখিয়া দিলে, লোকে ধার্ম্মিকরূপে শিখসমাজে সম্মান প্রাপ্ত হইতেন।

তাইমুরলঙ্গের বংশে সম্ভবতঃ ঔরঙ্গজেবই শেষ সম্রাট। তিনি প্রকৃত তেজস্বী শাসকের ন্যায় বিস্তীর্ণ রাজ্যের নানাপ্রান্তের নানা কলকোলাহলের মধ্যেও নির্ভীকতার সহিত শাসনদণ্ডপরিচালন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরবর্ত্তী অধিকাংশ মোগলসম্রাটই নীচ, স্বার্থপর, ঈর্ষান্বিত মন্ত্রীর ক্রীড়াপুত্তলীবৎ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া নামসর্ব্বস্ব রাজ্যশাসন করিতেন। এই সময়ের মধ্যে লক্ষ্ণৌ, হায়দরাবাদ ও বঙ্গদেশে পৃথক্ মোসলমানরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ তত্তৎ স্থানের মোসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ দিল্লীর সম্রাটের অধীনতা অস্বীকার করেন। ১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে বাজীরাও-পেশোয়া সশস্ত্রে দিল্লীনগরে উপনীত হইয়া ভারতের মোসলমান-ভাগ্যবিধাতাকে সন্ত্রাসিত করেন। রোহিলখণ্ডের আফগান ঔপনিবেশিক ও ভরতপুরের হিন্দুজাঠগণ শক্তিসঞ্চয় করতঃ মস্তকোত্তলন করে, এবং যখন পারস্যের বিজয়ী অধিনেতা দিল্লীর বহুমূল্য ধনরত্নাদি লইয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন, তখন মোসলমান-শাসনক্ষমতা সমূহ সঙ্কুচিত, সমাজ একান্ত বিশৃঙ্খলিত।

এই সময়ে অপর একটী সম্প্রদায় প্রাধান্যলাভের অবসর অন্বেষণ করিতেছিল। আবদুলসামুদ এবং তাহার হীনবল উত্তরাধিকারী খাঁবাহাদুর জিকারিয়াখাঁর (Tukareea Khan) শাসনকালে শিখগণ স্ব স্ব পল্লীতে নিরুদ্বেগে বসবাস করিতেছিল ; কখনও কখনও জীবিকা-নির্ব্বাহের নিমিত্ত বন-জঙ্গলে বা উপত্যকায় দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিত মাত্র। কিন্তু তাহা হইলেও গুরু নানক ও গোবিন্দের উদ্দীপনাপূর্ণ উপদেশ তাহাদের হৃদয় হইতে উৎপাটিত হয় নাই। কৃষক ও শিল্পিগণ অতি গোপনে তাঁহাদের উপদেশ আলোচনা করিত এবং কথঞ্চিৎ উন্নত শিখগণ অতি আগ্রহের সহিত দ্রুত উন্নতির আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিত।

নাদীরসাহের অভিযানসময়ে শিখগণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়। পারসিক সৈনিকগণের লুণ্ঠিত ধনরত্নাদি এবং বিজেতার আবির্ভাবে গিরিকান্তারে পলায়নপর ভীতিবিহ্বল অধিবাসিবৃন্দের ধনসম্পত্তি, শিখগণ লুণ্ঠন করিতে থাকে। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লুণ্ঠনব্যাপারে কৃতকার্য্য হইয়া তাহারা বৃহত্তর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে সাহসী হইল। শিখগণ ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করিয়া প্রকাশ্যে অমৃতসরে যাইতে লাগিল। ইতঃপূর্ব্বে তাহারা গোপনে অমৃতসরের মন্দির দর্শন করিতে যাইত। একজন মোসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, এই সময় হইতে শিখ অশ্বারোহিগণ দ্রুতগতিতে অশ্বচালনা করিয়া পবিত্র মন্দিরে পূজার্চ্চনা করিতে যাইত। পথিমধ্যে কেহ ধৃত, কেহ হত হইলেও তাহাদের কেহই ভয়ে তীর্থযাত্রা হইতে বিরত থাকিত না। জিকারিয়া-খাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র জিহিয়াখাঁ (Yehya Khan) এই সময় পাঞ্জাবের শাসন-কর্ত্তা ছিলেন। শিখগণ ক্রমে রাভীনদীতীরে ভুলেল্‌ওয়ালনামক স্থানে একটী ক্ষুদ্র দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া লাহোরের উত্তরপ্রান্তস্থিত এমিনাবাদ-নামক স্থানের চতুঃপার্শ্ব হইতে কর আদায় করিতে আরম্ভ করিল।

একদল রাজসৈন্ত শিখকরগ্রাহিগণকে আক্রমণ করে, কিন্তু পরাজিত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়। এই আহবে রাজসেনাপতি নিধন প্রাপ্ত হন। জিহিয়াখাঁ পরাজয়বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুনরায় একদল বীর্য্যশালী সেনা প্রেরণ করেন। এইবার শিখগণ পরাজিত হয়। অনেকে বন্দী হইয়া লাহোরে নীত হয়। যে স্থানে এই বন্দী শিখ-গণের বধক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহা 'সুহিদগঞ্জ' (place of martyrs) নামে পরিচিত। ভাই তারুসিংহও এই স্থানে সমাধিস্থ হন। তারু মস্তকের কেশকর্ত্তন ও মতপরিবর্ত্তন করিতে আদিষ্ট হন। কিন্তু গুরুগোবিন্দের এই প্রবীণ শিষ্য সে আদেশ প্রতিপালন না করায়, মোসলমানশাসনকর্ত্তার আদেশে সুহিদগঞ্জে ধরণীর শীতল ক্রোড়ে আশ্রয় প্রাপ্ত হন। মৃত্যুসময়ে তারু বলিয়াছিলেন যে, কেশ, মস্তকের ত্বক ও খুলি পরস্পর অবিচ্ছেদ্যসম্বন্ধে বিজড়িত মানুষের মস্তক প্রাণের সহিত একসূত্রে গ্রথিত। সুতরাং প্রজাপীড়ক শাসন-কর্ত্তার অবৈধ আদেশ পালন না করায় তাঁহাকে যে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইতেছে, তজ্জন্য তিনি বিন্দুমাত্রও দুঃখিত নন্।

জিকারিয়াখাঁর মৃত্যুর পর লাহোরের প্রতিনিধিত্ব লইয়া তাঁহার দুই পুত্রের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। কনিষ্ঠ শাহনোয়াজখাঁ জ্যেষ্ঠকে বিতাড়িত করতঃ লাহোরের শাসনক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং নিজের ক্ষমতা অপ্রতিহত করিবার আশায় আহাম্মদ শাহ আবদালীকে আহ্বান করেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দের জুনমাসে নাদির-শাহ নিহত হইলে আবদালী আফগানিস্থানের অধিপতি হন। দুর্‌রাণীরাজ মধ্যএসিয়ার শ্রমনিপুণ, কষ্টসহিষ্ণু জাতি হইতে নিজের আবশ্যকমত সৈন্যাদি সংগ্রহ করিয়া অপরিসীম উচ্চাকাঙ্ক্ষাচরিতার্থের উপযুক্ত স্থান ভারতের দিকে তৃষিতভাবে চাহিয়াছিলেন। এমন সময়ে লাহোরের শাসনকর্ত্তার আহ্বান এবং দিল্লী হইতে তাঁহার

চিরবৈরী নাদিরশাহের কাবুলের পলাতক শাসনকর্ত্তার নিমন্ত্রণ, আবদালীর নিকট মাহেন্দ্রক্ষণ বলিয়া প্রতীয়মান হইল। আবদালী সসৈন্যে সিন্ধুনদীর অতিক্রম করিলেন। কিন্তু লাহোরের জবরদস্ত শাসনকর্ত্তা নোয়াজ, আবদালীর রাজদ্রোহিতায় বিচলিত হইয়া তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিবার কল্পনা পরিত্যাগ করিলেন এবং সিন্ধুতীরে উত্তীর্ণ হইবামাত্র আফগানসৈন্যের গতিরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তাঁহার বাসনা পরিতৃপ্ত হইল না। আফগান-হস্তে নোয়াজ পরাজিত হইলেন, আবদালী পাঞ্জাবের অধিপতি হইলেন। আবদালী শিরহিন্দ্ পর্য্যন্ত পলায়িত নোয়াজের পশ্চাদ্ধাবন করেন। তথায় হতবীর্য্য মোসলমানসাম্রাজ্যের উজীরের সহিত নোয়াজ মিলিত হন। এখানে অনেকগুলি খণ্ডযুদ্ধ এবং একটী বৃহৎ সমরাভিনয়ের পর আবদালীর অদৃষ্ট অপ্রসন্ন হইল, তিনি তাড়াতাড়ি পাঞ্জাব হইতে পলায়নপর হইলেন। তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন-কালে সতর্ক শিখগণ তাঁহার পার্শ্বদেশ আক্রমণ করিয়া নিজ শক্তির পরিচয় প্রদান করে। পূর্ব্বোক্ত যুদ্ধে দিল্লীর উজীর এক গোলার আঘাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, কিন্তু তাঁহার পুত্র মীরমোন্নু অমিত বিক্রম ও বিপুল তেজস্বিতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনিই পরে মায়েন-উল্-মুলুক্ উপাধি ধারণ করিয়া লাহোর ও মুলতানের শাসন-দণ্ড পরিগ্রহ করেন।*

এই নবশাসনকর্ত্তা অতি ক্ষমতাশালী ও তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তিনি প্রভুর কার্য্যসাধন অপেক্ষা নিজের স্বার্থসাধনেই বিশেষ তৎপর ছিলেন। তিনি কাহাকেও বিশ্বাস করিতেন না। তাঁহার অধীনে দুইজন বিচক্ষণ ব্যক্তি শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল।

---

* Elphinstone, ii, p. 285.

সহকারিস্বরূপে কোরামল এবং জালান্ধারপ্রদেশের কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপে আদিনাবেগ নিযুক্ত হন। প্রথমোক্ত ব্যক্তি নানকের অনুচর ছিলেন; কিন্তু গোবিন্দের উপদেশগ্রহণ বা তাঁহার বশ্যতাস্বীকার করিতেন না। এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি, নাদিরশাহের প্রস্থানের পর জিকারিয়াখাঁ কর্ত্তৃক শিখদমনোদ্দেশ্যে দোয়াবপ্রদেশের কার্য্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তাঁহারা উভয়েই কিয়দ্দিবস বিচক্ষণতার সহিত শিখগণের সঙ্গে ব্যবহার করেন। আহাম্মদশাহের অভিযানসময়ে শিখগণ অমৃতসরের নিকটবর্ত্তী রামরাউনীতে একটী দুর্গ প্রতিষ্ঠিত করে এবং মদ্যব্যবসায়ী জোসিসিংকুলাল নামক তাহাদের এক সাহসী অধিনেতা স্বাধীনভাবে প্রচার করেন যে, এই প্রদেশে 'দাল,' 'খালসা' বা 'সিং' ইহাদের কাহারো দ্বারা একটী নূতন ক্ষমতা জন্মলাভ করিবে। মীরমোন্নু নিজের অবস্থা নিরাপদ করিয়াই এই বিদ্রোহ দমন করিতে যাত্রা করেন এবং তাহাদের দুর্গ অবরোধ করতঃ বিদ্রোহী শিখসৈন্যকে বিদূরিত করিয়া শান্তিসংস্থাপনের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আফগানগণের দ্বিতীয়বার আগমনসংবাদে তাঁহার পূর্ব্বোক্তরূপ বিধিব্যবস্থা এবং শৃঙ্খলাকার্য্য অপরিসমাপ্ত রহিয়া গেল। মোন্নু এই বিপদবিনাশের নিমিত্ত চেনাবপ্রদেশে অগ্রসর হইলেন এবং নানারূপ প্রতিশ্রুতি করিয়া ও প্রলোভন দেখাইয়া, দুর্‌রাণী-শিবিরে নিজ প্রতিনিধি প্রেরণ করিলেন। আহাম্মদশাহ যুবকের সামর্থ্যের প্রতি আস্থাবান ছিলেন। কারণ, ইতঃপূর্ব্বে যুবকের বীরত্বেই তিনি শিরহিন্দপ্রদেশ হইতে বিতাড়িত হন। নাদিরশাহ মোগলসম্রাটের নিকট হইতে সিন্দ্‌ ও কাবুলপ্রদেশ এবং জেলামনদীর তীরবর্ত্তী লাহোরের অন্তর্গত চারিটি জেলা প্রাপ্ত হন। আহম্মদশাহ বিপুল করপ্রাপ্তির আশায় এই সকল প্রদেশে যাইতে অভিলাষ করিলেন। তিনি নাদিরশাহের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন এবং

তজ্জন্যই তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যে, এই সকল প্রদেশে তিনি বিপুল ধনরত্ন সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

এই সকল সামান্য সামান্য বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করায়, মীরমোন্নু দিল্লী হইতে প্রশংসা প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু তিনি এতদিন যে কামবৃক্ষ হৃদয়ে বর্দ্ধন করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহার সেই চিরাভীপ্সিত কামতরুর মূলদেশে উজীর সাফ্‌দারজঙ্গ-কর্ত্তৃক ভীষণ কুঠারাঘাত হইল। মোন্নুর ক্ষমতাহ্রাসের নিমিত্ত উজীরসাহেব মুলতানের শাসনভার তাঁহার হস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া তাঁহারই নিয়োজিত লাহোরের প্রতিনিধি শাহানোয়াজখাঁর প্রতি ন্যস্ত করিলেন। কিন্তু মোন্নু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহেন, রাজক্ষমতা ও স্বশক্তিসামর্থ্যের বিষয়ে তাঁহার সূক্ষ্মধারণা ছিল। তিনি তদীয় সহকারী কোরামলকে, নবনিয়োজিত শাসনকর্ত্তাকে বিধ্বস্ত করিতে প্রেরণ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নোয়াজ জিকারিয়াখাঁর কনিষ্ঠপুত্র। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদিরশাহ যখন সিন্দ্‌নগরে প্রবেশ করেন, নোয়াজ তখন উক্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তা। নাদিরশাহের নিকট তিনি বশ্যতাস্বীকার করায়, পারস্যের বিজয়ী অধিনেতা তাঁহাকে 'শাহানোয়াজখাঁ' উপাধিতে বিভূষিত করেন। তাঁহার আসল নাম হিয়াতুল্লাখাঁ। যাহা হউক, মোন্নুর প্রেরিত কোরামলের হস্তে শাহানোয়াজ পরাজিত ও নিবৃত্ত হইলে, বিজয়দৃপ্ত মোন্নু তদীয় সহচরকে 'মহারাজা' উপাধি প্রদান করেন। দিল্লীর রাজাজ্ঞার প্রতি এবম্প্রকার অবজ্ঞাপ্রকাশ করিয়া এবং শিখগণকে দমন করিয়া, মোন্নুর হৃদয়ে আবার পূর্ব্বের উচ্চাশা জাগরিত হইল এবং তৎসঙ্গে আবদালীকে করপ্রদানের প্রতিশ্রুতিও বিস্মৃত হইলেন। কিছুকাল পরে আবদালী কর চাহিলে, মোন্নু সমস্ত বকেয়া পরিশোধ করিলেন সত্য, কিন্তু এই ব্যাপারে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের বিশ্বাস সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইল। কাজেই আফগানরাজ পুনরায় লাহোর

অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মোন্নু প্রথমতঃ বিপক্ষের সহিত সম্মুখ-সমরে সাক্ষাৎ করিবার ভাব দেখাইয়া, পরে নগরের প্রাচীরনিম্নে পরিখামধ্যে আশ্রয়গ্রহণ করেন। তিনি আত্মরক্ষায় রীতিমত যত্ন করিলে, সম্ভবতঃ সেবার আবদালীর ধ্বংসক্রিয়া নিষ্পন্ন হইত। কিন্তু মোন্নু চারিমাস অবরোধের পর একবার শক্তিপরীক্ষায় কৃতসংকল্প হইলেন। ইহাতে কোরামল অনন্তনিদ্রায় অভিভূত এবং আদীনাবেগ কোনওপ্রকারে পলায়নে সমর্থ হন। এভাবে দীর্ঘকাল বিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করা তাঁহার পক্ষে মঙ্গলজনক নহে বিবেচনা করিয়া, মোন্নু দুর্গে আশ্রয় লইয়া সমরসজ্জা পরিত্যাগ করিলেন। বিজয়ী শাহ এই আত্মসমর্পণে অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন এবং বিপুল ধনরত্ন হস্তগত করিয়া লাহোর ও মুলতান স্বরাজ্যের অন্তর্গত করিলেন। তিনি সেনাপতির অনুরূপ তেজস্বিতা এবং প্রতিনিধির যোগ্য কার্য্যদক্ষতার নিমিত্ত মোন্নুর ভূয়সি প্রশংসা করিয়া নবকরায়ত্ত প্রদেশের কর্তৃত্বভার তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত রাখিলেন। শাহ অতঃপর কাশ্মীরও স্বরাজ্যভুক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। *

বৈদেশিক-কর্ত্তৃক দ্বিতীয়বার লাহোর আক্রান্ত হওয়ায় দেশের শাসনসংরক্ষণের ব্যবস্থা শিথিল হইয়া পড়ে। এই অবসরে শিখগণ উন্নতির আকাঙ্ক্ষায় পুনরায় বিদ্রোহভাবাপন্ন হয়। আদীনাবেগ লাহোরের ব্যাপারে অকৃতকার্য্য হইয়া কর্ত্তৃপক্ষের নিকট যে একটু অপদস্থ ছিলেন, তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভের আশায় তিনি বিদ্রোহী শিখগণের সহিত সময়োপযোগী ব্যবহার করিতে মনস্থ করিলেন। শিখগণ তাহাদের স্বদেশ অমৃতসর হইতে গিরিপ্রান্ত পর্য্যন্ত একরকম স্বাধিকারে রাখিয়াছিল। আদীনাবেগ একদা 'মাখোয়াল'-উৎসবের

* Murray's Runjit Sinh, p. 10.

দিন শিখগণ যখন আমোদ-আহ্লাদে নিমগ্ন, সেই সময় তাহাদের উপর পতিত হইয়া তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। তত্রাচ আদীনাবেগ শিখগণের বন্ধুরূপে পরিচয় দিতে প্রয়াস পাইলেন এবং তাহাদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন যে, তাহাদের দেয় খাজানা নামমাত্র বা সামান্যমাত্র নির্দ্ধারিত হইবে এবং অপরের নিকট তাহাদের যাহা প্রাপ্য তাহার পরিমাণ সঙ্গত বা রীত্যনুযায়ী হইবে। বেগ তাহাদের অনেককে নির্দ্দিষ্টবেতনে নিজের অধীনে নিযুক্ত করিলেন। ইহাদের একজনের নাম জসিসিং; ইনি সূত্রধর ছিলেন, পরে একজন প্রবীণ সর্দ্দারমধ্যে পরিগণিত হন।

মীরমোন্নু আবদালীর অধীনে নূতনভাবে শক্তিসঞ্চয়ের অল্প-দিনের মধ্যেই কালগ্রাসে পতিত হন। তাঁহার বিধবা পত্নী নাবালক পুত্রের অভিভাবিকাস্বরূপ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিতা হইবার এবং দিল্লী-দরবার ও দুর্‌রাণীরাজের নিকট উভয়স্থানেই প্রতিষ্ঠিতা হইবার চেষ্টা করেন। তিনি উভয়রাজের নিকটই বশ্যতা স্বীকার করেন এবং ডেকানের প্রথম নিজামের পৌত্র গাজীউদ্দীনের (অপর নাম সাহাবুদ্দীন) সহিত স্বীয় দুহিতার বিবাহ দেন। এই সময় পাঞ্জাব কিছুকাল আদীনাবেগের শাসনাধীন থাকে, কিন্তু অনতিকাল পরে আবদালী পুনঃপ্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তাহা তাঁহার নিজের করিয়া লন। দুর্‌রাণীরাজ ১৭৫৫খৃঃ অব্দের শীতঋতুতে জেহানখাঁনামক সর্দ্দারের অভিভাবকতায় পুত্র তাইমুরকে রাখিয়া লাহোর পরিত্যাগ করেন।

যুবরাজ তাইমুরের প্রথম উদ্দেশ্য ছিল, বিদ্রোহী শিখগণকে সম্পূর্ণ-রূপে বিধ্বস্ত করা এবং লাহোর-উদ্ধার-ব্যাপারে দিল্লীর মন্ত্রীর সহায়তা করার অপরাধে আদীনাবেগকে দণ্ডিত করা। সূত্রধর জসি অমৃত-সরের রামরাউনী পুনরুদ্ধার করিয়াছিল, কাজেই ঐ স্থান আক্রান্ত হইল। দুর্গ ভূমিসাৎ হইল, প্রাসাদ বিনষ্ট হইল এবং শিখদিগের

পবিত্র জলাশয় পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনারাশিতে পরিপূর্ণ হইল। আদীনাবেগ যুবরাজকে বিশ্বাস করিতেন না, তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া গিরিপ্রদেশে আত্মগোপন করিয়া প্রতিহিংসার নিমিত্ত শিখগণকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। গুরুগোবিন্দের উপদেশ স্মরণ করিয়া নানা গ্রামের শিখ একত্রিত হইল। লাহোরের চতুঃপার্শ্বস্থ প্রদেশে আবার শিখ অশ্বারোহী ছড়াইয়া পড়িল। যুবরাজ ও তাঁহার অভিভাবক এই বিক্ষিপ্ত শিখসৈন্যগণকে দমনকল্পে পুনঃ-পুনঃ ব্যর্থমনোরথ হইয়া চেনাবপ্রদেশে প্রস্থান করা সঙ্গত বিবেচনা করিলেন। লাহোর কিছুদিনের জন্য বিজয়ী শিখগণের হস্তে থাকিল। জসিসিং সেই পূর্ব্বপ্রচারিত উক্তি—'খালসা' (Khalsa) * একটী স্বতন্ত্ররাজ্যরূপে পরিণত এবং সৈন্যসম্ভারে সমৃদ্ধিশালী হইবে,—তাহার সার্থকতা প্রদান করিলেন। মোগল-টাকশালে তিনি ইচ্ছানুরূপ মুদ্রা মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিলেন: টাকার একদিকে লেখা থাকিত, "আমাদের রাজ্য যাহা জসিকুলাল-কর্ত্তৃক বিজিত, তথা হইতে 'খালসা'র অনুগ্রহে মুদ্রিত হইল।" †

নজিবুদ্দৌলা এই সময় নিজ দক্ষতা এবং আবদালীর এজেণ্টস্বরূপে দিল্লীর দরবারে প্রভূত ক্ষমতাশালী হইয়াছিলেন। দিল্লীর মন্ত্রী ইহাতে ঈর্ষান্বিত হইয়া তাঁহার ক্ষমতাহ্রাসের নিমিত্ত মারাঠাগণকে আহ্বান

---

* "Khalsa, or Khalisa, is of Arabic derivation, and has such original or secondary meanings, as pure, special, free, &c. It is commonly used in India to denote the immediate territories of any chief or state as distinguished from the lands of tributaries and feudal followers. Khalsa can thus be held either to denote the kingdom of Govind, or that the Sikhs are the chosen people." Cunningham.

† Compare Browne, Tracts ii., 19.
Malcolm Sketch, p. 93.

করিলেন। নজিবুদ্দৌলা সহজেই পেশোয়ার ভ্রাতা রাঘোবাজীকে অগ্রসর হইতে প্রবৃত্ত করাইলেন। এমতে দিল্লী মারাঠাকবলে কবলিত হইল এবং নজিবুদ্দৌলা অতি কষ্টে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। অন্যের সাহায্যব্যতিরেকে কেবল শিখদিগের অনুগ্রহে পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তৃপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার শক্তি নাই দেখিয়া, আদীনাবেগ মারাঠাগণের হস্ত ইণ্ডাস্ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইবার সম্মতি-জ্ঞাপন করিলেন। আদীনাবেগ শিখ-অনুচরগণসহ রাঘোবাজীর সঙ্গে যমুনাতীর হইতে যাত্রা করিলেন। আবদালীর শিরহিন্দের শাসনকর্ত্তা বিতাড়িত হইল। কিন্তু সহরের লুণ্ঠনব্যাপারে মারাঠাগণকে অংশ না দেওয়ায়, বেহারে শিখবন্ধুগণের সহিত মারাঠাগণের মনোমালিন্য উপস্থিত হইল। দুইপুরুষ হইতে এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকায় শিখগণেরা ধারণা হইয়াছিল, একার্য্য কেবল তাহাদেরই একচেটিয়া। অতঃপর শিখগণ লাহোর পরিত্যাগ করিল, কয়েকটী আফগানসেনানিবাস উঠিয়া গেল। মারাঠাগণ মুলতান এবং আটোক (Attok) অধিকার করিয়া লইল। আদানা পাঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা হইয়াই থাকিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ স্বাধীন হইবার যে বাসনা তিনি হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, তাহা আর পূর্ণ হইল না। কারণ, ইহার কয়েক মাস পরেই ১৭৫৮ খৃঃ অব্দে তিনি ধরণীর পবিত্র ক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হইলেন। মারাঠাগণ ভাবিলেন, সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁহাদের পদতলে। এবং তদনুসারে নজিবুদ্দৌলার সহিত উভয়পক্ষের মঙ্গলকর দুইটী পরামর্শ স্থির করিলেন—অযোধ্যা-অধিকার এবং রোহিলা-নির্ব্বাসন। কিন্তু পাঞ্জাব হস্তচ্যুত হওয়ায় আবদালী দ্বিতীয়বার যমুনাতীরে দেখা দিয়া, মারাঠাগণের প্রভুত্বের যুদ্ধ-স্বপ্ন চিরদিনের তরে ভাঙ্গিয়া দিলেন।

দুর্‌রাণীরাজ বেলুচিস্থান হইতে যাত্রা করিয়া পেশোয়ার, পাঞ্জাব,

মুলতান, লাহোর-প্রভৃতি নানাস্থানের বিদ্রোহ প্রশমন করেন। তৎপর ১৭৬১ খৃঃ অব্দে পানিপথের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া পেশোয়া এবং মারাঠা উভয়েরই উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করতঃ শিরহিন্দ্ ও লাহোরে প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়া কাবুলে প্রত্যাগমন করেন। শেষোক্ত যুদ্ধের সময় শিখগণ লুণ্ঠনমানসে শ্যেনদৃষ্টিতে দুররাণী-সৈন্যের চারিদিকে নিযুক্ত ছিল। রীতিমত শাসনসংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা না থাকায় তাহাদের শক্তি বর্দ্ধিত হয় এবং শিখগণ কেবল যে তাহাদের স্বগ্রামে প্রভুত্ব করিত তাহা নহে; আগন্তুক বা নবসম্প্রদায়কে দমন করিবার অভিপ্রায়ে তাহারা এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেও আরম্ভ করে। রণজিৎসিংহের পিতামহ স্বরৎসিংহ লাহোরের উত্তরে তাঁহার স্ত্রীর পিত্রালয় গুজরানোয়ালা (Goojranwala) গ্রামে এইপ্রকার একটী সংস্থান নির্ম্মাণ করেন। ১৭৬২ * খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে দুর্‌রাণী-শাসনকর্ত্তা খোজা ওবেইদ উক্ত দুর্গটি ভূমিসাৎ করিতে যাত্রা করেন। তৎসংবাদ অবগত হইয়া শিখগণ একত্রিত হয় এবং আফগান শাসনকর্ত্তাকে এমনি শিক্ষা প্রদান করে যে, তিনি সঙ্গের জিনিষপত্র সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া প্রাণভয়ে লাহোরের প্রাচীরাভ্যন্তরে পলায়ন করিতে বাধ্য হন। শিরহিন্দের শাসনকর্ত্তা, মালের্ কোট্‌লা (Malerh Kotla) গ্রামের হিঙ্গনখাঁনামক এক মোসলমাননেতার সাহায্যে একরূপ স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতেছিলেন। কিন্তু ভারতীয় পাঠানের পক্ষে এইরূপ বিদ্রোহিতা, শিখগণের নিকট সমীচীন বোধ

---

* "Murray makes Kwaja Obeid the governor, and he may have succeeded or represented Boolund Khan, whom other accounts shew to have occasionally resided at Rhotas. Goojranwala is the more common, if less ancient, form of the name of the village attacked. It was also the place of Runjeet Sinha's birth, and is now a fair sized and thriving town."—J. Cunningham.

হইল না। 'খাল্‌সা'সৈন্ত অমৃতসরে সম্মিলিত হইল, তথায় সকলে পবিত্র জলাশয়ে অবগাহন করিয়া প্রথম 'গুরুমুট্টা'-(Gooroomutta) -সভার আহ্বান করে। সভায় কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হইল।

কিন্তু পরামর্শানুযায়ী কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই ১৭৬২ খৃঃ অব্দের শেষভাগে আবদালী পুনরায় লাহোরে উপনীত হইলেন। যাহারা শির্‌হিন্দের পার্শ্বে সচকিত ছিল, সম্ভবতঃ তাহাদের সহিত মিলিত হইবার অভিপ্রায়ে, শিখগণ সাতলেজের দক্ষিণদিকে প্রস্থান করিল। তাহাদের এই প্রস্থানের আর একটী উদ্দেশ্য, আবদালীর সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার শাসনকর্ত্তা জেইনখাঁকে পরাজিত করা। শিখগণ জেইনখাঁকে আক্রমণ করিবে, এমন সময়, আবদালী অতি দ্রুতগতিতে লাহোর হইতে লুধিয়ানার পথে তথায় উপনীত হইলেন। উভয়পক্ষের রণদামামা বাজিয়া উঠিল, শিখগণ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইল। মোসলমানগণ যেরূপ দক্ষতার সহিত সমরক্রিয়া সম্পন্ন করিল, তেমনি নিপুণতার সহিত আবার তাহাদের পশ্চাদনুশরণ করিল। এই যুদ্ধক্ষেত্র অদ্যাপি 'ঘুলুঘর'-(বিপদক্ষেত্র) -নামে পরিচিত। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই আহবে বার হইতে পঁচিশহাজার শিখসৈন্ত প্রাণত্যাগ করে। * শত্রুহস্তে যে সকল শিখ বন্দী হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে পাতিয়ালার বর্ত্তমান রাজপরিবারের পূর্ব্বপুরুষ আল্‌হাসিং ছিলেন। তাঁহার বীরোচিত আকৃতি সন্দর্শন করিয়া বিজেতা অতিশয় প্রীত হন এবং তাঁহাকে একটী রাজ্যের অধিপতি করতঃ নানারূপে পুরস্কৃত করিয়া অব্যাহতি

---

* "The scene of the fight lay between Goojerwala and Bernala, perhaps twenty miles south from Loodiana. Hinghon Khan, of Malirh Kotla, seems to have guided the Shah."—Ibid এই যুদ্ধ সম্ভবতঃ ১৭৬২ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সংঘটিত হয়।

দেন। বন্দীর প্রতি এইরূপ সদ্ব্যবহারের মূলে আবদালীর ভেদনীতি বিদ্যমান ছিল। 'মালোয়া সিং' এবং 'মানঝিয়া সিং' এই দুই সিং-সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ বাধাইয়া দেওয়া আবদালীর অভিপ্রায় ছিল। অতঃপর তিনি শিরহিন্দে তাঁহার আজ্ঞাধীন মিত্র নজিবুদ্দৌলার সহিত সাক্ষাৎ করতঃ লাহোরের কাবুলিমলনামক এক হিন্দু শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করিয়া কান্দাহারপ্রদেশের বিদ্রোহ দমন করিতে প্রস্থান করিলেন। কিন্তু তিনি সর্ব্বপ্রথম অমৃতসরে শিখগণের পুনঃনির্ম্মিত পবিত্র মন্দির ধ্বংস করিয়া, তাহাদের পবিত্র জলাশয়ে গোহত্যা করতঃ উহার পবিত্রতা বিনষ্ট করিয়া, অবিশ্বাসী বিদ্রোহিগণের তপ্তরক্তে মস্‌জিদের গাত্র ধৌত করিয়া এবং নিহত শত্রুর মস্তকদ্বারা পিরামিডের সংখ্যা বর্দ্ধিত করিয়া, তিনি তাঁহার গাত্রদাহ নির্ব্বাণ করেন।*

আবদালী এবম্প্রকার অমানুষিক অত্যাচার করিলেও শিখগণ নিরুৎসাহ হইল না, প্রত্যহই তাহাদের সংখ্যাধিক্য হইতে লাগিল। তাহাদের সকলের মনেই একটা ধারণা বদ্ধমূল হইল যে, তাহারা উন্নতির সোপানে আরোহণ করিতেছে এবং সকলেই প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার নিমিত্ত বদ্ধপরিকর হইল। শিখদলপতিগণ সাম্রাজ্য ও যশের আশায় উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। এমতে তাহাদের সম্মিলিত তরবারির প্রথম আঘাত পাঠান উপনিবেশ কুস্‌সুরের (Kussoor) উপর পতিত হইল। শিখসৈন্য উক্ত স্থান বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠন করিয়া তাহাদের পুরাতন আততায়ী মালের্‌কোট্‌লার হিঙ্গনখাঁকে নিহত করিল। তৎপর তাহারা শিরহিন্দ্ (Sirhind) অভিমুখে যাত্রা করিল। দিল্লীদরবারের ক্ষীণহস্ত মোস্লেমের সাহায্যার্থে উঠিতেই সক্ষম হইল না। আফগানশাসনকর্ত্তা জিয়েনখাঁ ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর

* Vide Forster, Vol. i., p. 320.

মাসে প্রায় চল্লিশহাজার শিখসৈন্তের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধ করিবার পর তিনি পরাজিত ও নিহত হন। সাত্‌লেজ হইতে যমুনাতীর পর্য্যন্ত শিরহিন্দের সমুদয় ভূভাগ বিজয়ী শিখগণের করতলগত হইল। যুদ্ধাবসানে শিখসৈন্য অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া পল্লীর পর পল্লী কি ভাবে অতিক্রান্ত হইয়া তাহাদের পূর্ণাধিকার জানাইয়াছিল, তাহা জনশ্রুতিমুখে আজিও শ্রুত হওয়া যায়। সমস্ত গ্রাম যে তাহাদের নিজের হইয়াছে, এখন যে তাহারা স্বাধীন, তাহা জানাইবার জন্য শিখ অশ্বারোহী দিবারাত্রি অশ্বপৃষ্ঠে থাকিয়া গাত্রবস্ত্র, উষ্ণীষ, কোমরবন্ধ, তরবারি প্রভৃতি, পরিধানের একখানি সামান্য বস্ত্র ব্যতীত, একে একে সমস্ত জিনিষ পল্লীতে-পল্লীতে স্বাধীনতার চিহ্নস্বরূপ বিলাইয়া বেড়াইয়াছে। এই আহবে শিরহিন্দ্‌ সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হয় এবং যে স্থানে গোবিন্দসিংহের জননী ও সন্তানগণ মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন, সেই স্থান হইতে লোষ্ট্র-বহনের সহিত এক গৌরবান্বিত জনশ্রুতি প্রচলিত রহিয়াছে। এই বিজয়গৌরবে উদ্দৃপ্ত হইয়া শিখগণ যমুনার পরপারে উত্তীর্ণ হইল। তাহাদিগকে সাহারানপুরে উপনীত দেখিয়া নজিবুদ্দৌলা সূর্য্যমলের সৈনাপত্যে জাঠসমর হইতে নিরস্ত হইয়া স্বাধিকাররক্ষার মানসে তথায় উপনীত হইলেন। তিনি আক্রমণকারিগণকে প্রতিনিবৃত্ত করিবার নিমিত্ত অনুরোধ এবং ভ্রূকুটি এই উভয়নীতিই অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক ব্যক্ত করিয়াছেন, শিখগণ এই সময় কিয়দ্দিবসের নিমিত্ত লাহোরও স্বাধিকারে রাখিয়াছিল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীব্রজসুন্দর সান্ন্যাল।

সুরনারী।

ভূঁয়ে নেমে মোরে ছুঁয়ে যাও ;
শুক্‌নো গাছে উঠ্‌বে ফুটে ফুল।

একটু থেমে মুখ্‌টি নুয়ে চাও
বুকের কোলে ছড়িয়ে এলোচুল।

অধরখানি কাঁপিয়ে গীতি গাও ;
অমনি কথা শুন্‌ব কালাকাণে।

মুখের বাণী ফুট্‌বে, যদি দাও
তৃপ্ত হ'তে বিন্দু মধুপানে।

ফুল্‌ফোটানো দীপ্তি চোখে মাখি
আমার পানে যদি থাক চেয়ে,—

বন্ধ হেন অন্ধ দুটি আঁখি
উঠ্‌বে ফুটে দিব্য আলো পেয়ে।

পরীর মত চ'লে যেতে দূরে
যাও গো যদি আঙুল ঠেরে ডাকি,—

আকাশপথ লঙ্ঘি যাব উড়ে ;
বিনা পাখায় পঙ্গু হবে পাখী।

মেঘের মত দোলাও নীলাঞ্চল—
ঢেলে বুকের তরল্‌ প্রেমকণা ;

ঝর্‌বে কত মরুর মাঝে জল,
উষর ক্ষেতে ফল্‌বে কাঁচা সোণা।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

রাবেয়া।

হিন্দুরমণীগণের মধ্যে গার্গী, মীরা, করমেতিবাই-প্রভৃতি এবং খ্রীষ্টানরমণীগণের মধ্যে সেণ্টসিসিলিয়া, গেঁয়ো-প্রভৃতি, যেমন ধর্ম্মজীবনে উন্নত হইয়া জগতের ইতিহাসে একটা স্থায়ী নাম রাখিয়া উত্তরকালের ভক্তগণের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতেছেন, মুসলমান-রমণীগণের মধ্যেও তেমনি রাবেয়া, জুলেখা, জুবেদা-প্রভৃতি মনস্বিনীগণ স্ব স্ব দৃষ্টান্তদ্বারা বহু ভক্তহৃদয় সিক্ত করিয়া রাখিয়াছেন।

মুসলমানদিগের মধ্যে মূলত শিয়া ও সুন্নি এই দুইটি সম্প্রদায়-ভেদ থাকিলেও শাখাপ্রশাখাসম্প্রদায় আমাদেরই মত অগণ্য। সকল শাখাসম্প্রদায়মধ্যে সুফীসম্প্রদায় প্রধান ও প্রসিদ্ধ। এই সম্প্রদায়ে বহু ভক্ত ও জ্ঞানী প্রবেশলাভ করিয়া ইহাকে যে ঔজ্জ্বল্য ও খ্যাতি দান করিয়াছেন, তাহা জগতের কোন ধর্ম্ম অপেক্ষা হীন নহে। এই ধর্ম্মের উপর বেদান্তপ্রতিপাদ্য ধর্ম্মের যথেষ্ট প্রভাব লক্ষিত হয়। বৈষ্ণব-ধর্ম্মের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

সুফীশব্দের ঠিক্ কি অর্থ, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। বিবদমান পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ ইহাকে আরবী 'সুফ্' (পশম) ধাতু হইতে নিষ্পন্ন করেন; কারণ, এই সম্প্রদায়ী সাধুসন্ন্যাসিগণ পশমী পোষাক পরিধান করিয়া থাকেন। কেহ বা ইহার ব্যুৎপত্তি পারসী 'সাফ্' (পবিত্র) ধাতু হইতে স্থির করিয়াছেন; কারণ, সুফীগণ কায়-মনোবাক্যের পবিত্রতারক্ষাই সাধনের পরম উপায় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। এবং কেহ বা গ্রীক্ ধাতু 'সোফিয়া' (জ্ঞান) হইতেও ইহা নিষ্পন্ন করেন; কারণ, ইঁহাদের মতে ব্রহ্মসাধনের প্রধান উপায় জ্ঞান *।

---

* সাংখ্যদর্শনের মত।

সুফীসম্প্রদায়ে দুইটি * প্রশাখা আছে। (১) মুতকল্লম অর্থাৎ গোঁড়া সম্প্রদায়, যাঁহারা বাহ্যপ্রক্রিয়ার অনুষ্ঠানপক্ষপাতী †। এবং (২) সুফী অর্থাৎ যাঁহারা আত্মনিগ্রহ ও কৃচ্ছ্রতাসাধনদ্বারা মনঃসংযমে যত্নপর।

এই সুফীধর্ম্ম পারস্যেই অধিক বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল। এই সম্প্রদায়গণ কোরাণকে ভগবদ্‌বাণী বলিয়া শ্রদ্ধা করেন বটে, কিন্তু ধর্ম্মপালনে 'পীর' বা গুরুর উপদেশ এবং আপনার বিজ্ঞান ও বিচারেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন। পাঁচ'বক্ত' নমাজ পড়া অপেক্ষা তাঁহারা নিরন্তর উপাসনার পক্ষপাতী। কোরাণনির্দ্দিষ্ট মন্ত্রপাঠ অপেক্ষা, আপনাপন মনোভাবদ্বারা উপাসনা ও প্রার্থনা তাঁহাদের নিকট সমীচীন। তাঁহাদের নিকট পবিত্রতা ও প্রেম এবং অন্য নিরপেক্ষ স্বাধীন উপাসনাই সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়। 'ইল্‌হাম্' বা সাধনের তিনটি সোপান। (১) পার্থিব-বিষয়-চিন্তা-বিসর্জ্জন। (২) কোরাণ, হদিস, সুন্নত-প্রভৃতি-পাঠ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জনে একমনে ঈশ্বরধ্যান ও উপাসনা; এবং অবিশ্রাম 'আল্লা'নামজপ, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই নাম অনায়াসে 'জাগ্রতস্বপতোবাপি গচ্ছতস্তিষ্ঠতোঽপি বা' উচ্চারিত না হয়। তৎপরে (৩) মানসজপ, যতক্ষণে বাক্য লোপ পাইয়া শুধু অর্থে ও ভাবে সমগ্র চিত্ত ভরিয়া না উঠে। এইরূপ অবস্থায় সামীপ্য মিলে।

যাঁহারা ব্রহ্মসামীপ্য লাভ করেন, তাঁহারা 'ইল্‌হামিয়া'। ইহার পরবর্ত্তী অবস্থা ব্রহ্মসাযুজ্যলাভ। এই অবস্থাগত সুফীগণ 'ইত্তিহাদিয়া'।

---

* শিয়াসম্প্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থ 'মজালিস্-উল্-মোমিনিন্'-অনুমোদিত, Beale's Oriental Biographical Dictionary দ্বারা সমর্থিত। কিন্তু 'গিয়াস-উল্-লোগাত'নামক পারস্য-অভিধানে তিন সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে।

† অনেকটা পূর্ব্বমীমাংসকদের অনুযায়ী।

ইঁহাদের মতে শুষ্কজ্ঞান ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায় নহে। বিচারবিতর্কে সকল আবরণ উদ্ঘাটিত হয় না। আত্মনিবেশ (তওর) দ্বারাই অন্তরের ধারণা পরিস্ফুট হয়*। নদীজলে বুদ্বুদ উঠিয়া যেমন তাহাতেই লয়প্রাপ্ত হয়, ব্রহ্মে আত্মবিলয়ও তেমনি মানবজীবনের সার্থকতা।† ব্রহ্মে 'আমিত্ব'-বিসর্জ্জনই সুফীর চরমবাসনা। আত্ম পরমাত্মার অংশমাত্র; পরমাত্মায় আত্মাকে মিলিত করিতে সুফীর পরম চেষ্টা। সৃষ্টপদার্থমাত্রেই ঈশ্বর রহিয়াছেন এবং সকল পদার্থ ঈশ্বরে রহিয়াছে। তিনিই একমাত্র সত্য, শিব, সুন্দর; আর সব মিথ্যামায়া। তাঁহাতে প্রেমই সার। মহাকবি সাদি বলিয়াছেন, "আমি সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের নামে শপথ করিয়া বলিতেছি যে, যখন তিনি তাঁহার বিভূতি আমার নিকটে প্রকাশ করিলেন, তখন আর সব মিথ্যামায়া বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়া গেল।" বর্ত্তমান জীবনটা প্রিয়তমের বিরহস্বরূপ। নানা তুচ্ছ-পদার্থে বিক্ষিপ্ত মনকে, প্রাকৃতিকসৌন্দর্য্য, সঙ্গীত, শিল্পকলা-প্রভৃতি মনোহর বিষয়সকল, আবার প্রিয়তমের দিকে ফিরাইয়া আনে। এই প্রেম মানুষ সযত্নে রক্ষা করিবে এবং সংযম ও চিত্তনিবেশদ্বারা সকল চিন্তা ঈশ্বরে দিবে এবং এইরূপে ক্রমে তৎসান্নিধ্য লাভ করিয়া অনন্তের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যাইবে।‡ হেজিরার দ্বিতীয় শতাব্দীতে

---

* পাতঞ্জলদর্শনের মত। † বেদান্তমত।

‡ এ সম্বন্ধে ইংরাজ রাজ-কবি টেনিসন এইরূপ লিখিয়াছেন—

"That each who seems a separate whole
Should move his rounds, and fusing all
The skirts of Self again, should fall
Remerging in the general soul,
Is faith as vague as all unsweet
Eternal form shall still divide
The eternal soul from all beside;
And I shall meet him when we meet".

সুফীধর্ম্ম অদ্বৈতবাদ আশ্রয় করিয়া অনেকের নিকট রহস্যময় হইয়া উঠে *। এ কারণে এই সম্প্রদায় মুসলমানসমাজে বিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছেন। এজন্য ইহাঁরা আত্মগোপনে যত্নপর। বোগদাদের অল-হল্লাজ "আমি সত্যস্বরূপ। যাঁহাকে আমি ভালবাসি তিনিই আমি এবং আমিই তিনি। আমরা উভয়ে অভেদ। তুমি যখন তাঁহাকে দেখ, তখন আমাকে দেখ; যখন আমাকে দেখ, তখন তাঁহাকেই দেখ।" এই কথা প্রচার করিয়া ৩০৯ হিজরীতে প্রাণ হারাইয়াছিলেন।

মোস্‌লেমজগতে যত প্রেমিকভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী ও উপদেশ সংগ্রহ করিয়া সুফী সাহিত্য আমাদের বৈষ্ণব-সাহিত্যের মত মধুর নব নব রসে পূর্ণ হইয়া আছে। ইহাঁদের মধ্যে মহাকবি সাদি, হাফেজ, খসরু †, ঔপন্যাসিক নিজামী, সনাই, ফরিদ-উদ্দিন, অত্তার এবং মৌলানা-জলালউদ্দিন-রুমী প্রধান। ইহাঁদের গ্রন্থসকল সুফীর আদরের ও পূজার সামগ্রী। জলালউদ্দিনের 'মস্‌নবী' এই ধর্ম্মের প্রধান শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ। কেহ কেহ ওমরখায়ামকেও সুফী বলিয়া দাবী করেন। তাঁহার ব্রহ্মবাদী কবিতা দুইচারিটি পাওয়া গেলেও, তাঁহার সংশয়বাদী কবিতার প্রাচুর্য্য মনে দ্বিধা আনয়ন করে। স্ত্রী ভক্তগণের মধ্যে রাবেয়া, জুলেখা, জুবেদা (ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হারুণ-অল্‌-রশিদের পত্নী) প্রভৃতিই প্রধানা। ইহাঁদিগের সকল ইতিহাস লিখিত অবস্থায় পাওয়া যায় না; উহারা শ্রুতিপরম্পরা ঐ সম্প্রদায় মধ্যে রক্ষিত হইতেছে। ঐসমস্তের সন্ধান জানিতে হইলে, কোন

* "Mysticism developed into Sufiism".—Spirit of Islam and Faith of Islam.

† খসরু বলেন, "প্রেমই আমার পূজার সামগ্রী। ইস্‌লামে আমার কি আবশ্যক?"

সুফী মৌলবীর সাহায্যলাভ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। এবং তাঁহাদিগকে চিনিয়া লওয়াও এক কঠিন ব্যাপার।

এই সুফী ভক্তদিগের উপাসনা প্রণালীভেদে ভিন্ন ভিন্ন। ইহাঁরা কোরাণনিষিদ্ধ দ্রব্যে একএকটা কল্পিত অর্থ যোগ করিয়া তাহাকেই উপাসনার অঙ্গ করিয়া লইয়াছেন। যথা—মদ্য = ঈশ্বরপ্রেম; সাকি বা শৌণ্ডিক = গুরু; প্রেমিকার অলকদাম = গুরুর প্রশংসাবাদ; ইত্যাদি। ইহাঁরা উপাসনাকে বলেন 'সুলুক' (যাত্রা) এবং উপাসকের নাম দিয়াছেন 'সালিক' (যাত্রী)। ঐ যাত্রাপথে আটটি অবস্থা, (১) আবুদিয়ৎ অর্থাৎ সেবা। (২) ইশ্‌ক্ অর্থাৎ প্রেম। (৩) জুহদ্ অর্থাৎ নিবৃত্তি বা বিজনবাস। (৪) মরিফত অর্থাৎ জ্ঞান। (৫) বাজদ্ বা হাল অর্থাৎ মত্ততা। (৬) হকিকত অর্থাৎ সত্য। (৭) বসল্ অর্থাৎ সাযুজ্যলাভ। (৮) ফনা অর্থাৎ নির্ব্বাণ।

হাফেজের জীবনে মত্ততা, সাদির জীবনে জ্ঞান, জুলেখার জীবনে প্রেম, জুবেদার জীবনে সেবা, অধিক পরিস্ফুট। রাবেয়ার জীবনে সকল অবস্থাগুলিই চমৎকাররূপে বিকাশপ্রাপ্ত হইয়াছিল।

রাবেয়া দরিদ্র পিতার কন্যা *। তাঁহার পিতার নাম ইস্‌মাইল; তিনি 'আদি'গোত্রীয়। এজন্য রাবেয়া উত্তরকালে "রাবেয়া অল্-আদারিয়া"-আখ্যা প্রাপ্ত হন †। কারণ, রাবেয়া চিরকুমারী ছিলেন। আরবের মরুভূমে একটি ক্ষুদ্রপল্লীতে তাঁহার জন্ম হয়। রাবেয়া শৈশবেই মাতৃহীনা। ইস্‌মাইলকে তাঁহার মাতৃ ও পিতৃকার্য্য উভয়ই করিতে হইত। বৃদ্ধ ইস্‌মাইল উপার্জ্জনের জন্য দৈনিকশ্রমে বাহির হইয়া যাইতেন, বালিকা রাবেয়া একাকী নির্জ্জনকুটীরে দিবাবসানে

* কাহারো কাহারো মতে তিনি পিতার চতুর্থ সন্তান। 'রব্বা' ধাতুর অর্থ চতুর্থ।

পিতার প্রত্যাগমনপ্রত্যাশায় অপেক্ষা করিতেন। শ্রান্ত পিতার জন্য মরুদুর্লভ জল সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। প্রত্যাগত পিতাকে স্নেহ-পানীয় দিয়া শীতল করিতেন। এইরূপ অবস্থায় বর্দ্ধিত হইয়া কৈশোরেই রাবেয়া আত্মনির্ভর, কর্ম্মঠ, সেবাপরায়ণ ও গম্ভীর হইয়া উঠিয়াছিলেন। ৮।১০ বৎসর বয়সেই তিনি সংযত, মিতবাক্ ও পরিশ্রমী রমণীর মত জীর্ণকুটীরখানিকে গৃহিণীনৈপুণ্যের শ্রী দান করিয়াছিলেন।

রাবেয়ার ভবনপল্লীর চারিদিকে বেদুয়িন দস্যুদিগের বাস ছিল। তাহারা মধ্যে মধ্যে গ্রাম আক্রমণ করিয়া স্ত্রীপুরুষ যাহাকে পাইত ধরিয়া লইয়া গিয়া দাসরূপে বিক্রয় করিত, অথবা আপনাদের নিকট দাসরূপে রাখিয়া দিত। রাবেয়ার বয়স যখন ১২।১৩ বৎসর, তখন একদিন এই দস্যুদল গ্রাম আক্রমণ করিল এবং অন্যান্য নরনারীর মধ্যে রাবেয়ার পিতা বৃদ্ধ ইস্‌মাইলকেও বন্দী করিয়া লইয়া গেল। রাবেয়া সংসারে এখন একা। কায়িক পরিশ্রমে নিজের অন্ন অর্জ্জন করিবার মত বয়স ও শক্তি তাঁহার হয় নাই। গ্রামবৃদ্ধগণ সম্মিলিত পরামর্শে স্থির করিলেন, রাবেয়া প্রত্যহ এক এক গৃহস্থের অতিথি হইবে এবং তিনিও যথাসম্ভব সেই অন্নদাতা গৃহস্থকে গৃহকর্ম্মে সাহায্যদান করিবেন। পল্লীর সকল গৃহস্থই দরিদ্র; কিন্তু দরিদ্র হইলেও আরব-পল্লীর আতিথেয়তা চিরপ্রসিদ্ধ।

এইরূপে রাবেয়ার দিন কাটিতে লাগিল। তিনি সমস্তদিন কোন পরিবারে কর্ম্ম করিয়া আহার্য্যলাভ করিতেন; আর সন্ধ্যাকালে আপনার শৈশবস্মৃতিজড়িত স্নেহময় পিতার শীতল ক্রোড়ের মত কুটীর-খানিতে আশ্রয় লইতেন। গ্রামবৃদ্ধাগণ কেহ কেহ অনুগ্রহ করিয়া রাত্রে রাবেয়ার কুটীরে শয়ন করিতেন। রাবেয়া রাত্রে শুইয়া শুইয়া পিতাকে চিন্তা করিতেন, তপ্তশ্বাস বুকের বেদনা লাঘব করিত না।

বৎসরেক কাটিয়া গেল। একদিন বৈকালে সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, রাবেয়া কুটীরদ্বারে বসিয়া মরুবালুকার দিগন্তহারা বিস্তার দেখিতেছিলেন। বৃদ্ধ পিতাকে স্মরণ করিয়া মন ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছিল। মরুদগ্ধ বায়ু তাঁহার শোণিতশোষী তপ্তশ্বাস লুটিয়া লইতেছিল। এমন সময়, একজন শীর্ণকায় বৃদ্ধ তাঁহার সম্মুখে দৌড়িয়া আসিয়া পড়িয়া গেলেন এবং ক্ষীণ শুষ্ককণ্ঠে বলিলেন, "রাবেয়া, আমি বেহুয়িন-শিবির হইতে পলাইয়া আসিয়াছি; বড় পিপাসা, একটু জল।"

রাবেয়া চিনিলেন তাঁহার পিতা। রাবেয়ার কুটীরে জল ছিল না। তিনি কুটীরে অল্পক্ষণ থাকিতেন বলিয়া দুর্লভ পানীয় সঞ্চিত রাখিবার আবশ্যকতা অনুভব করেন নাই। পিতার জলপ্রার্থনা শ্রবণমাত্রেই তিনি পাত্রহস্তে প্রস্রবণ-উদ্দেশে ছুটিয়া বাহির হইলেন। দৌড়িয়াও যাইতে-আসিতে তাঁহার অর্দ্ধঘণ্টার অধিক লাগিল। তিনি যখন পানীয় আনিয়া পিতার নিকট ধরিলেন, তখন তাঁহার ক্লিষ্টজীবন আর জীর্ণদেহে ছিল না। বহুকাল পরে অপ্রত্যাশিতদর্শন পিতাকে তৃষ্ণায় শুষ্ককণ্ঠে মৃত দেখিয়া, রাবেয়া অন্তরে বিষম ব্যথা পাইলেন। যে পিতা কতদিন পরম আদরে তাঁহাকে পালন করিয়াছেন, সেই পিতাকে একদিনও শুশ্রূষা করিতে না পারিয়া রাবেয়া দারুণ মর্ম্মাহত হইলেন। রাবেয়া পিতার ধূল্যবলুণ্ঠিত মস্তক কোলে তুলিয়া লইলেন; শীতলজল মৃতনিস্পন্দ ওষ্ঠে, চক্ষে, বক্ষে, গাত্রে সেচন করিতে লাগিলেন। যে পিতা একটিও পরিচয়বাক্য উচ্চারণ করিতে পারেন নাই, রাবেয়া তাঁহার মৃতদেহে সকল কাহিনী পাঠ করিতে লাগিলেন। শুষ্কমুখে কত অনশন ও তৃষ্ণার অসহ্য যন্ত্রণা রেখাপাত করিয়াছে; কত বিনিদ্র বিভাবরী নয়ননিম্নে কালিমাপাত করিয়াছে; কত নিষ্ঠুর কশাঘাত শীর্ণপৃষ্ঠে চিহ্ন আঁকিয়া দিয়াছে। স্বল্পমূল্য বৃদ্ধবন্দীকে দস্যুগণ বিক্রয় করে নাই, নিজেদেরই দাসত্বে নিযুক্ত রাখিয়াছিল, আজ বৃদ্ধ কোন

সুযোগে মুক্তি পাইয়াছিলেন—রাবেয়াকে শেষ-দেখা দেখিবার জন্য আজ এই মুক্তির দিনে, তাঁহার চিরমুক্তি, রাবেয়ার শিশুপ্রাণকে বিমথিত করিয়া দিতেছিল। সে কেন একগণ্ডূষ জল সঞ্চিত রাখে নাই। আজ সে নিজেকে পিতার মৃত্যুর কারণ মনে করিয়া অনুতপ্ত হইতেছিল।

গ্রামিকগণ সংবাদ পাইয়া বৃদ্ধের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য যখন উপস্থিত হইল, তখনো তাহারা দেখিল, রাবেয়া মৃতপিতার সর্ব্বাঙ্গে তপ্ত অশ্রু ও শীতল জল নীরবে সেচন করিতেছেন।

আরো কিছুদিন গেল। শোকে-দুঃখে রাবেয়ার জীবন গঠিত হইয়া উঠিতে লাগিল। রাবেয়া যৌবনে পদার্পণ করিলেন। রাবেয়া আরবরমণীর সৌন্দর্য্যে বঞ্চিতা ছিলেন। তিনি শুধু কৃষ্ণা ছিলেন না, অধিকন্তু কুৎসিতা ছিলেন। এক্ষেত্রে বিবাহাদি করিয়া গার্হস্থ্যস্থিতি-লাভের দুঃস্বপ্ন তাঁহার মনে আসিত না। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, শ্রমার্জ্জিত অন্নে উদরপূর্ত্তি করিয়া পিতার কুটীরেই তাঁহার উদ্দেশ্য-বিহীন জীবন অতিবাহিত করিবেন। এবং তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন।

আরো কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। আবার একদিন বেদুয়িন দস্যুদিগের দ্বারা গ্রাম আক্রান্ত হইল। অপহৃত হইলেন আর-সকলের মধ্যে রাবেয়া।

হজরত মহম্মদের অনুশাসনে দাসত্ব দুষ্ট বলিয়া বারিত হইলেও তৎকালে আরবের সর্ব্বত্র এই প্রথা বিশেষ পরিচিত ছিল। ধনিগণ সুন্দরী ক্রয় করিয়া পত্নীরূপে বা বিলাসসাধন জন্য গৃহে রাখিতেন। মজলিসে-উৎসবে এই সকল দাসদাসী, রূপে-সৌন্দর্য্যে, নৃত্যগীতে, সেবা-আয়োজনে ধনিভবনে সমাগত অভ্যাগতদিগকে সম্বর্দ্ধনা ও মুগ্ধ-তৃপ্ত করিত। রূপগুণসম্পন্ন দাসদাসী নগরের বাজারে বহুমূল্যে বিক্রীত হইত। রাবেয়া বসরার বাজারে নীত হইলে, এক বিলাসী ধনীর জন্য

তিনি ক্রীত হইলেন। রাবেয়া কাল এবং কুৎসিতা ছিলেন বলিয়া, তাঁহাকে ধনীর বিলাসসাধনী হইতে হয় নাই; তাঁহার ভাগ্যে শ্রমসাধ্য কর্ম্মের ভার পড়িয়াছিল। প্রভুর প্রমোদভবনে খাদ্যপেয় পরিবেশন করিতে হইত, প্রমোদবাসরের কুশ্রী লীলা নিত্য প্রত্যক্ষ করিতে হইত; প্রভুর বিলাসসম্ভোগে সাহায্য করিতে হইত।

তাৎকালিক আর একটী প্রথা ছিল—ধনিভবনে বিদ্বৎসমাগম। মধ্যযুগে ফরাশীরাজ্যে প্রসিদ্ধ বেশ্যালয়ে বিদ্বৎসম্মিলনী যেমন একটা রীতিমধ্যে গণ্য হইয়াছিল, তাৎকালিক আরবসমাজে ধনিগৃহে বিদ্বৎ-সম্মিলন তেমনি প্রথায় পরিণত হইয়াছিল। ধনী পরিচয় পাইবার জন্য অনেকেই পণ্ডিতদিগকে নৈশভোজে নিমন্ত্রণ করিয়া আত্মশ্লাঘা লাভ করিতেন। রাবেয়ার প্রভুগৃহে এই বিদ্বৎসমাগম নিত্যকার ব্যাপার ছিল। এজন্য রাবেয়ার পরিশ্রমের অবধি ছিল না। গুরুপরিশ্রমে ভগ্নস্বাস্থ্য হইয়া কত দাসদাসী প্রতিবৎসর মৃত্যুতে বিশ্রামলাভ করিত; আবার কত হতভাগ্য তাহাদের স্থান পূর্ণ করিতে আসিত। সামান্য ত্রুটিতে কশাঘাত ও লাঞ্ছনা নিত্য ভোগ করিতে হইত। রাবেয়া বাল্যকাল হইতে কর্ম্মনিপুণ ও পরিশ্রমী; এজন্য তাঁহার স্বাস্থ্য নষ্ট হয় নাই; এবং লাঞ্ছনাও অনেক কম ভোগ করিতে হইত।

নৈশভোজে অতিরিক্ত মদ্যপানে প্রভু ও অতিথিগণ যখন অবসন্ন হইয়া পড়িতেন, তখন ভৃত্যগণের বিশ্রামের সময়। প্রভুপ্রসাদাবশিষ্ট মদ্যমাংসে দাসগণ সমস্তদিনের শ্রমলাঞ্ছনার অপনোদন করিত। রাবেয়া সে দলে মিশিতেন না; সংযত-গম্ভীর রাবেয়া নিজের কক্ষ আশ্রয় করিতেন। ইহাতে তিনি ভৃত্যগণেরও সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সংযত-গম্ভীর চরিত্র দেখিয়া কেহ তাঁহাকে উত্যক্ত বা বিদ্রূপ করিতে সাহসী হইত না।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। এক রাত্রে নিয়মমত কবি,

দার্শনিক, জ্যোতিষী, চিকিৎসক প্রভৃতি বহুপণ্ডিত আমন্ত্রিত হইয়া রাবেয়ার প্রভুগৃহে উপস্থিত। পণ্ডিতে-পণ্ডিতে তর্ক ও মীমাংসা হইতেছে; সকলে স্ব স্ব বিদ্যার ভাণ্ডার উন্মুক্ত করিয়া কল্পতরু হইয়া বসিয়াছেন; রাবেয়ার প্রভু কিন্তু সাংখ্যপুরুষের মত অনাসক্ত নিষ্ক্রিয়-ভাবে মদের নেশায় বিভোর হইয়া আছেন; ফ্যাশানের দস্তুরমত যে সকল প্রসঙ্গ আলোচিত হইতেছে, তিনি তৎপ্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন। রাবেয়া একটার পর অন্য খাদ্যপেয় উপস্থাপিত করিতেছেন; মদ্য বোতলে-বোতলে আসিতেছে, নিঃশেষ হইতেছে। একজন অতিথি একটা অস্থিগ্রন্থি হইতে মাংসগ্রহণ করিবার সময় সেই গ্রন্থিসংস্থান দেখিয়া বলিলেন, "বাঃ, এ গ্রন্থিটা কেমন? মনুষ্যশরীরেও কি এরূপ গ্রন্থি আছে?" একজন চিকিৎসক বলিলেন, "মনুষ্যশরীরেও ঠিক এমনি আছে, তবে চতুষ্পদের ও দ্বিপদের গমনরীতির পার্থক্যহেতু যেটুকু বিভিন্নতা।" পূর্ব্ববক্তা বলিলেন, "মানুষের সহিত চতুষ্পদের এই পাদগ্রন্থি মিলাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়।" কথাটা মদিরামত্ত গৃহস্বামীর কাণে গেল। সেই অশুভক্ষণে বা শুভক্ষণে রাবেয়া এক থাল খাদ্য লইয়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ইহা দেখিয়া গৃহকর্ত্তা বলিলেন "তার আর চিন্তা কি? এই দাসীটার পা কাটিয়া দেখ।" আজ্ঞামাত্রে কয়েকজন রাবেয়াকে চাপিয়া ধরিল এবং চিকিৎসক এক-জন একখানা ছুরী লইয়া জঙ্ঘার পেশীসমূহ একটার পর একটা খুলিয়া অস্থি বাহির করিয়া ফেলিলেন। রাবেয়া অচল-অটল। মনুষ্যপদের গ্রন্থিসংস্থান দেখিয়া একজন বলিয়া উঠিলেন, "বা! ভগবানের কি বিচিত্র লীলা!" অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যে ঈশ্বরের সর্ব্বগ্লানিহর নাম রাবেয়ার কাণে গেল। চিকিৎসক পেশীগুলিকে পর পর বসাইয়া কিঞ্চিৎ ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলেন; দাসগণ ধরাধরি করিয়া তাঁহাকে তাঁহার কক্ষে রাখিয়া আসিল।

রাবেয়ার সমগ্র জীবন দুঃখময় হইলেও বর্ত্তমান শারীরিক দুঃখ তাঁহার চরম বোধ হইয়াছিল। সারাজীবনের দুঃখ তাঁহাকে সংযত চারিত্রবতী করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার জীবনে ঈশ্বরপ্রেমের আলোকপাত হয় নাই। আজিকার এই চরমযন্ত্রণার সময়, যে মধুময় নাম রাবেয়ার কর্ণে অমৃতনিষেক করিয়া গেল, তাহা তাঁহার জীবনে ব্যর্থ হয় নাই। তিনি পরমযত্নে সেই নাম আপনার মনোমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। রাবেয়ার মুখ হইতে প্রথম উপাসনা বাহির হইল "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ—শুক্‌র্ খোদা" !

তিনি তৎপরে বলিলেন, "আজিকার দুঃখ দিয়া প্রভু জানাইলে, এতদিন আমায় কি সুখে রাখিয়াছিলে; শরীরের এক অংশ বিকল করিয়া জানাইলে, শতদিকে তুমি কত যত্নে আমাকে রক্ষা করিতেছ। আমার প্রতিমুহূর্ত্তের অবস্থিতির জন্য তোমায় কত যত্ন লইতে হয়—ইহা ভাবিলেই অক্ষম আমি, অকৃতজ্ঞতার লজ্জায় মরিয়া যাই। আবার প্রভো, প্রার্থনা করিব কোন্ লজ্জায় ?"

এই যে নিষ্কামপ্রেম ফুটিয়া উঠিল, তাহা উত্তরোত্তর পুষ্ট হইতে লাগিল। মাসাধিককাল রাবেয়া একাকিনী শয্যাশায়িনী ছিলেন। ভৃত্যগণ একএকবার সামান্য খাদ্যপেয় দিয়া দেখিয়া যাইত মাত্র। এই সময়ে নিরন্তর ঈশ্বরসান্নিধ্য অনুভব করিয়া রাবেয়া পরমসুখী ছিলেন।

ক্রমে সুস্থ হইয়া রাবেয়া আবার প্রভুকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তিনি বাহ্যতঃ সংসারকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, কিন্তু চিত্ত নিরন্তর উপাসনায় নিমগ্ন থাকিত। রাবেয়া ঈশ্বরকে অহেতুক প্রেম দিয়া তৃপ্ত ছিলেন। যদি কখন প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা পরের জন্য।

"যখন দুঃখ পাই, কাঁদি। নিজের জন্য নহে। ভাবি এখনো ত এই যাতনায় কত লোক ভুগিতেছে। হায়, কবে সবটুকু দুঃখ আমায়

"আমার সমগ্র হৃদয়ের শোণিতকুম্ভ নিপীড়িত করিলে, যদি এই তাপিত মরুভূমে একজনেরও দাঁড়াইবার স্থান শীতল হয়—তবে না হয় আমার শোণিত ধরণী রঞ্জিত করুক।

"আমি যেন প্রভু, নিজের তীব্রযাতনা নিজচিত্তে গোপন রাখিয়া জগৎকে তৃপ্ত করিতে পারি। যে গিরি অগ্নিগর্ভ সেও কি শ্যামশোভায় আস্তীর্ণ নহে? যেদিন আমার যাতনা আমায় ভেদ করিয়া উঠিবে, সেদিন যেন তোমার উৎসঙ্গে সেই তীব্র উচ্ছ্বাস বাহির হয়। এখানে যদি হয়, তবে হায়, জগৎ যদি তপ্ত হয়!"

অতঃপর রাবেয়াকে কেহ কখন বিষণ্ণ দেখে নাই। তিনি সকল দুঃখ ঈশ্বরের প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন—"তুমি প্রভু, আমার দুঃখ কি বুঝিবে? তুমি যখনই আমার পানে চাহিয়াছ, আমি শত উৎসবে ফুল্ল হইয়া উঠিয়াছি। সূর্য্য কখন পদ্মের মলিন মুখ দেখিয়াছে? প্রেমাস্পদের মুখ দেখিলে দুঃখ থাকে কৈ?"

এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল। একদিন তাঁহার প্রভুগৃহে নিমন্ত্রিত অতিথি আসেন নাই; গৃহস্বামী অতিথির অপেক্ষায় অস্থির হইয়াছেন। সন্ধ্যা ঘনতর হইয়া রাত্রি হইল—তবু পানভোজন অনাস্বাদিত রহিয়াছে। অতিথির পূর্ব্বে গৃহস্বামীর খাদ্যপেয়গ্রহণ নিষিদ্ধ। রাত্রি গভীরতর হইল, কর্ত্তা সকল দাসদাসীকে বিদায় দিয়া স্বয়ং অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত তাঁহাকে অতিথির অপেক্ষা করিতেই হইবে। মগুলালসা পীড়া দিতে লাগিল; তিনি গৃহে স্থির থাকিতে না পারিয়া আস্তে আস্তে গৃহের বাহির হইলেন। জীবনে আজ বুঝি এই প্রথম সজ্ঞানে সাদা-চোখে প্রকৃতিসন্দর্শন। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত বালুকাপ্রান্তর রজতক্ষেত্রের মত বিস্তীর্ণ, খর্জ্জুরকুঞ্জ শ্যামশোভায় উজ্জ্বল; কি এক অপূর্ব্বরসে তাঁহার চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিল। তিনি শুনিলেন,

একটি মধুস্রাবী স্বর কোথা হইতে কি এক অপূর্ব্বঘোষণা প্রচার করিতেছে। স্বরানুসরণ করিয়া ভৃত্যাবাসে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সকল ভৃত্য নিদ্রিত, রাবেয়ার জাগ্রতকণ্ঠ হইতে এই স্বর্গসঙ্গীত ক্ষরিত হইতেছে। রাবেয়া বলিতেছেন—

"স্বামিন্, তোমাকে শতধন্যবাদ; হে আমার আশ্রয়দাতা পার্থিব প্রভু, তোমাকেও শতধন্যবাদ; তোমার নিকট যে আশ্রয় ও সুখ পাইয়াছি, তাহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ; তোমা হইতে যে দুঃখ পাইয়াছি, তাহার জন্য আরো ধন্যবাদ; আমি তোমার কৃপাতেই জগৎ-পতিকে চিনিতে পারিয়াছি। হে জগতের স্বামিন্, তোমার নিকট আর কি সুখ চাহিব? প্রভু, তোমাকে ডাকিয়াই যে অনন্তসুখ পাই। ইচ্ছা হয়, সেই সুখ তোমাকেই দেখাই। হে সখা, তুমি যে তাহা ভোগ করিতে পার না *, সেইজন্য আমার প্রাণ অবিরত কাঁদিতে চায়।

"কেন প্রভো, জগৎকে দুঃখ দেও, আর তোমার নিন্দা জগতে প্রসৃত হয়! তোমার নিন্দা আমার যে অসহ্য। সমুদ্রে যেমন সমস্ত নদী গিয়া পড়িয়াছে, আমাতে প্রভো, জগতের যত দুঃখধারা আসিয়া পতিত হউক। আমি দুর্ব্বল হইয়াও তোমার নামে সব বহন করিব।"

তৎপরে স্বীয় প্রভু ও অপরাপর দাসদাসীগণের শুভকামনা করিয়া ও তাঁহাদের অজ্ঞানকৃত পাপ ও অনাচার-অত্যাচারের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া রাবেয়া নিদ্রিতা হইলেন। গৃহস্বামী উন্মনস্ক হইয়া গৃহে ফিরিলেন। তিনি যাহাকে অত কষ্ট দিয়াছেন, সে আজ তাঁহার শুভকামনা করিয়া, ঈশ্বরপ্রেমের পরিচয় দিয়া, যে নবভাব ও নব-জীবনের আভাস দিল, তাহা তিনি হৃদয়ঙ্গম করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সমস্ত রাত্রি গেল; তৎপরদিনও চিন্তায়-চিন্তায় অনাহারে

* নির্গুণ ব্রহ্ম?

কাটিয়া গেল। গভীর রাত্রে আবার সেই মধুর স্বরে আকৃষ্ট হইয়া রাবেয়ার দ্বারে উপস্থিত। তখন রাবেয়া উপাসনারত—

"ওগো, কে হতভাগা, সমস্ত রাত্রি সখার ভবনের বাহিরে কাটাইয়াছ? ওগো, কে তুমি, সেই রুদ্ধদুয়ারে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছ? তোমার নয়নে কেন জল নাই? তোমার হৃদয়ে কেন অগ্নি? ওরে দুঃখী, তোর হৃদয় দগ্ধ হইয়া গেল, তবু তোমার নয়নে জল বহিল না? ওরে তৃষিত, ওরে ধূলিলুণ্ঠিত, ওরে ভিখারী, তুই বড় দুঃখী; আয় আমার দুঃখী ভাই, আমার হৃদয়ে আয়, তোর হৃদয়ের তাপ আমাকে দে, আমার নয়নজল তোকে দিব। ওরে তৃষিত, একবার প্রাণভরিয়া কাঁদিয়া দেখিবি, কত শান্তি? দুঃখী হইতে দুঃখী তুই, একদিন প্রাণভরিয়া কাঁদিতে পারিলি না? আজ তোকে কাঁদাইব; ওরে কাঁদিতে যদি চাহিস, তবে আমার শীতল বুকে আয়, তোর নয়নে উৎস বহিবে।

"হে সখা, যতদিন তুমি সমগ্র পতিতকে হাত ধরিয়া না উঠাইবে, ততদিন আমার হাত ধরিও না। যতদিন না তুমি সকল দুঃখীর চক্ষুজল মুছাইবে, ততদিন আমার চক্ষের জলের দিকে চাহিও না। যতদিন না সকলের হৃদয় সিক্ত কর, থাকুক আমার হৃদয় মরুভূমি—তোমার করুণার আবশ্যকতা নাই। প্রভু, যে পতিত, সে কি উঠিবে না? যে অশ্রুসিক্ত, সে কি সান্ত্বনা পাইবে না? যে অবসন্ন, সে কি নূতন প্রাণ পাইবে না? আমার ত' তুমিই আছ প্রভু, তাহাদের কে আছে নাথ?

"আমাকে অত্যুন্নত মেঘচুম্বী অনুর্ব্বর গিরিশিখর করিও না প্রভু,—আমাকে নীচ শস্যশ্যামল সমতল করিয়া দেও, ক্ষুধিত যেন আমাতে অন্ন পায়। আমাকে বিশাল অসীম লবণাম্বু সমুদ্র করিও না প্রভু,—আমাকে তাপিত ধরণীবক্ষে ক্ষীণ প্রস্রবণ করিয়া দেও, তৃষিত যেন আমাতে জল পায়। বীরের হস্তে উজ্জ্বল চাক্‌চিক্যময় শাণিত তরবারি

করিও না প্রভু, আমাকে সামান্য যষ্টি করিয়া দেও, পতিত ও দুর্ব্বল যেন আমাতে অবলম্বন ও আশ্রয় পায়।"

গৃহস্বামীর আরো একদিন অনাহারে কাটিয়া গেল। রাত্রে স্বপ্নাবিষ্ট মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আবার গিয়া শুনিলেন, রাবেয়া প্রার্থনারত।

"যদি স্বর্গের লোভে তোমায় ডাকিয়া থাকি প্রভু, সে স্বর্গ আমার হারাম্ হোক্। যদি নরকের ভয়ে ডাকিয়া থাকি প্রভু, নরকেই আমার গতি হোক্।

"তুমি যদি স্বর্গ হও, আমি প্রভু স্বর্গের ভিখারী। তুমি যদি নরক হও, আমি প্রভু, অনন্তকাল নরকের দ্বারে প্রবেশ-ভিক্ষা করিব।

"যখন প্রলোভন আসিয়া আমায় মোহিত করিতে চাহে, আমি কাঁদিয়া ফেলি। দুঃখে নহে,—অপমানে। সে কি জানে না, আমার সখা তুমি প্রভু স্বয়ং।"

পরদিন প্রাতে গৃহস্বামী সকল দাসদাসীকে মুক্তি ও পারিতোষিক দিয়া বিদায় দিলেন। রাবেয়াকে বলিলেন, "তোমার নিষ্কাম ঈশ্বরপ্রেম ও জীবনের শুভকামনা দেখিয়া আমার চিত্তভ্রান্তি দূর হইয়াছে। আমি তোমার প্রসাদে সংযতজীবনের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিয়াছি; ঈশ্বরপ্রেমের মহিমা অনুভব করিয়াছি। তোমাকে আমি মুক্তি দিলাম; তুমি আর কি চাও বল; তোমাকে আমার অদেয় কিছুই নাই।"

রাবেয়া লজ্জিতা হইয়া বলিলেন, "প্রভু, আমি নিরাশ্রয়, আপনার আশ্রয়ে সুখে আছি। এখনো আমি সেই আশ্রয় ও আপনার সেবার অধিকার ভিক্ষা করি। আপনি আমার যে কল্যাণ করিয়াছেন, আমি সেবাদ্বারা সেই কৃতজ্ঞতা জানাইবার অবসর পাই। আপনি আমাকে দূর করিবেন না।"

এই দিন হইতে রাবেয়া বসরাতেই স্বাধীনভাবে বাস করিতে

জ্ঞান ও পবিত্রতা, বিনয় ও নিষ্কামতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিলেন। লোকসেবাতেও তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। কথিত আছে, তিনি তাঁহার শ্রমার্জ্জিত অর্থদ্বারা বোগদাদ হইতে মদিনা পর্য্যন্ত একটা খাল খনন করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার উপাসনার নৈরন্তর্য্য অতি অদ্ভুত ব্যাপার।

তিনি প্রসিদ্ধ মোস্‌লেম সাধু সারিশক্তির * সমসাময়িক। হিজরী ১৮৫ (৮০১ খৃষ্টাব্দে) সালে তাঁহার মৃত্যু হয় †। ইবন্ অল্ জওজী তৎবিরচিত শুজর্ অল্ অকুদ্ গ্রন্থে রাবেয়ার মৃত্যুকাল ১৩৫ হিজরী (৭৫২-৫৩ খৃঃ) বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন ‡। ইবন্ অল্ জওজী তদ্‌রচিত সাফাৎ অস্ সাফাৎ গ্রন্থে রাবেয়াসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। তাহার কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিলাম।

"আব্দা রাবেয়ার দাসী ও ভগবানের পরিচারিকা। রাবেয়াসম্বন্ধে বলিয়াছেন,—'রাবেয়া সমস্ত রাত্রি উপাসনায় কাটাইয়া ভোরবেলা দিবাপ্রকাশ পর্য্যন্ত তাঁহার সেই উপাসনামন্দিরেই একটু ঘুমাইয়া পড়িতেন। দিবালোক চক্ষে লাগিবামাত্র ব্যস্তত্রস্ত হইয়া শয্যাত্যাগ করিয়া বলিতেন, "ওরে ওরে প্রাণ! কতক্ষণ তুই নিদ্রায় অচেতন থাকিবি? কখন্ তোর মোহনিদ্রা ভাঙ্গিবে রে? শীঘ্রই ত তোর চিরনিদ্রার সময় আসিতেছে। প্রলয়ান্তবিচারদিন (কেয়ামত বা last day of judgment) পর্য্যন্ত তুই ত' স্বচ্ছন্দে ঘুমাইবি। এখন একটু চেতন থাক।" তাঁহার মৃত্যু আসন্ন বুঝিয়া একদিন তিনি আব্দাকে

---

* সারিশক্তি একজন প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু। তিনিও নিষ্কাম জনহিতৈষার জন্য বিখ্যাত। একবার বোগদাদনগরে আগুন লাগিয়া অনেকের গৃহসম্পত্তি ভস্মসাৎ হইয়া যায়। এক ব্যক্তি আসিয়া সংবাদ দিল যে, তাঁহার দোকানঘরটী রক্ষা পাইয়াছে। ইহাতে তিনি বলিয়াছিলেন "ঈশ্বরকে ধন্যবাদ"। এক মুহূর্ত্তের জন্য যে তাঁহার স্বার্থ, পরার্থ অপেক্ষা প্রবল হইয়াছিল, এই অপরাধের জন্য তিনি ত্রিশবৎসর ক্রমাগত ঈশ্বরের নিকট অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

† Beale's Oriental Biographical Dictionary.

‡ শ্রীযুক্ত আমির আলিও এই তারিখ নির্দ্দেশ করেন। History of the Saracens.

ডাকিয়া বলিলেন, "আব্দা, আমার মৃত্যুসংবাদ কাহাকেও বলিও না; মৃত্যুর পর এই বোরকা দ্বারা আমার দেহ ঢাকিয়া দিও।" সেই বোরকা পশমনির্ম্মিত, তিনি উহা পরিধান করিয়া, সকলে সুষুপ্ত হইলে, নির্জ্জনে ঈশ্বরারাধনা করিতেন। মৃত্যুর একবৎসর পরে আব্দা রাবেয়াকে স্বপ্নে দিখিতে পান। রাবেয়া অত্যুজ্জ্বল সাটিনবস্ত্রে দীপ্তিময়ী; ঔজ্জ্বল্য, মসৃণতা ও কোমলতায় সেই সাটিনের সমকক্ষ কোন বস্ত্র আব্দা পৃথিবীতে দেখেন নাই। আব্দা তাঁহার কুশল-প্রশ্নের পর আবুকাল্লাবের কন্যা ওবেদার কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাবেয়া উত্তর করিলেন, "তাঁহার সুখস্বাচ্ছন্দ্য অবর্ণনীয়। আল্লার দয়াতে তিনি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া উচ্চতম স্বর্গে প্রস্থান করিয়াছেন।" আব্দা জিজ্ঞাসা করিলেন, "এমন কেন হইল? নরলোকে সকলে আপনাকেই ত অনেকগুণে শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষণা করিত।" রাবেয়া বলিলেন, "তাঁহার ভবিষ্যৎ-ভাবনা ছিল না; কাল প্রাতে বা সন্ধ্যায় কি হইবে, এ চিন্তা তাঁহার কথন হয় নাই। এই জন্যই তিনি শ্রেষ্ঠতালাভ করিয়াছেন *।" তথন আবদা বলিলেন, "নিষ্কামভাবে সর্ব্বদা তাঁহার চিন্তা করিও, তুমি কবরে শান্তি পাইবে।"

রাবেয়ার নিষ্কামত্বসম্বন্ধে আবুল্ কাশেম্ অল্ কুশায়রী বলেন, "তিনি ঈশ্বরে চিত্তসমাধান করিয়া প্রায়ই বলিতেন, 'হে আল্লা, যে চিত্ত লোভের বশে তোমায় ভালবাসে, তাহাকে তুমি অগ্নিদগ্ধ করিয়া দেও।"

একদিন সোফিয়া অস্ সোরা রাবেয়ার নিকটে বলিয়া ফেলিয়াছিল, "ওঃ, আমার কি বিষম দুঃখ।" রাবেয়া তাহাকে বলিলেন, "মিথ্যা বলিও না। বরং বল, আমার কি অল্প দুঃখ। বাস্তবিক তুমি যদি দুঃখী হইতে, তুমি তপ্তনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া শান্তি পাইতে না।"

রাবেয়া প্রায়ই বলিতেন, "আমার যে কার্য্য জগতে প্রচারিত ও প্রশংসিত হয়, আমি তাহাকে তুচ্ছ জ্ঞান করি।" তিনি সকলকেই উপদেশ দিতেন "তোমরা যেমন পাপ গোপন কর, সৎকার্য্যও তেমনি গোপন রাখিবে।"

---

* শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবেরও সন্ন্যাস এইরূপ ভবিষ্যচিন্তাবর্জ্জিত। তাঁহার সেবক গোবিন্দ ঘোষ কল্যকার জন্য একটি হরিতকী সঞ্চিত রাখিয়াছিলেন বলিয়া, সঞ্চয়বুদ্ধি থাকার জন্য তাঁহাকে গৃহস্থ হইতে বাধ্য করিয়াছিলেন।

রাবেয়া সর্ব্বদা সর্ব্বত্র ঈশ্বরসাক্ষাৎ করিতেন। একদা বসরার রাজপথে তিনি দেখিলেন যে, এক যুবক এক অবগুণ্ঠনবতীর পশ্চাতে লোলুপ-ব্যগ্রতায় অনুসরণ করিতেছে। তিনি তাহাকে ঐরূপ করার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, ঈষৎ ব্যক্ত সৌন্দর্য্যের পূর্ণ উপভোগের জন্য সে লালায়িত। তখন তিনি তাহাকে ব'ললেন, "যে চিরসুন্দর, পুষ্পপত্রফলের সুন্দর গুণ্ঠনে আপনাকে গুপ্ত রাখিয়াছেন, তাঁহার গুণ্ঠন-মোচন করিতে তোমার কেন ইচ্ছা হয় না।" রাবেয়ার প্রাণস্পর্শী বাক্যের এমনি প্রভাব ছিল যে, সেই যুবক উত্তরকালে ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন।

অবারিফ্ অল্ মারিফ্ গ্রন্থে শেখ সাহেব উদ্দিন অস্ সুহ্রাবরদী রাবেয়ার একটী বাণী সংগ্রহ করিয়াছেন। "হে প্রভু, আমার চিত্ত তোমারই সংসর্গের জন্য পৃথক রাখিয়াছি; এখানে যাহারা আমার মঙ্গললাভের প্রয়াসী, তাহাদের জন্য আমার এই দেহ রহিয়াছে। আগন্তুক দর্শক অতিথির সঙ্গী আমার দেহ; আমার প্রিয়তম আমার অন্তরের সাথী।" ইহা তাঁহার উপাসনার নৈরন্তর্য্যের সাক্ষ্য।

রাবেয়া বিধিনিবদ্ধ উপাসনাপ্রণালীর বিরোধী ছিলেন। স্বতঃ উৎসারিত চিত্তভাবে ঈশ্বরপূজাকেই তিনি আশ্রয় করিয়াছিলেন। তিনি উপাসনায় বলিতেন—"প্রভু, তোমার জন্য জগতের গণ্ডী ভাঙিয়া-আসিয়া যেন উপাসনার গণ্ডীতে না পড়ি। সে গণ্ডী বড় কঠিন,—তাহাতে যে প্রভু বড় দুখ।"

রাবেয়ার সমাধি জেরুজলামের পূর্ব্বাংশে জেবেল্-এৎ তর্ (Mount of Olives) পর্ব্বতের উপর আজো বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ স্থান তীর্থ হইয়াছে। প্রতিবৎসর বহু ভক্তের সমাগম হয়। উম্ অল্ খয়ের রাবেয়া (মঙ্গলমাতা রাবেয়া) আজও বহু ভক্তের পূজা পাইতেছেন।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

জিজ্ঞাসু পাঠক, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'তাপসমালা' পুস্তকে রাবেয়ার অন্যান্য বিবরণ সংগৃহীত পাইবেন। তাঁহার সংগৃহীত বৃত্তান্তের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজনবোধে লিখিত হইল না।

মাতৃদ্রোহীর প্রতি।

ও কিরে সাজ!
বিলাস-বসনে ভূষিত অঙ্গ,
নাহিরে লাজ!
কাঙ্গালিনী ওই জননী তোদের,
নাহিরে ঠিকানা উদরান্নের;
তা'রি সুত তুমি গর্ব্বে চলেছ
পরিয়া তাজ,
নাহিরে লাজ!

দীনের ছেলে,
ধনীর ভুষণ বল্‌রে বল্‌রে
কে তোরে দিলে!
ভুলিলি ভুলিলি কাহার মায়ায়,
তুচ্ছ ভূষণে সাজাতে কায়ায়
চির-অধীনতা-শৃঙ্খল নিলি
নিজের গলে,
দীনের ছেলে।

পরিয়ে তাজ,
ভেবেছ কি মনে দীনতা তোমার
ঘুচেছে আজ!
পাদুকা-চিহ্ন ওই ওই কার
লাঞ্ছিত হের ভূষণে তোমার,
দেখিয়া হাসিছে সারা সংসার
বাতুল-সাজ;

যে তাজখানি,
পরের পাদুকা তুলিয়া মাথায়
লয়েছ কিনি,
ফেল ফেল ভাই আজি তারে দূরে,
ফিরে এস এস জননীর ঘরে,
হোক সে কুটীর বংশ-তৃণের,
তবু সেথানি,
প্রাসাদ মানি।

খাটিবি আয়,
জননীরে আজি রাখিতে সকলে
মরিবি আয়!
যে শোণিত ওরা লয়েছে শুষিয়া
পূরা তাহা আজি নিজ লোহু দিয়া;
মাতৃবিদ্রোহীর প্রায়শ্চিত্ত
মানিবি তায়,
মরিবি আয়।

মহীশূর-ভ্রমণ।

মহীশূররাজ্যের আয়ব্যয়ের হিসাব ও রাজ্যশাসনপ্রণালীর দোষ-গুণ-সমালোচনায় আমাদের মাথা এত গরম হয়ে উঠল যে, বৈকালে যাদুঘর দেখতে যাবার সঙ্কল্পটা একেবারে চাপা পড়ে গেল। কতকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে ঘড়ি খুলে দেখলাম ৫॥০ বেজে গেছে, সুতরাং অদ্য যাদুঘর দেখার বাসনাটি পরিত্যাগ কর্‌তে হ'ল। শীঘ্রই কফি এসে হাজির হ'ল। কফি পান কর্‌তে কর্‌তে সন্ধ্যাটা কি ক'রে কাটাব তা ল'য়ে পুনরায় একটি তর্ক উত্থাপন করবার উদ্‌যোগ কর্‌ছি, এমন সময়, বন্ধুবরের সেই ভ্রাতৃকন্যাটি একটি ছোট চন্দনকাষ্ঠনির্ম্মিত গহনার বাক্স নিয়ে সলজ্জ ও স্মিতমুখে আমাদের নিকট উপস্থিত হ'ল। শুন্‌লাম, বেচারা অন্যান্য মহিলাগণকর্ত্তৃক তাদের দেশীয় অলঙ্কারগুলি আমাকে দেখাবার জন্য প্রেরিত হয়েছে। স্ত্রীচরিত্র অলঙ্কারসম্বন্ধে সর্ব্বত্রই সমান; এই অলঙ্কারপ্রদর্শনের সঙ্গে একটু স্ত্রীস্বভাবসুলভ গর্ব্বের সংশ্রব থাক্‌লেও, তাঁদের স্বদেশীয় এই সুন্দর ও অত্যাশ্চর্য্য অলঙ্কারগুলি দেখায়ে, একজন বিদেশীকে আশ্চর্য্য ও কৌতূহলান্বিত করে, একটু আনন্দ উপভোগ করাই যে তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেটা আমার সহজেই বোধগম্য হ'ল। আমার দেখবার জন্য অলঙ্কারগুলি প্রেরিত হওয়ায় যে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হয়েছি, এইটে আমার সহস্রধন্যবাদ-সহ পার্শ্বকক্ষস্থ রমণীগণের নিকট তরজমা করে দিতে বন্ধুরবকে অনুরোধ কর্‌লাম। ললনাগণকে বন্ধুটি মাতৃভাষায় কি বুঝালেন, বুঝলাম না; তবে রমণীগণের উচ্চহাস্যে আমার স্পষ্টই বোধ হ'ল যে, আমার ভাষানভিজ্ঞতার সুবিধা পেয়ে বন্ধুটি বিশ্বাসঘাতকের কার্য্য করেছেন, ধন্যবাদের পরিবর্ত্তে কোন-একটা হাস্যরসাত্মক কথা বলে

অনর্থ ঘটিয়েছেন। বন্ধুবরের এই দুশ্চিকিৎস্য কৌতুকপ্রিয়তা প্রায়ই আমার পক্ষে পীড়াদায়ক হ'ত। অনন্যোপায় হ'য়ে, বন্ধুবরের কোন সময়ে বঙ্গদেশে শুভাগমন হ'লে এর প্রতিশোধ নেব, এই শাসিয়ে, উপস্থিত ক্ষেত্রে আমায় নীরব হতে হ'ল। অনিন্দ্যসুন্দরী আয়তলোচনা এই বালিকাটি লজ্জাকম্পিতহস্তে অলঙ্কারগুলি একে একে বের করে আমাকে দেখাতে লাগ্‌ল। অলঙ্কারসম্বন্ধে বিদেশীর পরিহাস আশঙ্কা ক'রে, রুদ্ধশ্বাস হয়ে, এরূপ সকরুণ লজ্জিতনেত্রে আমার মুখের দিকে চাচ্ছিল যে, আমার মনে হ'ল, নিন্দাবাদের বিন্দুমাত্র তাপ লাগ্‌লেই বুঝি, নিদাঘকুসুমের মত বালিকাটি শুকিয়ে উঠ্‌বে। অলঙ্কারের মধ্যে অনেকগুলি হীরকখচিত ও বেশ মূল্যবান্। কতকগুলি অলঙ্কার যথার্থই বড় সুন্দর ও সুরুচির পরিচায়ক, কিন্তু দুই একটি অলঙ্কার আমার চক্ষে অত্যন্ত স্থূল ও বর্ব্বরোচিত বোধ হ'ল। বঙ্গদেশের ললনারা পূর্ব্বে যে অলঙ্কার ব্যবহার কর্‌তেন, তার মধ্যে অনেকগুলি মুসলমানদের অনুকরণের ফল ;—তা'র তুলনায় এই মহীশূরী অলঙ্কারগুলি অনেক শ্রেষ্ঠ ও সুরুচিসম্পন্ন। মুসলমানরাজার অনুকরণটা উত্তর-ভারতে সর্ব্বপ্রকার সম্প্রদায়ের মধ্যে যেরূপ হয়েছিল, দাক্ষিণাত্যে যে তার শতাংশের একাংশও হয় নাই, তা এই উভয়স্থানের হিন্দুদের আচার-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ তুলনা কর্‌লে সহজেই উপলব্ধ হয়। এই ঘোমটাটি ত আমার মনে হয়, খাস মুসলমানী অনুকরণ। দক্ষিণভারতে হিন্দুদের মধ্যে ঘোম্‌টা একেবারেই নেই। কোন প্রত্নতত্ত্ববিৎ হয়ত একটা পুরাতন সংস্কৃতশ্লোক উদ্ধৃত করে এখনই প্রমাণ দিবেন যে, ঘোমটাটা আমাদের দেশে চিরকালই আছে। অবশ্য, যদি এমন একটা শ্লোকই হয়, তবে তার উপর আমার আর কিছু কথা নেই। লক্ষ্মণসেন একটা সংস্কৃতশ্লোকের খাতিরে যখন বাঙ্গলার সিংহাসনটাই ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন তাঁর স্বদেশী হয়ে একটা শ্লোকের

জন্ম ঘোমটাতত্বসম্বন্ধে এই সামান্য বিশ্বাস পরিবর্ত্তন করা আমার পক্ষে বিশেষ কঠিন হ'বে না। যাহোক, অলঙ্কারগুলি দেখে সেগুলির যথেষ্ট প্রশংসা করলাম। প্রশংসাবাদে বালিকাটি সন্তুষ্ট হ'লেও লজ্জায় তার আকর্ণগণ্ডস্থল আরক্ত হয়ে উঠল। নিজের অলঙ্কারগুলির প্রশংসায় তার যে আহ্লাদ হয়েছে, পাছে তা এই বিদেশীর নিকট ধরা পড়ে, এই ভাবনাটি বালিকার লজ্জাবনত স্বচ্ছ লোচনযুগলে প্রকাশ পেয়ে, তার সেই গভীর অন্তর্নিহিত আহ্লাদের পরিমাণটা আমাকে জানিয়ে দিল। দেখলাম, লজ্জা ও স্ত্রীজনোচিত শান্ত রমণীয়তায় হিন্দুললনা সর্ব্বত্রই সমান। যে অলঙ্কারগুলি দেখলাম, সেগুলি বর্ণনা করতে চেষ্টা করব না। কারণ, আমার মনে হয়, পুরুষের সে চেষ্টা ধৃষ্টতামাত্র। শুনলাম, পূর্ব্বে মহীশূরে মুক্তার গহনার বড় 'রেওয়াজ' ছিল, এখন না কি সে রুচির পরিবর্ত্তন হচ্ছে। মুক্তার পরিবর্ত্তে হীরকের উপর আধুনিক ললনাগণের স্নেহ জন্মাচ্ছে। তা ছাড়া, গহনার গড়নসম্বন্ধেও বিলাতী অনুকরণে রুচির যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হ'য়ে অনেকটা মার্জ্জিত হয়েছে। আমাদের দেশের মেয়েদের সধবার চিহ্নস্বরূপ যেমন হাতে 'নোয়া' পরবার প্রথা আছে, এখানে তেমন নেই। স্ত্রীলোকেরা সধবা অবস্থার বিশেষ চিহ্নস্বরূপ এখানে কণ্ঠে একরকম সোণার হার পরেন। কুমারী বা বিধবার এই হারবিশেষে অধিকার নেই। শুনলাম, ঐ হার বিবাহরাত্রে বর স্বহস্তে বধূর কণ্ঠে পরিয়ে দেন। সধবা অবস্থায় সে হার ত্যাগ করা অতীব দূষ্য বলে পরিগণিত হয়। সীমন্তে সিন্দুর পরাটা এখানেও ঠিক আমাদের দেশের মত—একমাত্র ভাগ্যবতী সধবারই তাতে অধিকার। অন্যান্য অলঙ্কারের মধ্যে এঁরা একরকম স্বুবর্ণনির্ম্মিত কোমরবন্ধ পরিধান করেন, সেটা আমি উল্লেখযোগ্য মনে করি। এগুলি প্রায়ই খুব মূল্যবান এবং অবস্থাবিশেষে হীরকাদি-খচিত। কাপড়ের উপরে কটিদেশে এই আঁট-সাঁট কোমরবন্ধগুলি

পরি ি হয়। এই কটিবন্ধগুলির সম্মুখভাগটা বিলক্ষণ চওড়া। ঘাগর া মত পরিহিত বহুমূল্য জরির কাজ করা নীলকাপড়ের উপর ঐ ঝক্‌ঝকে কোমরবন্ধগুলির একটা বিশেষ সৌন্দর্য্য থাক্‌লেও, অনভ্যস্ত বাঙ্গালীর চোখে ওতে একটা পুরুষোচিত কাঠিন্যের ভাব দৃষ্ট হয়। এঁরা কবরীতে একরকম গোলাকার স্বর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কারবিশেষ পরিধা করেন। কৃষ্ণবর্ণ ঘনচিকুরবিশিষ্ট অনাবৃত কবরীর উপর এই অ রটি পীতবর্ণ গোলাকার পুষ্পের মত শোভা পায়। আমাদের দেশের নলকের মত এদেশের বলিকারা একরকম নলক ব্যবহার করে। নলকগুলি কিছু অধিক দীর্ঘ বলে' আমার চোখে সেগুলি সুন্দর বলে' বোধ হয় নাই। হীরকনির্ম্মিত 'নাকছাবি'ও এখানে অত্যন্ত প্রচলিত। সেটা এখানে রমণীগণের অত্যাবশ্যক বলে' বিবেচিত হয় এবং কি যুবতী, কি বয়স্থা, সকলেরই তা অপরিহার্য্য। সর্ব্বদা সেটা পরিধান না করা, অত্যন্ত দূষ্য বলে, বিবেচিত হয়। ললনারা প্রায় নাসিকার উভয়দিকে দুটি করে' নাকছাবি যুগপৎ ব্যবহার করেন। আমার মনে হয়, কর্ণাভরণের জন্য আমাদের দেশের ন্যায় 'দুল' বা 'ইয়ারিং' এখানে একেবারেই ব্যবহৃত হয় না, সবই হীরকনির্ম্মিত বোতামের মত ফুল।

অলঙ্কার-দেখা শেষ হলে, আমরা একটু বেড়াতে বের হলাম। বন্ধুবর আমাকে নিয়ে তাঁর একটি বিশেষ বন্ধু মিঃ সিএর বাড়িতে উপস্থিত হলেন। এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে পূর্ব্বে মাদ্রাজে আমার সামান্য আলাপ হয়েছিল। তিনি আমাকে দেখেই চিনে ফেল্লেন এবং খুব আপ্যায়িত আরম্ভ করে' দিলেন। আমাদের বসিয়ে তৎক্ষণাৎ একটি থালে করে' সেই আস্ত আস্ত পান, সিদ্ধকরা সুপারি, নারকেলের কুচি ও চূণ আনিয়ে আমার নিকট ধরলেন। সেই অখাদ্য পানগুলা তখন খাবার বিশেষ ইচ্ছা না থাকায়, অনেক ধন্যবাদ দিয়ে, এখন পান

থেতে ইচ্ছা নেই, এই কথাটি জ্ঞাপন করলাম। আমার কথা শে হতে না হতে ভূতাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় বন্ধুবর অকস্মাৎ উচ্চহাস্য করে উঠলেন এবং মিঃ সি-টিও অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হয়ে শূন্যদৃষ্টিতে একবার আমার ও একবার বন্ধুবরের মুখের দিকে অত্যন্ত অসহায়ভাবে তাকাতে লাগলেন। বিনাকারণে বন্ধুবরের এই অনৈসর্গিক হাসিটা আমার মনে যেন একটু ভয় জন্মিয়ে দিলে। পরক্ষণেই বন্ধুবরের হাসি একটু নৈসর্গিক আকার ধারণ করলে বুঝ্‌তে পারলাম যে, হা কোন ভৌতিক উপদ্রবে হয় নাই, উহা হাস্যরসাত্মক কোন নৈসর্গিক কারণ-সঞ্জাত। অনেক চেষ্টা করেও কিন্তু কারণটা ঠাওরাতে পারলাম না। হতে পারে, কোন-একটা মহীশূরী হাসির ব্যাপার ঘটেছে, যা হয়ত অশিক্ষিত বাঙ্গালীর চোখে ঠেকা অসম্ভব। কিন্তু মিঃ সি, তা হ'লে হাসলেন না কেন? মিঃ সি-ও ত খাস মহীশূরী—আয়েঙ্গার ব্রাহ্মণ। হাসা দূরে থাক্, তিনি বন্ধুর হাসি শুনে যেন আশ্চর্য্য হ'য়ে আমার দিকে হাঁ করে' রইলেন। বড়ই সমস্যায় পড়লাম। সর্ব্বদিকে বেশ ভাল করে' বিবেচনা করে' শেষে সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হলাম যে, বন্ধুবর ভূতাবিষ্ট হয়েছেন, অথবা যাকে ডাক্তারীতে 'ক্ষণিক খিপ্তা' বলে সেইরকম গোছের একটা-কিছু ঘটেছে। ভূতাবিষ্ট বন্ধুটির হাসিটা কতক সংযত হ'য়ে আসতেছিল, এমন সময়, আমি চেয়ার হতে উঠে মিঃ সিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি'? যেমন ঐ কথা বলা, আর বন্ধুবরের হাসিটা আবার 'জল যথা জাঙ্গাল ভাঙ্গিলে' গোছের হয়ে উঠল। তিনি হাসতে হাসতে রুদ্ধশ্বাস হয়ে আমাকে হাত ধরে বসালেন ও মিঃ সিকে মাতৃভাষায় হাসতে হাসতে কি বুঝাতে লাগলেন। মিঃ সির মুখখানি তৎক্ষণাৎ প্রফুল্ল হয়ে উঠল এবং তাঁর চোখের বিস্ময়পূর্ণ সেই বিহ্বল চাহনিটা একেবারে কেটে গেল। আমিও আশ্বস্ত হলাম। যাহোক, শেষে শুনলাম, এই গোলযোগটি না কি আমিই

বাধিয়েছি। মিঃ সি যখন আমাকে পান ও সুপারি নিতে অনুরোধ করেছিলেন, তখন না কি, পান খাবার ইচ্ছা না থাকলেও, আমার পান ও সুপারি গ্রহণ করা উচিত ছিল। এখানকার এই না কি দেশাচার। পান-সুপারি প্রত্যাখ্যান করলে না কি গৃহস্বামীর বড় অপমান করা হয়। আমি উহা প্রত্যাখ্যান করেছিলাম বলেই, শুনলাম, মিঃ সি অত বিস্ময়াপন্ন হয়েছিলেন। তাঁদের দেশাচারের অজ্ঞতা যে উহার একটা কারণ হতে পারে, এই সোজা কথাটা তাঁর বুদ্ধিতে তখন যোগায় নাই। পান ও সুপারি উপস্থিত হ'লেই গৃহস্বামীকে স্মিতমুখে অভিবাদন ক'রে, আগ্রহসহকারে দুএকটি পান ও সুপারি থালা হ'তে তুলে লওয়াই এখানকার ব্যবস্থা; সুতরাং পান খেতে ইচ্ছা নেই বলাতে, মিঃ সি একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। বন্ধুবর সমস্ত ব্যাপারটি কিন্তু তখনই বুঝ্‌তে পেরেছিলেন এবং আমাদের উভয়ের দুর্দ্দশা দেখে ঐরকম বীভৎসভাবে হেসে উঠেছিলেন। যাহোক, সমস্যা মিটলে মিঃ সির নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করে ও বন্ধুবরকে তাঁর হাসির এই বীভৎস-রসাত্মক ভাবটাকে একটু সংযত করে' ভবিষ্যতে অপেক্ষাকৃত একটু হাস্যরসাত্মক করবার চেষ্টা করতে অনুরোধ করে, আমি মিঃ সির সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হলাম। আলাপে বড়ই পরিতুষ্ট হলাম। দেখলাম, ভদ্রলোকটি অতীব বুদ্ধিমান ও বিশেষরকম মিশুক। শীঘ্রই আমার সঙ্গে বেশ আলাপ করে' নিলেন। ইনিও মাদ্রাজ ইউনিভার্সিটীর একজন গ্রেজুয়েট। দেখলাম, ইনি পৃথিবীর অনেক খবর রাখেন। কথায়বার্ত্তায় ক্রমে রাত্রি হয়ে পড়ায়, বিদায়গ্রহণ করে আমরা বাড়ি ফিরলাম। পরদিন সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই ঘরের দোর ঠেলাঠেলিতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। খুব ভোরে ওঠাটা নিজের তেমন অভ্যাস নেই বলে, একটু বিরক্তি বোধ হ'ল। দোর খুলেই দেখলাম, পেণ্টুলেন-কোট ও মাথায় সাদা পাগড়ী আঁটা মিঃ সি উপস্থিত। কি বিপদ্!

ইনি কি রাত ৩টার সময় উঠে বাড়ি থেকে সাজসজ্জা করে’ এখন ভিজিট রিটার্ণ কর্‌তে এসেছেন না কি? ভিজিট ফিরিয়ে দিবার জন্য ভোরবেলা মানুষকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে বিছানা থেকে ঠেলে তোলা যে, কোন্ দেশী সভ্যতা তা বুঝে উঠতে পারলাম না। সভ্যতাটি যে দেশেরই হোক না কেন, সেটা যে ভিজিট-পাওনাদারের পক্ষে অতীব পীড়াদায়ক, ভুক্তভোগী হ’য়ে সেটি আমি বেশ বুঝতে পারলাম। চোখ মুছতে মুছতে সুপ্রভাত ইচ্ছা করে ধন্যবাদ দিলাম ও একটু লজ্জা দিবার জন্য বল্‌লাম যে, খুব ভোরে উঠাটা আমার তেমন অভ্যাস নেই। তিনি কিন্তু লজ্জা পাওয়া দূরে থাক্, আমাকেই লজ্জা দিলেন। হাসতে হাসতে বল্লেন "ইংরাজী শিষ্টাচারের কথা ছেড়ে দিন। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে শয্যাত্যাগ করতে বিরক্ত হওয়া ব্রাহ্মণের উচিত নহে।" কথাটা শুনে একটু লজ্জিত হলাম বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যসম্বন্ধে তাঁর যুক্তিগুলির সহিত নিজের সমস্ত কার্য্যের যে সামঞ্জস্য নেই বোলতে বাধ্য হলাম। প্রাতে শয্যাত্যাগান্তে পেণ্টুলেন ও কোট পরে’ ছড়ি হাতে ক’রে প্রাতর্ভ্রমণটা দেশকালপাত্র-অনুসারে যদি ব্রাহ্মণের প্রাতঃকৃত্যের মধ্যে গণ্য হ’তে পারে, তা হ’লে একটু বেশী বেলা পর্য্যন্ত বিছানায় গড়াগড়ি দেওয়াটা, আর এমন বিশেষ কি অপরাধ হয়েছে যে, সেটা ব্রাহ্মণানুচিত কদাচারের মধ্যে গণ্য হ’তে পারে। মিঃ সি কিন্তু না-ছোড়-বন্দা; ভোরে ওঠাটা মানুষের যে বিশেষ দরকার, এসম্বন্ধে ক্রমে একটি ঘোরতর তর্ক বাধাবার উদ্যোগ করলেন। সকালে উঠে দুর্গানাম করবার আগেই যেরকম তর্কের যোগাড় দেখলাম, তাতে সে দিনটা ভাল যাবে কি না সন্দেহ হতে লাগল। দেখ্‌তে দেখ্‌তে বন্ধুবরও এসে উপস্থিত হলেন ও এত ভোরেই একটি তর্ক বেধেছে দেখে বেশ উৎফুল্ল হয়ে উৎসাহের সহিত মিঃ সির সঙ্গে যোগ দিলেন। দেখলাম, মিঃ সি

করেন, তর্কফলের কোন আকাঙ্ক্ষা করেন না। নিষ্কামধর্ম্ম যেমন সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ তার্কিকের মধ্যে নিষ্কামতার্কিকরাও অতীব ভয়ানক। তর্কের ফলাকাঙ্ক্ষা করেন না বলে, এই শ্রেণীর তার্কিক-দিগকে পরাজয়স্বীকার করান অতীব দুঃসাধ্য; এঁদের তর্কের ফল যা'ই কেন হো'ক না, এঁরা তা গ্রাহ্য করেন না, সুতরাং এঁদের তর্কও কখন থামে না। বন্ধুদ্বয় শাস্ত্রীয় প্রমাণ ছেড়ে দিয়ে, ভোরে-ওঠার সপক্ষে ইংরাজী নজীরসকল উদ্ধৃত করতে আরম্ভ করে দিলেন। যাহোক, শেষে অনেক হাস্যপরিহাসের পর কফিপানান্তে কোনরকমে তর্কটা শেষ করে, আমরা একখানি ঠিকাগাড়ি করে' মিউজিয়ম দেখতে বের হলাম। মিউজিয়মটি কলিকাতার মিউজিয়মের তুলনায় কিছুই নয়, একেবারে তুলনারই অযোগ্য। মহীশূররাজ্যের দ্রব্যাদির সংগ্রহই অধিক। শুনলাম, হায়দার ও টিপুর স্মরণচিহ্নগুলি প্রায় সমস্তই ভারত-গভর্ণমেণ্ট হস্তগত করে' মাদ্রাজ-মিউজিয়মে নিয়ে গিয়েছিলেন। পরে ভারতপ্রেমিক লাটকুর্জ্জনের ভিক্টোরিয়া-মেমোরিয়াল-হলের জন্য সেগুলি সেখান হ'তে এখন কলিকাতায় আনা হয়েছে। মিউজিয়মটি ক্ষুদ্র হ'লেও, মাদ্রাজ-মিউজিয়মের তুলনায় মন্দ নহে। অতি সুন্দররূপে সজ্জিত। মহীশূরের খনিজপদার্থের সংগ্রহটি সামান্য হলেও আমার বেশ ভাল লেগেছিল। মহীশূররাজ্যের প্রস্তর ও অন্যান্য খনিজপদার্থ পরীক্ষা ও ব্যবহারোপযোগী করবার জন্য, ষ্টেটের যে জিওলজিকাল অফিসটি আছে, শুনলাম, সেটি সুন্দররূপে পরিচালিত।

মিউজিয়ম দেখা শেষ হলে, আমরা পরলোকগত মহাধনবান প্রসিদ্ধ বণিক মিঃ টাটার *Experimental Silk Firm* দেখতে গেলাম। কারখানাটি ব্যাঙ্গালোর সহর হ'তে প্রায় দেড়ক্রোশ দূরে। শুনা যায়, পূর্ব্বে ব্যাঙ্গালোরের নিকটবর্ত্তী স্থানগুলিতে যথেষ্ট রেশম উৎপন্ন হ'ত। গুটিপোকাদের মধ্যে একসময় হঠাৎ একটা ভীষণ মড়ক উপস্থিত হয়ে

না কি রেশমের চাষটাকে একেবারে উৎসন্ন দেয়। চাষটাকে পুনর্জীবিত করবার চেষ্টা কিন্তু সেই অবধি আর কখন করা হয় নাই। কারণ, ভগবানের মারের উপর কথা কওয়া, অদৃষ্টবাদী ভারতবাসীদের স্বভাব-সিদ্ধ নহে। যা হোক, কয়েক বৎসর হ'ল মিঃ টাটা, এই চাষটি পুনর্জীবিত করা সম্ভব কি না, পরীক্ষা করবার জন্য ব্যাঙ্গালোরের নিকট অনেকটা স্থান নিয়ে ও জাপান হ'তে একজন পারদর্শী আনিয়ে, এই কৃষি-আগারটি স্থাপিত করেছেন। কারখানাটিতে গুটিপোকা জন্মান হয়। কারখানার সংলগ্ন অনেকটা জমিতে তুঁতগাছের চাষ করা হয়েছে। তুঁতগাছের পাতাই, শুনলাম, ঐ কীটদিগের আহার। কারখানাটি খুবই ছোট হারে করা হয়েছে। উহা একজন বহুদর্শী জাপানী অভিজ্ঞের তত্ত্বাবধানে থাকলেও, এর বর্ত্তমান অবস্থা দেখে কিন্তু আমার মনে হয়, টাটার মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারীরা এই কারখানাটিসম্বন্ধে তত মনোযোগী নন। এই কারখানাটি দেখে কিন্তু টাটার সুশিক্ষিত ব্যবসায়বুদ্ধি ও নানাবিধ নূতনরকমের ব্যবসায় উন্নতিলাভ করবার ইচ্ছা ও দক্ষতার প্রশংসা না করে' থাকতে পারলাম না।

শ্রীযতিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়।

পৃথিবীতে মানবাগমন।

পৃথিবীতে চিরদিন জীব বাস করে নাই; অন্ততঃ আমাদিগের ন্যায় জীব, চিরদিন বাস করিতে সক্ষম হয় নাই। যখন ইহা অত্যুষ্ণ ছিল, তখন বর্ত্তমানযুগের সমস্ত জীববাসের অনুপযোগী ছিল। ইহার জলময় অবস্থাও প্রথম সময়ে এ যুগের জীবগণের উপযুক্ত ছিল না। তৎকালে বায়ুর অবস্থাও আমাদিগের প্রাণনাশক ছিল। জলে চূণ, বায়ুতে অঙ্গারাম্ল এত অধিক ছিল যে, ইহা মানবের বাসোপযোগী ছিল না। ধরাপৃষ্ঠের নিম্নতম স্তর জীবচিহ্নবিরহিত। যে স্তরে প্রথম জীবচিহ্ন পাওয়া যায়, উহাতে চূণ ও অঙ্গারের ভাগ অত্যন্ত বেশি। চূণ ও অঙ্গারের সহিত কি জীবনের কোন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে? এখনও আমরা অঙ্গার-ই; আমাদিগের অস্থিসকল চূণ-অঙ্গার-মিশ্রিত।

জীব যেরূপে এই ধরাপৃষ্ঠে প্রথম আবির্ভূত হইল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই। কেহ একরূপে, কেহ অন্যরূপে, তাহার আবির্ভাবের রহস্যভেদ করিবার চেষ্টা করেন। আমরা সে কথা এস্থলে তুলিব না। কিন্তু জীব ধরাপৃষ্ঠে যেরূপেই আসিয়া থাকুক, তৎপরবর্ত্তী কালের ইতিহাস একবারে দুর্ব্বোধ্য নহে। কীট হইতে আরম্ভ করিয়া মানব পর্য্যন্ত বিবেচনা করিতে গেলে, জীবের ঊর্দ্ধগতি অতি বিস্ময়-জনক বোধ হয়। আর মনে হয়, যেন ধরিত্রী মানবের শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন; যেন তাহারই জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন।

সে সময়ে সমুদ্রে চূণ, বায়ুতে অঙ্গার, অত্যন্ত অধিক ছিল। সে কালের সমুদ্রবাসী জীব, ক্ষুদ্র হইতে অতি বৃহৎ পর্য্যন্ত সকলেই, অল্লাধিক চূণ টানিয়া লইয়া জলকে পরিষ্কার করিতে লাগিল। তাহা-দিগের দেহ প্রায় চূণই। এই সকল জীবের সংখ্যা এত অধিক হইল

যে, তাহাদিগের দেহগঠনকার্য্যে অনেক চূণ ব্যয়িত হইল। রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলেও অনেক চূণ মুসদ্রতলে পতিত হইয়া গেল; ইহাতেও জল অনেক বিশুদ্ধ হইল; ক্রমে সমুদ্রে চূণের আধিক্য গিয়া লবণের আধিক্য উপস্থিত হইল। বর্ত্তমানযুগে এই অবস্থাই বিদ্যমান, আর এই পদার্থ (লবণ) মানবের বিশেষ প্রয়োজনীয়। জল এইরূপে আদিমকাল হইতেই মানবের উপযোগী হইতেছিল। কিন্তু বায়ু কিরূপে পরিস্কৃত হয়? মানব যে অঙ্গারাম্ল সহ্য করিতে পারে না। মানবকে আনিতে হইলে এই পদার্থ বর্জ্জন করা আবশ্যক। তাই, সেকালের প্রকাণ্ড উদ্ভিদসকল ঊর্দ্ধে কাণ্ড ও শাখাপ্রশাখা বিস্তৃত করতঃ বায়ু হইতে অঙ্গার টানিয়া লইয়াছিল, এই উপায়ে যেমন বায়ুও পরিস্কৃত হইতেছিল, তেমনি সেই সকল উদ্ভিদের দেহে অঙ্গার সঞ্চিত হওয়ায় মানবের অগ্নি জ্বালাইবারও সদুপায় হইতেছিল। সে কালের উদ্ভিদসকল এত বৃহৎ * এবং এত বিস্তৃত ছিল যে, ইহাদিগের দেহগঠনকার্য্যে অনেক অঙ্গার ব্যয়িত হইয়াছে; এবং বায়ুও ক্রমে পরিস্কৃত হইয়াছে। সমুদ্র হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া যেমন জলস্থ ক্ষার এবং অন্যান্য ভাসমান পদার্থকে তলদেশে পড়িয়া যাইবার সাহায্য করিয়াছে, তেমনই ঐ বাষ্প বৃষ্টিরূপে পতিত হইতে অনেক অঙ্গারাদি লইয়াই পড়িয়াছে; তাহাতে গন্ধক, অঙ্গারাদি পদার্থ সেই জলের সহিত মিশিয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইয়া, একদিকে ধরার বাসোপযোগিতা, অন্যদিকে বায়ুর বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিয়াছে। এইরূপ নানাবিধ উপায়ে প্রকৃতি জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ধীরে ধীরে অনেক পরিবর্ত্তন করিতেছিলেন। সে সকলই ভূপৃষ্ঠকে মানবের বাসোপযোগী করিবার জন্য।

ভূপৃষ্ঠের সম্বন্ধে অতীতকালকে তিনভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে। (১) অজীবাবস্থা, (২) উদ্ভিদযুগ, (৩) জন্তুযুগ। "বলা বাহুল্য যে, উদ্ভিদযুগেও জন্তু ছিল, এবং জন্তুযুগেও উদ্ভিদ আছে। গরিষ্ঠ লক্ষণকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ বিভাগ করা যায়।" * জন্তুযুগে জলে-স্থলে যে সকল অতিকায় ও ভয়ঙ্কর জন্তুসকল বাস করিত, তাহারা প্রায় মস্তিষ্কহীন ছিল। সে যুগে সকল জন্তুরই মস্তিষ্ক নিতান্ত অল্প ছিল। সুতরাং বুদ্ধিবৃত্তিও যৎসামান্য ছিল। মানব তখনও ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয় নাই; হইলে তাহাদিগকে বশে আনিতে পারিত কি না সন্দেহ। বরং ইহাই আশঙ্কা হয় যে, সে যুগে মানব বিদ্যমান থাকিলে, ঐ সকল পশুর পার্শ্বে আত্মরক্ষা করিতেই সমর্থ হইলে চলে তখনকার সামান্য একটি সরীসৃপ, এখনকার উষ্ট্রের ন্যায়। এবং বৰ্দ্ধিতমা ...হাদি স্থলে, তিমি-আদি জলে, সে সময়কার অনতি- বীজ উপ্ত হইল। সে অবস্থায়, তাদৃশ দুষ্ট, অস্ত্রবহুল, অশিষ্য, হিংস্র- ...পাবৰ্ত্তের জটিল নিরস্ত্র মানবের উপযুক্ত বাসস্থান হইতেই পারে না। সেইজন্য প্রকৃতি [illegible] বিবিধ উপায়ে তাহাদিগকে সরাইয়া দিলেন। এই সকল উপায়ের মধ্যে শীত, গ্রীষ্ম, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা, আহারের অসদ্ভাব এবং অযোগ্যতা ইত্যাদি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জন্তুগণ এই সকল অস্ত্রধারিণী প্রকৃতির সহিত জীবনসংগ্রামে একে-একে পরাজিত হইতে লাগিল। যে এই কঠোর জীবনসংগ্রামে কোনরূপে আত্মরক্ষা করিতে সক্ষম হইল, সেই বাঁচিল; অন্যান্য চিরতরে বিলুপ্ত হইল। এই-রূপে যাহারা বাঁচিল, তাহারা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায়, এবং অধিকতর মস্তিষ্কবান। তাহারা শিষ্য, এবং পূৰ্ব্ববৎ হিংস্র ও অস্ত্রবহুল নহে। এই সময়ই মানবের আবির্ভাবের উপযুক্ত সময়। বায়ু বিশুদ্ধ হইয়াছে;

---

* ভারতী ২৯ ভাগ ১১৫৩ পৃঃ

নিদারুণ উষ্ণতার যুগ অতীত হইয়াছে ; অতিকায়, হিংস্র, বহু-অস্ত্রধারী পশুগণ একে-একে ভূপৃষ্ঠ হইতে বিদায়গ্রহণ করিয়াছে। এই সময়ের জন্যই ধরিত্রী অপেক্ষা করিতেছিলেন ; যুগযুগান্তর হইতে প্রস্তুত হইতেছিলেন। শুভক্ষণে মানবের জন্ম হইল ; প্রকৃতি কৃতার্থা ও পরিতৃপ্তা হইলেন।

সে কত কালের কথা তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। নানা জনে নানারূপ অনুমান করেন। সে কাল তিনলক্ষ বৎসরের ন্যূন হইতে পারে না ; যাহাকে আমরা জন্তুযুগ বলিয়াছি, তাহারই শেষাংশে মানবের আবির্ভাব, এইমাত্র বলা যাইতে পারে।* এই সময়ে অতি অদ্ভুত ব্যাপার সম্পন্ন হইয়াছিল। প্রকৃতি নির্ব্বোধ, ক্ষুদ্রমস্তিষ্ক, স্তন্যপায়ী জীবগুলিকে যুগপৎ বুদ্ধিবৃত্তির অ[illegible] লেন। যেন নিজের হাতে সকলেরই মস্তিষ্ক বাড়াই[illegible] সকল অপেক্ষাকৃত কম হিংস্র জীব তখন থাকি[illegible] সকলেই যুগপৎ মস্তিষ্কবান্ হইল। হস্তী, অশ্ব, গ[illegible] পশুগণ, আর ক্ষুদ্রকায় বানরগণ, সকলেরই মাথার খোল (কপালাস্থি) একসঙ্গে বাড়িয়া গেল ; সকলেরই মস্তিষ্কের পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী Tertiary সময়ে যেরূপ ছিল, তাহা হইতে অনেক বাড়িয়া গেল†। মুহূর্ত্তমধ্যে এই অভূতপূর্ব্ব অত্যাশ্চর্য্য ব্যাপার কেন সংসাধিত হইল? যদিবা মুহূর্ত্তমধ্যেও না হউক, যাহা অতীতকালে যুগযুগান্তরেও হইতে পারে

* এই সময়কে ভূতত্ত্ববিৎগণ Lower Miocene যুগ বলেন। The Romans Lecture 1905, pp. 17-18.

† It is a very striking fact that it was not in the ancestors of Man alone that this increase in the size of the brain took place at this same period, *viz.* the Miocene...... Other great mammals of the earlier Tertiary period were in the same case.—Nature an Man. R. Lecture 1905, p. 8.

নাই, তাহা এই (Miocene) জন্তুযুগের শেষার্দ্ধে এত তাড়াতাড়ি হইয়া উঠিল কেন ? আমি বলি, মানবের অভ্যর্থনার জন্য। মানব মানব-নাশের উপযুক্ত হইতে গেলে নখ, শৃঙ্গ, ভীমদন্ত ইত্যাদি লইয়া আবির্ভূত হইতে পারে না। মানবের সুন্দর রূপ, দেবোপম গুণসকল বিকশিত করিতে হইলে, তাহাকে একদিকে যেরূপ ক্ষীণ, দুর্ব্বল ও শান্ত করিতে হয়, অন্যদিকে তাহাকে তেমনি বুদ্ধিশালী করিতে হয়। তাই তাহার ক্ষুদ্রদেহে বিশালমস্তিষ্ক। এবং তাহাকে সর্ব্বজীবের শ্রেষ্ঠ করিতে হইলে, সকলকে তাহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত করিতে হইলে, তাহাদিগেরও গৃহপালিত হইবার অথবা অন্যবিধ শিক্ষাপ্রাপ্ত হইবার যোগ্যতা থাকা আবশ্যক। তাই তাহাদিগেরও নিতান্ত মস্তিষ্কহীন হইলে চলে না। এই জন্য যুগপৎ সমস্ত স্তন্যপায়ী জীবই বর্দ্ধিতমস্তক এবং বর্দ্ধিতমস্তিষ্ক হইয়া গেল। তখন হইতেই মানবের শ্রেষ্ঠত্বের বীজ উপ্ত হইল। এই মস্তিষ্কপদার্থের নানা কোষের বিচিত্রতা, নানা আবর্ত্তের জটিলতা, ইহাকে অসীম শক্তিশালী করিয়া তুলিয়াছে। ইহার আয়তন ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহার শক্তির সীমা নির্দ্দেশ করা অসম্ভব। মানবের দেহ ত ইহার পূর্ণবিকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র নহেই। ইহার শক্তি পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হইলে মানবদেহ ত ইহার প্রয়োজনসাধনে অসমর্থ হইবেই। মানবের বর্ত্তমান মনও, এই অসীম শক্তিসম্পন্ন পদার্থের সমস্ত সাধনা আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইবে না। এখনই মানব-মন আংশিকরূপে ইহার নিকট পরাস্ত হইয়াছে। কিন্তু সে কথা কিছু বিস্তৃত, তাহা ক্রমে আলোচিত হইবে।

শ্রীশশধর রায়।

সমসাময়িক ভারত।

রাষ্ট্রনীতি।

(২)

একজন ইংরেজ আমাকে বলিয়াছিলেন ;—"ন্যাশানাল-কংগ্রেসের নিকট, ভারতের মতামত জানিবার আশা করিও না। কংগ্রেসের প্রতিনিধিগণ হয় বড়মানুষ, নয় মধ্যবিত্তশ্রেণীর লোক। তুমি জানিবে, আমরাই দেশের সাধারণ প্রজাবর্গের স্বার্থসমর্থন করিয়া থাকি।" এই ইংরেজ তাঁহাদের দিক্ হইতে যাহা বলিয়াছেন, তাহা কতকটা ঠিক্। ব্রিটিশ-সরকার, অমুক বিশেষশ্রেণীর অনুকূলে শাসন-কার্য্য নির্ব্বাহ করেন, এ কথা বলা যায় না। ব্রিটিশ-সরকার, নির্ব্বিশেষ-ভাবে সকল শ্রেণীরই ধনশোষণ করিতেছেন। এ বিষয়ে তাঁহাদের তৌলদণ্ড,—বড়মানুষ ও মধ্যবিত্ত, উভয়েরই সমান ওজন। এই-রূপই ইংরেজের অপক্ষপাতিতা। কিন্তু এই ইংরেজটি ইহাও বলেন,—কংগ্রেসের মত, দেশের মত নহে। অধিকাংশ লোকের কোন মতামতই নাই। এ দেশে (Public Spirit) "সার্ব্বজনিক-কার্য্যোৎসাহ" বলিয়া একটা জিনিস্ কস্মিনকালেও ছিল না। এই কারণেই, দেশের কে রাজা হইল না হইল, দেশের লোক সে বিষয়ে বরাবর ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া আসিয়াছে। হাঁ, আজিকার দিনেও, অধিকাংশ লোক এসম্বন্ধে নিরপেক্ষ, নির্লিপ্ত, অজ্ঞ, অথবা নীরব। ব্রাহ্মণপ্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ বর্ণের লোকই প্রতিবাদকারী। আধুনিক যুগের ভাবসকল তাহাদের মনে প্রবেশ করিয়াছে। অন্য বর্ণের লোকেরা এখনও প্রস্তুত হয় নাই। একটুকরা খমিরে, এই বিপুল জনরাশি কখন গাঁজিয়া উঠিতে পারে না! এ কথা খুবই সত্য। তাই, রাজপুরুষদিগের

বেশ সুবিধা হইয়াছে। তাঁহারা হিন্দুসমাজের মধ্যেই, মনের মত কতকগুলি মিত্র ও সহকারী প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মিত্রগুলি,—রক্ষণশীলশ্রেণীর লোকদিগের নীরবতা, ঔদাসীন্য, নির্লিপ্ততা, এবং যাহা আরও গুরুপরিণামগর্ভ—যাহারা গ্রামপল্লির ধূলাকাদার মধ্যে নিয়ত বাস করে, সেই নগণ্য বিপুল জনসাধারণের অজ্ঞতা।

বসুমহাশয় বলেন,—"ভারতে ইংরাজ-আধিপত্যের গূঢ়রহস্য, ইংরাজের সামরিক বল নহে, কিংবা তদুৎপন্ন কতকগুলি সুযোগ-সুবিধা নহে; পরন্তু এদেশের বর্ণভেদপ্রথা, দেশের লোকের ধর্ম্ম ছাড়া আর সকল বিষয়েই ঔদাসীন্য, এবং আধ্যাত্মিক সভ্যতাজনিত অতিমাত্র শান্তিপ্রিয়তা।" অবশ্য, যে গ্রামবাসী ব্যক্তি একটু জানে-শোনে, জাতীয়-চেষ্টা-অনুষ্ঠানের সহিত তাহার আন্তরিক সহানুভূতি আছে। কিন্তু উহাদের মধ্যে এমন কত লোক আছে, যাহারা—এমন কি—জানে না—তাহারা কোন্ সরকারের অধীনে বাস করে।

এসম্বন্ধে অজ্ঞতাই প্রধান প্রতিবন্ধক। বিশিষ্ট বর্ণের লোকদিগের কথা স্বতন্ত্র; তাহারা অতীব সতর্কতার সহিত হিন্দুধর্ম্মের বিশুদ্ধ ঐতিহ্য রক্ষা করিতে যত্নবান। তাহাদের নিকট রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপার অবজ্ঞার বিষয়,—অতীব নিকৃষ্ট জিনিস। তাহারা মনে করে,—ঐহিক স্বার্থ ছাড়া রাষ্ট্রনীতির আর কোন লক্ষ্য নাই, কাজেই উহা মানুষকে আধ্যাত্মিক সাধনা হইতে পরাঙ্মুখ করে। তুমি কি "Gorgias" পাঠ করিয়া দেখ নাই, সক্রেটিস্ কি কঠোরভাবেই পেরিক্লিসের রাষ্ট্রনীতির প্রতি দোষারোপ করিয়াছেন! প্রতিবাদকারী উত্তর করিবেন,—কোন বন্দর-নগর, জাহাজের বহর, অস্ত্রাগার, প্রাকারাবলী, এই সমস্ত রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ পুরুষের নিকট কত প্রিয়—কত আদরের জিনিস; প্রতিবাদকারী এইরূপ যতই বলুন না কেন, তত্ত্বজ্ঞানী আপনার কথা কিছুতেই ছাড়েন না। পেরিক্লিসের রাষ্ট্রনীতি কি

লোকদিগকে ভাল নাগরিক করিয়া তুলিয়াছে? না, তাহা করে নাই। অবশ্য সক্রেটিস্ ইহা অস্বীকার করেন নাই যে, থেমিস্টক্লিসের ন্যায় কিংবা সিমনের ন্যায়, পেরিক্লিস একজন সৎ ভৃত্য কিংবা একজন সুদক্ষ দ্রব্যসংগ্রাহক কিংবা নগরের একজন নিপুণ সরবরাহকারী ছিলেন না। তুমি বলিতেছ, তিনি অ্যাথেন্স্‌নগরকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন; তাহা হইলে এ কথাও তোমায় বলিতে হইবে, তিনি বিলাস ও সুখসম্ভোগের আতিশয্য আনিয়া অ্যাথেন্স্‌কে নষ্টও করিয়াছেন। অপরিমিত অস্বাস্থ্যকর মেদবৃদ্ধির ন্যায়, ধনবৃদ্ধিও একপ্রকার ব্যাধি-বিশেষ। আসল কথা,—কোন নগর ধনশালী হউক বা না হউক, তাহাতে বড় আইসে-যায় না;—নগরের নিয়ম-ব্যবস্থা উত্তম হওয়া আবশ্যক, ন্যায়ধর্ম্ম প্রতিপালিত হওয়া আবশ্যক। আমার বোধ হয়, এই সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনি গ্রীক্‌দিগের মধ্যে বড়-একটা পৌঁছে নাই। সক্রেটিসের সহনাগরিকগণ এতটা চতুর ও কাজের লোক যে, তাহারা ঐহিক স্বার্থকে তুচ্ছ করিতে পারে নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে এমন সব মুনিঋষির মত লোক ছিল—এখনও আছে—যাহারা এইরূপ উন্নত ধরণের ত্যাগস্বীকারে সম্পূর্ণরূপে সমর্থ। তাঁহাদের চক্ষে,—পোয়া-ঘণ্টাকালস্থায়ী ধ্যানের নিকট, দিগ্‌বিজয়ের শক্তি কিছুই নহে...যদি কোন ভারতপর্য্যটক সংবাদপত্রাদি তন্নতন্ন করিয়া পাঠ করেন, কংগ্রেসের বাগ্মীদিগের বক্তৃতা শ্রবণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার এ বিষয়ে সন্দেহমাত্র থাকে না। অবশ্য, নিজের ঔদাসীন্যের কথা ছাদের উপর হইতে তাঁহারা উচ্চৈস্বরে সকলের নিকট ঘোষণা করেন না। আমি কতকগুলি সুশিক্ষিত ব্যক্তির সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া দেখিয়াছি। আমার স্মরণ হয়,—যখন তাঁহাদিগকে কতকগুলি প্রশ্ন করিলাম—তাঁহাদের মুখমণ্ডল বিস্ময়-রঞ্জিত হইয়া উঠিল। রাষ্ট্রনীতি, রাষ্ট্রসংস্কার, ব্যবস্থাপকসভা—এই সমস্ত বিষয়, মুহূর্ত্তের জন্যও তাঁহারা কখনো

চিন্তা করেন নাই! একজন ফরাসী পর্য্যটকের এসব কি প্রশ্ন! কলিকাতার সংস্কৃতকালেজের প্রিন্সিপ্যালের সহিত এ বিষয়ে আমার যে কথোপকথন হয়, দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহার মর্ম্ম এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি। কেননা, এই কথোপকথনে, অতীব কৃতবিদ্য কয়েক শ্রেণীর লোকের মনের ভাব বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়;—সেই সব শ্রেণীর লোকের মনের ভাব জানা যায়, যাহাদের দৃষ্টি, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অপেক্ষা, অতীতের উপর বেশী নিবদ্ধ। যে সকল পণ্ডিত, যে সকল ব্রাহ্মণ, স্বজাতীয় সাহিত্যের অনুশীলন করেন, তাঁহারা যে সেই সাহিত্যের মধ্যে, প্রাচীন আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিস্থাপনের যথেষ্ট হেতু আছে বলিয়া মনে করিবেন, তাহা ত ধরা কথা; এমন কি, তাঁহারা অন্যপক্ষের কথা একবার চিন্তা করিয়াও দেখেন না। এই অধ্যাপককে আমি ধৃষ্টতাসহকারে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—তাঁহার কালেজ হইতে রাষ্ট্রবিপ্লবকারীর দল তৈয়ারী হইতেছে কি না। তিনি একটু বিস্মিত হইয়া উত্তর করিলেন:—

"আমাদের অধিকাংশ ছাত্র, কোন একটা বিশেষ কেজো উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া, এখানে যেসব গ্রন্থের পাঠ আরম্ভ করে, পরে সেই সব গ্রন্থই পুনঃপুনঃ অধ্যয়ন করিতে ভালবাসে। আপনি যে আন্দোলনকারীদের কথা বলিতেছেন, তাহাদের উৎসাহ খড়ের আগুনের মত। উহা চপলমতি বালকের ক্ষণিক উচ্ছ্বাস!" তাহার পরে তিনি একটু হাসিয়া বলিলেন, "প্রথম বয়সে, তাহারা সমস্তই ভাঙ্গিতে চাহে, কিন্তু একটু বেশী বয়স হইলেই আবার শান্তভাব ধারণ করে..." বয়স, পারিবারিক শিক্ষা, বিশেষতঃ জাতিভেদপ্রথা,—এই সমস্ত, সর্ব্বোচ্ছেদকারী সংস্কারকদের শীঘ্রই চৈতন্যসম্পাদন করে। হিন্দুসমাজের কেন্দ্রস্থলটি যেন চলন্ত বালুরাশির মত;—যুবকের দল যতই আন্দোলন করুক না কেন, ক্রমে উহার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যায়,—চাপা পড়িয়া

যায়! তাহার পর, পণ্ডিত বলিলেন :—"আমি দেখিতে পাই, ফরাসীদের মুখে অর্থশাস্ত্রের কথা ছাড়া আর কোন কথা নাই। বস্তুতঃ তাঁহাদের কথা শুনিলে মনে হয়, যেন অর্থশাস্ত্র ছাড়া আর কোন বিজ্ঞানই নাই। তোমাদের যেন একটা-কিছুর পরিবর্ত্তন করা চাই,—একটা-কিছু ভাঙ্গা চাই, একটা-কিছু নূতন করিয়া গড়া চাই। আমাদের জড়তা যেমন আমাদের হাড়ে-হাড়ে,—তোমাদের আন্দোলনও তেমনি তোমাদের হাড়ে-হাড়ে। যার যেরূপ প্রকৃতি। ইহা প্রকৃতিভেদের কথা ভিন্ন আর কিছুই নহে। শোনো বলি ;—আমরা নিজেই নিজের দেশ শাসন করি, কিম্বা ইংরেজ কিম্বা অপর কেহ আমাদের হইয়া দেশ শাসন করে, বস্তুতঃ তাহাতে কি আসিয়া-যায় ; দেশ-শাসন-কার্য্যটা চলা নিয়ে বিষয়। আমাদের গৃহের কার্য্যভার একজন কাহারো লওয়া আবশ্যক ; সে ভার একজন লইয়াছেন ; এখন আমরা নিশ্চিন্ত। তাছাড়া, আমাদের পূর্ব্বেকার অন্য প্রভুদের মত, এখনকার প্রভুরাও একসময়ে এখান হইতে চলিয়া যাইবেন। এমন দিন আসিতে পারে, যখন অপেক্ষাকৃত অধিক বীর্য্যবান আর কোন জাতি এখানে আসিয়া ইংরেজের স্থান দখল করিয়া বসিবে। বিলাস-সামগ্রী, সুখস্বচ্ছন্দতা—ইংরেজের সমস্তই আছে। হাত বাড়াইলেই ইংরেজ ভৃত্য-সেবা প্রাপ্ত হয়। তুমি কি মনে কর, আমাদের মত নিশ্চেষ্ট ও নির্ব্বীর্য্য হইতে তাহাদের আর বড় বেশী বিলম্ব আছে? আমরা যেমন বটবৃক্ষের ছায়াতলে বসিয়া নিশ্চেষ্টভাবে শুধু ধ্যান করি, তাঁহারাও আমাদের দেখাদেখি সেইরূপ নিষ্কর্ম্মা হইয়া ধ্যান করিতে শিখিতেছেন। সূর্য্যের জ্বলন্ত উত্তাপ ও আলোক হইতে বহুদূরে থাকিয়া, বন্ধসন্ধ ঠাণ্ডা আফিস্-ঘরে, বৈদ্যুতিক পাখার নীচে বসিয়া, তাঁহারা বেশ আরাম উপভোগ করেন। আজ্ঞাবহ সুসজ্জিত পেয়াদা দ্বারদেশে নিয়ত হাজির।" এই সকল কথায়, জাতীয় ভাবের কোন লক্ষণই নাই ; বিদেশি-বিদ্বেষের চিহ্নমাত্র নাই ; কেবল

শ্লেষকটাক্ষপূর্ণ একটা কৌতুকের ভাব মাত্র উহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়···

আমার চক্ষের সম্মুখে এখন একটি পুস্তিকা রহিয়াছে—যাহা কলিকাতার কোন গ্রন্থকার আমাকে উপহার দিয়াছিলেন। এই গ্রন্থকার, তাঁহার বাল্যকালে সংস্কারক-দলের একজন অগ্রণী ছিলেন। ইংরাজেরা বাঙ্গালীর সম্বন্ধে যে ভীরুতার অপবাদ ঘোষণা করে, সেই অপবাদ-কলঙ্ক ক্ষালন করিবার জন্য তিনি গ্যাম্বেটার সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং ফরাসী সৈন্যের মধ্যে ভর্ত্তি হইবার জন্য তাঁহার নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করেন। গ্যাম্বেটা তাঁহাকে বিদেশী-সৈন্যসম্প্রদায়ের মধ্যে ভর্ত্তি করিবেন, এইরূপ প্রস্তাব করিলেন। তখন সেই বাঙ্গালীর নানাবিধ সঙ্কোচ উপস্থিত হইল। ভাবিলেন, তাহা হইলে হয়তো কোনসময়ে তাঁহার জাতভাইদের বিরুদ্ধে লড়াই করিতে হইবে; অবশেষে তিনি সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিবার সঙ্কল্প একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। তাহার পরে, আরো কত কি, তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন—কে জানে! তাঁহার পুস্তিকার নাম:—"আধুনিক ভারতের জ্ঞানোন্নতির ইতিহাস।" ইহা "নব্যভারতের" বিরুদ্ধে লিখিত। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এই:—

যে সকল নিয়মব্যবস্থা ও অনুষ্ঠানের দ্বারা য়ুরোপীয় জাতিগণ বলীয়ান হইয়াছে, সেই সকল ব্যবস্থা-অনুষ্ঠানরূপ বিদেশী চারা, নব্য-ভারত-সম্প্রদায় ভারতের মাটীতে লাগাইতে চাহেন। কিন্তু তাঁহারা কি করিতে যাইতেছন, তাহা তাঁহারা জানেন না। য়ুরোপীয় সমাজ বণিক-সমাজমাত্র। ভৌতিক অভাবাদিমোচন, সুখস্বচ্ছন্দতার পরিবর্দ্ধন,—ইহাকে যদি একটা আদর্শ বলা যায়, তাহা হইলে, ইহা ছাড়া সেই সকল সমাজের আর কোন আদর্শ নাই। তাহাদের সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাপার—যাহা বাণিজ্যব্যবসায় হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাদের

জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, উহা কেবল এইপ্রকার ভৌতিক অভাবই মোচন করিতে পারে। পার্লেমেন্টপদ্ধতি, স্বাধীনতা, রাষ্ট্রনৈতিক স্বত্বাধিকার—এ সমস্ত বণিক-শ্রেণীর অর্জ্জিত জিনিস। মাতৃদেশানুরাগ—এই শব্দটি কেহ যেন মুখে না আনে! কথাটি সুন্দর, কিন্তু আসলে জিনিসটা কদর্য্য। তুমি তোমার দেশকে ভালবাসো ; কেন ভালবাসো ?—না,—যেহেতু, দেশটি তোমার নিজের ; বিশেষতঃ সেই দেশ হইতে তোমার অনেক সুবিধা হইবে ; ধন-সম্পত্তি, প্রভাব-প্রতিপত্তি, তুমি ভোগ করিতে পাইবে,—অজ্ঞাতসারে তোমার মনে মনে এইরূপ একটা আশ্বাস জাগিয়া থাকে। ইহা নিছক্ আত্মম্ভরিতা। এই ভাবটা আরো অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া, অবশেষে রুদ্ধদ্বারিতা-দুষ্ট "জাতীয়তায়," কিংবা আততায়িতা-দুষ্ট "সাম্রাজ্যিকতায়" পরিণত হয়। তোমার দেশের জন্য,—পররাজ্য-আক্রমণ, পররাজ্যহরণ, পরধনশোষণ—এ সমস্ত করা চাই। তোমাদের সৈনিকদিগের গর্ব্ব পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, বিশেষতঃ তোমাদের বণিকদিগের মাল কাটাইবার জন্যও, এ সমস্ত কাজ তোমাদের করা চাই। ইহা হইতে আর একটি কথা আপনা-আপনি আসিয়া পড়ে ;—যাহারা আপনাকে সভ্য বলিয়া অহঙ্কার করে, বড় বলিয়া মনে করে—সেই শ্বেত-জাতীয় লোকেরা, একবার মনেও ভাবে না যে, তাহাদের সহিত পীত, কৃষ্ণ কিম্বা লোহিত জাতীয় লোকদিগের সমান অধিকার আছে। শ্বেতজাতিরা উহাদের প্রতি দৃক্‌পাতমাত্র না করিয়া উন্নতমস্তকে সগর্ব্বে পদক্ষেপ করে…

আমরা ভারতবাসী—এসো আমরা আরো একটু কাছ-ঘেঁসিয়া দেখি। আমাদিগকে যে উপহারের লোভ দেখান হইতেছে, তাহা যথেষ্ট লোভনীয় নহে.. সত্য বটে, আমাদের সভ্যতা বড়ই দুর্ব্বল। এ সভ্যতার মধ্যে শক্তিসামর্থ্য নাই, সৈন্যবল নাই, যন্ত্রবল নাই, বিলাস-দ্রব্যের অপূর্ব্ব চাক্‌চিক্য নাই। তা ছাড়া, য়ুরোপীয় সমাজ, এত

করিয়া যেসকল অভাবমোচনে প্রবৃত্ত, আমাদের সে সকল অভাবই নাই। শরীরের ভাবনা তেমন ভাবিতে হয় না বলিয়াই, আমাদের আত্মা অপেক্ষাকৃত স্বাধীন। আরো,—আমাদের মধ্যে সৈনিকতার উপদ্রব নাই, অরাজকতা নাই, দারিদ্র্যদুঃখ নাই। এবিষয়ে নব্যভারতও বড়-একটা সন্দেহ করেন না। দূরদৃষ্টি না থাকায়, এই সম্প্রদায় আমাদিগকে একটা নূতন সভ্যতা বরণ করিতে বলেন—যাহা তাঁহাদের মতে উন্নততর—যেহেতু অধিকতর পাশব। জাতীয়-সাহিত্যে স্বদেশানুরাগের কোন উল্লেখ নাই বলিয়া তাঁহারা লজ্জিত হন; এবং সংকীর্ণ স্বত্বাধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত হইবার জন্য তাঁহারা আমাদিগকে দৃঢ়ব্রত পেট্রিয়ট্ হইতে বলেন; তাহার পরেই স্বাভাবিক ক্রম-অনুসারে ইম্পিরিয়ালিষ্ট হইবার কথা। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা স্বদেশপ্রেমকে সদ্‌গুণের মধ্যে ধরেন নাই। আমি এ কথা জানি—দেশপ্রেমের যূপকাষ্ঠে কাহারও বলিদান হইয়াছে, দেশপ্রেমের নামে কেহ কেহ প্রতারিত হইয়াছে, দেশপ্রেমের রঙ্গভূমিতে কেহবা প্রকৃত বীরত্বও প্রদর্শন করিয়াছে। কিন্তু আমরা হিন্দু, আমরা এই মাতৃভূমিনিষ্ঠার মধ্যে—এই "মাতৃভৌমতার" মধ্যে একটা সঙ্কীর্ণভাব, একটা সাংসারিক কাজের ভাব, একটা কলুষিত ভাব ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই না; ইহা তত্ত্বজ্ঞানীর উপযুক্ত নহে। অন্তত আমাদের পক্ষে ইহা অনাবশ্যক; কেননা, আমরা বর্ণাশ্রমপ্রথার মধ্যে থাকিয়া একটা বৃহত্তর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। উহা এইরূপভাবে গঠিত যে, উহা হইতেই আমাদের আচারব্যবহার নিয়মিত হয়, আমাদের দৈনিক আহারের সংস্থান হয়,—আমরা একটা জীবনের আদর্শ প্রাপ্ত হই...

ইহাই এই পুস্তিকার সার-মর্ম্ম; ইহাই পুরাতন হিন্দুভাব। যাঁহারা এই ভাব পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও কখন কখন ইহার পুনরাবির্ভাব দৃষ্ট হয়, এবং এই হিন্দুভাব পুনরাবির্ভূত হইয়া, তাঁহাদের

মন হইতে য়ুরোপীয় ভাবকে দূরে অপসারিত করে। যাহারা সংক্রামক রোগের ন্যায়, নূতনের স্পর্শ হইতে আপনাদিগকে নিয়ত বাঁচাইয়া চলে, তাহারা ত এই পুরাতনকে আরো আঁকড়াইয়া ধরিবে। এই হিন্দুভাব,—সনির্ব্বন্ধভাবে, অটলভাবে, অন্ধভাবে রক্ষণশীল। ইহা ত হইতেই পারে, কেননা, এই ভাবটি পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। যাহারা এই রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে লিপ্ত হয় না, যাহারা এই কাজকে আপনাদের অযোগ্য বলিয়া মনে করে—তাহারা ছাড়া, আর একদল অতিরক্ষণশীল হিন্দু আছে, যাহারা সংখ্যায় অনেক বেশী; তাহারা, একটু-কিছু সামাজিক পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইলেই মহাচীৎকার করিয়া উঠে। ধর্ম্মপ্রচারের বিপদজনক প্রলোভন হইতে ইংরাজসরকার আপনাকে কতদূর রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ভগবান্ই জানেন। কিন্তু ঘটনাক্রমে ও অজ্ঞাতসারে তাঁহারা এরূপ কতকগুলা সংস্কার প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন—যাহা এদেশের পক্ষে সমাজবিপ্লবকর। শুধু তাঁহাদের অধিষ্ঠানমাত্রে, ও বিদেশী ব্যবস্থা-অনুষ্ঠানের গূঢ়প্রভাবে, পুরাতন হিন্দুসমাজ ভাঙ্গিয়া যাইতেছে; হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুকলা—যাহা-কিছু প্রকৃতরূপে হিন্দু—সমস্তই একটা সাঙ্ঘাতিক আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছে।

সে যাহা হউক, ন্যাশানালকংগ্রেসের সংস্থাপনে জলদজাল ভেদ করিয়া একটা নবরশ্মি দেখা দিয়াছে। ইহার ফলে, য়ুরোপীয় ভাবের দ্রুত উন্নতিতে যাঁহারা সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন, সেই সব রক্ষণশীল লোক, ভারতীয় সকল জাতির মধ্য হইতে আসিয়া, একপতাকাতলে মিলিত হইলেন। কিন্তু এই রক্ষণশীল দল, কংগ্রেসের উপর যে "মারণ"মন্ত্রপূত জলের ছিটা দিয়াছিলেন, তাহাই কংগ্রেসের পক্ষে দ্বিজন্মপ্রদ পূতবারি হইয়া দাঁড়াইল। কাল যাহারা কংগ্রেসের শত্রু ছিল, সেই জোটবদ্ধ রক্ষণশীলেরা, আজ কংগ্রেস-সভায় নব্যদের সহিত একসঙ্গে কাঁধা-কাঁধি বসিয়াছে দেখিয়া আপনারাই বিস্মিত হইল। এমন কি, কাশীর রাজাও

সেখানে মুসলমানদের সহিত সখ্যভাবে হস্তে হস্ত মিলিত করিলেন। কিন্তু এই নব্যপুরাতনের সম্মিলন শীঘ্রই বিলীন হইয়া গেল। কেননা, কেবল দুঃখ-আক্ষেপ প্রকাশ করা ছাড়া, আসলকাজসম্বন্ধে এই উভয়দলের মধ্যে কোন ঐক্য নাই। যখন রক্ষণশীলেরা য়ুরোপীয় শিক্ষার পরিবর্ত্তে বিশুদ্ধ দেশীয় শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের প্রস্তাব করেন, ইংরেজির বদলে হিন্দিকে ভারতের সাধারণ ভাষারূপে বরণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন, ম্যাঞ্চেষ্টারের জঘন্য বংকরা ছিটের কাপড়ের আমদানিতে যে পুরাতন দেশীয় বস্ত্রবয়নশিল্প মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছে, সেই শিল্পসংরক্ষণের উপায় বিধান করিবার জন্য যখন দাবীদাওয়া করেন, তখন মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদিগকে আমার এই কথা বলিতে ইচ্ছা হয়ঃ—উত্তম কথা বলিয়াছ! তোমরাই যথার্থ মাতৃভূমিভক্ত! কিন্তু সেপক্ষে এখন যে একটু বেশী দেরি হইয়া পড়িয়াছে: একশতাব্দীর আবর্ত্তন এখন সহসা পিছাইয়া দেওয়া যায় কিরূপে? যখন মেকলে, এক কলমের চোটে, সমস্ত ভারতকে ইংরাজিয়ানার পথে নিঃক্ষেপ করেন, সেই ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দে এই সব কথা বলা উচিত ছিল।

রাজনৈতিক আন্দোলনের আর একটা মস্ত প্রতিবন্ধক—এখানকার অধিকাংশ চাষী প্রজাই অজ্ঞ। উহারা একেবারেই নিরক্ষর। এই দরুণ অনেকদিন পর্য্যন্ত, এই আন্দোলনকার্য্য পদে-পদে বাধা প্রাপ্ত হইবে। হিন্দুজাতি আমাদেরই মত বুদ্ধিমান; তবে, তাহাদের ধরণ-ধারণ বিভিন্ন। যে সকল ভৃত্য, তাহাদের ইংরেজ প্রভুদের সঙ্গে সঙ্গে থাকে, তাহাদিগকে আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি, আগে যদি আমাকে কেহ বলিয়া না দেয়, তাহা হইলে, চাকরকে মনিব বলিয়া আমার ভ্রম হইতে পারে। হিন্দুরা যে সব বিষয় লইয়া ব্যাপৃত থাকে, তাহা আমাদের হইতে সম্পূর্ণ বিপরীত। তাহারা যেরূপভাবে ঐহিক স্বার্থসমূহ—প্রত্যক্ষ-স্বার্থসমূহ বিস্মৃত হইয়া স্বকীয় জীবনযাত্রা

নির্ব্বাহ করে, তাহা নিতান্ত বিসদৃশ ;—উহা আমাদের নিকট একটা হেঁয়ালি বলিয়া মনে হয়। চন্দ্রবর্কার, আমাকে একবার এই কথা বলিয়াছিলেন :—"তাহার দৃষ্টান্ত,—যেসব কুলি-মজুর বোম্বাইবন্দরে কাজ করে, তাহাদের কথাবার্ত্তা একবার শোনো ; তাহারা কি বিষয় লইয়া আপনাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা কহে ?—আত্মার অমরত্বসম্বন্ধে। তোমাদের মজুরেরা তোমাদের নিকট শুধু বেতনাদির কথা বলে।" হাঁ, তা বটে ; যাহারা এক-টুকরা ন্যাকড়া পরিয়া থাকে, যাহারা মুষ্টিমাত্র অন্ন আহার করে, যাহারা এই গ্রীষ্মদেশের প্রচণ্ড উত্তাপে অবসন্নপ্রায়, সেই সব জাহাজের মালখালাসী দীন মজুরেরা আপনাদের মধ্যে এই সব বিষয় লইয়া কথাবার্ত্তা কহে,—ইহা কি অদ্ভুত নহে ?—আমি বলিতে যাইতেছিলাম—ইহা কি অতীব শ্লাঘনীয় নহে ? তুমি বলিতেছ, এসব কথা বড়ই সুন্দর ! কিন্তু তাহাদের কাজকর্ম্মসম্বন্ধে একটু চিন্তা করিলে কি তাহাদের পক্ষে আরো ভাল হইত না ? অবশ্য, ইহারা তেমন কাজের লোক নহে, উহারা আপনাদের বর্ত্তমান স্বার্থ ভাল করিয়া বুঝে না ; অবশ্য, এই সব মজুরেরা জোটবদ্ধ হইয়া ধর্ম্মঘট করিতে তেমন পরিপক্ক নহে। কিন্তু তাহা বলিয়া কি করিবে ; এই জাতি,—আত্মা আছে বলিয়া বিশ্বাস করে ; আর কিছু না থাকুক, অন্তত ইহাদের একটা তত্ত্বজিজ্ঞাসু কুতূহলী মন আছে—যাহা সচরাচর দুর্ল্লভ। অনেক সময় দেখা যায়, গ্রামে গুরুমহাশয় নাই ; কিন্তু সেস্থলে গুরুমহাশয়ের অভাব কবির দ্বারা পূর্ণ হয় ; কবি, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে, সাদাসিধা গ্রাম্য শ্রোতৃবর্গের নিকট রামায়ণের সুন্দর সুন্দর কথা আবৃত্তি করিয়া থাকে। যাহা সাংসারিক হিসাবে নিতান্ত আবশ্যক, সে সব জিনিস ইহাদের কাছে নাই—আছে তাহাই, যাহা সংসারিক হিসাবে বাহুল্যমাত্র ! ইহারা নামস্বাক্ষর করিতে জানে না, আঙ্গুলের উপর গণনাদি করে ; কিন্তু এই এক অদ্ভুত ব্যাপার—যদি তুমি তাহাদিগকে তাহাদের সাহিত্যসম্বন্ধে, ধর্ম্মসম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ

কর—তখন তাহারা বেশ উত্তর করিবে। দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের ধর্ম্ম, জীবনসংগ্রামের উপযোগী নহে। যথারীতি অনুষ্ঠানাদির দ্বারা অর্চ্চনা করিলে, তাহাদের দেবতা সর্ব্বপ্রকার বর প্রদান করিয়া থাকেন। মনে কর, যদি কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ আসিয়া, কৃষিভূমিতে জলসেকের একটা নূতন উপায়ের কথা তাহাদের নিকট বিবৃত করেন এবং সেই সময়ে একজন সাধুসন্ন্যাসীও আসিয়া,—যাহার হস্তে স্বর্গের চাবি আছে—কোন এক নূতন দেবতার কথা তাহাদের নিকট প্রচার করে—তখন তাহারা কাহার কথা আগে শুনিবে?—সেই কৃষি-অধ্যক্ষের কথা—না সেই সাধুসন্ন্যাসীর কথা? আমার বোধ হয়, তাহারা সেই সাধুসন্ন্যাসীর কথাই আগে শুনিবে।

এসম্বন্ধে ইংরজরাজপুরুষ বলিতে পারেন:—থামো, একটু ধৈর্য্য ধর, ইহা আজিকার কথা নহে; এইরূপই বরাবর চলিয়া আসিতেছে। সে কথা সত্য, ইহা নূতন কথা নহে। অশিক্ষিত, আত্মহিতানভিজ্ঞ, অতীব বশ্য, গো-বেচারা হিন্দু চাষা আপনা-হইতে কখনই রাষ্ট্রবিপ্লব-সাধনে অগ্রসর হইবে না। কিন্তু যে সময়ে ইংরাজশাসন ভিতরে-ভিতরে লোকের অপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে, তখন যদি অর্দ্ধধর্ম্মপ্রচারক, ও অর্দ্ধরাজনৈতিক-আন্দোলনকারী,—এইরূপ কোন প্রধান ব্যক্তি তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে কিরূপ ঘটে?

হিন্দু চাষার মনের ভাব এই,—এখনকার বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা আর সবই ভাল। এই ন্যাশানাল্ কংগ্রেস্‌জিনিস্‌টা কি—হিন্দুচাষা তাহা ঠিক্ জানে না। সংবাদপত্রাদি ও কংগ্রেস্ যে দাবীদাওয়ার কথা বলে—সে দাবীদাওয়াগুলা কি—সে বিষয়ে সে আরো কম জানে। কিন্তু একপ্রকারে সহজবুদ্ধিতে, সে এইটুকু নিশ্চয় করিয়া বুঝে, সংস্কারকামী প্রধানেরা কংগ্রেসে যে কোন কথা বলেন, তাহাই দেশের কথা। সংস্কারের কথা, প্রজার প্রতিনিধি-সভার কথা—এ সমস্ত কথার

প্রতিধ্বনি তাহার হৃদয়ে পৌঁছে না। এসব কথা বুঝিতে পারিলেও সে ইতস্তত করিত। সে শুধু এইটুকু বোঝে:—বিদেশী সরকার, না দেশী সরকার।

এইজন্যই,—সমস্ত বাধাবিলম্বসত্ত্বেও, যাহাদের সংখ্যা আজ কম দেখাইতেছে, নিশ্চয়ই, কাল সেই সংখ্যা অধিক হইয়া দাঁড়াইবে। ন্যাশানাল্ কংগ্রেসের হুকুমের বল্ নাই—হাকিমি ক্ষমতা নাই, সুতরাং তাহার কথা ব্যাপকভাবে প্রচার করিবারও তেমন সুবিধা নাই; কিন্তু ইহা সত্ত্বেও কংগ্রেস্,—প্রচারের কাজ, লোকশিক্ষার কাজ, আরম্ভ করিয়াছে। অবশ্য, ইহা একদিনের কাজ নহে—ইহাতে প্রভূত ধৈর্য্য চাই। কোন জাতির রাষ্ট্রনৈতিক শিক্ষা কত কষ্টে সম্পাদিত হয়, ইহার দরুণ কত ক্ষতিস্বীকার করিতে হয়, আমরা তাহা বিলক্ষণ জানি। কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের কার্য্যবিবরণী বিস্তৃতভাবে প্রচারিত হইলেও, উহা যদি শুধু ইংরাজিভাষায় লিখিত হয়, তাহা হইলে ইংরাজি-শিক্ষিত লোক ছাড়া উহার মর্ম্ম আর কাহারও হৃদয়ঙ্গম হয় না। এইজন্যই কংগ্রেস্, জনসাধারণকে বুঝাইবার জন্য, দেশী ভাষায় ছোট ছোট পুস্তিকা প্রচার করিয়া থাকেন। উহাতে যেরূপ কথা লেখা হয়, যেরূপ ভাবে লেখা হয়, তাহা অজ্ঞ জনসাধারণের বেশ বোধোপ-যোগী। বলা বাহুল্য, চাষার ভাষাতেই চাষাকে বুঝান হয়, এবং যে সব বিষয়ে তাহার ঔৎসুক্য হইবার কথা, সেই সব কথাই তাহার নিকট বলা হয়। ভারতবর্ষের মহা-প্রতিনিধি সভার কথা তাহার কাছে বলা হয় না;—বলা হয়, মাঠঘাঠের কথা, ক্ষেতের কথা, জলসেকের কথা, খাজ্‌নার কথা। তাহার দৃষ্টান্ত,—এই দেখ একটি পুস্তিকা, গ্রামপল্লীতে ইহার বহুল প্রচার। গ্রন্থকার একজন মৌলবীর সহিত একজন চাষার কথোপকথন কাল্পনিকভাবে লিখিয়াছেন।

মৌলবী, প্রশ্নকারী চাষার নিকট দুইটি গ্রামের ছবি দিয়াছেন;

তন্মধ্যে একটি শায়শপুর ; ইহা গ্রামবাসীদিগের সাধারণ সম্পত্তি। দ্বিতীয়টি কম্বৎপুর ; ইহা একজন রাজার সম্পত্তি ; কিন্তু রাজা সেখানে বাস করেন না। কাহাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ বলা হইয়াছে, তাহা বুঝিতে বাকী থাকে না : এই রাজা, যিনি পরদেশীর ন্যায় দূর হইতে শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, ইনিই যে ইংরাজ-সরকার তাহাতে আর সন্দেহমাত্র নাই।

প্রথম গ্রামটি বেশ সমৃদ্ধিশালী ; দ্বিতীয় গ্রামটি ভগ্নদশাপন্ন ; দোকানদার ও সুদখোরের দৌরাত্ম্যে ইহা উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। রাজার কর্ম্মচারিগণ ফসলের বিষয় কিছুই বুঝে না ; "১৬ আনা ফসল ও ৬ আনা ফসলের" মধ্যে কি প্রভেদ তাহা তাহারা জানে না। এরূপ অনেক সময় ঘটিয়া থাকে; যেবার খুব দুর্ব্বৎসর, সেই বৎসরেই প্রজার নিকট খুব শুষিয়া খাজ্‌না আদায় করা হয়। আইন-অনুসারে নিঃস্বপ্রজাকে টাকাও ধার দেওয়া হয় এবং যখন পরিশোধ করিবার সময় আইসে, তখন সেই ধার-দেওয়া টাকার জন্য সমস্ত গ্রামকে আবদ্ধ রাখা হয়। ঐ গ্রামে একটা পুরাতন চৌবাচ্চা ছিল ; উহা হইতে, গ্রামের অর্দ্ধেক ক্ষেত জল পাইত। এই পুরাতন চৌবাচ্চাটির ক্রমে ভগ্নদশা উপস্থিত হইল। ১০০৲ টাকা ব্যয়ে উহাকে মেরামৎ করা যাইতে পারে—বাড়ান যাইতে পারে। একদিন, রাজা তাঁহার কর্ম্মচারীদিগকে ইহার তদন্ত করিবার জন্য পাঠাইলেন। তাহারা আসিয়া বলিল, পুরাতন চৌবাচ্চার এখন আর চলন নাই ; নদীর জল আনিবার জন্য, একটা খাল খনন করা আবশ্যক। গ্রামের প্রজারা ভয়ে-ভয়ে ইহার প্রতিবাদ করিল। তাহারা বলিল, "খালের জল ঠাণ্ডা, ইহা বরফ-গলা জল ; এই জলসেকে মাটিতে লোণা ধরিবে এবং ঐ মাটির ফসল সমস্তই জলিয়া যাইবে। চৌবাচ্চার বৃষ্টি-ধরা জলের অভাব আর কিছুতেই পূরণ হইতে পারে না।" কর্ম্মচারী বলিল,

"তোরা সব গাধা, তোরা এর কি বুঝিস্?" পরে, জলসেকের জন্য একটা খাল খনন করা হইল। প্রথম বৎসরে, খাল ছাপাইয়া জল উঠিল, এবং সেই জলে অর্দ্ধেক ফসল ডুবিয়া গেল। তাহার পর, যখন জল সরিয়া গেল, খালের কর্ম্মচারীরা আসিয়া প্লাবিত ভূমির পরিমাপ আরম্ভ করিল এবং ক্ষেতে জলসেক হইয়াছে বলিয়া প্রজার নিকট কর আদায় করিল। খালের দ্বারা গ্রামটি উৎসন্ন হইল, কিন্তু তবু প্রজাকে কর দিতে হইল।

তীব্র আক্রমণ হইলেও, কথাটা ঠিক্! ইংরাজ-শাসনতন্ত্রের প্রধান দোষ, ইহা বিদেশী শাসনতন্ত্র। যে দেশকে শাসন করা হইতেছে, সেই দেশের ভাব ইংরাজ-সরকার বুঝেন না। এখনকার শাসনকর্ত্তা রাজা ও শাসনাধীন প্রজা—ইহাদের স্বার্থ পরস্পরবিরুদ্ধ।

চাষার নিকট একটা ছবির আকারে সমস্ত ব্যাপারটা প্রদর্শিত হওয়ায়, এই রাজনৈতিক-প্রতিবাদ-জিনিস্টা যে কি, সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল—তাহার চোখ্ খুলিয়া গেল। তাহার গ্রামসম্বন্ধে যাহা বলা হইল,—সে বুঝিল সমস্ত দেশের পক্ষেই তাহা খাটে। আমার বোধ হয়, তখন সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল,—স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় লোকের শাসনাধীনে থাকাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অজয় সর্দ্দার।

(বঙ্গের অসাধারণ দস্যুবীর।)

অজয় সর্দ্দার বঙ্গদেশের একজন অত্যদ্ভুত মানুষ। ইহার জীবিত-কালে, সমগ্র বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ছোটনাগপুরে ইহার সমতুল্য ব্যক্তি বিদ্যমান ছিল বলিয়া আমরা পাঠ বা শ্রবণ করি নাই। ইহার অসংখ্য মহাদোষ ছিল, এ কথা সত্য; কিন্তু এই অসাধারণ মানুষ একেবারেই গুণবর্জ্জিত ছিল না। পৃথিবীর কোন পদার্থ এবং কোন জীব, একেবারে গুণহীন বা অপ্রয়োজনীয় হইতে পারে না; গুণহীনের আদৌ সৃষ্টি হয় না, ইহাই প্রকৃতির অকাট্য নিয়ম। দোষে-গুণে বিচার করিতে হইলে, নিরপেক্ষভাবে কহা যায়, অজয়সর্দ্দার বাঙ্গালাদেশের ও বাঙ্গালী জাতির এক অপূর্ব্বপুরুষ। দুঃখের বিষয়, অনেকে হয়তঃ ইহার নাম আদৌ শ্রবণ করেন নাই। ইহার সমসাময়িক লোক এখনও বোধ হয় দুই এক জন জীবিত আছেন। অজয়ের সমসাময়িক সমাজের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত হইয়া গিয়াছে; এখন নূতন সমাজ, নূতন মানুষ, নূতন প্রকৃতি ও নবীন প্রবৃত্তি দ্বারা বঙ্গদেশ পরিচালিত হইতেছে। অজয়ের সময়ে সংবাদপত্রের বহুল প্রচার ছিল না, সুতরাং তৎসাময়িক অসাধারণ মানুষদিগের নামও অনেকে পাঠ বা শ্রবণ করেন নাই। বলা বাহুল্য, এক সময়ে এই অসাধারণ অজয়ের প্রতাপে একঘাটে বাঘে ও ছাগে নির্ব্বিবাদে ও নির্ভয়ে জলপান করিত; জমিদারেরা সশঙ্কিত হইয়া সেলামদ্বারা তাহার অভ্যর্থনা করিত; পুলিশ ও হাকিমেরা ঘোরতর ভয়ে ও উদ্বেগে শশব্যস্ত থাকিত এবং ধনবান্ আড়ৎদার ও মহাজনে

করযোড়ে তাহার নিকট অভয় প্রার্থনা করিত। সুদূর ও দুর্গম পথ-গামী পথিকের সঙ্গে টাকা বা স্বর্ণ-রৌপ্যাদি থাকিলে, “ত্রাহি মধুসূদন” “ত্রাহি মধুসূদন” স্মরণ করিয়া তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে পথাতিক্রম করিত। সদ্গোপজাতীয় অজয়সর্দ্দারের নামে ও হুঙ্কারে একদিকে যেমন গর্ভিনীর গর্ভপাত হইত, অপরদিকে তেমনি অত্যাচারী দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচারের লোহদণ্ড চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধরাশায়ী হইত। পাঠকেরা এখন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, এই অত্যদ্ভুত লোকটা কে? ইহার নিবাস কোথায় এবং কি কারণে এই ব্যক্তি অত্যদ্ভুত বলিয়া গণ্য? এই কথাগুলির সংক্ষেপে উত্তর দিয়া অজয়সর্দ্দারের ক্ষমতা, প্রতাপ, প্রভুত্ব, সাহস, বীরত্ব এবং দোষ ও গুণ বর্ণনা করাই আমার উদ্দেশ্য। কিন্তু অজয়ের অদ্ভুত কাহিনী বিবৃত করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাকে অবান্তরভাবে অনেক বিষয়ের অবতারণা ও আলোচনা করিতে হইবে, তজ্জন্য পাঠকের সহিষ্ণুতাগুণের উপর নির্ভর করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। এস্থলে প্রথমেই বলিয়া রাখা আবশ্যক, এই মায়ামুগ্ধ অনিত্য ও অসার সংসারধামে, ক্ষণভঙ্গুর জীবনধারী মানবজাতি কেবল দুইটি কারণে প্রখ্যাতি লাভ করে; প্রসিদ্ধি লাভ করিবার আর তৃতীয় পন্থা নাই। অত্যন্ত সংগুণে (অর্থাৎ দয়া, ধর্ম্ম, বিদ্যা, পরোপকার, দেশ-হিতৈষিতা, বদান্যতা প্রভৃতি পুণ্যময় কর্ম্মে) মানুষেরা অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হয়, আবার অতুলনীয় অপরাধ বা দুষ্টতার জন্যও মানবেরা প্রখ্যাতি লাভ করিয়া থাকে। ইতিহাস ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ আছে। প্রথমোক্ত ব্যক্তিরা মহানুভব, সুযোগ্য বা মহাপুরুষ বলিয়া গণ্য হয়েন, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরাও অত্যদ্ভুত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয়। সম্রাট নিরো, হেরড, জগাই-মাধাই, রাজা কংস, জরাসন্ধ, রাবণ, ডাকাইত রবার্ট রডিয়র, লেডি ম্যাকবেথ, ক্লিওপেট্রা প্রভৃতি ইহার দৃষ্টান্ত। মহানুভব শ্রেণীর নরনারীর যে সকল বরণীয় গুণ থাকে, অজয় সর্দ্দারের তাহা

একেবারেই ছিল না, তাহা নহে; কিন্তু গুণের বীজ, সাধন অভাবে কখন বৃক্ষরূপে পরিণত হইয়া সুফল ধারণ করে নাই। বরং বিকৃতাবস্থায় ও ভ্রষ্টদিকে সূচীত হইয়াছিল, এইজন্য সে ব্যক্তি দস্যু, তস্কর, ইত্যাদি অপ-উপাধিতে খ্যাত। সে কথা পরে বলিব।

সম্প্রতি লর্ডকর্জ্জনকর্ত্তৃক বঙ্গের যে অনাবশ্যক অঙ্গচ্ছেদ এবং তদানুষঙ্গিক ব্যাপারসমূহ লইয়া বঙ্গদেশে যে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে, ত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ বর্ষাধিককাল পূর্ব্বে বাঙ্গালায় এইরূপ একটা অঙ্গচ্ছেদ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে এত আন্দোলন উপস্থিত হয় নাই। কারণ, তথনকার অঙ্গচ্ছেদ হুগলী, হাবড়া, বর্দ্ধমান, মেদনীপুর, বীরভূম এবং বাঁকুড়া এই কয়েকটা জেলা লইয়াই সংঘটিত হইয়াছিল। এক জেলার নানাস্থান অন্যজেলায় সংযুক্ত হইয়া গিয়াছিল। এতদুপলক্ষে বর্দ্ধমানজেলায় সুপ্রসিদ্ধ বুদ্‌বুদ্ মহকুমা একেবারে অন্তর্হিত হইয়া যায়। বুদ্‌বুদ্ সবডিবিজনের সর্ব্বশেষ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের নাম বাবু প্রতাপনারায়ণ সিংহ। বীরভূমজেলান্তর্গত রাইপুর-সুপুর নামক সুপরিচিত গ্রামের সুপ্রসিদ্ধ উত্তররাঢ়ী কায়স্থ জমিদারবংশে প্রতাপবাবুর জন্ম। কলিকাতা হাইকোর্টের য়্যাড্‌ভোকেট্-জেনেরল মিষ্টর এস্, পি, সিংহ; সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক (ডাক্তার) মেজর এন্, সিংহ, এম্, ডি; আই, এম্, এস্; কলিকাতা পুলিশের ভূতপূর্ব্ব ইন্‌স্‌পেক্টর ব্রহ্মপ্রসাদবাবু; সিউড়ির সরকারী উকিল বাবু রমাপ্রসন্ন, এম্, এ, বি, এল; ময়ূরভঞ্জ-মহারাজার সহকারী দেওয়ান ও বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত বাবু হেমেন্দ্রপ্রসাদ সিংহ, বি, এ; কলিকাতার ইন্‌কম্‌ট্যাক্স্ কলেক্টর্ বাবু চন্দ্রনারায়ণ সিংহ প্রভৃতি বড় বড় লোক, রাইপুর-সুপুরের বাবুদের বাটীর লোক। প্রতাপবাবু বহুদিনের পুরাতন ডেপুটী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত বিনয়ী, সদাচারী, ন্যায়পরায়ণ, দয়ালু এবং ধার্ম্মিক পুরুষ হইয়া উঠিয়াছিলেন; এজন্য লোকে বলিত "এমন

লোকের ডেপুটিগিরি করা সাজে না।" কিন্তু প্রতাপবাবু এমন নিরীহ ভদ্রলোক হইয়াও মানকর, শুস্করা, বুদ্‌বুদ্‌ প্রভৃতি অঞ্চলের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দস্যু ও ডাকাইতগণকে বিশেষরূপে দমন করিয়া গিয়াছেন। তখন এতদঞ্চলে অজয়সর্দ্দারের কনিষ্ঠসহোদর অভয়সর্দ্দারের "রাজত্ব" ছিল, অর্থাৎ এখানে সেই ব্যক্তিই ডাকাইত ও দস্যুদলের সর্দ্দার ছিল। প্রতাপবাবু অভয়কে দমন করিতে পারেন নাই; কিন্তু অভয়ের অনেক প্রবল শিষ্য ও প্রশিষ্যকে দমন করিয়া গিয়াছেন।

এই সময়ে বর্দ্ধমানজেলার আর একটা মহকুমা উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই প্রসিদ্ধ, প্রশস্ত ও পুরাতন মহকুমার নাম জাহানাবাদ। সে সময়ে এই মহকুমা, দস্যুতা, রাহাজানী ও ডাকাইতির সর্ব্বপ্রধান আড্ডা ছিল। একটা স্থানে একটু গুড় ফেলিয়া দিলে যত-গুলা পিপীলিকা একত্রিত হয়, জাহানাবাদ অঞ্চলে তখন এতগুলা দস্যু, ডাকাইত, লাঠিয়াল, রাহাজান, তস্কর প্রভৃতি বাস করিত। অরণ্যবিচরক মৃগপালের ন্যায় দলেদলে দস্যুরা বিচরণ করিত। ভয়ে লোকেরা রীতিমত শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় পাইত না। সে সময়ে রাঢ় অঞ্চলে, অর্থাৎ হাবড়া, হুগলী, বর্দ্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলায় যত দস্যু ছিল, সমস্ত বঙ্গদেশে তাহা ছিল না। অজয় সদ্গোপ ইহাদের প্রধান ছিল। জাহানাবাদমহকুমাকে উঠাইয়া দিলে দস্যু ও দস্যুতার সংখ্যা আরও অধিক হইবে, এই চিন্তায় বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট জাহানাবাদ সব্‌ডিবিজান উঠাইয়া না দিয়া, হুগলীজেলার অন্তর্গত করিয়া দিলেন। বেহারপ্রদেশের গয়াজেলার অধীনে একটা বিস্তৃত মহকুমা ছিল এবং এখনও আছে, তাহারও নাম জাহানাবাদ; এক শাসনকর্ত্তার অধীনে দুইটা মহকুমার এক নাম থাকায়, নানাপ্রকারের গোলযোগ উপস্থিত হয় বলিয়া, হুগলীজেলার জাহানাবাদের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন নাম দেওয়া হইল, নূতন নামটি "আরামবাগ"।

যাহা হউক, জাহানাবাদ-(আরামবাগ)-শাসনের জন্য বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট সে সময়কার ভাল ভাল ডেপুটী ও সুদক্ষ পুলিশকর্ম্মচারী-দিগকে তথায় পাঠাইতে লাগিলেন। অনরেবল্ ঈশ্বরচন্দ্র মিত্র, বাবু হরকালী মুখোপাধ্যায়, বাবু সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, নবাব আবদুল লতিফ খাঁ, বাবু গৌরদাস বসাক, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী ডেপুটীমাজিষ্ট্রেটগণ এবং দয়ানিধি সিং, কমীরুদ্দীন মিয়া, সেখ বকাউল্লা * প্রভৃতি বিখ্যাত পুলীশ ইনেস্‌পেক্টরগণ জাহানাবদ অঞ্চলে এইজন্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে দস্যুতার দমন হইয়াছিল; কিন্তু জাহানাবাদের অপবাদ কখনই ঘুচে নাই, এবং এখনও সেই অপবাদ অল্প বা অধিক পরিমাণে আছে। জাহানাবাদ অঞ্চলে তখন অনেক স্থান ভয়ঙ্কর ছিল; শেষরাত্রে (অর্থাৎ ৩টা হইতে প্রভাত ৪॥০ টা পর্য্যন্ত) এবং মধ্যাহ্ন কালে ও, সায়াহ্নে (গোধূলি সময়ে) দস্যুরা পথিকদিগের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইত এবং হত্যাও করিত। বাহকস্কন্ধস্থিত পাল্কীকেও আক্রমণ করিতে তাহারা ভীত হইত না; "যাত্রা"র দলকে আক্রমণ করিয়া যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইত। তখন পুরীধামে যাইবার পথে রেল ছিল না; সেই পুরাতন গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রোড দিয়া দলে দলে তীর্থ-যাত্রারা গমনাগমন করিত, সুবিধা হইলে তাহাদিগকেও দস্যুরা হৃত-স্বর্ব্বস্ব করিয়া দিত। তদ্ভিন্ন রাত্রিকালের ডাকাইতির ত কথাই নাই। এই সকল ভয়ঙ্কর ঘটনার কর্ত্তা ছিল—অজয়সর্দ্দার। অনেক সময়ে অজয় নিজে দস্যুতা করিতে যাইত না, কিন্তু অজয়ের শিষ্য ও প্রশিষ্য না থাকিলে বড় বড় ডাকাইতি বা রাহাজানী হইত না। অজয়ের অংশ অজয় প্রাপ্ত হইত। সে সময়ে অনেক জমিদার বড় বড় ডাকাইত

* কলিকাতার প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট মৌলবী বজলল্ করিমের ইনি পিতা।—লেখক।

ও দস্যুকে পালন করিত; কেহ কেহ অতি অল্পমূল্যে বহুমূল্যের ডাকাইতি মাল খরিদ করিয়া লইত। তখনকার অথবা তৎপূর্ব্বকালের অনেক লোক এইরূপ ব্যবসায়ে তালুকদার, জমিদার অথবা ধনবান গৃহস্থ হইয়া গিয়াছে। জাহানাবাদ অঞ্চলে এখনও অনেক ভয়ঙ্কর মাঠ এবং ভয়ঙ্কর স্থান আছে। কিন্তু দস্যু ও দস্যুতার সংখ্যা এখন কম। প্রায় পাঁচ ক্রোশ ছয় ক্রোশ ব্যাপী স্থানসমূহ লইয়া এক একটী থানা এবং তাহার অধীনে চারিশত পাঁচশত গ্রাম থাকিত। স্থানে স্থানে ভয়ঙ্কর পথের নিকটে বা পার্শ্বে ছোট ছোট ফাঁড়ি বসান ছিল; ফাঁড়িতে ফাঁড়িদার, দুই একটা বরকন্দাজ ও কখন কখন গ্রামের চৌকীদার হাজির থাকিত। ফাঁড়িদারেরা অনেক সময়ে উপস্থিত থাকিত না; ফাঁড়িগুলাও বন্ধ থাকিত। মাজিষ্ট্রেটসাহেব বা ডেপুটীসাহেবের আগমন-সমাচার ঘোষিত হইলে ফাঁড়িদারেরা সভয়ে ফাঁড়ি খুলিয়া রাখিত, নতুবা এই সকল মূর্খ ও সামান্য বেতনভোগী লোকেরা কর্ত্তব্যকর্ম্ম কি, তাহা বুঝিত না। ফাঁড়িদারদের সহিত দস্যু ও ডাকাইতদিগের সদ্ভাব ছিল, অনেক স্থানে ফাঁড়িদারেরাই দস্যুতা ক'রত। অন্য কেহ দস্যুতা করিলে ফাঁড়িদারেরা অংশ পাইত, সুতরাং রক্ষকগণ ভক্ষকরূপে বিরাজ করিত। আবার অনেক পুলিশদারোগাও, ফাঁড়িদার বা দস্যু-দলপতিগণের নিকট হইতে টাকার ভাগ পাইত। ফাঁড়িঘরের কাছে প্রায় লোকালয় থাকিত না; অনেক দূরে গ্রাম দেখা যাইত। সে সময়ে রাঢ় অঞ্চলে যে সকল প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ দস্যু ছিল, তাহাদের নামের তালিকা দিতে গেলে একটা বিপুলাকার "খাতা" পরিপূর্ণ হইয়া যাইতে পারে। পাঠকের কৌতূহলবৃত্তিচরিতার্থের জন্য নিম্নে কয়েকটা বিখ্যাত লাঠিয়াল, রাহাজান, দস্যু ও ডাকাইতের নাম দিলাম। তদ্যথা—পলাশনগ্রামবাসী ঈশ্বর বাগ্দী, বৈনানিবাসী অতো (অতুল ?) দুলে, জনাইবক্সা অঞ্চলের মত্তলা ফাকর ও কমলসেখ, ব্রিজ্‌ড়েগ্রামের সনাতন সদ্গোপ, দুবলগাছির মধু হাড়ি, চা গ্রাম বা চাঁইগাঁয়ের বীরে (বীরেশ্বর?) সর্দ্দার, কর্জ্জনা অঞ্চলের স্বরূপ ঝুরী (গোয়ালা), দিগ্‌ড়েগ্রামের জনার্দ্দন ডোম, বোঁয়াইগ্রামের কানাই বাউরী, মনসারাম ও রতনরাম, তিরোল-গ্রামের সাইতে চক্রবর্ত্তী, ওড়্গাঁয়ের ডাঙ্গার দিগম্বর চক্রবর্ত্তী, ঘুঘুডাঙ্গা-খালের কৈলাস চাবা, তারকেশ্বর অঞ্চলের জগাই বাগ্দী, বাঁকুড়ার

বনবিষ্ণুপুর অঞ্চলের সাতারাম মুচী, কোতলপুর, গোঘাট ও সোণামুখী অঞ্চলের উমেশ, পাঁচু এবং যতু সর্দ্দার ; হাবড়ার অধীনে গড়ভবানী-পুরের মাঠের বিখ্যাত বিনোদ রড়িং, মেদনীপুরজেলার ঘাটাল অঞ্চলের কেশব ছুলে, বর্দ্ধমানের পরাণ বাগ্দী প্রভৃতি কতলোকের নাম লিখিব ? রাঢ় অঞ্চলের বড় বড় দস্যুরা যেসকল স্থলে "আড্ডা" "ঝোপ" ও "ঘাত" রাখিত, তাহার সংখ্যাও কম নহে। সংক্ষেপে কয়েকটা স্থানের নামোল্লেখ করিলাম। কর্জ্জনার মাঠ, ভাগবৎখাঁয়ের দীঘী, গুগুনদীঘী, বুজুরদীঘী, উচালনের দীঘা, মায়াপুরের দাঘী, জাম্না, দামোদরের সদরঘাট, সুপুরের মাঠ, গর্দ্দানমারা দীঘী, ঘুঘুডাঙ্গার খাল, কোতলপুর যাইবার পথ, সোণামুখীর মাঠ, গোঘাটের রাস্তা, সুরপুরের চটান, রৈয়ৎপুরের মাঠ, হরিণখালীর নালা, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাঢ় অঞ্চলের দস্যু ও ডাকাইতদিগের একটা আশ্চর্য্য নিয়ম ছিল। তাহারা কখন চুরি বা প্রবঞ্চনা করিত না। চুরি বা সিঁদ দেওয়া প্রথাকে তাহারা অত্যন্ত ঘৃণা করিত। কাহাকে ঠকাইয়া তাহারা জীবিকানির্ব্বাহ করিত না। বলপূর্ব্বক ডাকাইতি বা রাহাজানী করিয়া বাহাদুরী দেখাইত ; কাপুরুষ তস্কর বা সিঁদচোরের বৃত্তি অবলম্বন করিত না। অজয়সর্দ্দারের দলের লোকদিগেরও তাহাই অকাট্য নিয়ম ছিল। অজয়ের জীবনঘটিত কাহিনীসমূহ বর্ণনা করিতে গেলে একমাসের লেখনীপরিচালনে তাহা সমাপ্ত হয় না। যে ঘটনায় অজয় সর্দ্দার গ্রেপ্তার হইয়া ইংরাজগবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া-ছিল সেই অদ্ভুত কাহিনীমাত্র এস্থলে বিবৃত করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। এই অত্যদ্ভুত ঘটনা—এই মহাভয়োৎপাদক ঘটনা—দস্যুদিগের ইতিহাসে প্রায় বিরল। এই ঘটনাসম্বন্ধে পুলিশ ও ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যতৎপরতা, দারোগার দুষ্টতা, ঠগীর বিচার, অজয়ের প্রাণদণ্ড এবং তাহার ভ্রাতা অভয়সর্দ্দারের পরিণাম ক্রমে ক্রমে বিবৃত করিব।

(ক্রমশঃ)

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

চতুর্থ দৃশ্য।

মন্ত্রণাগৃহ—রুস্তম ও দূত।

রুস্তম। দুর্ব্বল বুঝিয়া যেবা করে অপমান,
হ'ক না সে বিশ্বরাজ্যেশ্বর, কীট হ'তে
হীন সে পামর। সে কারবে অপমান,
তাই সয়ে রব? "অতিক্ষুদ্র তাতারের
মুষ্টিমেয় অধিবাসী, ভ্রূভঙ্গে আসিবে
বশে, ইঙ্গিতে পড়িবে পায়"—এত বড়
অহঙ্কার! পত্র কি লিখিব? (প্রকাশ্যে) দূত!
বল গিয়া পারস্যসম্রাটে, আমি দাস
তাতারের। দাসের যে কার্য্য তাই করি।
রাণীর আদেশ "পণ যেবা না রাখিয়ে
মোর, পাণি আশে আসিবে আমার পাশে,
প্রত্যাখ্যান করিও সেজনে।" বাদশাহে
অসংখ্য সেলাম দিয়ে, ব'ল দূত তাঁরে,
যতদিন রাণী, বন্দিনী না হবে তাঁর,
ততদিন অভিলাষ-বিড়ম্বিত তিনি।

দূত। যথা আজ্ঞা রাজপ্রতিনিধি। (প্রস্থান।)

রুস্তম। সমরে মাতিমু—
অজ্ঞান বালিকাদৃষ্ট আকাশকুসুম—
স্বপ্নহিন্দোলায় দোলা উদ্যানের কোলে,
কামনাতড়াগে, মত্ত হিল্লোলের সাথী
শতদল, আজি সৌরভ রাখিতে তার

অটুট অব্যয়—সমরে মাতিনু। ক্রোধে
আত্মহারা, পিতার আদেশ পাশরিনু—
না জানিনু রাণীর কি মত। যদি রাণী
ভয়াকুলা টলে প্রতিজ্ঞায়? যদি করে
পারস্যসম্রাটে আত্মদান? এত হীনা
হবে তাতারের রাণী? শৈশব যখন
তার, ক্ষুদ্রশিশু ধরি মোর পিতৃকর
চলিতে টলিত, সে সময় আধভাষে
যে আদেশ করিত পিতায়, পিতা মোর
দ্বিরুক্তি না ক'রে ঈশ্বর আদেশ জ্ঞানে
পালিত তথনি। সে রাণী যদ্যপি বলে—
সমরের নাই প্রয়োজন। কি করিব?
এতস্পর্দ্ধা করি, শেষে দন্তে তৃণ করি
পারস্যের সম্মুখে দাঁড়াব? পিতা মোর
আদর্শসচিব। তাঁর মুখে শুনিয়াছি,
শিশু শিরী কত রাজনীতির রহস্য
দেছে ভেঙে। সে কি শেষে আত্ম পাশরিবে!
যাক্, চিন্তা কেন? মৃত্যু যে সময় আসি
অতিথি দুয়ারে, তথনও আগে কার্য্য,
পরে বিবেচনা। (প্রস্থান।)

(আমিনার প্রবেশ।)

আমিনা। কিবা এর পরিণাম?
প্রেম আকিঞ্চনে এই জীবনসাধন।—
কি পাবে দক্ষিণা তার বুঝেছ কি রাণি?

প্রেমের পরীক্ষা এত করিছ সুন্দরি,
বুঝিতে না পারি কি তব অদৃষ্টে আছে !
বিশ্বাস আমার, সুফল ফলে না কভু
প্রেমপরীক্ষায়। উত্তরে যাইতে প্রেম
পূর্ব্বদিকে যায়, ভালবেসে পর বলে
হৃদয়ের ধনে, সম্মুখে ঠেকায় পায়,
পদধ্যান করে সঙ্গোপনে। পরীক্ষায়
প্রেম কভু হয় নাই স্থির। শিরি, শিরি,
সে প্রেম কি হবে স্থির তোর পরীক্ষায় ?
ঈশ্বর ! মঙ্গল দাও রাণীরে আমার।
কিন্তু কই রাজপ্রতিনিধি ? অপ্রেমিক
প্রাণেশ আমার। কই, কোথা সেই নিত্য
নব কথার ঝঙ্কার ? কই, কোথা সেই
বর্দ্ধিষ্ণু চলিষ্ণু পরচিন্তা স্তুপাকার ?

রস্তম। (নেপথ্যে) ওমরা মনসবদার নগরকোটাল
দুর্গরক্ষী সেনাপতি—সবারে ডাকিয়া
আন। বল, সবিশেষ আছে প্রয়োজন।

(রস্তমের প্রবেশ।)

আমিনা। উর্দ্ধশ্বাসে কেন প্রাণেশ্বর ?

রস্তম। উর্দ্ধশ্বাসে
কেন ?—মরণযন্ত্রণা শিরে। তাড়নায়
তার শ্বাস বুঝি থাকে নাকো। যতগুলা
নিশ্বাসপ্রশ্বাসে বাঁধা প্রাণ, একসঙ্গে
খুলে যাবে। ভবের বন্ধন, প্রাণেশ্বরি,

মুহূর্ত্তে ঘুচিয়া যাবে। তাই একেবারে
সংসারে চলার কার্য্য করিতেছি শেষ।

আমিনা। ও কি পাগলের মত কও!

রস্তম। কথা কই
তাই ত পাগল। এ জগতে কথা যদি
না থাকিত, হীনপ্রাণী মত, যে যাহার
আপন কর্ত্তব্যকাজ নিজে বুঝে নিত।
ভৃত্য-বন্ধু-উপদেষ্টা থাকি ত না আর।
কিন্তু তুমি হেতা কেন ?

আমিনা। কি হয়েছে? রাজ্যে কি বিপদ উপস্থিত?

রস্তম। শুধু কি বিপদ!—রাজ্য যায়। রাজ্যভার
দিয়াছ আমায়—আমি তার যোগ্য নই,
ফেলে তাই যাই পলাইয়া। ডা'ক তব
নিষ্ঠুরা রাণীরে। রূপের গৌরবে মত্ত,
বাহ্যজ্ঞানহীনা, বুঝিয়া না দেখে কভু,
রূপ-আকর্ষণে কি প্রতাপে অশান্তির
বন্যা আনে দেশে। কি প্রতাপে ভাঙে ঘর-
দ্বার।

আমিনা। কি বল কি বল প্রভু! বুঝিতে না
পারি! অগণ্য যে রাজসুত দ্বারদেশে
ছিল নতশির, তারা কি বিদ্রোহী?

রস্তম। আসে
অগণ্য সামন্ত লয়ে পারস্যের রাজা।
বলে, "ক্ষুদ্র রাণী, তার পণ কে শুনিতে

চায় ? তার তরে রচিব উদ্যান, বিশ্বে
যার নাই স্থান। এত কেন ? বলে তারে
লোটাইব পায়। রাণী না হইতে চায়,
বাঁদী করে' রাখিব ভবনে।

আমিনা। কি উপায়।
রাণী যদি পারস্যের শাহের আদেশে
না করে মস্তক নত,—শাহ্ কি রাণীরে
ধরে' করিবে বন্দিনী ?

রস্তম। তাও কি করিতে
পারে !—মস্তকের মণি করে', ধীরে ধীরে
শিকায় তুলিয়ে, কাফের পূজক মত
নিত্য পায়ে দিবে ফুলজল। শত শত
রাজপুত্র,—এক এক শত চন্দ্রোপম—
রাণী-কর-অভিলাষে বসিয়া দুয়ারে।
হতাশার অন্ধকারে ধীরে ধীরে পশি,
জনমের মত তারা হতেছে মলিন,
সে সবার মধ্যে তার পাত্র মিলিল না ?

আমিনা। তোমার ও পদ্মচক্ষু রাণীর তো নয় !
চাঁদ দেখা ভাগ্যে কভু ঘটেনি তোমার।
মাটী পানে চেয়ে চেয়ে কাটিল জনম।
যেই মুখ তুলে চাও, ভ্রমরে দেখিয়া—
তারেই শশাঙ্ক ভেবে হৃদে দাও স্থান।
আমি ত দেখেছি চক্ষে তোমার সুন্দর
শতচন্দ্রসমদ্যুতি রাজার কুমার।

মানুষ বলিয়া কিন্তু জন্মে নাই জ্ঞান,
দেখে বোধ হয়, যেন কোন তারকার
দেশে, কোন সোণার তিন্তিড়ীতরু হ'তে
ঝুপ্ ঝাপ্ করে' তারা পড়েছে তাতারে।
নর তারা নয়, প্রাণেশ্বর! এক এক
সোণার বাঁদর। অর্থহীন মুখভঙ্গী,
অর্থহীন লম্ফঝম্প শব্দ-উচ্চারণ
তাদের সম্বল। ভিক্ষুমত হত্তে-মেরে
পড়ে আছে দ্বারে, কবে শিরী, সুন্দরীর
রাণী, নয়নে হৃদয় পুরে, কটাক্ষের
ছলে, সর্ব্বস্ব করিবে তারে দান। ধিক্
ধিক্ রাজপুত্রনামে। দাতা, অন্ন-বস্ত্র-
ধন দানে আদরে ভিক্ষুরে। জানে মুষ্টি-
ভিক্ষা যোগ্য তার। শিরী মত মহীয়সী
রাণী, তার উচ্চহৃদিসিংহাসন;—সে কি
ভিক্ষুযোগ্য স্থান! জান না কি, ভুলিলে কি
প্রেমিক সুজন! প্রেমব্যবসায়ে, পায়ে
ধরা যার মূলধন, তার উপার্জ্জন
শুধু রাশি রাশি চরণপ্রহার।

রুস্তম। ভাল,
যাও তবে বলগে রাণীরে, আসিতেছে
বিপুল বিক্রমে হেথা পারস্যের রাজা।
গড়ায়েছে সোণার শিকল ছুটী, তুমি
উদ্ধত বালিকা, আর তোমার রাণীর,—

দুজনের প্রেমমাখা চরণযুগল,
বাঁধিয়া রাখিবে তার উচ্চসৌধশিরে।
দেখিবে সে, কিশোরীর রাতুল চরণ
বাঁধনে কেমনে করে প্রহার বর্ষণ।
রূপপ্রলোভনে শতরাজ্যে তুলিয়াছ
হাহাকার, এইবারে ভাষাও তাহার।

আমিনা। তবে তুমি কি করিতে আছ? মোটা পেটে
রাজ্যের সর্ব্বস্ব খেলে, রাণী যদি যায়
চ'লে, ঝকমারী তোমার নকরী। রাজ-
প্রতিনিধি—বাহুবলে ধর অহঙ্কার—
অগণ্য তাতারসৈন্য তোমার আজ্ঞায়
প্রদীপ্ত অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দিতে পারে—
স্বভাবজ দুর্ভেদ্যপ্রাচীরে রাজ্য তার
রক্ষিত চৌদিকে—সকল থাকিতে, রাণী
পারস্যের শাহগৃহে হইবে বন্দিনী!

রস্তম। আমি ত অমর হয়ে আসিনি ধরায়!
হয় যদি ঘোর রণ! তাই কেন—যদি
পারস্যের শাহ এসে এই ক্ষুদ্র দেশে
রাণীরে দুর্ব্বলা বুঝি করে অপমান,
মর্য্যাদা রাখিতে মোরে সমরে মাতিতে
হবে। তাতে যায় যদি প্রাণ—তার পর?

আমিনা। এতদূর ভেবে—এতদূর ভেবে তুমি
আসিয়াছ প্রাণেশ্বর! আমি ভেবেছিনু,
শাহ-আগমনবার্ত্তা শুনি ভীত বুঝি

বীরেন্দ্রকেশরী। তাই যদি হয়, আমি
তব অর্দ্ধাঙ্গভাগিনী, আর তব রাণী—
দুই বোনে আনন্দে শৃঙ্খল পরে' পায়,
পারস্যের কেলি-ঘরে হইব নর্ত্তকী।
শাহের সম্মুখে দোঁহে কর কাঁপাইয়া
বিনাইয়া বিনাইয়া উচ্চ তুলে তান,
পাহাড়ী ভৈরবী টোড়ি ঝিঁঝিট খাম্বাজে
গাইব হে, তব গুণগাথা। হেসে হেসে
শুনাব রাজায়, প্রবলের আক্রমণে
চারিধার চেয়ে কোন না দেখে উপায়,
প্রাণেশ আমার, ছুটে গেছে জীবনের
পারে, যাহে কেহ তারে খুঁজিয়া না পায়।

রস্তম। সেথা স্বর্গপথ রোধ করে' রব। যেই
আমিনা যাইবে, অমনি, এম্‌নি করে'
গলাটী টিপিয়া, আর তার চাঁদমুখে
এই মত চুণ-কালি দিয়া (চুম্বন) পুনরায়
স্বর্গসুখ ভুগিবারে পারস্যে পাঠাব।

আমিনা। যাও যাও—রাণীর কর্ত্তব্যকার্য্য রাণী
নিজে জানে। তুমি তার দাস, দাসকার্য্য
কর প্রাণপণে। যদি আসে পারস্যের
রাজা, অভ্যর্থনা সমুচিত দাও তারে।
আসে মিত্রভাবে, মিত্রতা দেখাও—আসে
শত্রুভাবে, চূড়ান্ত শত্রুতা জান, দাও
দেখাইয়া। মূর্খ তুমি, জান না প্রেমের

দাবী। তুলনায় তার, সে যে তৃণ মানে
সমগ্র সংসার। সে কি টলে অতিতুচ্ছ
পারস্যের রাজার ভ্রূভঙ্গে। তার সঙ্গে
রণরঙ্গে, সৃষ্টিকাল হ'তে কত শত
অশনি করেছে অভিযান, কিন্তু কবে
শুনিয়াছ, প্রেম তারা আনিয়াছে বশে!
সূক্ষ্মসূত্রে বাঁধা প্রেম, তরল আবেগ
তটিনীর টল্‌টল্ তরঙ্গ আশ্রয়—
কিন্তু রাজপ্রতিনিধি, ছিনাইতে তারে
মত্তকরিশুও ছিঁড়ে যায়। নিষ্পেষণে
করিতে দলন, শত শত বিশ্ব-অঙ্গ
যায় গুঁড়াইয়া।

রস্তম। ভাল, বল দেখি শুনি,
এটা কি রাণীর কথা। কিম্বা বোকা পেয়ে,
মনোমত বুঝাইয়া দিলে সুবদনি!
বিষম রহস্যকথা বলিব তোমারে।
রাণীরে দুর্ব্বলা বুঝি, পারস্যসম্রাট,
বন্দিনী করিতে তারে, বহুসৈন্য লয়ে
তাতারে করিছে অভিযান। সেনাপতি
তার, বহুগর্ব্বে পত্র দেছে মোরে, পত্র
দেখে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল, শাজাদীর
আজ্ঞা ল'তে দেরী সহিল না। পত্র লিখি—
হাত আসিল না। কি করি আমিনা—দূত-
মুখে, সমগর্ব্বে দিয়েছি উত্তর। কিন্তু
এখন হয়েছে ভয়। রাণী যদি টলে!

আমিনা। রাণী যদি টলে!—এক কথা তার—শিরী
কথা বলে' আর না ফিরায়। শিরী-যোগ্য
সৌন্দর্য্যে সাজায়ে, বসাইয়া মধ্যস্থলে
হিরণ্ময় প্রাসাদ সুন্দর, ক্ষীর সম
স্বাদু নীর উষ্ণপ্রস্রবণ, ক্ষীরনীর-
প্রবাহিণী পরিখা চৌদিকে। নীলকান্ত
মণিতরু, অঙ্গলগ্না কণকলতিকা,
উপরে নীলিমাকাশ, নিম্নে জলধর,
কৌমুদী-দামিনীলতা প্রাচীরবেষ্টনী—
এহেন উদ্যান যেবা রচিতে পারিবে,
আর তার সৌধশিরে রাণীরে বসাবে—
রাণী তার হবে।

রস্তম। ভাল, আমিনাসুন্দরি!
কল্পস্থায়ী সে সুন্দর রচনার মাঝে
ক্ষণিক যৌবন লয়ে' কেমনে বসিবে
রাণী!—লোক পাব—এ উদ্যান রচিবার
আছে শক্তিমান। কিন্তু রচিতে রচিতে
তায় বৃদ্ধা হবে সঙ্গিনী তোমার। হ'ক
রাণী, তবু নারী, অবলা তাহার নাম—
এমন বিষম পণ, এত অহঙ্কার,
কখন কি সাজে অবলার!

(শিরীর প্রবেশ।)

শিরী। কেনই না
হবে অহঙ্কার! তুমি দেহরক্ষী যার,
তার না রহিলে অহঙ্কার, কেবা তবে

এ রিপুরে হৃদে দিবে স্থান ? ষড়রিপু
মধ্যে শ্রেষ্ঠ এ রিপু দুর্জ্জয়,—সখা ! সে কি
যেথা সেথা রয় ? ভাবিয়া আকুল তুমি
ক্ষণস্থায়ী এ নবযৌবন ! কিন্তু সখা !
যেই মহাজন আমার বিষম পণ
রাখিবারে পারে, সে কি জানে না উপায়,
কেমনে প্রিয়ার থাকে অটুট যৌবন ?
যদি প্রেম করি, করিব তাহার সনে।
নহে, আগে হ'তে যেই দাসত্ব করিতে
আসিয়াছে, তার সেবা করিব কেমনে ?
চল সখী, উঠি গিয়া প্রাসাদশিখরে।
দেখে আসি কেমন সে পারস্যের রাজা—
দেবতা কি নর, কিম্বা সজ্জিত বানর,
সম্রাট কি শিরীপদপ্রান্তলেহী দাস।

ইতি প্রথমাঙ্ক।

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

সম্মোহন-বিদ্যা।

একজন প্রেতাত্মার সহিত একদিন ইংরাজীতে নিম্নলিখিত কথোপকথন হইয়াছিল। তাঁহার নাম জন্‌সন্; তিনি আসিয়া কহিলেন—

—দেখ, তোমরা আমার জন্য একটা কাজ করিতে পার?

—কি?

—মিস্ সিসিলের প্রেতাত্মাকে একবার আহ্বান করিয়া আনিতে পার?

—কে তিনি?

—সে কথা পরে বোল্‌ব। যদি তাকে ডেকে আমার একটা কথা বোল্‌তে পার, তাহলে তোমাদের কাছে বড় বাধিত থাকি—আর কতদূর যে উপকৃত হই তা বলতে পারি না।

—কেন, আপনিও ত তাঁকে সে কথা বল্‌তে পারেন?

—না, পারি না,—আমার ক্ষমতাতীত।

—কি রকম?

—তাহার সহিত আমার সাক্ষাৎ অসম্ভব।

—কেন অসম্ভব? কথাটা পরিষ্কার করিয়া বলিবেন কি?

—তার ও আমার থাকিবার স্থান স্বতন্ত্র—সে যেখানে থাকে, সেখানে আমার প্রবেশাধিকার নাই।

—আপনাদের থাকিবার স্থান কি ভিন্ন ভিন্ন আছে?

—হাঁ।

—আমরা ত পূর্ব্বে শুনিয়াছি, আপনারা সব স্থানেই যাইতে পারেন।

—পৃথিবীর মধ্যে সব স্থানেই যাইতে পারি বটে, কিন্তু পৃথিবীর

বাহিরে, কতকটা নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যতীত আমাদের গমনাগমনের ক্ষমতা নাই—আমরা চেষ্টা করিলেও পারি না।

—মিস্ সিসিল কি সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানের মধ্যে থাকেন না?

—না।

—তিনি কোথায় থাকেন?

—আমার থাকিবার স্থানের গণ্ডীর বাহিরে—অনেক দূরে।

—আপনারা কি পৃথিবীর মধ্যেই থাকেন না?

—না—তবে খুব কাছা কাছি বটে।

—তবে এখানে আসিলেন কেমন করিয়া?

—আমরা অনেক সময় পৃথিবীর মধ্যেই ঘুরিয়া বেড়াই।

—মিস্ সিসিলও ত পৃথিবীতে আসিতে পারেন?

—পারে বটে, কিন্তু আমি বহু অনুসন্ধান করিয়াছি, তাহাকে একবারও এখানে দেখিতে পাই নাই। সে বোধ হয়, এদিকে আসে না।

—আচ্ছা আপনাদের সব থাকিবার স্থান ভিন্ন ভিন্ন আছে কেন ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিবেন কি?

—বুঝিয়াছি, আপনারা ব্যাপারটা ভাল রকম বুঝিতে পারেন নাই। এ সব জানিয়া আপনাদের কি হইবে? এখন আমার কাজটা করিবেন কি না বলুন।

—নিশ্চয়ই; আপনার কাজ সম্পন্ন করিতে বিশেষ চেষ্টা করিব। কিন্তু ব্যাপারটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন, আমরা জানিবার জন্য বড়ই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছি।

—মানুষের মধ্যে যেমন ভাললোক-মন্দলোক আছে, আমাদের মধ্যেও তেমনি।—মানুষ মলেই সাধুপুরুষ হয়ে যায় না। জীবন্ত অবস্থায় যে, যে প্রকৃতির লোক থাকে, মৃত্যুর পরও তাহার বিশেষ

পরিবর্ত্তন হয় না। তোমরা যেমন চোর-ডাকাত-খুনেদের মানবসমাজ হইতে পৃথক্ করে আকাশস্পর্শী প্রাচীরঘেরা ভূমিখণ্ডের মধ্যে, সোজা কথায় যাকে জেল বলে, তার মধ্যে অবরুদ্ধ রাখবার ব্যবস্থা করেছ, এখানেও অনেকটা সেইরকম ব্যবস্থা। পৃথিবীর এপার ওপার থেকে লক্ষ লক্ষ মাইল দূরবর্ত্তী স্থানের (space) মধ্যে অনেকগুলি স্তরের মত আছে, এই বিভিন্নস্তরে বিভিন্নপ্রকৃতির আত্মাদের স্থান। যারা যে রকমের তারা তাদের নির্দ্দিষ্ট স্তরে মৃত্যুর পর গিয়া উপস্থিত হয়—অবশ্য অজ্ঞাতসারে; কে তাহাদের পথদর্শক তাহা আমি জানি না। একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মের ভিতর দিয়া সব হইয়া যায়—যেমন দিনের পর রাত্রি আসে, বসন্তে কোকিল ডাকে। এক স্তরের আত্মা অন্য স্তরে যাইতে পারে না, কিন্তু সকলেই পৃথিবীর মধ্যে আসিতে পারে, তাহাতে কোন বাধা নাই। হায়! সিসিল যেখানে আছে, সেখানে যদি যাইবার ক্ষমতা থাকিত!

—যাইতে আপনারা কিসে বাধাপ্রাপ্ত হন?

—পঙ্গু যেমন গিরি উল্লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ, এক্ষেত্রে আমরাও সেইরূপ। যেখানে আমাদের যাওয়া নিষিদ্ধ সেইদিকে যাইতে গেলেই আমাদের গমনাগমনের ক্ষমতা লোপ প্রাপ্ত হয়।

—আর দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?

—ক্ষমা কর, অনেক কথা বলিয়াছি—আর বলিতে পারিব না।

—আচ্ছা, আপনাদের বলিতে বাধা কি?

—অনেক কথা বলিয়াছি, আর কিছু বলিব না। সিসিলকে বলিও, তাহার নিকট আমি বড়ই অপরাধী—আমি তাহাকে মিথ্যা কথা বলিয়াছিলাম, মনে করিয়াছিলাম, তাহাতে সে আমাকে বিবাহ করিবে, আমি ভুল বুঝিয়াছিলাম, তাহার অন্তঃকরণ এত উচ্চ তাহা আমি জানিতাম না; আহা, বেচারা আমার কথাতেই আত্মঘাতী হইল। আমি নরাধম। তাহাকে বলিও, এখন আমি অনুশোচনা-অনলে

দগ্ধ হইতেছি; সে যেন আমাকে ক্ষমা করে—আমি কাতরকণ্ঠে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি—আর তাহার কাছে কিছু চাহি না, কেবল ক্ষমা ক্ষমা। ওঃ, সিসিল যদি আমাকে একদিনের জন্যও ভালবাসিত।—

—আপনি কি তাঁহাকে ভালবাসিতেন ?

—ভালবাসিতাম কি ?—আজও পর্য্যন্ত তাহাকে আমি খুব ভাল বাসি—এমন ভালবাসা কেহ কাহাকেও বাসে নাই। আর একটী কথা বলিও, সে যেন এই পৃথিবীতে আসিয়া আমার সহিত একটীবার সাক্ষাৎ করে—আমি তাহাব আশায় এইখানে সেই বিচারের দিন (dooer's day) পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব। হায়, হায়, মানুষ মরে, তবু স্মৃতি যায় না কেন ? ও, সিসিল, সিসিল!—ক্ষমা চাহিতেছি, মনের উদ্বেগে অনেক আক্ষেপে উক্তি বাহির হইয়া গিয়াছে, কিছু মনে করিও না। সিসিলকে আমার কথা বলিবে ত ? তাহাকে জানাইও আমি কতদূর অনুতপ্ত।

—মিস্ সিসিলের পরিচয় কি ? আরও অনেক ঐ নাম্নী থাকিতে পারেন ত ?

—আমি তার পরিচয় কিছু দিব না।—শুধু এই কথা, আমার বন্ধু—জন্‌সনের বন্ধু—এই যথেষ্ট। সিসিল নামে কোন প্রেতাত্মা আসিলে তাহাকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিও, জন্‌সন্ নামে কাউকে সে চেনে কি না, যদি বলে হাঁ, তবে আমি যাহা বলিলাম, সেই কথাগুলি বলিও, সে বুঝিতে পারিবে।

—তাঁহার পরিচয় দিতে আপনার আপত্তি কি ?

—আপত্তি আছে। নইলে দিলাম না কেন ?

—আপনার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিব।

—ধন্যবাদ।

আমরা চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু সিসিলের আত্মাকে পাই নাই।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

অজয় সর্দ্দার।

(দ্বিতীয় প্রস্তাব)

এইবারে আমরা অজয়সর্দ্দারের সেই বিখ্যাত মোকর্দ্দমাঘটিত ব্যাপারসমূহ উল্লেখ করিয়া পাঠকের কৌতূহলবৃত্তি চরিতার্থ করিতে আকাঙ্ক্ষা করি। এই মোকর্দ্দমার বিবরণ পাঠ করিয়া অনেক পাঠকের দেহ রোমাঞ্চিত হইতে পারে। এরূপ ঘটনা সচরাচর ঘটে না; অজয়ের জীবনে এরূপ ঘটনা একটিমাত্র ঘটিয়াছিল। আমরা সংক্ষেপে সেই বিখ্যাত মোকর্দ্দমা ও সেই লোমহর্ষণ ঘটনার উল্লেখ করিব।

দ্বারকেশ্বরনামক নদতটে জাহানাবাদ উপনগর অবস্থিত। দ্বারকেশ্বর পার হইয়া গেলে বালীদেওয়ানগঞ্জনামে এক গণ্ডগ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার তিন ক্রোশ অন্তরে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক "গড়মান্দারণ" গ্রাম। বঙ্কিমবাবুর দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে গড়-মান্দারণ পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে। বঙ্কিমবাবু জাহানাবাদের ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের চাকুরী করিবার সময়, গড়মান্দারণের মোগল-পাঠান-যুদ্ধ-ঘটনা হইতে দুর্গেশনন্দিনীর মূল বিষয় সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন। গড়মান্দারণ এক্ষণে ভগ্নাবশেষে পরিণত, ইহারই সামান্য দূরে একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম, তথায় হীরারাম চট্টোপাধ্যায়নামে এক ব্রাহ্মণের বসতি ছিল। হীরারামের প্রথমা স্ত্রী মৃত্যুমুখে পতিতা হইলে পর, হীরারাম কলিকাতা নগরীতে আগমন করিয়া চাকুরীর চেষ্টা করিতে থাকেন; মাসিক দ্বাদশমুদ্রা বেতনের একটা সামান্য চাকুরী প্রাপ্ত হইয়া হীরারাম শ্যামবাজারে বাস করিতে লাগিল। তিলি-জাতীয় একজন ধনবান আড়তদার ও মহাজনের গদিতে হীরারামের চাকুরী ছিল; বেতন ব্যতীত অন্যোপায়েও চট্টোপাধ্যায়মহাশয় কিছু

কিছু উপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইতেন। তখন ডাকঘর ও টেলিগ্রাফের ভাল বন্দোবস্ত ছিল না; পল্লীগ্রাম হইতে চিঠিপত্র আসিতে সুদীর্ঘ বিলম্ব হইত। এখন অনেক স্থানে রেলওয়েলাইন দৃষ্ট হইয়া থাকে; তখন মূল ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেললাইন ব্যতীত রাঢ় অঞ্চলে আর কোন রেল বা ট্রামের বন্দোবস্ত ছিল না। যাহা হউক, প্রায় দেড় বর্ষকাল পরে, হীরারাম চট্টোপাধ্যায় তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকর্ত্তৃক প্রেরিত একখানি পত্র পাঠে জ্ঞাত হইলেন যে, তাঁহার দ্বিতীয়বার বিবাহের বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গিয়াছে। পত্রখানির মর্ম্ম এইরূপ; পিতা লিখিতেছেন,—"প্রিয় হীরারাম! তোমার সহধর্ম্মিণী বিগতা হইয়াছেন সত্য, কিন্তু তোমার পুনরায় বিবাহ করিবার বয়স এখনও যায় নাই। তুমি যুবাপুরুষ, বিশেষতঃ পুত্রকন্যা নাই, বংশরক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক, তদ্ভিন্ন আমি এবং তোমার মাতা উভয়েই বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, অতএব তোমার পুনরায় বিবাহ করা নিতান্ত আবশ্যক। পৈত্রিক বাস্তুভিটায় সন্ধ্যাকালে প্রদীপ জ্বালিবার জন্যও একজন বংশধর থাকা প্রয়োজন। যাহা হউক, আগামী ১৭ই আষাঢ় তারিখে শুভলগ্নে তোমার বিবাহ হইবে, তুমি অন্ততঃ ১১ই আষাঢ় দিবসের পূর্ব্বে বাটীতে নিশ্চয় পৌঁছিবে। বিবাহের সমুদয় বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গিয়াছে, দিন পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে না; যত টাকা আনিতে পার, আনিও। ইত্যাদি।"

যথাসময়ে হীরারামের পিতার পত্র হীরারামের হস্তগত হইয়াছিল। পত্র পাইবার দুই তিন দিন পরে, হীরারাম তিনশত কয়েকটি টাকা সংগ্রহ করিয়া জন্মভূমি-অভিমুখে রওনা হইলেন। বর্দ্ধমান রেলওয়ে ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া ষ্টেশনের নিকট দোকানে রাত্রিযাপনপূর্ব্বক প্রত্যূষে স্বগ্রামাভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। বর্দ্ধমাননগর হইতে প্রায় এক ক্রোশ দূরে দামোদরনদ, তথাকার সদরঘাটে

নদ পার হইয়া, জামনানামক গ্রামে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রামলাভপূর্ব্বক পুরাতন গ্রাণ্ড্-ট্রঙ্ক-রোড নামক বিখ্যাত রাস্তা অবলম্বন করিয়া হীরারাম চলিতে লাগিলেন। কোতলপুরনামক স্থানের একটী লোক বর্দ্ধমানষ্টেশনে হীরারামের সহিত রাত্রিযাপন করিয়াছিল; সেই ব্যক্তি হীরারামের সঙ্গী ছিল; সে ব্যক্তির কোতলপুরগ্রামে যাওয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রায় দুই বা তিন ক্রোশ পথ অতিক্রম করিয়া সেই ব্যক্তি একটী সংক্ষিপ্ত রাস্তা দিয়া কোতলপুর-অভিমুখে চলিয়া গেল, সুতরাং হীরারাম একাকী হইল, আর কেহ সঙ্গী রহিল না। হীরা-রামের তখন ২৯ বৎসর বয়ঃক্রম, দেখিতে উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের লোক, দেহে অমিত বল ছিল। তখনকার পাড়াগাঁয়ের লোকেরা প্রায় সকলেই বলশালী ও সুস্থদেহ থাকিত।

বর্দ্ধমান হইতে হীরারামের গ্রাম প্রায় ১০ ক্রোশ দূরবর্ত্তী। এক দিবসে এই পথ অতিক্রম করা কঠিন ব্যাপার; বিশেষতঃ স্নান-আহার, আহ্নিক-পূজা প্রভৃতির সময় চাই; এই জন্য হীরারাম ভাবিলেন, সূর্য্যাস্তের সময় কোন গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব পশ্চিমগগণে ক্ষীণতেজ হইয়া ক্রমে ক্রমে অদৃশ্য হইয়া গেলেন; গোধূলি আসিয়া দেখা দিল; পথও ভয়ানক এবং দুর্গম; বিশেষতঃ পথের ধারে গ্রাম নাই, পথিকেরাও তখন গমনাগমন বন্ধ করিয়া দূরবর্ত্তী গ্রামসমূহে বিশ্রামলাভ করিতেছিল। ক্ষুধার্ত্ত, পিপাসিত ও পথক্লান্ত হীরারাম, এমন সময়ে, গ্রাণ্ড্-ট্রঙ্ক-রোড্ পথের ধারে এক ফাঁড়িঘরে উপনীত হইলেন। ক্ষুদ্র ফাঁড়িঘরের পার্শ্বে প্রকাণ্ড দীঘি, চারিদিকেই বিরাট মাঠ, কেবল দুই শত বা তিন শত হস্ত দূরে একখানি অতি সামান্য দোকান অবস্থিত। এক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক ঐ দোকানে বসিয়া মুড়ি-মুড়কী, চাউল-ডাউল প্রভৃতি বিক্রয় করিতে-ছিল। এই স্থান জাহানাবাদ মহকুমার অধীন।

দোকানে গিয়া ব্রাহ্মণযুবক ঐ বুড়ী স্ত্রীলোককে এবং তাহার একটী অতি অল্পবয়স্কা দৌহিত্রীকে ভিন্ন আর-কাহাকেও দেখিল না। যাহা হউক, তথায় সন্ধ্যাহ্নিক সমাপনপূর্ব্বক কিছু "জলখাবার" খাইয়া হীরারাম ফাঁড়িঘরে উপনীত হইল। বুড়ী কহিয়া দিয়াছিল, আমার দোকানে রাত্রিযাপনের স্থান নাই, তুমি ফাঁড়িঘরে গিয়া ফাঁড়িদার-মহাশয়কে অনুরোধ করিলে তিনি তোমাকে একটু স্থান দিতে পারেন। ব্রাহ্মণ তাহাই করিল। ফাঁড়িঘরে গিয়া হীরারাম ভাবিল, আমি এক্ষণে নিরাপদ; কারণ, ফাঁড়িঘরকে একপ্রকার ছোটখাট থানা বলা যাইতে পারে। কিন্তু নির্ব্বোধ ব্রাহ্মণ তখনও জানিতে পারে নাই যে, নরাধম ফাঁড়িদারেরাই দস্যুদিগের প্রধান বন্ধু ও সহায়, আর ঐ বুড়াটা চোরের সর্দ্দারনী। যাহা হউক, মুসলমান ফাঁড়িদারকে সেলাম করিয়া ব্রাহ্মণ যাহা কহিল, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই, —"আমার নিবাস গড়মান্দারণ পরগণা, আমি জাতিতে ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ পিতামাতার পত্র প্রাপ্ত হইয়া দেশে যাইতেছি; কলিকাতা হইতে রওনা হইয়াছিলাম, বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত রেলে আসিয়া পদব্রজে আসিতেছি। রাত্রিকালে কৃপা করিয়া ফাঁড়িঘরে আমাকে কয়েক ঘণ্টার জন্য আশ্রয় দিলে, আমি কল্য প্রাতে গ্রামাভিমুখে রওনা হইয়া যাইব। আমার সঙ্গে নগদ একশত বত্রিশ টাকা ও তদ্ভিন্ন দুইশত টাকার নোট আছে। নোটগুলা নম্বরারী নহে, ১০ টাকার নোট। তা-ছাড়া বাঘমুখো একজোড়া সোণার বালা, রূপার একছড়া চন্দ্রহার এবং হাতের একটা সুবর্ণনির্ম্মিত "অনন্ত" আছে। এই অনন্তনামক অলঙ্কারের সংযোগস্থলে একটা সোণার চাকৃতী আছে, সেই চাকৃতীর উপরে আমাদের দেশীয় একটা স্বর্ণকার কলিকাতার শ্যামবাজারের ছোট কালীমূর্ত্তি খোদিত করিয়া দিয়াছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সমুদয় টাকা, নোট ও অলঙ্কার রাখিয়া দিউন এবং আমাকে একটা রসিদ

দিয়া বাধিত করুন। রাত্রি প্রভাত হইলে আপনার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ করিয়া রসিদ প্রত্যর্পণপূর্ব্বক নোট, টাকা ও অলঙ্কারাদি লইয়া গৃহে চলিয়া যাইব। রাত্রিকালে নিজের কাছে টাকাকড়ি রাখা উচিত বিবেচনা করি না।" ভণ্ড ফাঁড়িদার কহিল "ঠাকুর গো! এরূপে কাহারও টাকা, নোট বা গহনা আমরা রাখি না; রাখিবার হুকুমও নাই, তবে তুমি ব্রাহ্মণ, বিশেষতঃ ধার্ম্মিক, ভদ্রলোক এবং দূরদেশবাসী পথিক, সুতরাং অগত্যা তোমার অনুরোধ রক্ষা করিব, এবং রাত্রিকালে এখানে শুইতে দিব।" এই কথা শুনিয়া নির্ব্বোধ হীরারাম ফাঁড়িদারকে শত শত ধন্যবাদ দানপূর্ব্বক যথাসর্ব্বস্ব তাহার হস্তে অর্পণ করিল। বলা বাহুল্য, ঐ রাত্রে ফাঁড়িঘরে সেই অপূর্ব্ব দস্যুদলপতি—সেই দিগ্বিজয়ী দস্যুবীর—অজয়সর্দ্দার স্বয়ং উপস্থিত ছিল। কি একটা গোপনীয় বিষয়ের মন্ত্রণার জন্য অজয়সর্দ্দার, এই ঘটনার দুই দিবস পূর্ব্ব হইতে ফাঁড়িদারের কাছে ফাঁড়িঘরে অবস্থান করিতেছিল। ক্রমে ক্রমে অজয়সর্দ্দার-প্রভৃতির সহিত হীরারাম চট্টোপাধ্যায়ের আলাপ-পরিচয় হইয়া গেল। দস্যু ও ডাকাইতেরা অপরিচিত বিদেশীকে প্রকৃত নাম ও বাসস্থান প্রায়ই বলে না সুতরাং এক একটা কৃত্রিমনামে চাটুর্য্যের নিকট ইহারা পরিচিত হইয়া গেল। তাহাদের প্রকৃত বাসস্থানের পরিচয় হীরারাম প্রাপ্ত হইল না।

রাত্রি প্রায় সাড়ে নয়টা বাজিয়া গেলে ব্রাহ্মণকে সম্বোধন করিয়া ফাঁড়িদার কহিল "আমার সঙ্গে আইস, আমি তোমার শয়নের স্থান দেখাইয়া দিতেছি।" এইখানে বলিয়া রাখা উচিত, ফাঁড়িখানার দুই পার্শ্বে দুইটা কামরা ছিল, তদ্ব্যতীত আর এক দিকে আর একটা নাতিক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ ঘর প্রায়ই খালি থাকিত। এই ঘরে গিয়া ফাঁড়িদার একটা চৌকিদারকে একখানা পুরাতন মাদুর এবং ছিন্ন কাগজ

ও ছিন্ন কাপড়ে প্রস্তুত একটা ছোট বালিস আনিতে কহিল। তাহা আনীত হইলে, ফাঁড়িদার বলিল, "বামুণঠাকুর! তুমি এই ঘরে নিরাপদে শুইয়া থাক।" এই কথা কহিয়া ফাঁড়িদার চলিয়া গেলে হীরারাম চট্টোপাধ্যায় ঐ মাতুর এবং ঐ উপাধানে দেহ ও মস্তক রাখিয়া শয়ন করিল। ফাঁড়িদারের মুখে অজয়সর্দ্দার, বামুণের সমুদয় কথা অবশ্য শুনিয়াছিল। রাত্রিকালে চাটুর্য্যেকে হত্যা করাই স্থির হইল।

এই ঘটনার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে ফাঁড়িদারের কনিষ্ঠ সহোদর স্বগ্রাম হইতে আসিয়া ফাঁড়িতে অবস্থান করিতেছিল। দুই এক দিন মধ্যে তাহার গ্রামে প্রত্যাগমন করিবার কথা ছিল। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতাবশতঃ ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। ফাঁড়িথানার পার্শ্বে যে দোকান ছিল, তাহারই অতি নিকটে কয়েকটা দুগ্ধবতী ভীর জন্ত একটা ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর ছিল, তাহারই একদিকে ফাঁড়িদারের টর্চ্চী, "খানা" প্রস্তুত করিত। অজয়সর্দ্দার আগমন করায়, একজন গোপজাতীয় লোক রশুয়ের কার্য্য করিতেছিল। রাঢ় অঞ্চলের লোকেরা দিবসে অনেক বিলম্বে ভোজন করে, রাত্রিকালেও অনেক বিলম্বে ভাত খাইয়া থাকে। ফাঁড়িদারের কনিষ্ঠ সহোদর, শারীরিক অসুস্থতানিবন্ধন সন্ধ্যাকালের একটু পরেই আহারক্রিয়া শেষ করিয়া রাখিয়াছিল। যে কুঠুরীতে হীরারাম চট্টোপাধ্যায় শয়ন করিল, তাহারই বহির্দ্দেশে, দ্বারের সম্মুখে এবং মাটির বারান্দায়, ফাঁড়িদারের ভাই, শয়ন করিয়া রহিল। উভয়েরই উপাধান, কতকগুলা ছিন্ন কাগজ ও কাপড়-পরিপূর্ণ থলিবিশেষ; উভয়েরই বিছানা পুরাতন মাতুর। মাঠে ঘর বলিয়া ভোরের সময় শীতল বায়ু বহিতে থাকে, তজ্জন্য শৈত্যানুভব হয়, এই কারণে ফাঁড়িদারের ভাই একখানা উড়ানি (চাদর) দ্বারা দেহাবৃত করিয়া শুইয়া রহিল। হীরারামের সঙ্গে চাদর বা উড়ানি ছিল, সেও চাদর জড়াইয়া শয়ন করিল। ফাঁড়িদার এবং তাহার লোকেরা

প্রায় সকলে, উভয়ের শয়নের স্থান ভাল করিয়া দেখিয়া চলিয়া গেল। রাত্রি প্রায় একাদশঘটিকার সময় সকলে সেই গোয়ালঘরে আহার করিতে গেল, এবং নানাপ্রকার রহস্যময় গল্প ও কাহিনী কহিতে কহিতে ও শুনিতে শুনিতে আহারে বিলম্ব করিতে লাগিল। এই স্থানে বলিয়া রাখা উচিত, ফাঁড়িদারের নিরপরাধী কনিষ্ঠ সহোদর, উহাদের লোমহর্ষণ ষড়যন্ত্রের কথা কিছুই শুনে নাই; তাহাকে কেহ এ সকল কথা শুনায় নাই, সুতরাং এই ঘটনার সে কিছুই জানিত না।

জ্যৈষ্ঠ মাস, ভয়ানক গ্রীষ্ম, বায়ু প্রায় নাই। ক্ষুদ্রঘরের ভিতর অসংখ্য মশা; গরমের ত কথাই নাই; হীরারামের পক্ষে সে ঘরে শয়ন করা কঠিন হইতে কঠিনতর হইয়া উঠিল। ইতঃপূর্ব্বেই লিখিয়াছি, ফাঁড়িদারের সহোদর ঐ কুঠুরীর দ্বারের সম্মুখস্থ বারান্দায় শুইয়াছিল; তাহাকে সম্বোধন করিয়া হীরারাম কহিল—"ভায়া! আমার কুঠুরীতে যে প্রকার গ্রীষ্ম এবং মশকের উপদ্রব, তাহাতে ইহার ভিতর শয়ন করা অত্যন্ত কষ্টকর, অতএব তুমি এই ঘরে শয়ন কর, আর আমি তোমার স্থানে শুইয়া থাকি।" ফাঁড়িদারের ভাই বলিল "ঠাকুর গো! তাহা কেমন করিয়া হইতে পারে? আপনি ব্রাহ্মণ, আর আমি মুসলমান; আমি ঘরের ভিতর শুইব, আর আপনি ঘরের বাহিরে শুইবেন, ইহা কি কখন হইতে পারে? যাহা হউক, অনেক অনুরোধ ও তর্কবিতর্কের পরে ফাঁড়িদারের ভাই ঘরের ভিতর শুইতে গেল আর হীরারাম চট্টোপাধ্যায় বহির্দ্দেশে তাহার স্থানে শুইয়া রহিল।

এদিকে রাত্রি প্রায় এক ঘটিকার সময় চট্টোপাধ্যায়ের নিদ্রাভঙ্গ হইল, তখন ঘরের ভিতর মুসলমান গভীর নিদ্রায় মগ্ন ছিল। কিয়ৎ-ক্ষণ পরে দুই একটা লোকের পদশব্দ শ্রবণ করিয়া, হীরারাম নিঃশব্দে শয়ন করিয়া রহিল, কেবল চক্ষুদুইটি অল্পমাত্র খুলিয়া-রাখিয়া নীরবে

পথের দিকে চাহিয়া দেখিতে লাগিল। অল্পকাল পরে, অজয়সর্দ্দার একটা শাণিত "খাঁড়া" (পাঁটাকাটা অস্ত্রবিশেষ) হাতে লইয়া, ফাঁড়িদারের সঙ্গে সেই ক্ষুদ্রগৃহে প্রবেশপূর্ব্বক, ব্রাহ্মণভ্রমে ফাঁড়িদারের কনিষ্ঠ সহোদরকে হত্যা করিল। ঘরের ভিতর রক্তের নদী বহিতে লাগিল। এদিকে হীরারাম নিঃশব্দে শয়ন করিয়া ভগবানকে ডাকিতে লাগিলেন। হত্যাক্রিয়া সমাধা হইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ বিছানাসমেত মৃতদেহকে দীঘির মধ্যে লইয়া "গাঁজ" মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়া দিল। পাছে মড়া জলোপরি ভাসিয়া উঠে এজন্য একখানা বড় পাথরে একটা বড় রশি (দড়া) বাঁধিয়া মৃতদেহকে জলের ভিতর ডুবাইয়া দেওয়া হইল। ফাঁড়িখানা বন্ধ করিয়া, দীঘির মধ্যে অজয়সর্দ্দার ও ফাঁড়িদার প্রভৃতি চলিয়া যাইবার কিয়ৎক্ষণ পরে, হীরারাম চট্টোপাধ্যায় সেস্থান পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রাণভয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে এবং প্রবলবেগে মাঠের উপর দিয়া অন্ধকারে দৌড়িতে লাগিল। নিকটে কোথাও গ্রাম নাই, সুতরাং কোথাঁয় দৌড়িতেছে তাহার কিছুই সে জানিতে পারে নাই। প্রায় তিন মাইল পথ দৌড়িয়া গিয়া হীরারাম অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িল; নিকটে কয়েকটা বড় বড় আম্রগাছ ছিল; একটা গাছের উপর আরোহণ করিয়া উড়ানি দ্বারা নিজের পা গাছের ডালে বাঁধিয়া রাখিয়া শাখায় বসিয়া রহিল। এদিকে অজয়, ফাঁড়িদার ও অন্যান্য লোক দীঘি হইতে ফিরিয়া আসিয়া তামাকু সেবনপূর্ব্বক নিদ্রায় নিযুক্ত রহিল। ভাই ঘুমাইয়া গিয়াছে বলিয়া তাহাকে আর জাগাইবার আবশ্যক নাই ভাবিয়া ফাঁড়িদারের ভ্রাতার বিষয়ে কেহ কিছু অনুসন্ধান করিল না। কুঠুরার ভিতরকার রক্ত ইত্যাদি প্রভাতে পরিষ্কার করা হইবে, এইরূপ পরামর্শ স্থির রহিল।

রজনী শেষ হইলে, কাক-কোকিল-প্রভৃতি বিহঙ্গগণ কাকলিলহরী দ্বারা দিগ্‌দিগন্ত আমোদিত করিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে আলোক

সঞ্চারিত হইবার প্রথমাবস্থায় হীরারাম দেখিল অদূরে গ্রাণ্ডট্রঙ্ক রাস্তার উপর দিয়া ছয়খানি বলদশকট যাইতেছে, গাড়োয়ানেরা হৃদানন্দে গীত গাহিতেছে। চট্টোপাধ্যায়মহাশয় বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে জাহানাবাদ পর্য্যন্ত পৌঁছিল। তথায় তত্রত্য ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টরের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। তখন বাবু ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল বাহাদুর জাহানাবাদের ডেপুটী ছিলেন। ইনি কলিকাতা পটলডাঙ্গার সুবিখ্যাত ঘোষালবাবুদের বংশসম্ভূত। ইনি যেমন পরিশ্রমপরায়ণ, তেজস্বী, সাহসী, বীর এবং দুষ্টের দমনকারী ও শিষ্টের পালনকারী ছিলেন, তেমনি ঘোরতর দুর্দ্দান্ত শাসক বলিয়া গণ্য হইতেন। ইহাঁর প্রতাপে ও ভয়ে সাপে-নেউলে একত্রে নির্ব্বিবাদে বিচরণ করিত। এখনও অনেকের মুখে শুনা যায়—

"জমিদারের মুখুটি।
ঘোষালের ডিপুটি॥"

অর্থাৎ জমিদারের মধ্যে যেমন উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ডেপুটির মধ্যে তেমনি ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল। যাহা হউক, হীরারামের প্রমুখাৎ সেই লোমহর্ষণ ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ শ্রবণ করিয়া ঘোষালমহাশয় ক্রোধে, ঘৃণায়, প্রতিহিংসাপরায়ণতায় অগ্নিশর্ম্মাতুল্য হইয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণের যথাবিধি আহারাদির বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া, অপরাহ্লে পুলিশের ইনেস্পেক্টর, দারোগা ও দ্বাদশজন কনেষ্টবল এবং প্রায় অর্দ্ধশত চৌকিদারকে ডাকাইয়া ঐ ঘটনার সমুদয় কথা জানাইলেন, এবং রাত্রি নয় ঘটিকার সময় তাহারা সেই দীঘির অভিমুখে রওনা হইবে, এইরূপ আদেশ জারি করিলেন। বলা বাহুল্য, রাত্রি প্রায় সার্দ্ধনয়ঘটিকার সময় ডেপুটীবাবু, সব্‌ডেপুটিবাবু এবং ঐ সমস্ত লোক ফাঁড়িঘরের অভিমুখে রওনা হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইবার একটু পূর্ব্বে তাঁহারা দীঘির ধারে উপস্থিত হইয়া সর্ব্বপ্রথমে দীঘির ঘাটে

পাহারার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া ফাঁড়িদার, ফাঁড়ির বরকন্দাজগণ, চৌকিদার, দোকানদারিণী প্রভৃতি সমুদয়কে গ্রেপ্তারকরিলেন, কিন্তু অজয়সর্দ্দার ইতিপূর্ব্বেই ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, সুতরাং সে আর গ্রেপ্তার হইল না। পুলিশ ইনেস্পেক্টরের লাঠির প্রবল আঘাতে ফাঁড়ির একটা বৃদ্ধ বরকন্দাজ ও সেই বুড়ী দোকান-দারিণী সমস্ত ঘটনা প্রকাশ করিয়া দিল। পুলিশের মারাত্মক "শ্যাম-চাঁদের" আঘাতে ফাঁড়িদারের মুখেও সমুদয় কথা প্রকাশিত হইয়া পড়িল। দীঘির ভিতর অনুসন্ধান করিয়া মৃতদেহও পাওয়া গেল। ডেপুটীবাবু, মোকর্দ্দমার তদারক করিয়া জানিলেন, ইতিমধ্যে চারি ক্রোশ দূরবর্ত্তী থানার দারোগার নিকটে "অনন্ত"-নামক সোণার অলঙ্কার এবং রূপার "চন্দ্রহার" গহনা, ফাঁড়িদারের ভৃত্য পৌঁছাইয়া দিয়াছে ; উহা দারোগার অংশের জিনিস। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, এই অলঙ্কারগুলি হীরারামের সঙ্গে ছিল ; সোণার অনন্তে কালীদেবীর মূর্ত্তিও খোদা ছিল। থানার দারগা, ফাঁড়ির ফাঁড়িদার, বরকন্দাজ, বুড়ী দোকানদারণী, চৌকিদার প্রভৃতি গ্রেপ্তার হইয়া হাজতে আবদ্ধ রহিল, কিন্তু অজয়সর্দ্দারের সন্ধান পাওয়া গেল না।

প্রসিদ্ধ ডিটেক্‌টিভ্ পুলিশইনেস্পেক্টর সেখ বকাউল্লা, অজয়সর্দ্দারকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য অনেকপ্রকার কৌশল অবলম্বন করিলেন, কিন্তু অজয় গ্রেপ্তার হইল না। অবশেষে ঠগী ডিপার্টমেণ্টের সুবিখ্যাত ডিটেক্‌টিভ্ পুলিশ ইনেস্পেক্টর শ্রীযুক্ত ভবানীচরণ সমাদ্দারমহাশয় ব্রহ্মচারী সাজিয়া অজয়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য নানাস্থানে ঘুরিতে-ফিরিতে লাগিলেন। এই সময়ে অজয়সর্দ্দার হুগলীজেলার অন্তর্গত তারকেশ্বরধাম হইতে তিন ক্রোশ দূরবর্ত্তী এক গ্রামে অবস্থান করিতে-ছিল। ভবানীবাবু তারকেশ্বরের মাঠে এক প্রকাণ্ড চন্দ্রাতপ (সামিয়ানা) টাঙ্গাইয়া সর্ব্বসাধারণমধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন, "আমার

সহিত শ্রীশ্রীমাতা জগদম্বার নিত্য সাক্ষাৎ হইয়া থাকে। মাতা কালী প্রতিদিন আমাকে দর্শন দেন। সম্প্রতি তাঁহার আদেশ হইয়াছে যে, তাঁহার প্রিয় বরপুত্রস্বরূপ সমুদয় দস্যু, ডাকাইত, রাহাজান, তস্কর ইত্যাদিকে এক দিবস চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয় ভোজন করাইতে হইবে, এবং ঐ দিবস উহারা যে বর প্রার্থনা করিবে দেবী তাহা মঞ্জুর করিবেন। ইত্যাদি।" পাঠকমহাশয়রা বোধ হয় জানেন, ডাকাইত, দস্যু, রাহাজানপ্রভৃতি কালীদেবীর প্রধান ভক্ত, সুতরাং এই জনরব শ্রবণ করিয়া দলে দলে দস্যুগণ ঐ মাঠে উপস্থিত হইতে লাগিল। ব্রহ্মচারীকে সাক্ষাৎ "কালীপুত্র" ভাবিয়া সকলে তাঁহার চরণধূলি গ্রহণ করিতে লাগিল। অজয়সর্দ্দার তখনও গ্রাম হইতে বাহিরে আইসে নাই; মনে মনে ভাবিল "কালীমাতা যদি আমাকে এই বিপদজনক মোকর্দ্দমা হইতে রক্ষা করেন, তাহা হইলে আমি তথায় যাইতে পারি।" যাহা হউক, অজয়সর্দ্দারও ব্রহ্মচারীর নিকটে উপস্থিত হইল। কৌশলে ভবানীপ্রসাদ জানিতে পারিলেন, ইহারই নাম অজয়সর্দ্দার। অতি শীঘ্র এবং অতি গোপনে সদর অফিশে লোক প্রেরিত হইল, প্রায় একশত কনষ্টেবল আসিয়া অজয়কে এবং বারজন প্রসিদ্ধ দস্যুকে গ্রেপ্তার করিয়া লইয়া চলিল। ঠগীবিভাগসংযুক্ত আইনানুসারে ঐ দ্বাদশজন দস্যুর এবং দিগ্বিজয়ী দস্যুবীর অজয়সর্দ্দারের ও ফাঁড়িদারের ফাঁসি হইয়া গেল। দারোগা প্রভৃতি যাবজ্জীবনজন্য দ্বীপান্তরিত হইল।

যাহার নামে বাঘে-ছাগে একত্রে জলপান করিত, যাহার ভয়ে গবর্ণমেণ্টবাহাদুর হইতে সামান্য পথিক পর্য্যন্ত সমুদয় লোকে সশঙ্কিত থাকিত, যে ব্যক্তি আদেশ করিলে রাত্রি তিন ঘটিকার সময়েও এক হাজার লাঠিয়াল একত্র করিতে পারিত, সেই অজয়সর্দ্দার ইহজগতে আর নাই; পাপিষ্ঠের পাপের সমুচিত দণ্ড হইয়াছে। পরাক্রমী দস্যু-বীর অজয়সর্দ্দারের কয়েকটা গুণও ছিল। এই ব্যক্তি সদ্গোপজাতীয়

লোক ছিল বলিয়া কখনও সদ্গোপের বাটীতে ডাকাইতি করে নাই, এবং সদ্গোপ পথিককে আক্রমণ করে নাই; অপর দস্যুদিগকেও সে এই কার্য্যে নিষেধাজ্ঞা দিয়াছিল। অজয়সর্দ্দার কয়েকবার কয়েকটা ভগ্নশিবমন্দিরের সংস্কারজন্ত টাকা দান করিয়াছিল বলিয়া প্রবাদ আছে। অনেক গ্রামের গুরুমহাশয়গণ পাঠশালার জন্য অজয়সর্দ্দারের নিকট রীতিমত বৃত্তি পাইতেন, এ কথা অকাট্য সত্য। কয়েকজন ব্রাহ্মণাধ্যাপককে তিনি অনেক টাকা দিয়া বিপদ হইতে মুক্ত করিয়াছিলেন। একদা একজন পণ্ডিত ব্রাহ্মণ কন্যাদায়গ্রস্ত হইয়া যথাতথা অর্থভিক্ষা করিতেন, অজয় তাঁহাকে ১৫টি টাকা দিতে গিয়াছিল; ব্রাহ্মণ কহিলেন "ডাকাইতের পাপের ধনের অংশ আমি গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি না।" কিন্তু কয়েক মাস পরে ঐ ব্রাহ্মণকে মিথ্যাকথা কহিতে, জালদলিল প্রস্তুত করিতে এবং পরস্ত্রী গমন করিতে দেখিয়া অজয়সর্দ্দার তাহার গলায় পা দিয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিয়াছিল। অজয়ের বাটীতে ভিখারিগণ ভিক্ষা পাইত। এত টাকা—রাশি রাশি টাকা—হস্তগত হইত বটে, কিন্তু অজয়সর্দ্দার কখন "বাবুগিরি" করে নাই। তাহার আহার ও পরিচ্ছদ অতি সামান্য ছিল, সে সুরাপান করিত না, তামাকু ব্যতীত কখনও কোন নেশার দ্রব্য ব্যবহার করে নাই। ব্যভিচারদোষ তাহাতে বিন্দুমাত্র ছিল না, সে সাধ্বী স্ত্রীলোকগণকে দেবীর ন্যায় ভক্তি করিত। অজয়ের দেহ সবল, বর্ণ উজ্জ্বল-শ্যাম, মাথার কেশ দীর্ঘ ও কুঞ্চিত এবং মুখ ও চোখ্ ভদ্রলোকের মত ছিল।

[সমাপ্ত।]

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

সমসাময়িক ভারত।

রাষ্ট্রনীতি।

(৩)

সংবাদপত্র-সম্পাদক, উকীল-কৌঁশুলি, অধ্যাপক, ছাত্রবৃন্দ—ইহারাই উদারমতাবলম্বী ও জাতীয় ভাবের ভাবুক। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণযুবকেরা তত্রত্য 'বেঞ্চি' ছাড়িতে না ছাড়িতেই, কংগ্রেসের দলভুক্ত হইয়া পড়ে।

১৯০০ সালের কংগ্রেস-সভার শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে, লাহোরের ছাত্রবৃন্দই অধিকতর উৎসাহী ও আগ্রহান্বিত। তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, কংগ্রেসের কার্য্যনির্ব্বাহভার গ্রহণ করিয়াছে। উহাদের মধ্যে একজন, ছাত্রবৃন্দের প্রতিনিধিরূপে,—অভিনন্দনসূচক সম্ভাষণপত্র পাঠ করিয়া, সংবাদপত্রসম্পাদক তিলককে অভ্যর্থনা করিল। স্বকীয় সংবাদপত্রে তিলক ইংরাজসরকারকে তীব্ররূপে আক্রমণ করায় তাঁহার কারাদণ্ড হয়।

আলিগড়-কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রধানাধ্যক্ষ Th. Beck-এর কথায় যদি বিশ্বাস করিতে হয়,—বক্তৃতা-মঞ্চে কিংবা সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় যাহারা নানা কথা বলে, সেই সব বাচালদিগের কথায়, ভারত-পর্য্যটক বিদেশী ও রাজপুরুষেরা, বেশী গৌরব ও প্রাধান্য দিয়া বড়ই ভুল করেন। বেক্ বলেন, দেশের এমন কতকগুলি প্রধান আছে, যাহাদিগকে প্রধান বলিয়া সকলেই স্বীকার করে, এবং অনেকেই যাহাদের কথার বাধ্য ;—সেই সকল প্রধানেরা, ইচ্ছা করিলে লোকের ধর্ম্মোন্মত্ততা ও যুদ্ধপ্রবৃত্তিকে গুহার মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিতেও পারে, কিংবা শৃঙ্খলমুক্ত হিংস্র পশুর ন্যায় জনসমাজের মধ্যে ছাড়িয়া দিতেও

পারে। তাহাদিগকেই "প্রধান" বলা তাঁহার অভিপ্রায়,—যাহারা প্রাচীন গোষ্ঠীপতি, বড়বড় রাজ্যের রাজা, রাজপুত ও ঠাকুর। সমস্ত বাঙ্গলাদেশের সংবাদপত্র ও বক্তৃতায় যাহা না হয়, তাহা তাহাদের দ্বারা সম্পন্ন হইতে পারে; ইচ্ছা করিলে তাহারা এক ইঙ্গিতে বিদ্রোহানল প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিতে পারে;……কিন্তু তাহাদের সে ইচ্ছা নাই; কখনও যে সে ইচ্ছা হইবে, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ আছে। মহাভারতের সে সাংগ্রামিক কাল চলিয়া গিয়াছে; রাজচক্রবর্ত্তীর ইঙ্গিতমাত্রে পদানত প্রজাবৃন্দ এখন আর সশস্ত্রে সমুত্থান করে না। আলিগড়ে বেকের স্থানে এখন যিনি আসিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গেও আমি সাক্ষাৎ করিয়াছি। সিদ্ধিকল্পে সম্পূর্ণ ভরসা না থাকিলেও—তিনি মুসলমানসমাজকে চেতাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। বেক্ যে ভ্রমে পতিত হইয়াছিলেন, ইনি সে ভ্রমে পতিত হন নাই। কোন দেশে যে পরিমাণে লোকশিক্ষার উন্নতি ও প্রসার হয়, সেই পরিমাণে সেখানে বাক্য ও লেখার প্রভাবও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। শান্তির আমলে, উকীল-ব্যারিষ্টারেরা দেশের যেরূপ কাজ করিতে পারে, গোষ্ঠীপতি ভূস্বামীরা সেরূপ পারে না। যে অবধি, পঞ্চায়তের হাত হইতে বিচার-ক্ষমতার কিয়দংশ উঠাইয়া লইয়া ডিষ্ট্রীক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হইল, সেই অবধিই উকীল-ব্যারিষ্টারেরও প্রতিপত্তি বাড়িয়াছে। তলোয়ারের ধার অপেক্ষা কথার ধার বেশী। তেমন বেশী পরিমাণে সংবাদপত্রাদি মুদ্রিত হয় না বলিয়া এখানকার মুদ্রাযন্ত্রের যে কোন প্রভাব নাই, এ কথা বলা নিতান্ত অযুক্ত। ১৮৯৭ সালে পুণায় যে দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়, পত্রসম্পাদক তিলকই তাহার উদ্দীপক। রাজপুরুষেরা তাহাতে এতই ভীত হইয়াছিলেন যে, তাঁহারা বিকার-রোগীর মত বিকারের ঝোঁকে তাড়াতাড়ি এমন একটা দারুণ আইন বিধিবদ্ধ করিয়া ফেলিলেন যে, তাহা পরে কার্য্যতঃ পরিত্যাগ করিতে হইল।

সংবাদপত্রাদির খুব কম সংখ্যাই মুদ্রিত হয়। অমুক সংবাদপত্রের মুদ্রাঙ্কনের সংখ্যা ১০০০ হইতে ১৫০০ মাত্র। বোম্বাইপ্রদেশস্থ Times of India পত্রের পরিচালক আমাকে বলেন, "আমাদের কত বেশী খর্চ্চা পড়ে তুমি শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে; আমাদের প্রতি সংখ্যার মূল্য চারি আনা। সেইজন্য এখনো আমাদের কাগজ, বড় বড় য়ুরোপীয় সংবাদপত্রাদির গ্রাহক-সংখ্যায় পৌঁছিতে পারে নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষা গ্রাহক-সংখ্যা আরও বেশী হওয়া উচিত।"

আলাহাবাদের Pioneer-এর মত, Times of Indiaও একটি ইঙ্গ-ভারতীয় সংবাদপত্র। এই দুই পত্রে, রাজপুরুষদেরই মতামত প্রতিফলিত হইয়া থাকে। দিবসের প্রচণ্ড উত্তাপ-সময়ে, রাজপুরুষেরা একটা লম্বা আরাম-কেদারায় বসিয়া, হুইস্‌কি-সোডা সেবন করিতে করিতে পাওনীয়ারপত্র পাঠ করেন। ইহাই তাঁহাদের আত্মবিনোদনের প্রকৃষ্ট উপায়। দেশীয় সংবাদপত্রাদি, হয় ইংরাজীতে নয় স্থানীয় দেশ-ভাষায় লিখিত হইয়া থাকে। ৩১শে মে, ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বঙ্গভাষায় লিখিত প্রথম-সংবাদপত্র শ্রীরামপুরে প্রকাশিত হয়। সংবাদপত্রাদির যে তেমন উন্নতি হইতে পারে না, তাহার একমাত্র কারণ,—জনসাধারণের দারিদ্র্য ও পাঠকসংখ্যার স্বল্পতা। অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর। এ বিষয়ে জাপান খুব উৎকর্ষলাভ করিয়াছে। তাহার কারণ, জাপানের প্রাথমিক শিক্ষার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত। আমি অবগত হইলাম—জাপানের মুদ্রাযন্ত্রের অবস্থা খুব ভাল না হইলেও, অন্ততঃ সেখানকার জনসাধারণ এতটুক শিক্ষা পাইয়াছে যে, তাহারা সংবাদপত্রাদি অনায়াসে পাঠ করিতে পারে। আমি কতবার স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ছাই-ভরা একটা সমকোণবিশিষ্ট বাক্সোর মধ্যে দুই তিনটা চ্যালাকাঠ রহিয়াছে—সেই বাক্সোর নিকটে বসিয়া ক্ষুদ্রকায় দাসীরা, মহা ঔৎসুক্যের সহিত কোন একটা গল্পের বই পাঠ করিতেছে।

হয়তো ইহা কোন য়ুরোপীয় সংবাদপত্রে প্রকাশিত ছোট ছোট গল্পের অনুবাদ……

কর্ত্তৃপুরুষেরাও সময়ে সময়ে মুদ্রাযন্ত্রের উন্নতিপথে বাধা দিয়াছেন। ১৮২৫ সাল পর্য্যন্ত,—কোন একটু ত্রুটি দেখিলেই, ইংরাজ-সরকার সংবাদপত্রপরিচালকদিগকে দেশান্তরিত করিতে পারিতেন;—সে অধিকার তাঁহাদের ছিল। তাহার পরেও এসম্বন্ধে কোন বিশেষ আইন-প্রণয়নের প্রয়োজন হয় নাই। কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে, ফৌজদারী আইনের মধ্যে একটা বিষাক্ত কথা সন্নিবেশিত হইল; রাজার প্রতি অভক্তি-উৎপাদনের চেষ্টামাত্রই, বিদ্রোহ-আইনের অধিকারভুক্ত—এইরূপ একটা কথা, কুপিত রাজপুরুষেরা বিদ্রোহ-আইনের মধ্যে সন্নিবেশিত করিলেন। এই নূতন আইনের বলে,—পূর্ব্বে যাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছি, সেই পত্রসম্পাদক তিলকের বিচার হয়, এবং সেই বিচারে তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাহার পর যখন, রাজপুরুষদের উষ্ণরক্ত একটু ঠাণ্ডা হইয়া আসিল, তখন তাঁহারা তাঁহাকে মার্জ্জনা করিলেন। ইহাতে প্রজাবর্গের নিকট ইংরাজ-সরকারের দারুণ দুর্ব্বলতা প্রকাশ হইয়া পড়িল।

'বাবুদের' নামে কত কথাই না শোনা যায়। সুযোগ্যতা ও সুবিবেচনার অভাবে, বাবুদের সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা কেবল 'ছেলেমানসি' অলীক কথায় ও অমূলক 'উড়ো' সংবাদে পরিপূর্ণ, ইত্যাদি। কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে, বিদেশীয় লোকের দ্বারা দেশের ধন শোষিত হইতেছে দেখিয়া রক্ত ঠাণ্ডা রাখা কি সহজ কথা? তাছাড়া আমাদের কোন বিশেষ সংবাদপত্রের লেখার ভাব দেখিয়া যদি কেহ আমাদের ফরাসীজাতিসম্বন্ধে সাধারণভাবে কোন একটা মত পোষণ করে, তাহা হইলে তোমার কিরূপ মনে হয়? বাচালের শিরোমণি বাঙ্গালীর নিকট সুবিবেচনার দাবী করা বৃথা। এই বাচালতা প্রখর

সূর্য্যোত্তাপের ফল—তাতে আবার সে সূর্য্য ভারতের সূর্য্য! মালাবারি, এই সকল সংবাদপত্রের বেশ একটা ভাব-ব্যঞ্জক নাম দিয়াছেন;—"মশক-সংবাদপত্র।" মশার ঝাঁকের মত ভীষণ শত্রু—দৌর্ব্বল্যাকর শত্রু আর দ্বিতীয় নাই। উহারা যেন সুতীক্ষ্ণ মর্ম্মঘাতী ক্ষুদ্র তীরের গুচ্ছ; উহাদের হইতে আত্মরক্ষা করা অসম্ভব, কেননা, উহাদিগকে চক্ষে দেখা যায় না; এবং যখন তোমার বিশ্রামের খুবই প্রয়োজন, ঠিক্ সেই সময়েই উহারা অলক্ষিতভাবে তোমাকে আক্রমণ করে। হাতীরা মশকের ভয়ে অস্থির হইবে ইহা কি তুমি কখন স্বপ্নেও মনে করিতে পার? হাতী যখন কিয়ৎকালের জন্য কোথাও থামে, তখন সে প্রথমেই পঙ্কের মধ্যে নিমজ্জিত হয়, এবং তাহার সমস্ত গাত্রচর্ম্ম কর্দ্দমে পরিলিপ্ত করে। পরে সেই কর্দ্দম শুষ্ক হইয়া শত্রু-আক্রমণ-নিবারক একপ্রকার বর্ম্মাচ্ছাদনে পরিণত হয়। কিন্তু—মালাবারি বলেন—ব্রিটানীয়-গজরাজের সেরূপ কোন বর্ম্মাচ্ছাদন নাই যাহাতে মুদ্রাযন্ত্রের মশকবৃন্দ হইতে গজরাজ আপনাকে রক্ষা করিতে পারে;—একটু তন্দ্রা আসিয়াছে কি, অমনি এক ঝাঁক্ মশা আসিয়া হুল ফুটাইয়া তাহার গাত্র ক্ষতবিক্ষত করিয়া দেয়। তখন গজরাজ ক্রোধে প্রজ্জ্বলিত হইয়া শুণ্ডের দ্বারা,—স্তম্ভপ্রায় স্বীয় স্থূল জঙ্ঘার দ্বারা শত্রুকে তাড়না করিতে যতই চেষ্টা করে, ততই সে চেষ্টা নিষ্ফল হইয়া যায়,—ততই উহা হাস্যকর ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়।

দুটি লোক ভারতবর্ষীয় মুদ্রাযন্ত্রের অলঙ্কার;—তিলক ও ম্যালাবারি। অকুশল রাজপুরুষেরা, কারাদণ্ড প্রয়োগ করিয়া, তিলককে অন্যায়দণ্ডিত ব্রতবীররূপে দাঁড় করাইয়াছে। তিলক সেই বলিষ্ঠ পার্ব্বত্য মারাঠাদের বংশধর, যাহারা বিগত শতাব্দীতে, স্বকীয় বাহুবলে ভারতের একটা বৃহৎ খণ্ড অধিকার করে। বৈদেশিকদের দাসত্বশৃঙ্খল বহন করা মারাঠাদের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। তিলক, মহা-

রাষ্ট্রাধিপতি শিবাজির স্মৃতিপূজা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগ করায় ইংরাজ-সরকার সন্ত্রস্ত হইলেন। তাঁহারা মনে করিলেন, ইহাতে করিয়া জাতীয় ভাবের একটা প্রবল উৎস উচ্ছ্বসিত হইয়া মহাবিপ্লব উপস্থিত করিবে। তাই, হত্যা-উত্তেজনার অপরাধে তিলক অভিযুক্ত হইয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। এই বিচারের সময় যে 'জুরী' নিযুক্ত হয়, তাহাদের মধ্যে কোন ভারতবাসী ছিল না—সকলেই ইংরেজ। পরে প্রকাশ পাইল, যে হত্যাকার্য্যের জন্য অভিযোগ করা হয়, তাহা দৈবঘটনামাত্র। কংগ্রেস্-সভায় আমি তিলককে দেখিয়াছিলাম। তিনি উক্ত সভায় দুর্ভিক্ষ-সম্বন্ধে খুব তীব্রভাবে বক্তৃতা করেন। এই অসাধারণ ব্যক্তি—যিনি দুই-দুইটা জাতীয় সংবাদপত্রের ও কতকগুলি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা এবং যাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য—তিনি ঐ দিবসেই সন্ধ্যার সময়, আর একটা সভায় বেদের প্রামাণিকতা ও কালনিরূপণসম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। আর ম্যালাবারীর কথা যদি জিজ্ঞাসা কর,—ইঁহার জীবদ্দশাতেই ত এখানকার দুই-দুইজন লোক ইহাঁর জীবনী লিখিয়াছেন। শুধু ইনি যে ভারতবর্ষেই পরিচিত, তাহা নহে, ফ্রান্সেও ইনি সুপরিচিত। কুমারী মেনা (Menant) যিনি ইহাঁর সহিত বোম্বায়ে একত্র বাস করেন—ইনি তাঁহার একটি জীবনী-গ্রন্থ ফরাসীভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। যদি কোন দিন ভারতীয় মহিলাদিগের দুঃখদুর্দ্দশার উপশম হয়, তজ্জন্য মালাবারীকেই তাঁহাদের দুই হাত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে হইবে,—সে আশীর্ব্বাদ তাহারই প্রাপ্য। Indian Spectator নামক পত্রে তিনি তাঁহাদেরই পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন; সভাসমিতিতে তিনি তাঁহাদের হইয়াই বক্তৃতা করিয়াছেন। বোম্বায়ে ইণ্ডিয়ান স্পেক্‌টেটারের কার্য্যালয়ে, আমি এই গোলগাল ছোট মানুষটিকে কাজকর্ম্মে অবিরত ব্যস্ত দেখিয়াছি, এবং তালীবন-পরিবেষ্টিত সমুদ্রসম্মুখস্থ তাঁহার সেই বণ্ডোরার বাংলো-গৃহেও

তাঁহার সহিত পুনঃসাক্ষাৎ করিয়াছি। আমার সহিত বিশ্রম্ভালাপের অবসর করিবার জন্য এবং তালীবনের পরপারে, সাগরের সুদূর দিগন্তে সূর্য্যাস্ত দেখাইবার জন্য, তাঁহার গৃহের ছাদে আমাকে লইয়া গেলেন। এই সময়ে, "East and West" নামক একটা কাগজ বাহির করিবার কল্পনা তাঁহার মনে প্রথম উদয় হয়। তিনি দিগন্তের উপর দৃষ্টি স্থির রাখিয়া, আপনার মনে যেন কথা কহিতেছেন—এই ভাবে, জিজ্ঞাসিত না হইয়াও, কথা বলিয়া যাইতে লাগিলেন। "আমরা পার্শি—আমরা একটু বেশী দ্রুত চলিতে চাই; কিন্তু ইংরেজেরা আবার তেমনি আস্তে-আস্তে চলেন; তাঁহাদের কিছুতেই নাড়ানো যায় না। তাছাড়া, তাঁহাদের শাসনতন্ত্র, তাঁহাদের শাসন-ব্যয়, তাঁহাদের যুদ্ধবিগ্রহ, আমাদের পিষিয়া ফেলিতেছে; সে সব ব্যয়ভার আমরা বহন করিতে পারি, এরূপ অর্থবল আমাদের নাই।" আমরা যখন ছাদের উপর হইতে নীচে নামিলাম, সেই সময়ে ম্যালাবারীর একজন জীবনালেখকের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল। একজন য়ুরোপীয় আসিয়াছে শুনিয়া, তিনি এইমাত্র এইখানে উপনীত হইয়াছেন।

এই দুই ব্যক্তি ছাড়া, পূর্ব্বযুগের আরও কতকগুলি খ্যাতনামা মহিমান্বিত ব্যক্তির নাম আমি উল্লেখ করিতে পারি; যথা—মোহন রায়, কেশব,—যিনি "ইণ্ডিয়ান মিররের" প্রতিষ্ঠাতা, বিদ্যাসাগর, ইত্যাদি। যাহাই হউক, শুধু মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে, দেশের রাজনৈতিক শিক্ষা কখনই সম্পাদিত হইতে পারে না। যুদ্ধকালে, (Irregular sharp shooters) "অনিয়মিত বন্দুকধারী"-দলের যে কাজ, এই সকল সাময়িক পত্রাদিরও সেই কাজ। ইহারা শত্রুদিগকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে, হায়রান্ করিয়া ফেলে; এবং ইহার প্রত্যুত্তরে শত্রুরাও সময়ে সময়ে উহাদিগকে সমূলে ধ্বংস করে। কিন্তু সত্যকথা বলিতে কি—এই সকল লোকের মধ্যে কোন একটা সাধারণ কার্য্যতালিকা ও নির্দ্দিষ্ট

কার্য্যক্রম নাই। এই জন্যই যাঁহারা উদারনীতির মুখপাত্র তাঁহারা এই একতার অভাব বিশেষরূপে অনুভব করিতে লাগিলেন ; এবং এই উদ্দেশ্যসাধনের জন্যই ন্যাশানাল-কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হইল। আমার মনে হয়, উনবিংশতি শতাব্দীয় ভারতের ইতিহাসে এমন কোন ঘটনা নাই, যাহা গুরুত্বে ও দূরস্পর্শিপ্রভাবে, ইহার সমান। ইহা একপ্রকার শান্তিময় রাজবিপ্লব বলিলেও হয়। যেদিন পার্শি, হিন্দু, এমন কি—মুসলমান্, আপনাদিগকে একই দেশের সন্তান মনে করিয়া, পরস্পরের প্রতি সৌভ্রাত্রের হস্ত প্রসারণ করিল ; যেদিন, একজন হিন্দুভাবাপন্ন ইংরেজের পরামর্শক্রমে ভারতের জাতীয় মহাসভা প্রতিষ্ঠিত হইল, সেই দিনই ভারতের ভাবী মহাজাতির অভ্যুদয় সূচিত হইল। সমস্ত ভারতের মতামত প্রকাশ করিবার একটি সুব্যবস্থিত যন্ত্র দৃঢ়পত্তন ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার মিলন-মণ্ডপ—ইহার বক্তৃতা-বেদী সমস্তই প্রস্তুত হইল ; রাজপ্রতিনিধিবাহাদুরের শাসনকার্য্যের উপর স্বকীয় *মতামতের প্রভাব প্রকটিত করিয়া কংগ্রেস্ বেশ আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ* করিল। ১৯০০ সালের কংগ্রেস্-সভাপতির উক্তি-অনুসারে ইহাকে দেশের "রাজনৈতিক-বিবেকবুদ্ধির" (Political conscience) আধার বলা যাইতে পারে। আমি পরে, একটি পৃথক্ পরিচ্ছেদ, বিশেষ করিয়া কংগ্রেসের নামে উৎসর্গ করিব।

এই কংগ্রেস্ একটি বিদ্যালয়—যেখানে নব্যভারতের পার্লেমেণ্ট তৈয়ারী হইতেছে। কংগ্রেস্ সমস্ত ভারতকে এই কথা বলিতেছেন ;—"এখন তোমাদের কোন একটা বিশেষ মতামত নাই"। এ কথা যদি সত্য হয়, লোকমতের প্রচারপক্ষে একটা বিশেষ অভাব আছে, তাহা হইলে, এই কংগ্রেস্ অপেক্ষা মতামতপ্রচারের উৎকৃষ্ট যন্ত্র আর কি হইতে পারে? কংগ্রেস্ আরো এই কথা বলেনঃ—"তোমাদের মধ্যে রাষ্ট্র-পরিচালক রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ নাই।" ভাল, কংগ্রেসই এইরূপ

পুরুষ তৈয়ারী করিয়া তুলিবে। প্রথমতঃ কংগ্রেস্, বর্ত্তমান-বংশীয় লোকদিগকে রাজনৈতিকসমস্যাঘটিত বিষয়ের বাদানুবাদে অভ্যস্ত করিবেন, এবং যে সকল গুণবান্ লোকের বিদ্যাবুদ্ধি ও দক্ষতা এখনও পর্য্যন্ত অনিয়োজিত রহিয়াছে, সেই সব লোককে দেশের নেত্রসমক্ষে আনয়ন করিয়া, তাহাদিগকে উপযুক্ত কার্য্যে নিয়োগ করিবার ভার দেশের উপর ন্যস্ত করিবেন। ইংরাজসরকার যদি সেই সব লোকের বল পরীক্ষা করিয়া দেখেন ত—দেখিতে পাইবেন, তাঁহাদের মধ্যে, তয়াবজী আছেন, রমেশ দত্ত আছেন, মাধবরাও আছেন, চন্দ্রবর্কার আছেন; এবং সর্ব্বোপরি সেই পার্শি দাদাভাই নওরোজি আছেন, যিনি আমাদের পার্লেমেণ্টসভাতেও একজন বেশ গণ্যমান্য সভাসদরূপে পরিচিত হইতে পারেন। ইনি ভারতের-সেই "মহাবৃদ্ধ" যাঁহার নামোল্লেখমাত্রে ১৯০০ সালের কংগ্রেস্সভায়, স্তুতিধ্বনির যেন একটা ঝড় বহিয়া গিয়াছিল। তিনি একটা বিষয়ের চিন্তাতেই তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। ১৮৮৬ সালের দ্বিতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নৌরোজি "ভারতের বর্দ্ধনশীল দারিদ্র্যবিভ্রাট"-সম্বন্ধে একটা ভয়সূচক পূর্ব্ব-ইঙ্গিত করিয়া সমস্ত সভামণ্ডপকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। আরও বহুপূর্ব্বে ১৮৭৩ সালে, লণ্ডন নগরে, বোম্বাইশাখায় Indian Association সভার সমক্ষে যে রিপোর্ট তিনি পাঠ করেন, তাহাতেও এইরূপ একটা আতঙ্কের সূচনা ছিল। ভারতের সমস্ত প্রাকৃতিক ধনসম্বলসম্বন্ধে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুশীলন করেন। তিনি যে হিসাব দিয়াছেন, তাহা অতীব ভয়ঙ্কর। রায়তের একবেলার অন্নসংস্থান অতি কষ্টে হওয়ায়, রায়ত, দুর্ভিক্ষের দুই অঙ্গুলী ব্যবধান দূরে প্রায় নিয়ত বাস করে। হিসাবপ্রস্তুতকারী উদ্ধত রাজপুরুষেরা বলেন, উহা সর্ব্বৈব মিথ্যা। কিন্তু যাঁহারা প্রথমে দাদাভাইর কথা মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া-দিয়াছিলেন, পরে তাঁহারাই নিজ কথা প্রত্যাহার করিয়া দাদাভাইর কথাই স্বীকার

করিতে বাধ্য হইলেন। ভাবিকাল, দাদাভাইপ্রদত্ত হিসাবের সত্যতাই সপ্রমাণ করিল। ১৮৯৩ সালে, তাঁহার খুব একটা জয়লাভ হয়; লণ্ডনের কোন এক বিভাগ হইতে প্রতিনিধিরূপে নির্ব্বাচিত হইয়া তিনি পার্লেমেণ্ট-সভায় প্রবেশলাভ করিলেন। ভারত আশা-আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। দাদাভাইর উৎসাহ-উদ্যম দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইল। ইঙ্গভারত-সরকারের শাসন-বিভাগ ও সমরবিভাগের ব্যয়সম্বন্ধে যে অনুসন্ধান-সমিতি নিয়োজিত হয়, সেই Welby-সমিতির সমক্ষে দাদাভাই রিপোর্টের উপর রিপোর্ট দাখিল করিতে লাগিলেন।

অনুসন্ধান নিষ্ফল হইল। দাদাভাইও পার্লেমেণ্টের প্রতিনিধিরূপে পুনর্ব্বার নির্ব্বাচিত হইলেন না। কিন্তু তথাপি ঐ খ্যাতনামা বৃদ্ধের উৎসাহ কমিল না। তিনি ১৯০৪ সালের ১৭ই অগষ্টে, অ্যামষ্টারডামের International Social Congress-এর সমক্ষে এই ভারতীয় সমস্যাটি স্থাপন করিলেন। ১৯০৪ সালের ১৯শে অগষ্টে Temps নামক সংবাদ-পত্রে তাঁহার বক্তৃতার যে সারমর্ম্ম প্রকাশিত হয়, আমি তাহার কিয়দংশ এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি:—

"আজিকার অধিবেশনে, যে বক্তৃতা পঠিত হয়, তাহাতে খুব একটা হৈচৈ পড়িয়া-গিয়াছে; কথাগুলা লোকের মনে গভীররূপে অঙ্কিত হইয়াছে; অন্তর্জাতীয় সামাজিক মহাসভায় ভারতবাসীদিগের একজন প্রতিনিধির এই প্রথম প্রবেশ;—ইহাও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিতে হইবে।

এই প্রতিনিধির নাম দাদাভাই নৌরোজি। ইনি বৃদ্ধ। ইনি পঞ্চাশবর্ষ ধরিয়া স্বদেশীয় ভ্রাতৃগণের দুঃখদুর্দ্দশাপ্রশমনের চেষ্টা করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বকথার উল্লেখ করিয়া বলিলেন, কেবল হিন্দুদের সহযোগিতাতেই ইংরেজেরা ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয়। হিন্দুরাই তাঁহাদের হইয়া যুদ্ধ করে, তাহাদিগকে অর্থ দিয়া

সাহায্য করে। তাহারই পুরস্কারস্বরূপ, ইংরেজেরা ভারতবাসীদিগকে জঘন্য দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়াছে ; অবিরত ধনশোষণদ্বারা ভারতকে দরিদ্র করিয়া ফেলিতেছে। ইংরেজ রাজপুরুষদিগকে প্রতি বৎসর ২০ কোটি টাকা ভারতের দিতে হইতেছে। দশকোটি টাকা মাত্র দেশে থাকিয়া যায়। পক্ষান্তরে, ইংরেজের বাণিজ্যে প্রতিবৎসর ২০ কোটি টাকা, দেশ হইতে বাহির হইয়া যায়। প্রায় ৩০ কোটি টাকা পরিমাণ ভারতের ধনক্ষয় হয়...তাই, লোকদিগের ভয়ানক দুরবস্থা। সুবৎসরেও অধিকাংশ লোক কোনপ্রকারে ক্ষুন্নিবৃত্তি করে ; এবং অজন্মা হইলে, দুর্ভিক্ষপীড়িত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোক মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়। লোকদিগের অভাবানুরূপ যথেষ্ট পরিমাণ শস্য উৎপন্ন হয় না,—এ কথাও বলা যায় না ; আসল কথা, লোকেরা এত দরিদ্র যে, স্বশ্রমোৎপন্ন দ্রব্য উহারা পুনর্ব্বার ক্রয় করিতে সমর্থ হয় না। রাশি রাশি চাউল ও অপর শস্য বিদেশে চলিয়া যায় ; এদিকে ঐ সব শস্যের উৎপাদকগণ অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।...

১৮৩৩ ও ১৮৫৮ সালে, ইংরাজ এই গুরুগম্ভীর প্রতিজ্ঞাবাক্যে বদ্ধ হয় যে, স্বজাতিনির্ব্বিশেষে ভারতবাসীদিগের সহিত ব্যবহার করিবে। কিন্তু সেই কথার ব্যত্যয় করিয়া, তাহারা এখন আপনাদের জাতভাইদিগকেই বড় বড় কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছে। উহারা হিন্দুদিগকে উৎপীড়ন করিতেছে,—উহাদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করিতেছে। তাহাদের এই জঘন্য ব্যবহার, তিরস্কারের যোগ্য।" এই বক্তৃতার পর, সভাপতি বলিলেন :—"আমাদের এই কংগ্রেসের মতে, ইংরাজের এই ভারতশাসননীতি অতীব গর্হিত।"

যাহাই হউক, পূর্ব্বে ভারতের জন্য কার এত মাথাব্যথা ছিল ? কতকগুলি দেশপর্য্যটক, মুষ্টিমেয় বিদ্বজ্জন—ভারতসম্বন্ধে ইহাদেরই যা-একটু ঔৎসুক্য দেখা যাইত। আজ এই চির-উৎপীড়িত জাতির

কণ্ঠস্বর সমুদ্র পার হইয়া আমাদের নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া পৌঁছিয়াছে। য়ুরোপ, ভারতের অভিযোগ শুনিতে আজ প্রস্তুত; এবং ভারতও য়ুরোপীয় জনসাধারণের সমক্ষে ভালরূপেই আত্মপক্ষ সমর্থন করিয়াছেন।

অতএব, ভারতবাসীরা কি বিষয়ের দাবীদাওয়া করে, তাহা জানিবার এখন সময় উপস্থিত হইয়াছে। কংগ্রেস্ ও সংবাদপত্রাদি কি-কি কাজ করিতে চাহে, দেশের দাবীটা কি,—এই সমস্ত বিষয় জানা আবশ্যক।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

জাপানের শিল্প ও বাণিজ্য।

শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভাবেই দেশ উন্নত হইয়া থাকে। যে দেশ যে পরিমাণে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিসাধন করিতে পারিতেছে, সে দেশ তত বৈদেশিক অর্থে ধনবান হইয়া উঠিতেছে। দেশ অন্য দেশের সহিত ব্যবসায় প্রতিযোগিতায় ক্রমেই নানারূপ বৈজ্ঞানিক উপায়ে কত সহজে সুন্দর সুন্দর বস্তু প্রস্তুত করিয়া সমগ্র পৃথিবী সমক্ষে উপস্থিত করিয়া আপন আপন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে সক্ষম হয়। যে দেশে বিজ্ঞানের চর্চ্চা নাই, বর্ত্তমান যুগে সে দেশে শিল্পবাণিজ্যের উন্নতি হওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব। সে দেশের অর্থ বিদেশে যাইবে ছাড়া আসিবে না। আজকাল যেমন ভারতের অবস্থা। জাপান অন্যান্য বিষয়ের চেয়েও অতি অল্পকাল মধ্যে শিল্পবাণিজ্যে যেরূপ উন্নতি দেখাইয়াছে, এরূপ পৃথিবীর কোন জাতি কোন বিষয়ে দেখাইতে পারে নাই। ইহাদের এই অভাবনীয় পরিবর্ত্তনে অনেকেই বলিয়া থাকেন যেন অলৌকিক দৈবশক্তির প্রভাবে জাপানীরা ভেল্কিবাজীর ন্যায় অসম্ভব কার্য্যসমুদায় অতি সহজে নীরবে সুসম্পন্ন করিয়া ফেলিতেছে। সামরিক কৌশলে

ইহারা চীন ও রুষকে পরাস্ত করিয়াছে। কিন্তু শিল্পবাণিজ্য-যুদ্ধে জাপানীদের অসাধারণ নৈপুণ্য দর্শনে শিল্পবীর ইংরাজ, ফরাসী, জার্ম্মান এবং মার্কিন জাতি পর্য্যন্ত স্তম্ভিত হইয়া উঠিয়াছেন।

১৮৯৫ খৃঃ চিকাগোপ্রদর্শনীতে জাপানী সূতী ও রেশমী বস্ত্র, চীনামাটীর বাসন, বাঁশ এবং বেতের জিনিস, মাদুর এবং বার্ণিশের কায দেখিয়া আমেরিকান্‌গণ অবাক হইয়াছিলেন। ভবিষ্যতে তাহাদের বাণিজ্যের বিশেষ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা মনে করিয়া পর বৎসর তথাকার শিল্পবাণিজ্যসমিতিকর্ত্তৃক মিঃ রবার্ট পি, পোর্টার (Former Supdt. of the 11th Census, U. S. A.) জাপানী শিল্পের তত্ত্বানুসন্ধানের নিমিত্ত জাপানে প্রেরিত হন। মার্কিন জাতি যে জাপানকে যথেষ্ট লাভজনক ক্ষেত্র মনে করিয়া ১৮৫৪ এবং ১৮৫৭ খৃঃ বাণিজ্যবিষয়ক সন্ধি স্থাপন করেন, আজ মিঃ পোর্টার আসিয়া দেখেন লাভজনক দূরের কথা বরং জাপানই মার্কিন দেশ হইতে অর্থশোষণের বিধিব্যবস্থা করিয়া বসিয়াছে। তিনি তাঁহার বিবরণীতে প্রকাশ করেন—"It is impossible for American manufacturers to compete with their oriental rivals, who enjoy the advantage of a superabundant supply of intelligent and quickly adaptable workmen, willing and eager to work for wages which could not be made to supply the barest necessities of life to the poorest American workmen."

মাঞ্চেষ্টারের তন্তুবায়েরা বলে "আমরা তিন পুরুষের চেষ্টায় বস্ত্র-বয়নে যে নিপুণতা লাভ করিতে পারিয়াছিলাম, জাপানীরা দশ বৎসরেই তাহা শিখিয়াছে। তাহাদের সহিত আমরা কিরূপে প্রতিযোগিতা চালাইব ?"

জাপানী শিল্পবাণিজ্যের ইতিহাসে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক প্রণালী দ্বারা না হইলেও বস্ত্রাদি বহু জিনিস নাকি অনেক পূর্ব্বেই জাপানে তৈয়ার হইত। কিন্তু ক্রমে ইউরোপ ও আমেরিকার সহিত ঐ সকল দ্রব্যে প্রতিযোগিতাসংরক্ষণে অসমর্থ হওয়ায় গবর্ণমেণ্ট অনুসন্ধানে জানেন, উক্ত দুই স্থানেই সে সকল দ্রব্য বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কলের সাহায্যে প্রস্তুত হয়। গবর্ণমেণ্ট ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিজ্ঞান ও শিল্প শিক্ষার নিমিত্ত দলে দলে ছাত্র বিদেশে প্রেরণ করেন। তাঁহারাই দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ শিল্পবিজ্ঞানের কার্য্যকর স্কুল, কলেজ এবং কারখানা স্থাপন করিয়া বর্ত্তমান উন্নতির দ্বার উন্মুক্ত করেন। জীর্ণঘর সংস্কার করিতে অবশ্য পূর্ব্বভিত্তি বজায় রাখিয়া ভাঙ্গা-কাটা জায়গাটুকু জোড়ান হয়, কিম্বা চূণকাম করান হয়, ইত্যাদি। কিন্তু নূতন ঘর তৈয়ার করিতে যেমন ইচ্ছা তেমনই করা যায়। দশখানা বাড়ী দেখিয়া একখানা বাড়ীর পছন্দ মত নক্সা ঠিক করিয়া লওয়া বেশ সহজসাধ্য। জাপানীদের শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়ই নূতন বাড়ীর ধরণে গঠিত। বিভিন্ন সভ্যদেশের শিল্পবাণিজ্য প্রভৃতি দেখিয়া-শুনিয়া যেটী সবচেয়ে সহজসাধ্য অথচ বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুন্দরভাবে অল্প টাকায় চালাইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের সহিত প্রতিযোগিতারক্ষণ সম্ভবপর জাপানীরা নব্যপ্রণালীতে তেমন পন্থাটীই অবলম্বন করিয়াছে, আমাদের ভারতেও ঠিক তেমনটীর দরকার। যেহেতু অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের শিল্পবাণিজ্য নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

জাপান অন্যান্য দেশের ন্যায় আমদানী, রপ্তানী দুই-ই করিতেছে। জাপান শিল্পবাণিজ্যের নূতন দেশ। তাই ভাবি, শিল্পবাণিজ্যের ভিত্তি দৃঢ় করিবার নিমিত্ত এতাবৎ জাপানকে অন্যান্য দেশ হইতে বিস্তর কল-কব্জা আনিতে হইয়াছে। এ ছাড়া ক্ষুদ্র জাপানের শতকরা

৮২ ভাগের উপর পাহাড়াবৃত, কাজেই অবশিষ্ট জায়গার ধান্যাদি শস্যে, সাড়েচারিকোটী লোকের উপযোগী খাদ্যের সঙ্কুলান হইতে পারে না ; এবং কারখানার জন্য তূলা, পশম, চর্ম্ম প্রভৃতির (raw materials) আবশ্যক। এই সব কারণে জাপানকে যথেষ্ট টাকার জিনিস বিদেশ হইতে আনিতে হইতেছে। কিন্তু বাণিজ্যের প্রতি-যোগিতায়, আমার মনে হয়, জাপান সুদে-আসলে সে সকল টাকা আদায় করিবে। এখানে শতকরা ৬০ জন কৃষিকার্য্যে, ৩৫ জন শিল্পবাণিজ্যে, এবং অবশিষ্ট ৫ জন অন্যান্য কার্য্যে লিপ্ত। ভারতবাসী (বিশেষতঃ বঙ্গদেশবাসী) ছাড়া পৃথিবীর সকল জাতিই শিল্পবাণিজ্যকে সম্মানের কায বলিয়া মনে করে। জাপানে এমন লোক অতি বিরল, যিনি ঘরে বসিয়া শুধু অন্নধ্বংস করেন। সকলেই কিছু-না-কিছু করিতেছে। প্রায় অধিকাংশ বাড়ীতেই (বিশেষতঃ সহরের) কোন-না-কোন বিষয়ের একটী ছোটখাট কারখানা আছে। জাপান—ইউরোপ ও আমেরিকার ন্যায় ধনী দেশ নহে। এখানে ভারতের ন্যায় অল্পবেতনে যথেষ্ট লোক পাওয়া যায়। পাশ্চাত্যজাতি, জাপানী শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির কারণ নির্দ্দেশ করিয়া বলেন, জাপানীরা অতি অল্পবেতনে সন্তুষ্ট। ঐরূপ বেতনে পাশ্চাত্যজাতির কাহারও খোরাক-পোষাক চলিতে পারে না কাজেই জাপানের সহিত প্রতি-যোগিতা চালান অসম্ভব। জাপানীরা প্রথমতঃ ক্ষুদ্রাকারে কারখানা (factory) স্থাপন করেন। ক্রমেই ইঁহারা কারবার বড় করিতে থাকেন। অনেক সময় গবর্ণমেণ্ট নূতন কারখানা খুলিবার জন্য টাকা হাওলাত দিয়া থাকেন। ক্রমে কারখানার আয়ের দ্বারা ঋণ পরিশোধ হইতে থাকে। কারখানাতে কার্য্যশিক্ষার পক্ষে ভারতীয় ছাত্রবৃন্দের জাপানই উপযুক্ত স্থান। কেননা, ইউরোপীয় ও আমে-রিকান সওদাগরের ন্যায় ভারতবাসী কেহই কোটী কোটী মূলধন

খাটাইয়া কারবার খুলিবেন না। আর বাস্তবিক ভারতবাসীর কাহারও অবস্থা তেমন স্বচ্ছলও নহে। কাজেই ক্ষুদ্রায়তনে আরম্ভ করিবার পক্ষে জাপানই উপযুক্ত শিক্ষার স্থল।

জাপানীদের শিল্পবাণিজ্য যেন জোয়ারের জলের মত স্ফীত হইয়া উঠিতেছে। ১৮৮৪ খৃঃ—১৮৯৪ খৃঃ এই দশবছরে যে পরিমাণ জিনিস বিদেশে রপ্তানী হইয়াছে, নূতন রিপোর্টে প্রকাশ, গত দশবছরে (১৮৯৪ খৃঃ—১৯০৪ খৃঃ) তাহার ৯০ গুণ জিনিস বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। আমেরিকারই সহিত জাপানের ব্যবসাবাণিজ্যে আদান-প্রদান বেশী হইয়া থাকে। পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে যথেষ্ট জিনিস আমদানী হইত। কিন্তু এখন আমদানী কমিয়া ক্রমেই রপ্তানী বাড়িতেছে। ১৮৭৯—১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের চেয়ে, ১৮৮৪—১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে জাপান আমেরিকায় ৮৮ গুণ, এবং ৮৯৪—১৯ ৪ খৃঃ ১৬৫ গুণ জিনিস রপ্তানী করিয়াছে। শিল্পবাণিজ্যপ্রভাবে জাপান ক্রমেই ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া উঠিতেছে, জীবনোপায়ও মহার্ঘ হইয়া উঠিতেছে। ব্যবসায়ের জোরে সকলের সাংসারিক অবস্থা ক্রমেই উন্নত হইতেছে। খাদ্যদ্রব্যাদির মূল্য মহার্ঘ হওয়া সত্ত্বেও দেশের এ-হেন উন্নত অবস্থা প্রমাণ করিতেছে যে, একমাত্র শিল্পবাণিজ্য ইহাদিগকে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়া তুলিল। ২০ বৎসরে জিনিসের কিরূপ মূল্য-পরিবর্ত্তন হইয়াছে, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

Year	rice	miso	salt	soy	woodfire	charcoal	cotton	rent	bath	average rate
1873	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
1894	165	189	91	158	141	150	118	228	22 1	162

জাপানে শিল্পবাণিজ্যবিষয়ক একটী সভা আছে। ঐ সভায় বিভিন্ন প্রদেশীয় চেম্বার্স অব কমার্সের প্রতিনিধিগণ সমবেত হইয়া দেশের শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে প্রয়াস পাইয়া থাকেন। ১৮৯৫ খৃঃর মে মাসে হাকোদাতেনামক স্থানে ঐ সভার অধিবেশন হয়। ঐ সভায় মিঃ কাণেকো বলেন "যে যে কারণে দেশ শিল্পবাণিজ্যে উন্নত হইতে পারে, আমাদের সে সমস্তই আছে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতিলাভ করিতে পারিব, এই জন্যই বুঝি পরমেশ্বর কৃপা করিয়া ক্ষুদ্র দেশের তুলনায় বেশী লোকের সৃজন করিয়াছেন; জাপানীদের কার্য্য করিবার শক্তি এবং বুদ্ধিবৃত্তি অতীব প্রখরা। তাঁহারা সব বিষয়েই সূক্ষ্মদর্শী।" তিনি আরও বলেন "জাপানীরা পৃথিবীর মধ্যে সব জাতির চেয়ে চতুর; এই জন্যই মার্কিনজাতি পর্য্যন্ত জাপানীদিগকে ভয় করিয়া চলে।"

কৃষি ও শিল্প বিভাগীয় ভাইস্ মিনিষ্টার বলেন, মেইজী অব্দের (১৮৬৮ খৃঃ) প্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই শিল্পবাণিজ্যবিষয়ে সকলের চক্ষু উন্মীলিত হইতে থাকে। দেশে অনেক কুসংস্কার ছিল। প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের (দাইমিওর) ক্ষমতা তখন অসাধারণ ছিল। তাঁহাদের জন্যই ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে দেশে রাজাবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। আবার তাঁহাদের চেষ্টাতেই উহার অবসান হয়, তাঁহাদের যত্নেই দেশের যাবতীয় লোক কুসংস্কার ত্যাগ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় অবলম্বন করিতে আরম্ভ করে। ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কসাই-চামারের ব্যবসা-অবলম্বনকারিগণ সমাজচ্যুত হইত। কালচক্রের পরিবর্ত্তনে সে ভাব এখন কিছুই নাই। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে নেশনালব্যাঙ্ক-সম্বন্ধীয় আইন জারি হয়। ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই বহু ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে জাপানে ৯৫০টী ব্যাঙ্কের উল্লেখ আছে। আর ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের রিপোর্টে ২১০৫টী ব্যাঙ্কের উল্লেখ রহিয়াছে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইয়াকোহামা হইতে টোকিও পর্য্যন্ত ১৮ মাইল রাস্তার উপর প্রথম রেলের লাইন বসে। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে মোট ৬৩ মাইল মাত্র। কিন্তু ১৯০১ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্টের ১০৫৯ মাইল, এবং বেসরকারী ২৯৬৬ মাইল, মোট ৪০২৫ মাইল রাস্তার উপর ট্রেন্ যাতায়াত করিত। রেলের রাস্তা ক্রমেই বাড়িতেছে। এ ছাড়া বড় বড় সহরে এবং সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে বৈদ্যুতিক ট্রাম এবং ট্রেন্ চলিতেছে। এই জাপানে যখন ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে রেলগাড়ীতে প্রথম কাচের দুয়ার-জানালার প্রবর্ত্তন হয়, তখন খোলা-দুয়ার-জানালা-ভ্রমে গাড়ীতে ঢুকিতে অনেক আরোহীকে আঘাত পাইতে হইয়াছে। আজ তাহারাই বলিতেছে, জাপানীরা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুচতুর জাতি। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে জাপানে প্রথম জাহাজ প্রস্তুত আরম্ভ হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জাপানের ১৪০০ খানা জাহাজ ছিল। আর ১৯০১ খৃষ্টাব্দে ৫৪১৫ খানা জাহাজের উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, আজকালকার সব জাহাজই ইউরোপীয় ধরণে (patternএ) তৈয়ারি হয়। তিন চারি বৎসর পূর্ব্বের রিপোর্টে প্রকাশ, ৭১টী ষ্টীমার এবং জাহাজ-লাইন জাপানের সহিত বিভিন্ন দেশের কারবার এবং গতায়াতের সহায়তা করিতেছে।

শিল্পবাণিজ্যের উন্নতিকল্পে যত কিছু বন্দোবস্ত থাকা সম্ভবপর সে সমস্তই আছে। গবর্ণমেণ্ট বাণিজ্যের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নবান। বহু অর্থব্যয়ে শিল্পবাণিজ্য এবং আর্টস্কুল এবং কলেজ স্থাপন করিয়া সাধারণের শিক্ষার পথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন, এছাড়া প্রতিবৎসর অনেক যুবককে শিল্পবিজ্ঞানশিক্ষার নিমিত্ত বিদেশে প্রেরণ করেন।

প্রাকৃতিক দৃশ্যের চিত্র অঙ্কনে জাপানীরা যেরূপ সিদ্ধহস্ত এরূপ

কোথাও দেখা যায় না। অতি পূর্ব্বে এদেশে একমাত্র সিন্তোধর্ম্মই ছিল। সিন্তোধর্ম্মাবলম্বীরা কেবল প্রকৃতিদেবী এবং রাজাকেই দেবতা-জ্ঞানে পূজা করিত। তাই এখনও ঋতুপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাপানীরা দেশশুদ্ধ সকলে একরূপ মাতোয়ারা হইয়া উঠে। জাপানী মেয়েরা রেশমী এবং স্থতিকাপড়ের, কাগজের এবং কাঠের পাতলা পাতের যে লতা-পাতা এবং ফুল রচনা করেন, তাহা প্রাকৃতিক লতা-পাতা এবং ফুলের অবিকল অনুরূপ। কার্য্যতঃ অনেক সময় আমরা স্বাভাবিক ফুল মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছি। আমেরিকা এবং ইউরোপের সৌখীন মেয়েরা জাপানী রেশমী-ফুল সমাদরে গ্রহণ করিয়া তাহাদের কবরীর সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করে।

জাপানীরা অনুকরণে বিশেষ পটু। তাই, যে দেশে যাহা-কিছু নূতন বাহির হইতেছে, জাপানীরা অবিকল তাহাই তৈয়ার করিতেছে। এমন কি, অনেক জিনিসে বিদেশীর মার্কা দিয়া বিদেশী জিনিসের সহিত মিশাইয়া ফেলিতেছে।

কলকারখানাসম্বন্ধে যে জাপানে ৫০ বৎসর পূর্ব্বে কোনরূপ ধারণা ছিল না, এখন সেই জাপানে প্রায় ঘরে ঘরে কলকারখানা। টোকিও সহরের কোন উচ্চস্থানে দাঁড়াইয়া চতুর্দ্দিকে তাকাইলে, কারখানার অসংখ্য চিম্‌নি দেখিয়া সহজেই অনুমিত হয় যে, জাপানে শিল্পবাণিজ্যের কত উন্নতি হইয়াছে। দুপুর ১২টা বাজিলে কারখানার বাঁশীর ধ্বনিতে টের পাইতাম যে, টোকিওতে অসংখ্য কারখানায় কায হইতেছে। রাজধানী বলিয়া কেবল টোকিওতেই কারখানা রহিয়াছে, তাহা নহে। জাপানের কোন কোন জায়গা টোকিওর চেয়েও বেশী কারবারী। ওসাকাসহর, জাপান অর্থাৎ প্রশান্তমহাসাগরস্থ ব্রিটীশ দ্বীপের ম্যাঞ্চেষ্টার বলিয়া খ্যাত, ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন জিনিস প্রসিদ্ধ। নাগানো, রেশমের কেন্দ্র-

স্থল। নাগোইয়া, বস্ত্রবয়নের এবং ঘড়িনির্ম্মাণের ; সাকাই, রাগকম্বল, টুপি (straw), ডাক্তারী অস্ত্র এবং অন্যান্য লৌহজাত দ্রব্যের এবং হোকাইদো, কয়লা, কেরোসীন, এবং খনিজধাতুর কেন্দ্রস্থল। দেশের প্রায় সবই কোন-না-কোন জিনিসের জন্য বিখ্যাত। আর আমাদের দেশের যে স্থান শিল্পবাণিজ্যসম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে এককালে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল, এখন তাহা খোওয়াইতে বসিয়াছে। থাকিবার মধ্যে আছে শুধু বর্দ্ধমানের সীতাভোগ, বাগবাজারের রসগোল্লা, ভীমনাগের সন্দেশ, বিক্রমপুরের পাতক্ষীর এবং এই জাতীয় কিছু।

বাণিজ্যে লক্ষ্মী লাভ হয়, কথাটা ভারতবাসী মাত্রেই বলিয়া থাকেন ; তাঁহারা আরও বলেন, বাণিজ্যব্যতিরেকে দেশের উন্নতি হইতে পারে না। অথচ কেন বুঝিতে পারি না, সকলেই অদ্যাপি বাণিজ্যকে কতকটা ঘৃণার চক্ষে দেখেন। ভারতের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা বাণিজ্যবিষয়ে বঙ্গদেশবাসীই পশ্চাৎপদ। কারণ, পশ্চিম-দেশীয় অনেক ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, মারহাট্টি প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় হিন্দু, পার্শী এবং মুসলমান অনেক সওদাগর এসিয়ার এবং ইউরোপের প্রায় সকল দেশেই ব্যবসায়-বাণিজ্য করিতেছেন। সুদূর জাপানের এক ইয়াকোহামা সহরেই ২৩ জন ভারতীয় সওদাগর ব্যবসায় চালাইতেছেন। কোবে সহরেও ২০।২১ জন সওদাগর রহিয়াছে ইহাদের কাহার কাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া জানিয়াছি, ইহাদের অনেকেরই ফ্রান্স, ইংলণ্ড, জার্ম্মানি প্রভৃতি দেশে কারবার আছে। চীনদেশে, ম্যানিলায়, শ্যামে, হঙ্কং এবং সিঙ্গাপুরে বিস্তর পশ্চিম-ভারতীয় সওদাগর ব্যবসায়-বাণিজ্যে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। দুঃখের বিষয়, বঙ্গের একজনও সাহস করিয়া এমন লাভজনক কার্য্যে আগ্রহসহকারে হস্তক্ষেপ করেন না।

ক্ষুদ্র জাপান, আবশ্যকীয় অনেক জিনিস দেশে যোগাইয়া বিদেশেও

কি পরিমাণ প্রেরণ করিয়া থাকে, ভাবিলে অবাক হইতে হয়। ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতেও অবশ্য অনেক জিনিস এদেশে আসিয়া থাকে। কেননা, সভ্যজগতে ব্যবসা-বাণিজ্যের পরস্পর আদান-প্রদান অবশ্য-ম্ভাবী। ইংরাজ, জার্ম্মান, ফরাসী এবং আমেরিকার যুক্তরাজ্যবাসী যেমন নিজেদের জিনিস অন্যদেশে পাঠাইয়া থাকেন, তেমনই অন্য দেশের জিনিসও তাঁহারা গ্রহণ করিয়া থাকেন। জাপানে যে সকল জিনিস আমদানী হয়, তাহার ৭৭ ভাগের ২০'২ ভাগ ইংল্যাণ্ড হইতে, ১৯ ভাগ ভারতবর্ষ হইতে, ১৫'৭ আমেরিকা হইতে, ১৪'৮ চীন হইতে এবং ৭'৭ জার্ম্মানি হইতে। অবশিষ্ট ২৩ ভাগ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে আসিয়া থাকে। অনেকের, হয়ত ভারতের ভাগ ইংল্যাণ্ডের প্রায় সমান দেখিয়া ভারতের শিল্পবাণিজ্যসম্বন্ধে উচ্চ বিশ্বাস জন্মিতে পারে। কিন্তু ১৯ ভাগের এক ভাগও শিল্পজাতদ্রব্য নহে। তদযথা—চাউল, চামড়া, নীল, পাট, শন, মোম এবং কাঠ। অন্যান্য দেশ হইতে জাপানে প্রধানতঃ তূলা, ষ্টিল ও লৌহজাত নানারূপ কলকব্জা এবং অন্যান্য দ্রব্যজাত, কেরোশীন তৈল, চাউল, ডাউল, ময়দা, চিনি, পশমীবস্ত্র, চর্ম্ম, ঘড়ী, নীল এবং আল্‌কহল্‌ ইত্যাদি আমদানী হইয়া থাকে। সম্প্রতি গত বৎসরের বাণিজ্য বিষয়ক যে রিপোর্ট বাহির হইয়াছে, তাহাতে প্রকাশ "১৯০৪ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাজ্য হইতে ৫০,০০,০০০ ডলারের* কেরোশীন ৪৮,০০,০০০ ডলারের ময়দা, ৪৫,০০,০০০ ডলারের তূলা, ২০,০০,০০০ ডলারের কল্। ১৯,০০,০০০ ডলারের লৌহ ও ইস্পাতের দ্রব্য, ১৭,০০,০০০ ডলারের চামড়া এবং ১১০০০০০ ডলারের সূতি জিনিস জাপানে আমদানী হইয়াছে। জাপান অন্যান্য দেশের চেয়ে আমেরিকার যুক্তরাজ্যেই বেশী রপ্তানী করিয়া থাকে।

* ১ ডলার=৩৲ তিন টাকা।

জাপান ১৮৮৪ খৃঃ ২,৯৪,৩৪,০০০ ডলারের, ১৮৯৪ খৃঃ ৫,৬০,১৭,০০০ ডলারের এবং ১৯০৪ খৃঃ ১৫,৮৯,৯২,০০০ ডলারের দ্রব্য বিদেশে প্রেরণ করে। তন্মধ্যে ১৮৮৪ খৃঃ ১,১৪,১১,০০০ ডলারের ১৮৯৪ খৃঃ ২,১৪,৮৮,০০০ ডলারের এবং ১৯০৪ খৃঃ ৫,০৪,২৩,০০০ ডলারের জিনিস কেবলমাত্র আমেরিকার যুক্তরাজ্যেই প্রেরণ করে।

গত বৎসর যুক্তরাজ্যে প্রেরিত দ্রব্যের মধ্যে রেশম ৩,০৪,০০,০০০ ডলারের, রেশমীবস্ত্র ১৬,০০,০০০ ডলারের, চা ৫,৬০,০০,০০০ ডলারের ; মাদুর ২৩,০০,০০০ ডলারের, চীনামাটীর বাসন ১,০০,০০০ ডলারের। এতদ্ব্যতীত কর্পূর, খড়ের বুনান জিনিস, কাঠের এবং বেতের জিনিস, কাগজ, গন্ধক, দাঁতের বুরুষ, পাখা, চাউল প্রভৃতি উক্ত দেশে প্রেরিত হইয়াছে। উহার কোনটাই ৩,০০,০০০ ডলার অর্থাৎ ৯,০০,০০০ টাকার কম প্রেরিত হয় নাই। আশ্চর্য্যের বিষয় সামান্য দাঁতের বুরুষও অন্ততঃ নয় লক্ষ টাকার এক যুক্তরাজ্যেই প্রেরিত হইয়াছে।

জাপান হইতে প্রধানতঃ রেশম, রেশমী বস্ত্র, কার্পেট, মাদুর, চীনামাটীর বাসন, বার্নিশের জিনিস, ছাতা, চা, কয়লা, মাছ এবং মাছের তেল, পাখা, কাগজ, মদ, ঔষধ, সূতা, শিঙ্গের দ্রব্যজাত, তামাক (সিগারেট), কাঠ, লতা এবং বেতের জিনিস, দেশলাই, তাম্র এবং তাম্রনির্ম্মিত নানাবিধ দ্রব্য, কর্পূর পেন্সিল এবং সাবান বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

গবর্ণমেণ্ট বাণিজ্যবিস্তারের জন্য যথেষ্ট সহায়তা করিয়া থাকেন, বিদেশে জিনিস পাঠাইতে উহার উপর কোন শুল্ক দিতে হয় না। বিদেশী জিনিসের উপরে শুল্ক আছে। গবর্ণমেণ্ট লবণ, মদ ও তামাকের ব্যবসা স্বহস্তে রাখিয়াছেন।

কয়েকটি জিনিসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বস্ত্রবয়ন।—সূতী ও রেশমীবস্ত্রবয়নে জাপানীরা অল্পসময়ে যে

কৃতিত্ব লাভ করিয়াছে, পৃথিবীর অন্য কোন জাতিই তেমন পারে নাই, পূর্ব্বে বিদেশ হইতে সূতা আসিত। ইহারা বস্ত্র বয়ন করিত মাত্র। ১৮৭৭ খৃঃ গবর্ণমেণ্ট সূতাকাটার কল স্থাপন করিয়া বৈদেশিক সূতাপ্রচলন বন্ধ করিবার জন্য সাধারণকে উৎসাহিত করেন। ১৮৮৭ খৃঃ বিদেশ হইতে ৬৩২৫২৯.৪ পাউণ্ড সূতা জাপানে আমদানী হয়। কিন্তু ১৮৯৫ খৃঃ ১৯৬০০০০০ পাউণ্ড সূতা মাত্র আমদানী হইয়াছে। ক্রমেই বহু সূতাকাটার কল সংস্থাপিত হইতেছে। বিদেশী সূতার আমদানীও যথেষ্ট কমিয়া যাইতেছে। এখন কোরিয়া এবং চীনে জাপানীরা প্রচুর সূতা রপ্তানি করিতেছে। ১৮৯৪ খৃঃ জাপানে ৫৯টী সূতাকাটার কল ছিল। ১৮৯৬ খৃঃ দেখা গেল ৬৭টী হইয়াছে। এইরূপ প্রতি বৎসরই বাড়িয়া যাইতেছে। ১৮৯৫ খৃঃ ত্রিশহাজার স্ত্রীলোক এবং দশ হাজার পুরুষ কলের সাহায্যে বস্ত্রবয়নে নিয়োজিত ছিল, এ ছাড়া হাতের তাঁতে যে কত লোকে বস্ত্র বয়ন করিত, তাহা নির্ণয় করাই দুরূহ, এই সময়ের কথায় জাপানী বস্ত্রবয়নরিপোর্টে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের জাতীয়-শিল্পসমিতির প্রেসিডেণ্ট মিঃ থিওডোর সি. ছার্চ্চ প্রকাশ করিয়াছেন—It is no exaggeration to say that nearly every house in rural Japan the spinning wheel and loom are kept going from morning till night.

সময়ের মূল্য জাপানীরাই বুঝিয়াছে। উপরোক্ত রিপোর্টেই প্রকাশ "অনেক কারখানায় ২৪ ঘণ্টাই কায চলিতেছে। কোন কোন কারখানায় ২০।২২ ঘণ্টা। ১২ ঘণ্টার কম কোন কল চলে না। গড়ে নাকি ২২॥০ ঘণ্টা কাল প্রতি কল কায করিতেছে।

১৮৯০ খৃঃ জাপানে ৬২৫০০০০০৲ টাকার কাপড় প্রস্তুত হয়, এবং ৮ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯৮ খৃঃ [illegible] টাকার উপর

কাপড় প্রস্তুত হয়। আট বৎসরেই কাপড়ের কারবার প্রায় ৪ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। ১৯০১ খৃঃ কেবল সূতা কাটিবার নিমিত্তই ৬৩০২১ লোক কারখানার কায করিত। জাপান আজকাল চীন, কোরিয়া, ফর্ম্মোজা প্রভৃতি স্থানের বিস্তর কাপড় প্রেরণ করিয়া থাকে।

রেশম।—জাপান রেশম এবং রেশমী কাযের জন্য বিখ্যাত। রেশমী শিল্পে জাপান আজকাল ফ্রান্স অপেক্ষাও হীন নহে বলিয়া মনে হয়। আমেরিকা, ইংলণ্ড, জার্ম্মানি, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে প্রতি বৎসর প্রচুর রেশম এবং রেশমজাত দ্রব্য রপ্তানি হইয়া থাকে। কৃষি ও শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের নিকট অনুসন্ধানে জানিলাম, সমগ্র জাপানে সম্প্রতি ২৪১৮টী রেশমী সূতা কাটিবার এবং ১৬৮১টী রেশমী বস্ত্রবয়নের কারখানা আছে। কি আশ্চর্য্য, এই ক্ষুদ্র জাপানে ৪০০০ চারি হাজারের উপর রেশমের কারখানা! ১৮৮০ খৃঃ জাপান ১৬৫৯৭৭৮৬৲ টাকার রেশম বিদেশে রপ্তানি করে। ১৮৯৫ খৃঃ ৭৬৫৯২৬৬০৲ টাকার রেশম বিদেশে প্রেরিত হয়। আর গত বৎসর কেবল আমেরিকার যুক্তপ্রদেশেই ৪৮০০০০০০৲ টাকার রেশমী বস্ত্র রপ্তানি হইয়াছে। ক্রমেই বৈজ্ঞানিক উপায়ে জাপানে ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধি করা হইতেছে। রেশমের আবাদও যথেষ্ট হইতেছে।

১৮৭২ খৃঃ ভাই কার্বণ্ট্ ইউরি এবং প্রিন্স্ ইওকুরা একসঙ্গে ইউরোপ এবং আমেরিকা-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বত্রই রেশমী রুমালের ব্যবহার দেখিতে পাইয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ উহার প্রচলন প্রবর্ত্তন করেন। জাপান ১৮৯৫ খৃঃ আমেরিকা এবং ইংলণ্ডে ৮০০৯৯৩৪৲ টাকার রেশমী রুমালই প্রেরণ করিয়াছে।

কম্বল।—১৮৩১ খৃঃ মেকাই-নামক স্থানে মিঃ কুজিমোজে ছোজা এমোম্ সর্ব্বপ্রথম জাপানে কম্বল তৈয়ার করিতে আরম্ভ করেন, আজ পর্য্যন্তও তাঁহার বংশধরেরা কৃতিত্বের সহিত প্রকাণ্ড কারবার চালাইয়া

আসিতেছেন। অনেকদিন কেবল শীতপ্রধান জাপানের অভাব পূরণ করিতেই কাটিয়াছিল। ১৮৮৯ খৃঃ ৩৭৫০০৲ টাকার এবং ১৮৯৫ খৃঃ ৭৬৫০০০০০৲ টাকার কম্বল বিদেশে প্রেরিত হয়। এখানকার কম্বল সাধারণতঃ তূলা, পশম এবং মোটা রেশমে প্রস্তুত হইয়া থাকে।

মাদুর।—এখানকার মাদুর বাস্তবিক দেখিবার জিনিষ। এখানে চেয়ার-টেবল-খাট-পালঙ্কের তেমন প্রচলন নাই। অধিকাংশের বড়ীই কাষ্ঠনির্ম্মিত। নৌকার ন্যায় পাটাতন করা আছে। তাহার উপর মাদুর বিছান হয়। অতিথি-অভ্যাগত সকলেই জুতা বাহিরে রাখিয়া ভিতরে গিয়া মেজের উপর বসিয়া থাকেন। কাজেই মাদুরের প্রচলন খুব বেশী। ওসাকা, মাদুরের কারখানার কেন্দ্রস্থল। ১৮৯৪ খৃঃ সমগ্র জাপানে ১৭৮১টী মাদুর বুনিবার কারখানা ছিল, এবং ১৬০০৪ জন লোক মাদুরের কায করিত। বলা বাহুল্য, সম্প্রতি কারখানার সংখ্যা আরও বাড়িয়া গিয়াছে। ১৮৮৫ খৃঃ ১৪০০৲ টাকার মাত্র মাদুর বিদেশে প্রেরিত হয়, ১৮৯৫ খৃঃ ৫২০০০০০৲ টাকার মাদুর বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়। কিন্তু ১৯০৪ খৃঃ একমাত্র যুক্তরাজ্যেই (আমেরিকা) ৩৫০০০০০৲ টাকার মাদুর প্রেরিত হইয়াছে।

খনিজপদার্থ।—গবর্ণমেণ্ট খনিজবিদ্যা শিক্ষার জন্য অনেক যুবককে বিদেশে প্রেরণ করেন। জাপানে টিনের কার্য্য আরম্ভ হইলে, প্রথমে বিদেশে শিক্ষিত দুইটী যুবক ইঞ্জিনিয়ার পাথর-চাপায় কালকবলে নিপতিত হয়েন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনার্থ উঁহাদের তৈলচিত্র এবং জীর্ণশীর্ণ পোষাকগুলি পর্য্যন্ত অতি যত্নে মিউজিয়ামে রাখিয়া দিয়াছেন। এবং উঁহাদের সংসারযাত্রানির্ব্বাহের সুন্দর বিধিব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন।

হোকাইদো দ্বীপ (Yesso) আকরের কেন্দ্রস্থল, এখানে কয়লা

এবং কেরোশীনই প্রধান আকরিক পদার্থ। স্বর্ণ-রৌপ্যের আকরও আছে। জাপানে ৫৭টী রৌপ্য, ১৩৬টী তাম্ররৌপ্য (ভেঁজাল) এবং আরও অনেকগুলি মিশ্রধাতুর আকর আছে। ১৮৯৪ খৃঃ ২৩৬৯৬ আউন্স, এবং ১৮৯৫ খৃঃ ২১০০০ আউন্স স্বর্ণ; আর ১৮৯৪ খৃঃ ১৯৫৬৯৩৮ আউন্স এবং ১৮৯৫ খৃঃ ১৭৬৮২৫০ আউন্স রৌপ্য আকর হইতে খনন করা হয়। ৬টী তাম্রখনিতে গড়ে প্রতি বৎসর ২৬০০০০০০ পাউণ্ড তাম্র উত্তোলন করা হয়।

দেশলাই।—জাপান, ইউরোপ এবং আমেরিকার সহিত দেশলাইয়ের প্রতিযোগিতা চালাইতেছে। একজন ইউরোপীয় রিপোর্টার লিখিয়াছেন—An important industry in Japan and one which is making its competition felt in Europe is the manufacture of lucifer matches. কোন কোন দেশলাই-ফ্যাক্টরীতে রোজ ২৫০০ লোক কার্য্য করিতেছে। কোবে, হিওগো, ওসাকা এবং টোকিও দেশলাই-প্রস্তুতের প্রধান স্থল।

বৈদেশিক বণিকেরা কারবারের জন্য ওসাকার নাগোইয়া ষ্ট্রীটকে লণ্ডনের হোয়াইট্ চ্যাপেল, নিউইয়র্কের বাউয়ারী, এবং লিভারপুলের স্কট্ল্যাণ্ড রোডের ন্যায় বর্ণন করিয়া থাকেন।

১৮৮৪ খৃঃ কেবলমাত্র ৪১৮৮৲ টাকার দেশলাই বিদেশে রপ্তানি হয়। ১৮৯৪ খৃঃ ৭০০৯২১৮৲ টাকার দেশলাই বিদেশে যায়। আজকাল বোধ হয়, উহার দ্বিগুণের কম বিদেশে রপ্তানি হয় না।

মদ।—হোকাইদোর অন্তর্গত ছাপোরোর মদই বিখ্যাত। প্রতি বৎসর অনেক টাকার মদ বিদেশে প্রেরিত হয়। জাপানীরা অনেকে পানাসক্ত হইলেও বৈদেশিক মদের কাটতি এখানে নাই বলিলেও চলে।

কাগজ।—আমেরিকার যুক্তরাজ্যের বণিকসম্প্রদায়ের প্রেসিডেন্ট-

মহাশয় বলিয়াছেন—"কাগজেও জাপান আমাদিগকে পরাস্ত করিতে চলিয়াছে। জাপানের কাগজ আমাদের কাগজের চেয়ে মসৃণ ও স্থায়ী বেশী।" মিৎছুমোতো, কোজো এবং গাম্পি নামক তিনপ্রকার গাছের বল্কলদ্বারা জাপানে কাগজ প্রস্তুত হয়। যে সকল অনুর্ব্বর, বালুকা এবং প্রস্তরময় ক্ষেত্রে অন্য কোন শস্য জন্মে না, সেখানে এই তিনপ্রকার গাছের বিস্তর আবাদ করা হয়। (১) জাপানের চর্ম্মকাগজে (Leather paper—অনেকটা চামড়ার মত) বাক্সের ছাউনি অতি সুন্দর হয়। ঐ কাগজে টেবিল, ঘরের দেওয়াল এবং মেজে মোড়াইয়া থাকে। (২) তৈলকাগজে জাপানী ছাতা (কারাকাছা) এবং লণ্ঠন প্রভৃতি প্রস্তুত হইয়া থাকে। (৩) অর্দ্ধস্বচ্ছ কাগজে বড়লোকের অথবা বৈদেশিকদের উপযোগী ভাড়াটিয়া বাড়ার দেওয়ালের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আমেরিকা এবং ইউরোপে প্রতি বৎসর অনেক টাকার নানারঙের কাগজ প্রেরিত হইয়া থাকে। (৪) তুলা এবং পুরাতন সংবাদপত্র দ্বারা অন্যান্য দেশের কাগজের ন্যায় জাপানেও কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে।

আমরা যাহাকে চাইনিজ্ লণ্ঠন বলি, ঐ সকল লণ্ঠন এখানে অসংখ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। রাস্তা-ঘাটে, দোকানে, গাড়ীতে সর্ব্বত্রই ঐ সকল লণ্ঠন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে প্রায়ই রাত্রিতে মিছিল বাহির হইয়া থাকে। মিছিলে (procession), প্রত্যেকেই কাগজের লণ্ঠনে একটী করিয়া প্রদীপ লইয়া হাঁটিতে থাকে, একজন্য উহাকে চ্যোচীন বা লণ্ঠন-প্রছেশন বলিয়া থাকে। ইংলণ্ড এবং আমেরিকায়, সাধারণতঃ কাগজের রুমাল, কার্ড, পর্দ্দা লণ্ঠন, খেলনা এবং টেবিলের নীচে ব্যবহারোপযোগী সুন্দর সুন্দর প্রশস্ত তা প্রভৃতি রপ্তানি হইয়া থাকে। জাপানীকাগজ কোমল, মসৃণ, অধিক দিন স্থায়ী, সুন্দর নক্সার অথচ অতি সুলভ বলিয়া

সকলেই প্রশংসা করে। ১৮৯৪ খৃঃ জাপানে ১২০০০০০০৲ টাকার কাগজ প্রস্তুত হয়। জাপানে কাগজ প্রস্তুতের জন্য প্রথম শ্রেণীর নব্য কল চলিতেছে।

বার্ণিশ।—পৃথিবীর মধ্যে জাপানী বার্ণিশ সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ইংরাজী 'জাপান'শব্দের অর্থ বার্ণিশবিশেষ। এদেশের নাম নিপ্পন। বৈদেশিকগণ এদেশের ঐ বার্ণিশের জন্যই জাপান নাম দিয়াছেন। আমরাও এদেশের নাম জাপান বলিয়াই জানি। সাধারণ লোকে এখনও জাপানকে নিপ্পন বলিয়া থাকে।

জাপানে এই বর্ণিশের ৪৪০৭টী কারখানা আছে। কাঠের জিনিস এখানে যেমন সুলভ অথচ সুন্দর, এরূপ কোথাও আছে কি না, বলিতে পারিনা। যে সকল পার্ব্বত্য প্রদেশে শস্য জন্মে না, তথায় যত্নসহকারে নানারূপ ব্যবহারোপযোগী বৃক্ষের আবাদ করা হয়। কৃষিকলেজে ফরেষ্টরী বিভাগ রহিয়াছে, এখানকার অনেক ফরেষ্টার আমেরিকা গবর্ণমেণ্ট পদে নিযুক্ত আছেন। নানারূপ গাছের আবাদ করে বলিয়াই দেশলাই, পেন্সিল, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি আসবাবে জপানীরা অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতা চালাইতে সক্ষম। জাপানী বাড়ী-ঘর সকলই কাঠের। এমন কি, রাজধানী টোকিও সহরের শতকরা ৯৮টী বাড়ী কাষ্ঠনির্ম্মিত। ২।১টী মাত্র বাড়ী ইষ্টকনির্ম্মিত। টেলিগ্রাফ এবং ট্রামকারের থাম, নর্দ্দমা এবং ফুটপাত সমস্তই কাষ্ঠ নির্ম্মিত।

চীনামাটি এবং কাচের জিনিসপত্র।—শেতো, জাপানের একটী ক্ষুদ্র সহর। সহরে আনুমানিক ১০০০ বাড়ী আছে। এইস্থলে সর্ব্বপ্রথম চীনামাটীর বাসন প্রস্তুত হয় বলিয়া, জাপানে চীনামাটির নাম শেতোমোনো (মোনো=পদার্থ) কোন এক বৈদেশিক রিপোর্টার লিখিয়াছেন, শেতোর প্রত্যেক বাড়ীই যেন এক একটী ছোটখাট ফ্যাক্টরী। ১৮৯৪ খৃঃ ৪৮০৫৭৩৩৲ টাকার চীনামাটীর বাসন বিদেশে

প্রেরিত হয়। কাচের জিনিসও আজকাল যথেষ্ট প্রস্তুত হইতেছে; ঘরের দুয়ার-জানালা হইতে আরম্ভ করিয়া বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সমস্তই জাপানে প্রস্তুত হইতেছে। কাচের ছাদবিশিষ্ট দুইএকখানা ঘরও দেখিতে পাওয়া যায়।

কর্পূর।—জাপানীরা ফর্ম্মোসাদ্বীপ হইতে প্রচুর কর্পূর পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রেরণ করে।

বাঁশ এবং বেতের জিনিস।—এখানে বাঁশ এবং বেতের যে সুন্দর সুন্দর বাক্স তৈয়ার হয়, তাহার নিকট ষ্টীলট্রাঙ্ক এবং গ্লাডষ্টোন ব্যাগকেও হার মানিতে হয়। এইজন্য এ বাক্সগুলিও বিদেশে যথেষ্ট রপ্তানি হইয়া থাকে। বাঁশের এবং বেতের দ্বারা ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য অতি সুন্দর সুন্দর গাড়ী প্রস্তুত করিয়া থাকে। দেখিতে ঠিক বিলাতী গাড়ীর ন্যায় অথচ মূল্য অতি সামান্য। শুনিতে পাই, জাপানে নাকি বাঁশ দিয়া সম্প্রতি বাইসিকেল তৈায়ার করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

সামান্য সূচিকা হইতে আরম্ভ করিয়া রেল, ষ্টীমার, জাহাজ প্রভৃতি যাহা-কিছু সভ্যজাতির পক্ষে আবশ্যকীয় সমস্তই জাপানে প্রস্তুত হইতেছে। আজকাল যুদ্ধ-জাহাজ পর্য্যন্ত জাপানে তৈয়ার হইতেছে। বন্দুক, কামান, গোলাগুলি, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি সমস্ত এখানেই তৈয়ার হইতেছে। স্থানে স্থানে জলপ্রপাতের বিদ্যুৎ খাটাইয়া কত কি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কার্য্য করিতেছে। বৈদ্যুতিক ট্রামে সহর ঢাকিয়াছে, টেলিফোনে দেশ ঘেরিয়াছে, সভ্যজগতের কিছুরই অভাব নাই। জার্ম্মাণশাস্ত্রানুযায়ী সকল রকম ঔষধই এখানে প্রস্তুত হইতেছে। জাপানী ঔষধ কোরিয়া, চীন প্রভৃতি দেশে বিস্তর প্রেরিত হইতেছে।

আর একটী কথা, জাপানে কোন জিনিস নষ্ট হয় না। বাড়ী-ঘরের আবর্জ্জনা বলুন, আর পায়খানার ময়লা বলুন, কিছুরই অপব্যয় হয় না। সকলই কোন-না-কোন কাযের উপযোগী করিয়া লওয়া

হয়। বলা বাহুল্য, মেথর প্রভৃতিকে মাহিয়ানা দিতে হয় না, বরং মেথরই অনেক সময় গৃহস্বামীকে পয়সা দিয়া থাকে। ময়লা আবর্জ্জনা প্রভৃতি দিয়া ক্ষেত্রের সার প্রস্তুত হইয়া থাকে। দেশে সব কাযই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে চলিতেছে।

শিল্পবাণিজ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন নানারকম কোম্পানি খোলা হইতেছে। ১৮৯৪ খৃঃ ২৯৬৭টি কোম্পানী ছিল। ১৮৯৯ খৃঃ ৭৪২৯টিতে দাঁড়াইয়াছে। তন্মধ্যে কৃষিবিভাগের ১৭৬; শিল্প—২২৫৩; বাণিজ্য—২৭২২; রপ্তানি—৫১০; ব্যাঙ্ক—২১০৫ এবং রেলওয়ে কোম্পানী ৭৩টী। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে একটী তালিকা দেওয়া গেল। যদিও লোকের মাহিয়ানা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে, তবু বাণিজ্যে জাপানীরা অন্যান্য দেশের সহিত প্রতিযোগিতা-রক্ষণে অসমর্থ হইবে না বলিয়া এদের বিশ্বাস।

	1894	1895	1896	1897	1898	1899
কাঠের মিস্ত্রী	৫৫.০	৫৭.৫	৬২.৫	৫৭.৫	৭৩.৫	৮২.৫
রাজমিস্ত্রী	৭৫.০	৯১.০	৭৬.০	৫৫.০	৪৪.০	১৫৫.০
অন্যান্য আসবাব প্রস্তুতকারী	৪৭.৫	৬৫.০	৫৭.৫	৬২.৫	৭৩.৫	৯০.০
জুতা প্রস্তুতকারী	৮০.০	৬০.০	৬০.০	৫০.০	৬৮.৮	১২০.০
বিদেশী পোষাকের দরজী	৮২.৫	৭৬.০	৬২.৫	৭০.০	৭১.০	৮৫.০
লোহার কর্ম্মকার	৫০.০	৫০.০	৫০.০	৫০.০	৬২.০	৬৫.০
ল্যাকার বার্ণিশকারী	৭৫.০	৮০.০	৭৫.০	৫০.০	৬১.৪	৮১.৭
প্রেসের কম্পোজিটর	৫০.০	৫০.০	৫০.০	৪২.০	৪১.২	৫৭.৫
কুলি (মুটে)	৩৭.৫	৩৫.০	৩৮.০	৩৭.৫	৪৬.৯	৫০.০

উল্লিখিত পয়সা হিসাবে বিভিন্ন বিভাগীয় সুদক্ষ কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি দৈনিক উপার্জ্জন করিয়া থাকে। (শিল্পবাণিজ্য-রিপোর্ট, টোকিও)।

শ্রীযদুনাথ সরকার।

ক্রমাবনতি।

আমাদের ধর্ম্ম ও জাতীয় জীবন।

ধর্ম্মই জাতীয় জীবনের ভিত্তি। পৃথিবীর জাতিসকল স্ব স্ব ধর্ম্ম অনুসারে উন্নত বা অবনত হইয়া আসিতেছে। জাতীয় ধর্ম্মের শক্তি জাতীয় শক্তির মূল, জাতীয় ধর্ম্মের উৎসাহ জাতীয় উৎসাহের প্রস্রবণ, জাতীয় ধর্ম্মের উদ্যম ও কর্ম্মনিষ্ঠাই, জাতিকে উদ্যমশীল ও কর্ম্মনিষ্ঠ করে। জাতীয় ধর্ম্মের ভিত্তি অসার বা দুর্ব্বল হইলেও জাতির ভিত্তিও অসার ও দুর্ব্বল হইয়া থাকে। কোন প্রবলতর ধর্ম্মপ্রথার আক্রমণে বিধ্বস্ত হইয়া যখন সেই অসার ভিত্তির ধর্ম্ম বিলুপ্ত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিলুপ্ত ধর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট আচার-ব্যবহারাদি ও বিশ্বাসে বিশেষত জাতিত্বের লোপ হয়, তখন সেই জাতি এমন নূতন আকার ধারণ করে যে, তাহার পূর্ব্বভাবের কোন লক্ষণই প্রায় দৃষ্ট হয় না। বর্ত্তমান রোমান বা গ্রীকদিগকে প্রাচীন রোমান্ বা গ্রীকদিগের সহিত তুলনা করিলে, কোন সাদৃশ্যই প্রায় লক্ষিত হয় না, এমন কি, বর্ত্তমানে রোমান্ নামে কোন জাতি আছে বলিয়াই বোধ হয় না। বর্ত্তমান মিসরে প্রাচীন মিসরের কোন জাতীয় চিহ্ন বা সাদৃশ্য লক্ষিত হয় কি? যদি কিছু সাদৃশ্য থাকে তাহা আকৃতিতে মাত্র। দুইচারিটা প্রাচীন কীর্ত্তি সর্ব্বভুক কালের করাল প্রহার সহ্য করিয়া প্রাচীনের পরিচয় দিতেছে মাত্র। জাতীয় ধর্ম্মের মৃত্যুর সহ জাতীয় জীবনের সম্পূর্ণ অবসান হয়। আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, রীতি-নীতি প্রভৃতি সমস্তই সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়।

রোমের ধর্ম্মের মৃত্যুসহ রোমান জাতির মৃত্যু হয়; গ্রীসের জাতীয় ধর্ম্মের মৃত্যুসহ গ্রীকজাতির মৃত্যু হইয়াছে, মিসরের জাতীয় ধর্ম্মের

মৃত্যুসহ মিসর জাতিরও মৃত্যু হইয়াছে। ভারতের ধর্ম্ম, মিসর, গ্রীক্ ও রোমের প্রাচীন ধর্ম্ম অপেক্ষা অধিক প্রাচীনতর। এক খৃষ্টধর্ম্মে আক্রমণে প্রথমোক্ত ধর্ম্মত্রয় ও মুসলমান্ধর্ম্মের আক্রমণে মিসরের ধ' বিধ্বস্ত হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ভারতের ধর্ম্ম বৌদ্ধধর্ম্মে প্রবল তাড়ন, জৈনধর্ম্মের ভীষণ আক্রমণ, মুসলমানধর্ম্মের প্রব' ঝটিকা, খৃষ্টধর্ম্মের অপূর্ব্ব কুহক, একে একে বিফল করিয়া, অচল অটল ও অটুট রহিয়াছে। কালের কুটীল গতিতে যে তুইদশটী পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা অতি সামান্য, তাহাতে মূলের কোন পরিবর্ত্তনই ঘটে নাই। ভারতের ধর্ম্মের নাম সনাতনধর্ম্ম। ইহা চিরন্তন, ইহার না' নাই। শত সহস্র বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কত নদ-নদী বিলুপ্ত হইয় গিয়াছে, কোন কোনটী বা পরিবর্ত্তিত পথে ধাবিত হইতেছে, কত অরণ্য সমৃদ্ধিশালা নগরে পরিণত এবং কত নগর অরণ্যে পরিণত হইয়াছে, কতই পরিবর্ত্তন চতুষ্পার্শ্বে লক্ষিত হইতেছে, কিন্তু সেই সনাতনধর্ম্মের কোন পরিবর্ত্তনই হয় নাই। তাহা যেমন তেমনই আছে, এবং তদ্ভিত্তিক আর্য্যজীবন তদ্ভাবে ভাবান্বিত হইয়া রহিয়াছে। খৃষ্টধর্ম্ম গ্রীস-রোমের জাতীয়ধর্ম্মবিনষ্টপূর্ব্বক স্বীয় আসন স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া তাহা যে, কালে এই সনাতনধর্ম্মের আসন টলাইতে পারিবে বলিয়া, খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকেরা ঘোষণা করেন, তাহা তাঁহাদের অদূরদর্শিতার পরিচয়মাত্র।

ভারতবাসী বলিলে, কোন জাতিবিশেষকে বুঝায় না; কারণ, ভারতবর্ষে বিবিধজাতির বাস। সাধারণতঃ ভারতবাসী দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, আর্য্য ও অনার্য্য। ম্লেচ্ছ ও যবন, অনার্য্যপর্য্যায়ভুক্ত। যখন মুসলমানেরা দেশ জয় করিয়া তথায় বাস ও রাজ্য করিতে লাগিল, তখন ভারতবাসী, হিন্দু ও মুসলমান এই দুই প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত হইল। এবং সেই সময় হইতে উভয় শ্রেণীর জাতীয়ধর্ম্ম হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইল। হিন্দু বলিতে যে কেবল আর্য্যই বুঝায় তাহা

নহে ; যাহারা মুসলমান্ নহে, তাহারাই হিন্দুনামে অভিহিত হইত। পারসীরা মুষ্টিমেয় বলিয়া গণনার মধ্যে আইসে নাই। সুতরাং এক হিন্দুশব্দে যে, কেবল সনাতনধর্ম্মাবলম্বীকে বুঝায় এমত নহে, বৌদ্ধ, জৈন, এমন কি, শিখেরাও এই পর্য্যায়ভুক্ত হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং হিন্দুধর্ম্ম বলিলে কোন বিশেষ ধর্ম্মবিশ্বাস বা ধর্ম্মপ্রথা বুঝায় না। ধর্ম্ম-বিশ্বাসের বিশেষ পার্থক্য থাকিলেও সনাতনধর্ম্মাবলম্বী ও বৌদ্ধ, জৈন ও শিখদিগের মধ্যে একটী বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই বিশেষত্ব ইহা-দিগকে মুসলমান হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে, এবং এই বিশেষত্ব অবলম্বন করিয়াই ইহাদের সকলকেই হিন্দুনামে অভিহিত করা হয়। সে বিশেষত্ব বা সাদৃশ্য কি? ইহাদের আচার-ব্যবহারে, বেশ-ভূষায়, চাল-চলনে এবং বাহ্যিক-উপাসনাপ্রথা-প্রভৃতিতে ও ধর্ম্মবিশ্বাসে এই বিশেষত্ব লক্ষিত হয়।

বেদভিত্তিক ধর্ম্মের নামই সনাতনধর্ম্ম। সত্যশব্দের অন্য অর্থ সনাতন। বেদভিত্তিক ধর্ম্ম সম্পূর্ণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই ইহার সনাতন আখ্যা হইয়াছে, আর সেই কারণেই ইহা এত ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করিয়াও স্থির আছে।

যে ধর্ম্ম মানবচিত্তের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে পারে না, তাহাই অসারভিত্তিক। অনুকূলতর কোন ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেই লোকে সে ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে। বিদ্যা ও বুদ্ধির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মানবের চিত্তবৃত্তির পরিবর্ত্তন হয়, এবং সেই পরিবর্ত্তনজন্য মানবচিত্তের আকাঙ্ক্ষাও রূপান্তরিত হয়, যে ধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার আকাঙ্ক্ষা মিটাইতে পারে, প্রাকৃত ব্যক্তির সামান্য আকাঙ্ক্ষা হইতে জ্ঞানী ও বিদ্বানের উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পর্য্যন্ত যাহা পূর্ণ করিতে পারে, কোনপ্রকার পরিবর্ত্তনে তাহার পরিবর্ত্তন হয় না, তাহা বাস্তবিকই সনাতন। আমাদের ধর্ম্ম এই ভাবের ধর্ম্ম বলিয়াই ইহা সনাতননামে আখ্যাত হইয়াছে, এবং বিবিধ

নৈসর্গিক ও রাজকীয় পরিবর্তনেও ইহার বিশেষ কোন পরিবর্তন ঘটে নাই।

এই সনাতনধর্ম্মের এক অপূর্ব্ব মিশ্রণী শক্তি আছে। সেই শক্তিবলে ইহা অপর ধর্ম্মকে আপনাতে মিশাইয়া লইয়া তাহার পৃথক অস্তিত্ব লোপ করিয়া দেয়। এই সনাতনধর্ম্মের বিবিধপ্রকার সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আবার ব্যবহার ও ধর্ম্মবিশ্বাস পৃথক হইলেও কতকগুলি বিষয়ে এমন সাদৃশ্য আছে যে, তাহাতেই তাহারা মূলবৃক্ষের অঙ্গীভূত হইয়া আছে। চৈতন্যদেব জাতিভেদের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া হরিনাম-নিষ্পাদিত সাম্যের ভেরী নিনাদিত করেন। কিন্তু সেই ভেরী মহাপুরুষের মুখচ্যুত হইবার পরেই, বৈষ্ণবধর্ম্ম সনাতনধর্ম্মের অঙ্গীভূত হইয়া গেল, জাতবৈষ্ণবেরা এক পৃথকজাতি বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিল। গোস্বামিগণ এই সম্প্রদায়ের নেতা হইয়াও সামান্য দুইচারিটী বিষয়ে মাত্র হরিবিলাসের মতানুসরণপূর্ব্বক আর সকল ব্যাপারেই দেশ প্রচলিত স্মৃতিশাস্ত্রের অনুসরণ করিতে লাগিলেন। জাতবৈষ্ণবেরাও সকল বিষয়ে হরি-বিলাসের মতানুসারে চলে না, তাহারাও মাঝামাঝি একটা ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। এইরূপ ব্যাপার সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়।

এখন দেখা যাইতেছে যে, ঊনবিংশস্মৃত্যুক্ত বিধিনিষেধগুলির সমষ্টিই সাধারণত ধর্ম্মনামে অভিহিত হইয়া থাকে। তাহাদের পালনে ধর্ম্ম ও অকরণে অধর্ম্ম হয় বলিয়া জনসাধারণের মনে দৃঢ়বিশ্বাস হইয়া গিয়াছে। এই অনুশাসনসমষ্টির মধ্যে যেগুলি সামান্য ও তত প্রয়োজনীয় নহে, সেগুলি একপ্রকার পরিত্যক্ত হইয়াছে, কোথাও বা কাল-ক্রমে এই বিধিনিষেধের কোন কোনটী বিশেষ ভাবান্তরিত হইয়া আছে। সূর্য্যোদয় হইতে যতক্ষণ না লোকে শয়ন করিতে যায়, ততক্ষণ আর্য্যমাত্রেরই নিত্যনৈমিত্তিক কার্য্যের নির্দ্দেশ আছে, এবং শিষ্টাচার-

সম্বন্ধেও অনেক বিধিনিষেধ আছে; কিন্তু তাহার সকলগুলি যথাযথ পালিত হয় না, অথচ তাহাতে বিশেষ প্রত্যবায় আছে বলিয়াও লোকের ধারণা নাই। কিন্তু দশবিধসংস্কার, বিশেষতঃ বিবাহ, এবং খাদ্যাখাদ্যবিষয়ের বিধিনিষেধ অধিকাংশ স্থলেই অক্ষুণ্ণ আছে। বিবাহ-ব্যাপার সর্ব্বত্রই সমানভাবে প্রবল। বাঙ্গালায় এরূপ ব্যাপার হইয়াছে যে, স্মৃত্যুক্ত বিবাহব্যাপারেই হিন্দুর হিন্দুত্ব আসিয়া ঠেকিয়াছে। অন্য ব্যাপারে না মানুন, কেবল বিবাহব্যাপারে এই জাতিভেদ মানিয়া অনেকে হিন্দুসমাজে রহিয়াছেন।

এই জাতিভেদই হিন্দুধর্ম্মের মূলভিত্তি। ইহা জাতীয়-জীবন-গঠনের জন্যই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। জাতীয় উন্নতির জন্য এই জাতি-ভেদ বিশেষ উপযোগী বলিয়াই বোধ হয়। এক জাতি অপরের কর্ম্ম করিলে পতিত হইবে, এইরূপ অনুশাসন থাকায়, যতদিন জাতিগুলি স্ব স্ব কর্ম্মের উন্নতিসাধনপূর্ব্বক পরস্পরকে সাহায্য করিয়া এবং পরস্পরের সহিত সহানুভূতি রাখিয়া সমাজাঙ্গ পরিপুষ্ট রাখিয়াছিল, ততদিন কোন গোলযোগই উপস্থিত হয় নাই। মহাভারতে দেখা যায়, প্রথম একই জাতি ছিল। তাহার পর সমাজ-সৌষ্ঠবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সেই একই জাতি প্রথমতঃ তিন জাতিতে বিভক্ত হয়। সেই তিনের সাধারণ নাম দ্বিজ। সুতরাং এই ত্রিধাবিভাগের পূর্ব্বে যে একজাতি ছিল, তাহাকে দ্বিজনামে অভিহিত করা যায়, এবং মহাভারতেও তাহা ব্রাহ্মণনামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন বর্ণের প্রত্যেকরই বিশেষত্ব আছে। একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই দেখা যায় যে, এই বর্ণবিভাগ যারপরনাই হিতকর, প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত।

আত্মপোষণ ও আত্মরক্ষণ জীবজগতের দুইটী প্রধান নৈসর্গিক ক্রিয়া। বংশবর্দ্ধনপূর্ব্বক জাতীয় অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা, তৃতীয় নৈসর্গিক

ক্রিয়া; কিন্তু ইহা আত্মপোষণ ও আত্মরক্ষণের অন্তর্ভূত। কারণ, এ বৃত্তি স্বভাবতঃ জীবমাত্রে নিহিত থাকিলেও অনেক স্থলে দেখা যায় যে, তাহা নিষ্ক্রিয় হইয়া থাকিলেও ক্ষতি হয় না, এবং জীব তাহা কার্য্যকারিণী না করিতেও পারে। কিন্তু আত্মপোষণ ও আত্মরক্ষণ অপরিহার্য্য। এতদ্ভিন্ন মনুষ্যমধ্যে আর একটী নৈসর্গিক ক্রিয়া দেখা যায়, তাহাও একপ্রকার অপরিহার্য্য। আপনার নিঃশ্রেয় চিন্তাই সেই ক্রিয়া। এই নিঃশ্রেয়, ঐহিক ও পারমার্থিকভেদে দ্বিবিধ। একত্রে অবস্থিত মনুষ্যসমষ্টিই সমাজনামে অভিহিত হয়, সুতরাং সমাজাঙ্গ মনুষ্যাঙ্গের প্রতিরূপ এবং ইহার ক্রিয়াদিও মানবের ক্রিয়াদির প্রতিরূপ মাত্র। আত্মপোষণ, আত্মরক্ষণ ও নিঃশ্রেয়সাধন সমাজেরও তিনটী নৈসর্গিক-কার্য্য। সমাজের অস্তিত্ব, মানবের অস্তিত্বের ন্যায় এই তিন কার্য্যের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। সর্ব্বত্রই মানব-সমাজস্থ লোকদিগকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত দেখা যায়, প্রথম শ্রেণী নিঃশ্রেয়সাধনব্যাপারে, দ্বিতীয় আত্মরক্ষণে এবং তৃতীয় আত্মপোষণে নিযুক্ত। অসভ্য মানবসমাজে এই ক্রিয়াবিভাগটি স্পষ্ট না থাকিলেও তাহার অস্তিত্ব অনুভূত হইয়া থাকে। সর্ব্বাবস্থাতেই মানব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দুইটি জগতের অস্তিত্ব স্বতঃই স্বীকার করিয়া থাকে, এবং এই দুইটী যে কোন দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, তাহাও স্বীকার করে। পরোক্ষানুভূতি বিশেষ সূক্ষ্মবুদ্ধিসাপেক্ষ; সুতরাং সর্ব্বাবস্থায় ও সর্ব্বত্রই পরোক্ষ-তত্ত্ববিদেরা বিশেষ সম্মানিত হইয়া থাকেন। সেবাগ্রহণবৃত্তিও মানবমাত্রেরই স্বাভাবিক। জীবজগতের সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায় যে, বলবান্ দুর্ব্বলের উপর বলপ্রয়োগ করিয়া আপনার আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন ও সুখসাধন করে। সর্ব্বপ্রকার মানবসমাজেই দাসশ্রেণীস্থ একদল লোক দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্যতার ও সর্ব্বপ্রকার উন্নতির সহ সভ্যসমাজে এই দাসত্বপ্রথার কঠোরত্ব হ্রাস হইয়া আসিলেও, সর্ব্বত্র মূল অক্ষুণ্ণ দেখিতে পাওয়া

যায়। রোমের পেট্রিসিয়ন্ ও প্লিবিয়ন, ইউরোপের সভ্যসমাজের লর্ড ও আভিজাত্যপ্রথা ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা দাসশ্রেণীভুক্ত হইয়া উচ্চশ্রেণী লোকের সেবা আপনাদের কর্ত্তব্য মনে করিয়া আসিতেছে, তাহারা সেই সেবাকরণে আনন্দলাভ করে, এবং অকরণে প্রত্যবায় মনে করিয়া থাকে। মার্কিণের যুক্তরাজ্যে ও ফ্রান্সে এই ব্যাপার সুস্পষ্ট লক্ষিত না হইলেও, তাহার বীজ নষ্ট হয় নাই বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়, এবং কালক্রমে এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, রূপান্তরিত হইয়া, পূর্ব্ববৎভাবেই পরিণত হইবে বলিয়া বোধ হয়।

এই জাতিভেদ প্রাকৃতিক নিয়মে নিষ্পাদিত হয়। সেই কারণে ইহা কেবল মনুষ্যসমাজে কেন, ইতরপ্রাণীর মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইতরপ্রাণীর মধ্যে এই জাতিভেদ বর্ণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বর্ণ অর্থে রং বুঝিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে সাদা-কাল-রং-অনুসারে জাতিভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, অর্থাৎ আর্য্য-বিজেতারা শ্বেতকায় ও দেশের আদিমনিবাসীরা কৃষ্ণকায়, এই সাদা ও কাল ভেদকে তাঁহারা জাতিভেদ মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে দ্বিজ ও শূদ্র এই দুই ভেদ হইতে পারে, কিন্তু দ্বিজদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণভেদ কি করিয়া হইবে। এখানে বর্ণ শব্দের অর্থ রং নহে। বর্ণশব্দের অর্থ বর্ণনা, বিশেষত্বনির্দ্দেশদ্বারা যাহা বর্ণিত বা পৃথকীকৃত বা বিভক্ত হইয়াছে। বর্ণশব্দের অর্থ, বিশেষত্ব-নির্দ্দেশপূর্ব্বক সম্যক্ নির্দ্দিষ্ট বিভাগ। ইতরপ্রাণীর ও উদ্ভিদের মধ্যে যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া জাতি নির্দ্দিষ্ট হয়, আর্য্যসমাজে আদৌ জনবর্গ প্রাকৃতিক-যোগ্যতা-অনুসারে গুণকর্ম্ম-বিভাগতঃ চারি বর্ণে সুনির্দ্দিষ্ট সামাজিক বিভাগে বিভক্ত হয়। অন্যান্য মানবসমাজে এই চতুর্বিধ জাতিবিভাগ লক্ষিত হইলেও, তাহা বর্ণাকার ধারণ করে

যায়। রোমের পেট্রিসিয়ন্ ও প্লিবিয়ন, ইউরোপের সভ্যসমাজের লর্ড ও আভিজাত্যপ্রথা ইহার সাক্ষ্য দান করিতেছে। ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, যাহারা দাসশ্রেণীভুক্ত হইয়া উচ্চশ্রেণী লোকের সেবা আপনাদের কর্ত্তব্য মনে করিয়া আসিতেছে, তাহারা সেই সেবাকরণে আনন্দলাভ করে, এবং অকরণে প্রত্যবায় মনে করিয়া থাকে। মার্কিণের যুক্তরাজ্যে ও ফ্রান্সে এই ব্যাপার সুস্পষ্ট লক্ষিত না হইলেও, তাহার বীজ নষ্ট হয় নাই বলিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়, এবং কালক্রমে এই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, রূপান্তরিত হইয়া, পূর্ব্ববৎভাবেই পরিণত হইবে বলিয়া বোধ হয়।

এই জাতিভেদ প্রাকৃতিক নিয়মে নিষ্পাদিত হয়। সেই কারণে ইহা কেবল মনুষ্যসমাজে কেন, ইতরপ্রাণীর মধ্যেও দেখিতে পাওয়া যায়। ইতরপ্রাণীর মধ্যে এই জাতিভেদ বর্ণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত বর্ণ অর্থে রং বুঝিয়া থাকেন, তাঁহাদের মতে সাদা-কাল-রং-অনুসারে জাতিভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, অর্থাৎ আর্য্য-বিজেতারা শ্বেতকায় ও দেশের আদিমনিবাসীরা কৃষ্ণকায়, এই সাদা ও কাল ভেদকে তাঁহারা জাতিভেদ মনে করিয়া থাকেন। তাঁহাদের মতে দ্বিজ ও শূদ্র এই দুই ভেদ হইতে পারে, কিন্তু দ্বিজদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই বর্ণভেদ কি করিয়া হইবে। এখানে বর্ণ শব্দের অর্থ রং নহে। বর্ণশব্দের অর্থ বর্ণনা, বিশেষত্বনির্দ্দেশদ্বারা যাহা বর্ণিত বা পৃথকীকৃত বা বিভক্ত হইয়াছে। বর্ণশব্দের অর্থ, বিশেষত্ব-নির্দ্দেশপূর্ব্বক সম্যক্ নির্দ্দিষ্ট বিভাগ। ইতরপ্রাণীর ও উদ্ভিদের মধ্যে যেমন প্রাকৃতিক নিয়মে সুনির্দ্দিষ্ট হইয়া জাতি নির্দ্দিষ্ট হয়, আর্য্যসমাজে আদৌ জনবর্গ প্রাকৃতিক-যোগ্যতা-অনুসারে গুণকর্ম্ম-বিভাগতঃ চারি বর্ণে সুনির্দ্দিষ্ট সামাজিক বিভাগে বিভক্ত হয়। অন্যান্য মানবসমাজে এই চতুর্বিধ জাতিবিভাগ লক্ষিত হইলেও, তাহা বর্ণাকার ধারণ করে

নাই। কেবল আর্য্যসমাজেই বর্ণাকার দেখিতে পাওয়া যায়। এক এক বিভাগের বিশেষত্ব এমন সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে নির্দ্দিষ্ট, তাহার গুণ ও কর্ম্ম এরূপ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মরূপে নির্দ্ধারিত, এবং তাহার আচারব্যবহার ও কার্য্য-কলাপে এরূপ বিশেষত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, একবর্ণের অন্যবর্ণের সহিত মিশ্রিত হইবার কোন উপায়ই নাই। বর্ণচতুষ্টয় যাহাতে স্ব স্ব সীমার মধ্যে থাকিয়া স্ব স্ব কার্য্যকলাপ সম্পাদন করে, তাহার অতি সুব্যবস্থা করা হইয়াছিল। প্রাকৃতিক নিয়মেরই অনুসরণ করিয়া অবশ্যম্ভাবী বা ঘটনাচক্রে সমুপস্থিত মিশ্রবর্ণের অস্তিত্ব হইলে, তাহা কোন্ বর্ণভুক্ত হইবে তাহার ব্যবস্থা থাকায় বর্ণবিভাগের আধিক্য নিরস্ত হইয়াছে। এক এক বর্ণের অভ্যন্তরীণ বিভাগ আধুনিক ও সামাজিক পরিবর্ত্তনে নিষ্পাদিত হইয়াছে, কিন্তু এতাবৎ বর্ণচতুষ্টয় মূলতঃ পরস্পর সম্পূর্ণ পৃথক্ রহিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রেরা নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছেন। কিন্তু অধঃস্তন বর্ণ উচ্চতম বর্ণে স্থান পায় নাই। যদিও উচ্চতম বর্ণ নিম্নতর বর্ণে, সম্পূর্ণ না হউক অংশতঃ, পতিত হইয়াছে, এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। পশ্চিমাঞ্চলে ভূমিহার ব্রাহ্মণ, বাঙ্গালায় বৈদ্যসম্প্রদায়, তাহার পরিচয় দিতেছে। আর্য্যসমাজের জাতি-ভেদব্যবস্থায় এক বিশেষত্ব এই যে, তাহাতে উর্দ্ধগতি বা ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা নাই। এই যুক্তি আছে যে, আর্য্যসমাজের বর্ণবিভাগ প্রাচীন উদ্ভিদ-জগতের জাতিবিভাগের ন্যায় সুনিষ্পাদিত। যেমন বংশ ঘাসজাতীয়, তাহার যতই উন্নতি হউক না কেন, তাহা যেমন বৃক্ষজাতীয় হইতে পারে না, সেইরূপ অধঃস্তন বর্ণ যতই উন্নত হউক না কেন, তাহা উচ্চতর বর্ণভুক্ত হইতে পারে না, এই কারণে উচ্চতন ও অধস্তন বর্ণভুক্ত হইবার ব্যবস্থা নাই। জাতিত্যাব্যবস্থায় কেহ কোন কারণে অবনতি প্রাপ্ত হইলে, সে আপন বর্ণেই পতিত হইয়া থাকে। ক্রমোন্নতির ব্যবস্থা একেবারে নাই, এ কথাও বলা যায় না। কারণ, দেখা যায় যে,

বিশ্বামিত্র কঠোর তপস্যার বলে, বহুকাল পতিত হইয়াও ব্রহ্মর্ষিত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। স্বয়ং প্রজাপতি তাঁহাকে ব্রহ্মর্ষি আখ্যা প্রদান করিলেও তিনি তাহাতে কৃতপ্রত্যয় হয়েন নাই। পরে যখন বশিষ্ঠ তাঁহার ব্রহ্মর্ষিত্বের অনুমোদন করিলেন, তখন তিনি প্রীত হইলেন। বিশ্বামিত্রের ব্রহ্মর্ষিত্বলাভকালে চেষ্টা, এবং তাঁহার বশিষ্ঠের সহিত বিবাদবিষয়ে পুরাণে যে আখ্যায়িকা বর্ণিত আছে, তাহা পাঠেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কোন্ সূত্র অবলম্বন করিয়া ব্রাহ্মণাদিবর্ণ-বিভাগ হইয়াছিল। অনেক কঠোর সাধনার পর, তবে বিশ্বামিত্রের রজোপ্রাধান্য অপগত হইয়া সত্ত্বপ্রাধান্য লাভ হয়, তবে তিনি ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন। পুরাণে, গৃহীর মধ্যে যেমন জনক, ক্ষত্রিয়ের মধ্যে বিশ্বামিত্রও সেইরূপ একমাত্র উদাহরণ। উভয়েই আদর্শচরিত্র। বিশ্বামিত্রের ব্যাপারে ইহাই প্রকাশিত হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের ন্যায় চেষ্টা করিলে ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতে পারেন, তবে তাহা কঠোর সাধন সাপেক্ষ ও ব্রহ্মর্ষিপ্রবরের অনুমোদনসাপেক্ষ।

এ ব্যাপার একপ্রকার অসম্ভব ও অসাধ্য হওয়ায় নিম্নবর্ণের উচ্চবর্ণ-প্রাপ্ত্যাধিকারও ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া যায়। পরিণামে এই চারিবর্ণ প্রায় সর্ব্বত্র পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক হইয়া প্রকৃতপ্রস্তাবে বর্ণ হইয়া উঠিল। ব্রাহ্মণের চারিবর্ণে, ক্ষত্রিয়ের তিনবর্ণে, বৈশ্যের দুইবর্ণে বিবাহও প্রায় সর্ব্বত্র নিষিদ্ধ হইয়া আসিয়াছে; নেপাল ও অন্য দুই এক স্থানে মাত্র প্রচলিত আছে। বিবাহের নিয়ম ক্রমে সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসিয়াছে, এবং দ্বিজগণ ও শূদ্রগণ বিভিন্নশ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পূর্ব্বোক্ত পৃথক্ভাবকে দৃঢ়তর করিয়া তুলিয়াছেন। এই উত্তরকাল-প্রসূত সঙ্কীর্ণতা মহা-অনর্থের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণিগত অভিমান, মিলন ও সহানুভূতির মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছে, এবং তাহাই জাতীয় অধঃপতনের একমাত্র কারণ হইয়াছে।

এই জাতিভেদই আমাদের ধর্ম্মের ও সমাজের মূলভিত্তি। এই বর্ণচতুষ্টয়রূপ মহাস্তম্ভচতুষ্টয় সমগ্র আর্য্যসমাজকে ধারণ করিয়া আছে। কালক্রমে ইহা এতই দৃঢ় হইয়াছে, আর্য্যসমাজের অস্থিমজ্জার সহিত এরূপ মিলিত হইয়াছে যে, ইহার অস্তিত্ব ও জাতীয় অস্তিত্ব একপ্রকার অভেদ ও অবিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধেরা এই স্তম্ভচতুষ্টয় ভগ্ন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিল, কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বরঞ্চ পরিণামে তাহাদেরই অন্তর্গত হইয়া অংশীভূত হইয়া পড়িল। গুরুনানক ও তৎপরবর্ত্তী গুরুগণও এবিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। শিখসম্প্রদায়কেও এই আর্য্যসমাজের অংশীভূত হইয়া আপনাদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে হইয়াছে। শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি মহাপুরুষগণও এবিষয়ে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু কাহারই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই, বৈষ্ণব অর্থাৎ জাতবৈষ্ণব এক ভিন্নজাতিরূপে পরিগণিত হইয়া আর্য্যসমাজেরই অংশীভূত হইয়া রহিয়াছে।

ধর্ম্ম শব্দের অর্থ যাহা ধারণ করে। এই বর্ণাশ্রমবিভাগ আর্য্য-সমাজকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছে, এই জন্যই শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত বর্ণাশ্রম-সম্বন্ধে যে সকল বিধিনিষেধ আছে, তাহা পালন করাই ধর্ম্মনামে অভিহিত হইয়াছে। ঈশ্বরে বিশ্বাস-ভক্তি না থাকিলেও কেবল বেদকে অপৌরুষেয়জ্ঞানে অবিচারিতভাবে বেদসম্মত মন্বাদিস্মৃতি-নিবদ্ধ বিধিনিষেধের পালন করিলেই ধর্ম্মপালন করা হয়। আর্য্য-সমাজে ধর্ম্মবিশ্বাসের বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। প্রধানতঃ, পঞ্চ-উপাসক-সম্প্রদায়। প্রত্যেক সম্প্রদায়ে আবার কত বিভাগ আছে, সাধনার বৈচিত্র্য, বিশ্বাসের বৈচিত্র্য এবং বেদ ও স্মৃতির অবিরুদ্ধ আচার-ব্যবহারের বৈচিত্র্যও যথেষ্ট আছে, তথাপি এই বিবিধজাতি, বিবিধ-সম্প্রদায়, বিবিধমতাবলম্বী জনসমূহকে একত্রে এক সনাতন আর্য্য-সমাজে নিবদ্ধ রাখিয়া এই সনাতন বর্ণাশ্রমধর্ম্ম আজ যুগযুগান্তর

বর্ত্তমান রহিয়াছে। সুতরাং ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, ইহার ধারিণী, বা একীকরণী শক্তি অপূর্ব্ব ও প্রকৃতিসিদ্ধ। এরূপ ব্যাপার সমগ্র ভূমণ্ডলে আর কুত্রাপি লক্ষিত হয় না। আমাদের ধর্ম্মে এই বন্ধনী শক্তি না থাকিলে কতকাল পূর্ব্বে আর্য্যসমাজ সমাজান্তরে নিমগ্ন হইয়া যাইত, এবং আর্য্যনাম একেবারে বিলুপ্ত হইত। এই বর্ণাশ্রমধর্ম্ম স্বীয় শক্তিবলে বৌদ্ধ, জৈন, শিখ-প্রভৃতি বিরুদ্ধসম্প্রদায়ের বিরোধ উপশমিত করিয়া আপনার অঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছে এরূপ অপূর্ব্ব শক্তিশালিনী সমাজ-ব্যবস্থা থাকিতেও ভারতবাসী বিশ্লিষ্ট কেন? ভারতে একতা নাই কেন? ভারতবাসী মিলিত হইয়া কার্য্য করিতে পারেনা কেন?

এখন দেখা যাইতেছে যে, সমগ্র আর্য্যসমাজের পরম-মঙ্গল-সাধনার্থই বর্ণাশ্রমস্বরূপ সামাজিক ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরস্পর যাহাতে ভাই ভাই হইয়া কার্য্য করিতে পারেন, তাহারও বিশেষ ব্যবস্থ ছিল। ব্রাহ্মণ একেবারে ভোগবিমুখ হইয়া কেবল সংসারে জীবনযাত্রানির্ব্বাহের উপযোগী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া দিনপাত করিবেন, এবং কায়মনোবাক্যে আপনার ও জগতের মঙ্গলসাধনার্থ জ্ঞানালোচনায়, তত্ত্বনির্ণয়ে ও ভগবৎ-আরাধনায় নিরত থাকিবেন, অপর বর্ণ তাঁহার পেনসন্ বহন করিয়া তাঁহাকে পূর্ব্বোক্ত মঙ্গলকর ব্রতসাধনার্থ যথেষ্ট অবকাশ দিবেন। ব্রাহ্মণ জনসাধারণের শিক্ষক, উপদেষ্টা ও গুরু হইয়া যতদিন সমাজে দেববৎ পূজা ও সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছেন, যতদিন উদরান্নের জন্য ব্যস্ত না হইয়া প্রচুর অবসরে জগতের প্রচুর মঙ্গলসাধনে দৃঢ়ব্রত ছিলেন, ততদিন আর্য্যসমাজ মহাগৌরবে গৌরবান্বিত হইয়াছে। রাশি রাশি শাস্ত্রগ্রন্থ তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ। অসন্তুষ্ট ব্রাহ্মণ স্বপদচ্যুত হইয়া ভ্রষ্ট হয়। কিন্তু কালচক্রে ব্রাহ্মণগণের এ ভাবের ব্যতিক্রম

ঘটিতে লাগিল। রাজামহারাজগণ তাঁহাদিগকে ভূরিদক্ষিণা দান করায়, এবং চতুর্দ্দিকে সমৃদ্ধিশালী ক্ষত্রিয়বৈশ্যগণের ভোগাড়ম্বর তাঁহাদিগকে লুব্ধ করিতে লাগিল, তাঁহারাও ঐহিকের প্রলোভনে আকৃষ্ট হইয়া পরমার্থের মাহাত্ম্য ও মূল্যবত্তা বিস্মৃত হইয়া ভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। এদিকে ক্রমাবনতি-স্রোতে আকৃষ্ট হইয়া ক্ষত্রিয়-বৈশ্যেরাও পরমার্থ হইতে দিন দিন দূরে যাইয়া পড়িতে লাগিলেন, ধনমদমত্ততা, শক্তিমত্ততা প্রভৃতি তাঁহাদিগকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করিয়া তুলিল; তাঁহারা আর পূর্ব্বের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগের সম্মানাদি করা আপনাদের অবশ্যকর্ত্তব্য মনে না করিয়া, অনিচ্ছায়-অশ্রদ্ধায় দানাদি করিতে লাগিলেন। সমাজশীর্ষ ব্রাহ্মণগণের শ্রেষ্ঠত্বের জন্য অন্তরে গোপনে বিদ্বেষ বহন করিতে লাগিলেন ক্রমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ে গুরু-শিষ্য, পিতৃ-পুত্র-সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইয়া আশ্রিত ও প্রতিপালক ভাব আসিয়া উপস্থিত হইল, উভয়েই আপন-আপন সাম্প্রদায়িক গর্ব্বে গর্ব্বিত, সুতরাং রীতিমত বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতে লাগিল। বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্র-বিবাদ ইহার পূর্ব্বসূচনা। ব্রাহ্মণবীর পরশুরাম যে ত্রিসপ্তবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করেন বলিয়া পুরাণে উল্লেখ আছে, সে এই উভয়সম্প্রদায়ের বিবাদের কথা ক্ষত্রিয়কে শাস্তি দিবার জন্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়কর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় তেজ মিলিত করিয়া, ক্ষত্রিয়ের উগ্রতা প্রশমিত করিয়া পুনশ্চ ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপন করেন। ভগবান্ রামাবতারে পরশুরামের তেজ হরণ করার কথা ভগবানকর্ত্তৃক বা ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয়ের উগ্রতা-বিনাশন ও তাঁহাকে স্বপদে স্থাপন করার ব্যাপার মাত্র ইহাও প্রাকৃতিক নিয়মসঙ্গত। ক্ষত্রিয়েরা পুনশ্চ মহাপরাক্রান্ত হইয়া, সমাজের অপর অঙ্গসকল বিদলিত করিতে লাগিলে, ধরা তাঁহাদের ভারে ও অত্যাচারে প্রপীড়িতা হইলেন। তখন চক্রীর চক্রে মহাভারতের মহা-সমরের আবির্ভাব হইল, আবার ক্ষত্রিয়কুল নির্ম্মূল হইল, এমন কি,

আপনার যদুবংশীয় বীরগণের সম্পূর্ণ বিনাশ সাধন করিয়া তবে ভগবান্ ক্ষান্ত হইলেন।

এইরূপে সমাজের মস্তক ও বাহু উভয়ই শক্তিহীন হইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গে কলিরও প্রবেশ হইল। সত্যযুগে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পূর্ণশক্তিতে বিরাজমান ছিল, ত্রেতায় ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের বিবাদের চরম হয়, এবং এই যুগেই বিশ্বামিত্র ও বশিষ্ঠের বিবাদ এবং পরশুরামকর্তৃক নিঃক্ষত্রিয়-করণ, এবং পুনশ্চ পরশুরামের তেজহরণব্যাপারে সমাজ কতকপরিমাণে শক্তিহীন হইয়া পড়ে। দ্বাপরের মহাসমরে ভগবান্ অবতার গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয়বার ক্ষত্রিয়নিধনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া সাম্য স্থাপন করিলেন। কিন্তু এই ব্যাপারের পর সমাজের শক্তিহীনতা ও অঙ্গবিপ্লব্য আর করিল না। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শক্তিহীন হইলে বৈশ্য ও শূদ্র বলবান ও সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল। সমাজে মহা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় সম্মান পাইয়াও আপনাদিগকে অবমানিত মনে করিতে লাগিলেন, সকলেই ক্রমে ক্রমে স্বকর্ম্মভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন, বর্ণাশ্রমধর্ম্মে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইতে লাগিল। পুরাণ ও তন্ত্রে কলির যে যে লক্ষণ দেওয়া আছে, তাহা পূর্ব্বোক্ত ব্যাপারই সপ্রমাণিত করিতেছে।

বর্ণাশ্রমের এই বিশৃঙ্খলাসহ দেশের ও জাতির অধঃপতন আরম্ভ হইল। ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষিগণের ধর্ম্মশাস্ত্র-অনুসারে ব্রাহ্মণ গৃহী হইয়াও ফকির। তাঁহাকে ভোগবিলাস হইতে পৃথক থাকিতে হইবে, কেননা, ভোগবিলাস চিত্তকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করে, পরমার্থ হইতে দূরে লইয়া যায়, বুদ্ধিকে কলুষিত করে, ও মানবকে যার-পর-নাই স্বার্থপর করে। সামাজিকব্যবস্থা-অনুসারে ব্রাহ্মণ শীর্ষস্থান অধিকার করেন, যজন-যাজন, অধ্যয়ন-অধ্যাপন তাঁহার কার্য্য, তিনি জনসাধারণের গুরু, ধর্ম্মোপদেষ্টা ও শিক্ষক। পরমার্থই তাঁহার একমাত্র আলোচ্য বিষয়।

সুতরাং তাঁহার শিক্ষা ও জীবনযাত্রা স্বীয় বৃত্তি-অনুরূপ হওয়া প্রয়োজন। ভিক্ষা বা অযাচিত দান তাঁহার জীবিকা। তাঁহার এতদূর উদাসীন হইবার কথা যে, তিনি, আগামী কল্য কি হইবে, সে বিষয়ে চিন্তা পর্য্যন্ত করিবেন না। যাঁহারা ব্রাহ্মণকে মধ্যস্থ করিয়া বিদ্যা, জ্ঞান ও পরমার্থ-তত্ত্ব লাভ করিবেন, তাঁহাদের উপদেষ্টার যোগক্ষেমের ভার গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ অবসর দিবার কথা,— এই সুব্যবস্থা একযুগমাত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ছিল। আধ্যাত্মিকজগতের ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থার বিপর্য্যয় ঘটিতে লাগিল। ভোগ-বিলাসের প্রাবল্যসহ লোকের মন পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হইতে লাগিল, লোকেরও উপদেষ্টা বা লোক-গুরু ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধার হ্রাস হইতে লাগিল। যোগক্ষেম বহন করা কর্ত্তব্য বা ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া যে বিশ্বাস ছিল, তাহার হ্রাস হইতে লাগিল। ক্রমে বেচারা ব্রাহ্মণ প্রকৃত ভিক্ষুকের স্থান অধিকার করিতে লাগিল। তাহাতে তাহার আত্মগ্লানি ও আত্মাবনতি ঘটিতে লাগিল। এদিকে ব্রাহ্মণেরা অপর বর্ণের নিকট যথোচিত সম্মান না পাইয়া এবং আধ্যাত্মিক ক্রমাবনতির স্রোতে আকৃষ্ট হইয়া ক্রমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হইতে লাগিলেন। চতুষ্পার্শ্বস্থ ভোগবিলাস ও ঐশ্বর্য্য তাঁহাদের চিত্তকে লুব্ধ করিতে লাগিল। তাঁহারা ভিক্ষুক হইয়া, উদাসীন গৃহস্থ হইয়া, জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করা অযোগ্য ও ক্লেশকর মনে করিতে লাগিলেন। সুতরাং অন্যবর্ণের বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক অপর বর্ণের ন্যায় ঐশ্বর্য্যশালী হইয়া ভোগবিলাস-সুখলাভার্থ যত্নবান হইলেন ; অথচ পিতৃপৈতামহ ব্রাহ্মণ্যবৃত্তি একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। এইরূপে একটী ডালখিচুড়ি পাকাইয়া গেল। আর্য্যসমাজের ভিত্তিমূলে দুর্ব্বলতা ও বিশৃঙ্খলতা প্রবেশ করিল, এবং সেই দুর্ব্বলতা শাখাপ্রশাখায় পরিব্যাপ্ত হইয়া সমগ্র সমাজকে দুর্ব্বল, লক্ষ্যভ্রষ্ট, একতাশূন্য ও বিশৃঙ্খল করিয়া তুলিল।

মহাভারতকার, ক্ষত্রিয় ভূপতি পরীক্ষিতকর্তৃক ব্রাহ্মণের অবমাননা কলির প্রবেশের সূচনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণের অবমাননা, পরমার্থে অনাস্থা, এবং তজ্জন্য গুরু, দেবতা, শাস্ত্র প্রভৃতিতে অনাস্থা ও অভক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এবং তাহাই কলির প্রাদুর্ভাব বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সত্যযুগে ধর্ম্ম চতুষ্পাদ, ত্রেতায় ত্রিপাদ, দ্বাপরে দ্বিপাদ্ ও কলিতে একপাদ বলিয়া যে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা এই অধ্যাত্মক্রমাবনতিরই কথা। ইহা প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে; এই কারণেই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি, কতবার আসিয়াছে ও গিয়াছে বলিয়া নানাস্থলে নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক ক্রমাবনতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের বিশৃঙ্খলা ও অবনতি অবশ্যম্ভাবী, এবং এই বিশৃঙ্খলা ও অবনতি চরমসীমায় উপস্থিত হইলেই যুগান্তর উপস্থিত হইবার কথা। কলির শেষে ভগবান্ অবতার গ্রহণ করিয়া ম্লেচ্ছনিবহ নিধন করিবেন বলিয়া যে উক্তি দেখা যায়, তাহাতে যে ম্লেচ্ছশব্দ আছে, তাহার অর্থ হিন্দু ভিন্ন অপর জাতি নহে; তাহার অর্থ উন্মার্গগামী আচারভ্রষ্ট পূর্ণ ম্লেচ্ছ-ভাবাপন্ন হিন্দু বা আর্য্য।

বল্লালসেন বঙ্গীয় আর্য্যসমাজে কৌলিন্য প্রচলন করিয়া সমাজের উচ্চতম দুই স্তরের বিশৃঙ্খলতা দূর করিয়া ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় স্থানীয় কায়স্থদিগের শ্রেষ্ঠত্বসম্পাদনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন। আচার, বিনয়, বিদ্যা-প্রভৃতি যে নবগুণ কুলিনের কুল-লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা যে ব্রাহ্মণে থাকে, তিনি যে প্রকৃতপ্রস্তাবে ব্রাহ্মণনামের সম্পূর্ণ উপযোগী, সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ নাই। কালক্রমে বল্লালের এই মহামঙ্গলকর সামাজিক ব্যবস্থার কি অবনতি ও দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে, তাহা বোধ হয় আর কাহারও জানিতে বাকি নাই। আজ কুলিন আপনাকে যে নবগুণান্বিত মহাপুরুষের সন্তান বলিয়া পরিচয়

দেন, তাঁহার সে নবগুণের একটী গুণের শতাংশের এক অংশও আছে কি? কুলিনের ছেলে বলিলেই যেন পরান্নসেবী, পরাবসথশায়ী, মূর্খ, জড়, কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানশূন্য একটী অপূর্ব্বজীব বলিয়া বোধ হয়। হরুঠাকুর যে বলিয়াছিলেন, 'এরা জাতকুলিনের ছেলে, এদের শাল দিব কি বলে'—সে বাস্তবিক কথা। এই মহাহিতকর কৌলিন্যপ্রথা ক্রমাবনতির যাদুমন্ত্রে এক মহারাক্ষসীর আকার ধারণ করিয়া সমাজের যে কি সমূহ অনিষ্টসাধন করিয়াছে, তাহা বলা যায় না। শত শত অবলা এই রাক্ষসীর নিকট বলীরূপে প্রদত্ত হইয়াছে, বহুবিবাহ ও তৎসঙ্গী কয়েকটী অতিভীষণ মহাপাপ সমাজের উচ্চস্তরে প্রবেশ করিয়া সমাজের হৃদ্‌রক্ত শোষণ করিতে আরম্ভ করে। কালক্রমে লোকে শিক্ষিত হওয়ায়, এই প্রথার অনিষ্টকারিতা অনুভূত হইতেছে, সুতরাং এই কৌলিন্যপ্রথারূপী রাক্ষসী ক্রমে হীনবল হইয়া আসিতেছে।

ব্রাহ্মণকুলের অবনতি হওয়ায় এই হইয়াছে যে, পূর্ব্ব মহির্ষিগণ যে ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রণয়ণ করিয়া গিয়াছেন, কালক্রমে তাহার পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা উপস্থিত হইলেও, তাহার কোন প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন হয় নাই। কারণ, পরবর্ত্তী ব্রাহ্মণকুলে এমন কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, যাঁহারা মন্বাদির ন্যায় জনসাধারণের উপর আধিপত্য করিতে পারেন, অথবা যাঁহাদের প্রণোদিত বিধিনিষেধ অভ্রান্ত বলিয়া পরিচালিত হইতে পারে। সুতরাং সেই পুরাতন বিধিনিষেধ লইয়া সমাজ চলিতেছে। এমন অনেক বিধিনিষেধ আছে, যাহা পালন করা অসম্ভব; সুতরাং সেগুলি আর পালিত হইতেছে না। তাহার অপালনজন্য যে প্রত্যবায়ের ভয় ছিল তাহাও নাই। আবার প্রাচীন বিধিনিষেধের ভাং-চুর করিয়া সময়োচিত নূতন বিধিনিষেধের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্য্যাদা হ্রাস হইয়া আসিয়াছে। এক আইন চিরকাল চলে না। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংঘটিত

সামাজিক পরিবর্ত্তনের অনুযায়িক ধর্ম্মশাস্ত্র অর্থাৎ সামাজিক আইনেরও পরিবর্ত্তন হওয়া প্রয়োজন। তাহা না হওয়াই সমাজে এত বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছে। আর এক কথা, ধর্ম্মশাস্ত্রের অপালন জন্য যে অপরাধ হয়, তাহার শাস্তিবিধান করিবার জন্য রাজার বা শক্তিমান্ পঞ্চায়েতের সম্পূর্ণ অধিকার না থাকিলে, সে সকল বিধিনিষেধ সম্যক পরিচালিত হয় না। আমাদের দেশে না আছে সেরূপ রাজা, না আছে সেরূপ পঞ্চায়েৎ, সুতরাং শাস্ত্রমর্য্যাদা ও শাস্ত্রব্যবসায়ীর সম্মান একপ্রকার বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছে। স্মার্ত্ত রঘুনন্দন বঙ্গীয় হিন্দুসমাজের পরিচালনার্থ নব্যস্মৃতির প্রচলন করিয়া যান। তিনি রাজবলে বলীয়ান হইয়া এবং পূর্ব্ব মহর্ষিগণের বাক্যের দোহাই দিয়াই এই নব্যস্মৃতি প্রচলিত করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি ঊনবিংশস্মৃতি, পুরাণ এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া এই নব্যস্মৃতি প্রণয়ন করেন, ইহাতে তাঁহার আপনার কিছুই ছিল না, তাহা থাকিলে কেহ তাঁহার কথা গ্রাহ্যই করিত না। কারণ মহানির্ব্বাণতন্ত্রে সাক্ষাৎ মহাদেবের মুখ হইতে যে সকল বিধিনিষেধের বা ক্রিয়াকাণ্ডের ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে, সমাজে তাহাই আদৌ স্থান পায় নাই। ব্রাহ্মণের অবনতি হওয়ায় দেশে ধর্ম্মশিক্ষারও সবিশেষ অবনতি হইয়াছে। লোকে যথেচ্ছ আচরণ করিতেছে, কেহ তাহাদের শাসন করিবার নাই। ব্রাহ্মণ সমাজের কর্ত্তা ও নেতা ছিলেন। রাজশক্তি, রাজদণ্ডপ্রয়োগে ব্রাহ্মণের পৃষ্ঠপোষক ছিল। স্বয়ং ভূস্বামীকেও সামাজিক ব্যাপারে ব্রাহ্মণের আজ্ঞাপালন করিতে হইত। ব্রাহ্মণেরও যথেচ্ছ আচরণ করিয়া আপন শক্তির অপব্যবহার করিবার উপায় ছিল না। কোন সামাজিক সমস্যা উপস্থিত হইলে, মহর্ষিগণ এবং তৎপরে পণ্ডিতগণ মিলিত হইয়া তাহার সমাধান করিতেন। এই সমাধানে কাহারও আপন মত প্রচলনের অধিকার বা প্রসার ছিল না। শাস্ত্রের দোহাই না দিলে

কাহার কোন কথা গ্রাহ্য হইত না; এবং শাস্ত্রের সমক্ষে রাজা হইতে দীনদরিদ্র পর্য্যন্ত সকলেই অবনতমস্তক হইতেন। সমাজেও সুশৃঙ্খলা, একতা, বল ও সুখসমৃদ্ধি ছিল। ক্রমে এ ব্যবস্থা লোপ হইয়া আসিতে লাগিল, প্রাকৃতিক নিয়মে গঠিত সামাজিক অবস্থার ব্যত্যয় ঘটিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় জীবনের অবনতি হইতে লাগিল।

মানবের ধর্ম্মজীবন তাহার সাংসারিক জীবনকে নিয়মিত ও গঠিত করে। মুসলমানের বীরপনা তাহার ধর্ম্মজীবনপ্রসূত ও তদ্দ্বারা পরিপুষ্ট। খ্রীষ্টধর্ম্মে পারুষ্য ও কোমলতা মিলিত হওয়ায় তাহাদের জাতীয় জীবনও সেইরূপে গঠিত হইয়াছে। দর্শনের গভীর গবেষণা সনাতনধর্ম্মের মধ্যে যে ভাব বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছে, তাহা উচ্চতমস্তর হইতে নিম্নতমস্তর পর্য্যন্ত আপামর-সাধারণের সাংসারিক জীবনের ভিত্তি হইয়া রহিয়াছে। জগৎ মিথ্যা, জীবন স্বপ্ন, মায়া মরীচিকা, দুই দিনের জন্য সংসারে আসা, সংসারে সকলই অসার, সুতরাং তাহাতে আস্থা কোনক্রমেই বিধেয় নয়। এই ভাব আর্য্যসমাজের হাড়ে-হাড়ে বিঁধিয়া আছে, এই কারণেই আর্য্যগণ সাংসারিক হইয়াও অন্তরে এত অনাস্থাবান্, পরকালই তাহার লক্ষ্য, ইহকালের সুখদুঃখ স্বপ্নের সুখদুঃখের ন্যায় গণনায়ই আইসে না। তাহার পর আর্য্যসমাজে জনসাধারণ ভাগ্যবাদী পুরুষকারের মহত্ত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব থাকিলেও, যোগবাশিষ্ঠাদি গ্রন্থে তাহা প্রকাশিত হইলেও, পুরুষকার শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিতে পারে নাই। এই প্রারব্ধবাদ ও মায়াবাদ জনসাধারণকে নিরুদ্যম ও পরমুখাপেক্ষী করিয়া তুলিয়াছে। ঊনবিংশ সংহিতায় আর্য্যমাত্রেরই জীবনের প্রায় সকল কার্য্যেরই বিধিনিষেধ আছে, কেবল নাই মাতৃভূমির পূজার কথা, মানবের স্বদেশের প্রতি কর্ত্তব্যের কথা। দেশ রাজার, রাজা তাহার যাহা হয় ব্যবস্থা করিবেন,

রাজাজ্ঞা পালন করিবে—অবিচারিতভাবে পালন করিবে। রাজা সাক্ষাৎ বিষ্ণুর অবতার, তাঁহার কার্য্য অন্যায় হইলেও ন্যায় বলিয়া ধরিয়া লইতে হইবে। দেশ তাঁহার, প্রজা তাঁহার কৃপায় ও অনুমতিতে তাহাতে বাস করে। প্রজার কিছুই নাই, সে সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী। এরূপ অবস্থায় দেশে লোকের মনে স্বদেশপ্রীতি স্বদেশানুরাগ কিরূপে থাকা সম্ভব। রাজপুতবীর যে স্বদেশের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, রাজপুতরমণী যে জ্বলন্তকুণ্ডে আত্মাহুতি দিয়াছেন, তাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশানুরাগ বলা যায় না। রাজপুতবীরগণ রাণা প্রতাপেরই হউক বা অন্য রাণারই হউক রাজাজ্ঞা পালনপূর্ব্বক রাজভক্ত প্রজার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত রাজসর্ব্বস্বত্বই এখানেও প্রকাশিত হইয়াছে। সমগ্র ভারতের ইতিহাসে যদি একটী ওয়ালেস্, একটী গ্যারিবল্‌ডা, একটী ওয়াসিংটনের আদর্শ পাওয়া যাইত, তবে বলা যাইতে পারিত যে, প্রকৃতপ্রস্তাবে স্বদেশভক্তি, স্বদেশানুরাগ ছিল বা আছে। সামান্য পশুপক্ষীও আপনার বাসস্থান পরহস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত সমর্পণ করে। কেননা, সে তাহাকে আপনার করিয়া লইয়াছে, তাহাতে তাহার মমতা জন্মিয়াছে। সে পরের ঘরে পরের কৃপায় কালযাপন করে না। আর যাহাদের বিশ্বাস যে, তাহারা পরের ভূমিতে পরের কৃপায় কালযাপন করিতেছে, তাহারা কৃতজ্ঞতার খাতিরে সেই রক্ষকের, সেই পিতার জন্য প্রাণপণ করিবে। তাহার যে স্বদেশের প্রতি মমতা সে বহুদিন সম্পর্ক জন্য, নিজস্ব বলিয়া নহে। ধর্ম্মশাস্ত্রসকলে মানবহৃদয়ে বীরত্ব-উদ্দীপক কোন বিধিনিষেধ নাই, বীরের বীরাচার ক্ষত্রিয়গণের সাম্প্রদায়িক নিয়মে প্রবর্ত্তিত। এ কথা বলা যাইতে পারে যে, অন্যান্য ধর্ম্মসপ্রদায়ের ধর্ম্মগ্রন্থেও যে এরূপ ব্যবস্থা আছে এমন নহে। তাহা হইতে পারে। আমাদের দৈনিক জীবন ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিনিষেধে সম্পূর্ণ নিয়মিত। উত্থান, উপবেশন, শয়ন, ভ্রমণ, অশন, বসন, হাঁচি কাসি প্রভৃতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাপারেরও যখন বিধিনিষেধ আছে, তখন এরূপ গুরুতর ব্যাপারের বিধিনিষেধের অভাব কার্য্যগতিকেই হউক আর অন্য কারণেই হউক, জাতীয় জীবনকে যে অতীব বিকলাঙ্গ করিয়া রাখিয়াছে সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহই নাই।

৮

যে রাজপুত একদিন বীরদর্পে জগৎ প্রকম্পিত করিয়াছে, আজ সে নির্জ্জীব কেন? তাহার স্বদেশে মমতা নাই, সে রাজাজ্ঞাবাহী, তাহাকে পরিচালন করিবার রাজাও নাই, তাই সে নির্জীব। বীরগাথা গীত হইলে রাজপুতের হৃদয়ে যে উল্লাস দেখা দেয়, তাহা বিদ্যুৎবৎ ক্ষণেই বিলীন হয়, তাহা শ্মশানবৈরাগ্যবৎ অসার ও অস্থায়ী। গুরু-গোবিন্দ যে মহামন্ত্রে নিরীহ শিখদিগকে অপূর্ব্ব বীরে পরিণত করিয়াছিলেন, ভারতের মজ্জাগত ক্রমাবনতিরূপ মহারোগ সেই জীবন্ত মহা-মন্ত্রকে বিষহীন সর্পবৎ করিয়া রাখিয়াছে। রণজিতের সঙ্গে সঙ্গে শিখের শিখত্ব গিয়াছে। সে মহারাষ্ট্রীয় বীরদর্প কোথায়, শিবজীর পর তাহা নির্ব্বাপিতপ্রায় হইয়াছিল। তাহার পর কয়েকজন পেশোয়ার চেষ্টায় তাহা পুনরুদ্দীপ্ত হইয়া অজেয় ভারত-গগন উদ্ভাসিত করিয়াছিল। তাঁহাদের পরেই ক্রমাবনতি-স্রোতে ভাসিয়া সবই গিয়াছে; অথচ এই রাজপুত এই শিখ, এই মহারাষ্ট্রীয় যোদ্ধৃগণ ইংরাজবীরকর্ত্তৃক নীত হইয়া পৌরুষপ্রকাশে সভ্যজগৎকে চমকিত করিয়া তুলে। দেশের শাস্ত্রানুমোদিত রাজা-প্রজা-সম্বন্ধ, দেশবাসীর অস্থিমজ্জায় পরাধীনতা মিশাইয়া দিয়াছে পরমুখাপেক্ষিতা ভারতবাসীর জাতীয়-জীবনকে চিরকালই হীনবল করিয়া রাখিয়াছে। তাহা না হইলে ভীষ্ম-দ্রোণ সম মহা মহা রাজপুতরথীদিগকে পরাস্ত করিয়া মুসলমান কি সিংহাসন স্থাপন করিতে পারিত! পরাজিতেরা বিজেতাকে নিশ্চিন্ত হইতে দেয় নাই সত্য, কিন্তু সে চেষ্টা ও যত্ন জনসাধারণের নহে, তাহা রাজার, জনসাধারণ কেবল আজ্ঞাবহমাত্র। সুতরাং ক্রমাবনতিতে রাজপদস্থ বীর নেতার যেমন অভাব হইয়া আসিতে লাগিল, ভারতের বীরগৌরবও অপনীত ও অদৃশ্য হইতে লাগিল,—এ মজ্জাগত রোগের যে কোন ঔষধ আছে, এমন বোধই হয় না।

শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী।

বিহারে হিন্দু-পার্ব্বণ।

আমাদের দেশে বলে "বার মাসে তের পার্ব্বণ"; কিন্তু বিহারে চার তেরং বাহান্ন পার্ব্বণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। বস্তুত এদেশে পরব্ (পার্ব্বণ) নিত্য। আজ গোয়ালিনী দুধ দিল না, কাল আসিয়া বলিল, তাহাদের পরব্ ছিল, সেইজন্য জমীদার দুধ কাড়িয়া লইয়াছে। কাল দাই চাকর কাজ করিতে আসিল না, পরশু আসিয়া বলিল, তাহাদের পরব্ ছিল, সেই জন্য আসিতে পারে নাই। পরশু তেলী (কলু) আসিয়া বলিল, তেল অনেক মহার্ঘ হইয়াছে, কারণ পরব্ সম্মুখে। এইরূপ এ প্রদেশে নিত্য পরবের জ্বালায় বিহারপ্রবাসী বাঙ্গালীগণ ব্যতিব্যস্ত। এমন কি, কোন একটা পরবের ছুতানাতা পাইলে বাজারের ব্যবসায়িগণ পর্য্যন্ত দ্রব্যাদির মূল্য বাড়াইয়া দেয়।

বাঙ্গালাদেশের ব্রত-পার্ব্বণে যেরূপ সাধারণতঃ পুরোহিতব্রাহ্মণ আনাইয়া পূজা বা ব্রত করানর পর, ঠাকুরকে নিবেদিত দ্রব্যাদির দ্বারা ব্রাহ্মণভোজনাদি করান হইলে, উদ্বৃত্ত দ্রব্যাদি বাড়ীর লোকে প্রসাদ পাইয়া থাকে; কিন্তু বিহারে ইহার বিপরীত—অধিকাংশ পরবেই স্ত্রীলোকেরা স্বহস্তে পুরী, মিঠাই, ঠেকুয়া, পূয়া, পীঠা প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া, স্বীয় পতিপুত্রাদির সহিত আহার করিয়া থাকে। এ বিষয়ে বিহারী রমণীগণ 'আত্মতুষ্টে জগৎতুষ্ট' এই নীতি অবলম্বন করিয়া থাকে।

এদেশের পার্ব্বণসমূহে এরূপ স্বকীয় আহারের সুব্যবস্থার প্রধান কারণ এই মনে হয় যে, এ দেশের জনসাধারণ নিতান্ত দরিদ্র, সাধারণতঃ ইহাদের ভাল আহারের বন্দোবস্ত নাই—দুইবেলা পাকশাকের রীতি অতি অল্পলোকের বাড়ীতেই দৃষ্ট হয়। অধিকাংশ

স্থলে একবেলা, বিশেষতঃ দিবাভাগে, ছাতু, ভুট্টা, ভাজা-ভূজা, ফল-মূল, খাইয়া রাত্রিতে ভাত বা রুটী খাইবার ব্যবস্থা করা হয়। সুতরাং পর্ব্বোপলক্ষে একটু ভাল করিয়া আহারাদি করার প্রথা স্বভাবতঃ পদ্ধতি বা পরবরূপে পর্য্যবসিত হইয়া থাকিবে।

এই প্রস্তাবে আমরা দুর্গাপূজা, কালীপূজা, রামলীলা, হিন্দোল (ঝুলন) প্রভৃতি পূজাপদ্ধতি বর্ণনা না করিয়া, 'ভারতী'তে পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রবন্ধে বর্ণিত 'ছট্-পরব' ও 'চক-চন্দার' ন্যায় কেবল পরবগুলিরই বর্ণনা করিব। বলা বাহুল্য, এদেশের অসংখ্য পরবগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা বা উল্লেখ করা অসম্ভব, সুতরাং আমরা বাছিয়া বাছিয়া কয়েকটী প্রধান পরব মাত্র ইহাতে সংক্ষেপে সন্নিবেশিত করিলাম।

আমাদের রাম-অনুগ্রহ-নারায়ণের জননী সরস্বতীর সংসারের প্রতি সম্প্রতি কমলার কৃপাদৃষ্টি হওয়াতে, তিনি অধিকাংশ ব্রত বা পরবই সম্পন্ন করিয়া থাকেন। তিনি বৈশাখে (১) বিসুয়া; আষাঢ়ে (২) লখ্-পাঁচে; শ্রাবণে (৩) কৃষ্ণাষ্টমী, (৪) চক-চন্দা, (৫) তীজ্, (৬) শাওনী পূর্ণিমা; ভাদোতে (ভাদ্রে) (৭) অনন্তা; আশ্বিনে (৮) জিতিয়া; কার্ত্তিকে (৯) ছট্‌পরব্, (১০) সুখরাতি, (১১) জোঠান্; মাঘে (১২ তিল্‌সঙ্ক্রান্ত, (১৩) বসন্ত্ পঞ্চমী; ফাল্গুনে (১৪) ফাগুয়া; চতে (চৈত্রে) (১৫) রামনবমী, (১৬) চৈতী-ছট্ ইত্যাদির প্রায় কোনটিই বাদ দেন না।

বৈশাখে—

(১) বিসুয়া ও সিরুয়া।

'বিসুয়া'নামক পরবে অপেক্ষাকৃত ধনবান বিহারীরা ছাতু, চিনি, ঘৃত, দুগ্ধ ইত্যাদি খাইয়া থাকে। গরীব লোকেরা গুড় দিয়া ছাতু ও আম্রের 'টিকোলা' বা 'গোটী' খাইয়া থাকে।

পরদিন 'সিরুয়া'নামক পরব সম্পন্ন করা হয়। ইহাতে 'হোলীর' (দোলপূর্ণিমার) ন্যায় পরস্পরের গাত্রে জল-কাদা প্রদান করে, এবং রাস্তার পথিকদিগের গাত্রেও দিয়া থাকে। পরে স্নানাদি করিয়া দেবোদ্দেশে উৎসর্গীকৃত 'পীঠা' সকলে মিলিয়া আহার করিয়া থাকে।

আষাঢ়ে—

(২) লথ্‌পাঁচে।

আমাদের দেশে দশহরার দিন, সর্পভয় নিবারণজন্য মনসাপূজা করিয়া অভুক্ত অবস্থায় তিক্তদ্রব্য (উচ্ছে প্রভৃতি) আস্বাদন করিবার প্রথা আছে। কলিকাতার অধিকাংশ বিদেশী অধিবাসী যাহারা মেসের বাসা প্রভৃতিতে অবস্থান করে, তাহাদের তিক্তদ্রব্যাদি আস্বাদন করিবার সুবিধা হয় না।* তাহারা গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিবার সময়, পথে কোন ঠাকুরবাড়ীতে একটী পয়সা দিয়া প্রণাম করিলে পূজারীব্রাহ্মণ তাম্রকুণ্ড হইতে চরণামৃত এবং একখানা থালায় রাশীকৃত কাঁচা উচ্ছে হইতে এক খণ্ড লইয়া তাহার হস্তে দিয়া থাকেন, সে ব্যক্তি তাহা দন্তে কর্ত্তন করিয়া তিক্তদ্রব্য আস্বাদন করিয়া থাকে।

এ দেশে আষাঢ় মাসে 'লথ্‌-পাঁচে' নামক যে পার্ব্বণ অধিষ্ঠিত হয় তাহা বাঙ্গলাদেশের দশহরার মনসাপূজার অনুরূপ। ইহার অপর নাম 'নাগ-পঞ্চমী'। ঐ দিন বিহারীহিন্দুরা সর্পের নামে দুগ্ধ ও 'লাবা' (খৈ) দিয়া পূজা দিয়া থাকে। ইহারা তিক্তদ্রব্যজন্য নিমপত্র ব্যবহার করে। অভুক্ত অবস্থায় স্ত্রীলোকেরা পতিপুত্রকন্যা লইয়া নিমপত্র-আস্বাদন ও দধিভোজন করিয়া, নাগকে উৎসর্গীকৃত পুরী, ক্ষীর এবং আম্র, কাঁঠাল প্রভৃতি সাময়িক ফল, প্রসাদ পাইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন স্ত্রীলোকেরা ঐ দিন ঘরদ্বারে খৈ ছড়াইয়া দেয়। আমাদের দেশে দশহরার দিন গঙ্গাপূজা বা মনসাপূজা পুরোহিত-

ব্রাহ্মণের সাহায্য ভিন্ন অনুষ্ঠিত হয় না, কিন্তু বিহারের নাগ-পঞ্চমীতে বাড়ীর প্রবীণা স্ত্রীলোকেরাই স্বয়ং পূজাদি সম্পন্ন করেন।

শ্রাবণে—

(৩) কৃষ্ণাষ্টমী।

কৃষ্ণাষ্টমীর অপর নাম জন্মাষ্টমী। শ্রাবণ মাসের ঐ দিনে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়া থাকে। ঐ দিন হিন্দুদিগের বড় আনন্দের দিন। ঐ দিন হিন্দুরা শসা, কলা, পেয়ারা প্রভৃতি ফল আনিয়া দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া থাকে।

জন্মাষ্টমীর দিন শ্রীকৃষ্ণের জন্মসম্বন্ধে একটি বিচিত্র প্রথা বিহারে ও পশ্চিমোত্তর প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। গৃহাভ্যন্তরে একটি 'আসন বানাইয়া' (যাহাকে 'সামান' কহে) অর্থাৎ একটি নাতিউচ্চ ক্ষুদ্র মৃৎবেদিকা প্রস্তুত করিয়া, ঐ সামানের উপর একটি 'ক্ষীরা' (শসা) রাখিয়া দেওয়া হয়। আর যখন ঐ ক্ষীরা ফাটিয়া যায়, লোকে বলে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইয়াছে। তখন একটি শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি আনিয়া হিন্দোলায় ঝুলাইয়া থাকে। তাহার সম্মুখে গীতবাদ্য-ভজনাদি করিয়া থাকে। ধনবান্ লোকেরা নর্ত্তকী আনাইয়া, বাই-নাচ প্রভৃতি দিয়া থাকে। আর ঐ দিন অনেকে শ্রীকৃষ্ণাষ্টমীর বরৎ (ব্রত) করিয়া থাকে। সমস্তদিন উপবাস করিয়া, শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইলে পূর্ব্বোক্ত শসা দিয়া পারণ বা ফলাহার করে। আর যশোদামায়ী যেরূপ সূতিকাগৃহে ঝাল-মসলা খাইয়াছিলেন, তাহার নিদর্শনস্বরূপ, সেইরূপ ঝাল-মসলা প্রস্তুত করিয়া সকলে প্রসাদ পাইয়া থাকে। প্রথমে আতপচাউল ও ধনিয়া ঘৃতে ভাজিয়া, পরে চিনি ও নানাপ্রকার মসলাসংযোগে উক্ত ঝাল-মসলা প্রস্তুত করা হয়। আমরা প্রসাদ পাইয়া দেখিয়াছি, উহা খাইতে বেশ সুস্বাদু।

(৪) চক্-চন্দা।

চক্-চন্দা আমাদের দেশের নষ্টচন্দ্রের অনুরূপ। যে নষ্টচন্দ্রের প্রতিবিম্ব গোষ্টবিহারী শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র গোষ্পদে অবলোকন করিয়া অনর্থক অপকলঙ্কভাগী হইয়াছিলেন,—যাহা হইতে 'মণিহরণের' কথার উৎপত্তি হইয়াছে। এবং যে নষ্টচন্দ্রের প্রতি অবলোকন করিয়া কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপিকা, কৃষ্ণবিরহে কাতরা হইয়া বলিয়াছিলেন, "হে নষ্টচন্দ্র! আমার ত শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত মিলন হইল না। তুমি আমার এই অপকলঙ্ক রটিয়া দেও যে, আমার সহিত তাঁহার একবার মিলন হইয়াছিল, তাহাতেও আমার সুখ!" ঐ দিন এক্ষণে কতকগুলি প্রতিবাসিপীড়নকারী অনাবিষ্ট বালক ও যুবকের পরগৃহে ইষ্টকাদিপ্রক্ষেপের সুবিধার দিনরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যাহাহউক, ইহার বিষয় 'ছট-পরব' ও 'চক-চন্দা' নামক প্রবন্ধে 'ভারতী'তে পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া এখানে লিখিত হইল না।

(৫) তীজ্।

'তীজ্'পরবের অনুরূপ কোন পার্ব্বণ বা ব্রত বঙ্গদেশে পরিলক্ষিত হয় না। কিন্তু ইহা বিহারী রমণীগণের একটি বিশিষ্ট পরব। 'ছট-পরব' স্ত্রীপুরুষ উভয়েই করিবার অধিকারী, কিন্তু 'তীজ' কেবল স্ত্রীলোকেরাই করিয়া থাকেন। বিহারী রমণীরা যতদিন কুমারী অবস্থায় থাকেন, ততদিন তাঁহাদিগকে 'তীজ' করিতে হয় না; কিন্তু বিবাহের পর হইতে প্রত্যেক রমণীই 'তীজ' করিতে বাধ্য। তবে যদি কোন অনিবার্য্য দৈবীকারণে 'তীজ ছুট্ যায়' অর্থাৎ ব্রত করিতে বাধা পড়ে, তাহা হইলে তিনি নিষ্কৃতি পাইলেন, তাঁহাকে আর তীজ করিতে হয় না।

বিবাহের পর, ও 'পাওনা' (প্রথম-শশুর-ঘর-বসত) হইবার পূর্ব্বে,

এই ব্রত আরম্ভ করিতে হয়। ইহাতে 'গৌরা' (গৌরী) অর্থাৎ পার্ব্বতীর এবং শিবজীর মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া একখানি কাষ্ঠনির্ম্মিত পীঁড়ির উপর রাখিয়া 'পুয়া' (মাল্‌পো) প্রস্তুত করিয়া হরপার্ব্বতীর উদ্দেশে নিবেদন করা হয়। আর ব্রতধারিণীর সহোদর ঐ পীঁড়িশুদ্ধ ঠাকুর লইয়া, দিবসে চারিবার, এবং রাত্রিতে চারিবার, ঐ স্ত্রীলোকের মুখ ও মস্তকের নিকট আন্দোলন করিয়া থাকে। তখন বাড়ীর অন্যান্য স্ত্রীলোকেরা পূর্ণ-কোরসে গীত গাইতে থাকে। 'তীজ'সম্বন্ধে বিহারী রমণীদিগের মধ্যে অনেকানেক গীত প্রচলিত আছে। ইহার রচনাপ্রণালী ও সুর-লয়-তান অদ্ভুতপ্রকারের—বাঙ্গালী পাঠকদিগের পক্ষে তাহা নিতান্ত নীরস বোধ হইবে অনুমানে উদ্ধৃত হইল না।

তৎপরদিন ঐ দেবদেবীর মূর্ত্তি কোন 'তালাব' (দীর্ঘিকা), পোখ্‌রা' (পুকুর) বা 'আহারা'তে (বিলে) ভাসাইয়া দেওয়া হয়।

বিশিষ্ট ধনবান্ ব্যক্তিদিগের গৃহে তীজব্রৎ সম্পাদনজন্য স্বর্ণ বা রৌপ্যনির্ম্মিত শিব-গৌরীর মূর্ত্তি নির্ম্মিত থাকে। বলা বাহুল্য, তাহা ভাসাইয়া না দিয়া পরবৎসরের ব্যবহারজন্য তুলিয়া রাখা হয়।

(৬) শাওনী পূর্ণমাসী।

শাওনী পূর্ণমাসীতে (শ্রাবণী পূর্ণিমাতে) বিহারী নরনারীগণ গঙ্গা-স্নান করিয়া থাকে। যেহেতু পুণ্যসলিলা ভাগীরথী বিহারভূমের বক্ষঃস্থল ভেদ করিয়া প্রবাহিত হইতেছেন, তাহার অধিকাংশ বিহারবাসী গঙ্গার উভয়কূলে আসিয়া স্নান করিবার সুবিধা পাইয়া থাকে। বক্সারের রামরেখাঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিয়া-জেলার কারাগোলাঘাট পর্য্যন্ত ভাগীরথীর উভয়কূলে যত ঘাট-আঘাট প্রভৃতি আছে, তাহা শ্বেত-রক্ত-নীল-পীত প্রভৃতি নানাবর্ণের বিচিত্র বসনভূষণ পরিধান করিয়া লক্ষ লক্ষ স্নাতকবৃন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়।

পূর্ণিমার দুই তিন দিন পূর্ব্ব হইতে মুঙ্গেরের কষ্টহারিণীর ঘাট, সীতাকুণ্ড, সুলতানগঞ্জ-ষ্টেশনের নিকট গঙ্গাগর্ভস্থ ক্ষুদ্রশৈলখণ্ডে স্থাপিত গৌরীনাথমহাদেবের মন্দিরের নিকটস্থ ঘাট, বক্‌সারের রামরেখাঘাট-(যেখানে শ্রীভগবান রামচন্দ্র অহল্যাপাষাণী উদ্ধার ও 'রামচরিত্র'নামক বনে তাড়কা বধ করিয়া গঙ্গাপার হইয়া জনকপুরীতে গিয়া বিশাল হরধনু ভঙ্গ করিয়া সীতাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন)-প্রভৃতি বিহারের প্রসিদ্ধ তীর্থঘাটে বহুনরনারী-সমাগম হইয়া থাকে। বিহারী রমণীরা বিবিধবর্ণের বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিতা হইয়া পুত্রকন্যাদিসমভিব্যাহারে, কেহ গো-শকটে, কেহ এক্কা গাড়িতে, এবং অধিকাংশ পদব্রজে গঙ্গাস্নানে গিয়া থাকে। তখন গঙ্গাতীরাভিমুখী রাজপথগুলিতে জনস্রোত, জলস্রোতের ন্যায় ক্রমাগত চলিতে থাকে। স্থানে স্থানে গঙ্গার ঘাটে এরূপ জনসঙ্ঘ হয় যে, পুলিসের বিশেষ সাবধানতাসত্ত্বেও পদচাপনে লোক মারা যাওয়ার সংবাদ পাওয়া গিয়া থাকে।

শাওনী-পূর্ণমাসীতে গঙ্গাস্নান ভিন্ন অন্য কোন ক্রিয়াকলাপ দেখিতে পাওয়া যায় না ; কেবল গরীব ব্রাহ্মণেরা লোকের হস্তে কঙ্কণ বাঁধিয়া দিয়া, যাহার যেমন অবস্থা, তাহার নিকট হইতে দুই চারি আনা 'বক্‌শিস্' (পুরস্কার) আদায় করিয়া থাকেন।

ভাদ্রে—

(৭) অনন্ত কা বরৎ।

'ভাদো মাহিনা'তে 'অনন্তভগবানের' নামে এই ব্রত করা হয়। যাঁহারা অনন্ত পাইয়া থাকেন, তাঁহারা এই ব্রত করিতে বিশেষরূপে বাধ্য। আমাদের দেশেও অনন্তব্রত আছে, কিন্তু এদেশে অনন্ত-প্রাপ্তিসম্বন্ধে এক নূতন নিয়ম পরিলক্ষিত হয়। যদি কেহ ঘটনাক্রমে

অনন্তের 'ডোরা' (সূত্র) কুড়াইয়া পান, তাঁহাকে এ ব্রত করিতেই হইবে। কেহ কেহ করিতে না পারিলে, কুড়ান অনন্ত গঙ্গাজলে ভাসাইয়া দিয়া নিষ্কৃতি পায়। কিন্তু দ্বিতীয়বার কুড়াইয়া পাইলে আর তাহার নিষ্কৃতি নাই ; তাহাকে এ ব্রত নিশ্চয় করিতেই হইবে। যাঁহারা অনন্ত পাইয়া থাকেন, তাঁহারা দক্ষিণহস্তের উপরিভাগে বাঁধিয়া বরং করিয়া থাকেন। শশা, কলা প্রভৃতি ফল আনিয়া অনন্ত-ভগবানের পূজার জন্য নৈবেদ্য প্রস্তুত করা হয়। এই ব্রত সম্পন্ন করিতে ব্রাহ্মণের সাহায্য লইতে হয়। যাহারা ধনবান গৃহস্থ তাহারা পুরোহিত আনাইয়া গৃহে ব্রত করাইয়া থাকে। কিন্তু গরীব-দুঃখীরা এই কার্য্যের জন্য বাজারে পথিপার্শ্বে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণসকলের দ্বারা কার্য্য করাইয়া লয়। পথিপার্শ্বে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণের নিকট অনেকগুলি লোক একত্রিত হইলে, তিনি পূজার উপকরণাদি লইয়া অনন্ত ভগবানের 'পোথী' (পুঁথি) হইতে অনন্তব্রতের কথা শুনাইয়া, অনন্তের ডোরা হাতে বাঁধিয়া দেন।

বাঙ্গালাদেশে স্ত্রীলোকেরাই অনন্তব্রত করিয়া থাকেন। এতৎ সম্বন্ধে তথায় কৌতূহলোদ্দীপক কয়েকটি কথা প্রচলিত আছে। 'ভারতী'র পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনার্থ তাহার একটি এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল।

কোন বিহারদেশীয় ভোজপুরিয়া 'সাধু' ভিক্ষাকার্য্যব্যাপদেশে ঘুরিতে ঘুরিতে বাঙ্গালাদেশের কোন পল্লীগ্রামের এক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ-বাড়ীতে অনন্তব্রতের দিন অতিথি হয়। বাড়ীর গৃহিণী অতিথি সমাগত দেখিয়া, তাহাকে চণ্ডীমণ্ডপে বসিতে বলিয়া বিজ্ঞাপিত করেন যে, আজ তাঁহাদের অনন্তব্রত—পুরোহিতব্রাহ্মণ আসিয়া পূজা ও ব্রত-কথাদি শেষ হইতে বিস্তর বিলম্ব হইবার সম্ভাবনা। সুতরং সাধু যদি ইচ্ছা করেন, গৃহস্থেরা ব্রাহ্মণ, তাঁহাদের হস্তের পাক করা পায়স

পীষ্টকাদি ঠাকুরের প্রসাদ ভোজন করিতে পারেন ; নতুবা তিনি স্বপাকে খাইতে ইচ্ছা করিলে, বাড়ী হইতে রন্ধনের যোগাড় করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

অনন্ত-ব্রতের প্রসাদী আহারীয় দ্রব্যের সুব্যবস্থার কথা শুনিয়া সুচতুর সাধু বলিল, "মায়ী! হাম্ ভি ব্রাহ্মণ হায়। হামারা ভি 'অনন্তা' হায়।" সুতরাং গৃহস্থদের অনন্তব্রত শেষ হইলে, পায়স, পীষ্টক, তালের বড়া ইত্যাদির দ্বারা অতিথি বেশ পরিতোষপূর্ব্বক আহার করিয়া নিতান্ত হৃষ্টান্তঃকরণে স্বীয় গন্তব্যপথে চলিয়া যায়!

উক্ত ঘটনার কয়েক মাস পরে, সেই সাধু ফিরিবার সময় পুনরায় সেই গৃহস্থের বাড়ীতে অতিথি হইল; এবং প্রথমেই গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিল, "মায়ী! আজ ক্যা হায়?"

গৃহিণী উত্তর করিলেন "বাবা! আজ আমাদের ভীম একাদশী।" সাধু অনন্ত-ব্রতের পায়স ও তালের বড়ার কথা স্মরণ করিয়া বলিল, "মায়ী! হামারা ভি 'ভীমা' হায়!"

সুতরাং গৃহিণী অতিথির আহারাদির বন্দোবস্ত না করিয়া চুপ্‌চাপ্ রহিলেন। বেলা ২টা, ৩টা, ৪টা বাজিয়া গেল; কিন্তু বাড়ীতে পায়স-পীষ্টকাদির কোন উদ্যোগ না দেখিয়া, অতিথি সন্দিগ্ধমনে গৃহিণীকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "'ভীমা'কা ক্যা হোতা হায় মাইজী?"

গৃহিণী উত্তর করিলেন, "বাবাজী! ভৈমী একাদশীতে কিছু আহার করিতে নাই—দিবারাত্রি নির্জ্জলা উপবাস থাকিয়া, পরদিন প্রাতে স্নানাদির পর, দ্বাদশীর পারণা করিতে হয়। তখন জল খাইতে পাইবে তুমি একাদশী করিয়া থাক, ইহা কি জান না!"

সাধু প্রথমে "হামারা ভি ভীমা হায়" বলিয়া গোল করিয়া ফেলিয়াছে, এখন আর উপায়ান্তর না দেখিয়া, নিতান্ত ক্ষুণ্ণমনে নিরাশ-

ব্যঞ্জক স্বরে বলিল, "মাঈ! আপ্‌লোককা যো 'অনন্তা' হায়, ইয়ে বড়া আচ্ছা হায়; লেকেন্‌ ভীমা বড়া টিম্‌টীমা' হায়!"

আশ্বিনে—

(৮) দশহরা।

বঙ্গদেশে দুর্গোৎসবের সময় এদেশে দশহরা হইয়া থাকে। বাঙ্গালিগণের আগমনহেতু এদেশে দুর্গাপূজাও অনেক দিন হইতে আরম্ভ হইয়াছে। নতুবা "রামলীলা"ই দুর্গোৎসবের সময়ের প্রধান পরব। দুর্গাপূজার সময় এদেশে ডোম, মেহথর প্রভৃতি নিকৃষ্ট জাতিরা কালীপূজা করিয়া থাকে। সুতরাং দুর্গাঠাকুর-বিসর্জ্জনের দিন, দুই-চারিখানি দুর্গা-প্রতিমা অন্তর একএকখানি কালীমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আর দুর্গাপূজার সময়ে এদেশে 'জিতিয়া'নামে এক প্রসিদ্ধ পার্ব্বণ আছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

(৯) জিতিয়া।

জিতিয়াতে বিহারী হিন্দুরা শ্রীদুর্গার নামে বরৎ করিয়া থাকে। 'ছট-পরবের' ন্যায় ইহাতেও পূর্ব্বদিনে 'সঞ্জৎ' করিতে হয়। সপ্তমী-পূজার দিন 'সঞ্জৎ'—ঐদিন লবণ খাইতে নাই। আতপতণ্ডুলের অন্ন, দুগ্ধ, চিনি ইত্যাদি খাইতে হয়।

ইহাতে 'কলসী-আস্থাপন' (ঘট-স্থাপনা) করিয়া পূজা করিতে হয়। গৃহের একটি নির্দ্দিষ্ট স্থান উত্তমরূপ খুঁড়িয়া পরিষ্কার করিয়া, তাহাতে যব ছড়াইয়া দিয়া, তদুপরি ঘটস্থাপনা করা হয়। ঐ যবের গাছ বাহির হইলে, তাহা লইয়া বিজয়াদশমীর দিন গরীব ব্রাহ্মণেরা লোকের কাণের উপর ঝুলাইয়া দিয়া, আশীর্ব্বাদ করিয়া, শ্রাবণী-পূর্ণিমাতে কঙ্কণবন্ধনের ন্যায় দুই চারি আনা পুরস্কার আদায় করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে যাহাদের বাড়ীতে দুর্গাপূজা হয়, তাহাদের কাহারও প্রতিপদাদিকল্প বা ষষ্ঠ্যাদিকল্প অনুযায়ী উক্ত তিথিদ্বয় হইতে যেমন বাড়ীতে চণ্ডীপাঠ করান হয়; বিহারে 'কলসী-স্থাপনের দিন হইতে বাড়ীতে 'দুর্গা-পাঠ' করান হইয়া থাকে। দুর্গাপাঠ চণ্ডীপাঠের নামান্তরমাত্র।

জিতিয়াপরব অষ্টমীর দিন হইয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশে মহাষ্টমীর দিন সন্ধিপূজার সময় যেরূপ পাঁঠা, আক, কুমড়া ইত্যাদি বলিদান দেওয়ার রীতি আছে, জিতিয়াপরবে ঐ সন্ধিক্ষণে 'ভূয়া' (কুমড়া) বলিদান দেওয়া হয়। কিন্তু ঐ কুমড়া এক অতি বিচিত্রপ্রণালীতে বলিদান দেওয়া হইয়া থাকে। উহাতে চারিটা সরল কাষ্ঠখণ্ড গুঁজিয়া পাঁঠার ন্যায় চারিটা পা তৈয়ারি করা হইলে, তখন ছাগবলিদানের পরিবর্ত্তে উহা বলিদান দেওয়া হয়। উহা বলিদান করিতে কামারের সাহায্যগ্রহণ করা হয় না, ব্রতধারিণীর কোন আত্মীয় বলিদান-কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে। তখন নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি দিয়া শ্রীদুর্গার নামে পূজা দেওয়া হয়, যথা—ঠেকুয়া, সাঁচা, লাড্ডু প্রভৃতি মিষ্টান্ন এবং বাদাম, কিশ্‌মিশ্‌, ছোহারা, কেতারী (ইক্ষু) প্রভৃতি ফলমূল।

বাঙ্গালী হিন্দুদিগের কোন মাঙ্গলিক কার্য্যে যেরূপ গৃহভিত্তিতে বসুধারা দিবার রীতি আছে, এদেশে জিতিয়াতে কলসাস্থাপনের সময় গৃহের দেওয়ালের কোণগুলিতে চূণ ও কালি দিয়া দাগ দেওয়া হইয়া থাকে।

কার্ত্তিকে—

(১০) ছট-পরব্।

ছট-পরব বিহারী হিন্দুদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরব্। এতৎসম্বন্ধে ইতঃপূর্ব্বে 'ভারতী'তে বিস্তৃত বর্ণনা করা হইয়াছে—সুতরাং পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীরাজেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিরী-ফরীদ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

ফরীদের কুটীর-সম্মুখে মুস্তাফা দাঁড়াইয়া আছেন। হস্তে একখানি চিত্র। তিনি কুটীরদ্বার পশ্চাতে রাখিয়া সম্মুখের বনপথের পানে চাহিয়াছিলেন। তখন গভীরা রজনী—উন্মুক্ত আকাশে তারকারাজি ঝক্‌ঝক্ করিতেছিল। ধীরকল্লোলে নির্ঝরিণী তরঙ্গ-পতিত তারকার গান নাচাইয়া-নাচাইয়া বহন করিয়া লইয়া যাইতেছিল।

মুস্তাফা। কই, কোথা ?—ফরীদ—ফরীদ !—কই, কোথা
ফরীদ কুটীরে ? মিথ্যায় ঘেরেছে তারে !
ঈশ্বর, সত্যের মূর্ত্তি—নিত্যপ্রেমময় !
আপনার ছায়া মর্ত্ত্যে করিয়া প্রেরণ
কেমনে হে মিথ্যাজালে ঘেরে দিলে তারে !
এখনো বুঝিতে নারি, কি পার্থক্য প্রেমে-
ভগবানে। তবে কেন, প্রেমময় প্রভু,
প্রেমের সে চারু অঙ্গে দিয়েছ মিথ্যার
আবরণ ! ছলনা-রচিত গৃহদ্বার,
ছলনার বিশাল প্রাকার—এ সৌধের
অভ্যন্তরে তব অন্বেষণে, কেন প্রভু !
সর্ব্বাঙ্গে জড়ায়ে যায় ছলনার লতা ! (কুটীরাভিমুখী হইয়া)
ফরীদ—ফরীদ ! আর কোথা সে ফরীদ !
হে ভগ্নকুটীর ! তুই প্রেমের নিবাস !
ঐশ্বর্য্যগৌরবে তোর অট্টালিকা মানে

পরাভব—তাই কি ধরেছ মুখে দীন
উপহাস ! আমারেও ছলিতে সাহস
তোর ! বাল্য হ'তে যে সৌন্দর্য্য সন্তর্পণে
করিয়া গঠন—করিয়া জীবন পূর্ণ
দিয়াছিনু তোরে উপহার—সে ফরীদ-
ধনে ধনী—এত স্পর্দ্ধা ! আমারে কর্‌লো
উপহাস ! প্রাণহীন মৃত্তিকার দেহ—
দেহীশূন্য—আমার ফরীদশূন্য হয়া—
মৃতমুখে হাসি তোর পশিল কেমনে ?
অভাগ্য প্রেমিক পুত্র প্রাণ কি সঁপিয়া
গেছে তোরে ? সত্য বল্, নহে এই
চিত্রের প্রহারে ভূমিসাৎ করে দিব।
মরেছে ফরীদ। আর কোথা খুঁজি তারে !
মরেছে ফরীদ। নিজেই না জানে, কোথা
আছে। নিজের অস্তিত্বজ্ঞান সাধ ক'রে
ঢেলে দেছে রাক্ষসার পায়। জীবনের
পূর্ণস্রোতে, যৌবনতরঙ্গমাঝে পড়ে
কোন্ রাজ্যে চলে গেছে ফরীদ আমার !
মিছে তার অন্বেষণ—মিছে তারে হৃদে
আবাহন।

(কুটীর মধ্য হইতে ফরীদের প্রবেশ।)

ফরীদ। এই-যে এই-যে—এতক্ষণ
কোথা ছিলে, গুরু ? করেছি যে কত স্থানে
তব অন্বেষণ, সে সুদীর্ঘ শতপথ
চিন্তায় যদি হে চলি, ক্লান্তি আসে মনে।

মুস্তাফা। কুটীর হইতে বাহিরিলি—এ বৃদ্ধের
আকুল আহ্বানে ভুলে কাণ নাহি দিলি!
রে অভাগ্য! এরি মধ্যে এত মিথ্যা শিখে
নিলি—আমারে খুঁজিলি!

করীদ। মিথ্যা নহে
গুরু। খুঁজেছি তোমার ঘরে—খুঁজিয়াছি
আকুল প্রান্তরে—যাহারে দেখেছি চক্ষে
সুধায়েছি তারে—তটিনীরে করিয়াছি
আবেদন—কিন্তু কেহ না বলিল, কোথা
ওস্তাদ আমার। নিশীথের নীরবতা
ভেঙে, উচ্চরবে করিনু চীৎকার—ছুটে
গেল প্রতিধ্বনি, গ্রাম হ'তে গ্রামান্তরে।
পড়িল তটিনীগর্ভে,—তরঙ্গে-তরঙ্গে
নাচিয়া নাচিয়া কথা চলেছে সাগরে—
এমনত দেখি নাই! দরিদ্র বালক
আমি। তব প্রেমে আজন্ম লালিত।—শুধু
কথা, শুধু সে তোমার প্রিয়নাম, গুরু,
তা নিয়ে রহস্য করে নিষ্ঠুরা প্রকৃতি!
চীৎকারে সুনিদ্রা ভাঙে শুনি চিরদিন।
কিন্তু হায়, কি বলিব গুরু—মুক্তকণ্ঠে
উচ্চারিত তোমার সে মধুময় নাম
সুষুপ্তি ঢালিল ঘরে-ঘরে!—কোথা ছিলে?

মুস্তাফা। মধুভাষী হতভাগা! কথায় ভুলায়ে
দিলি। তুই মোরে খুঁজে এলি!

ফরীদ। খুঁজে এনু।
মনে হ'ল তুমি যেন কুপিত আমায়।
ভাবনার যাতনায় অস্থির হইয়া,
তোমার প্রসাদ আকিঞ্চনে, অন্বেষণ
করিনু তোমারে। সত্যই কি গুরু, তুমি
রুষ্ট মোর পরে?

মুস্তাফা। যদিও ছিলাম ভাল—
এই বারে রুষ্ট—যথার্থই রুষ্ট আমি।
বৃদ্ধকালে তুই দেখি পাগল করিলি
মোরে। এ দুর্ব্বল দেহে, দাঁড়ায়ে দাঁড়ায়ে
অর্দ্ধমৃত আমি তোর দ্বারে—উচ্চরবে
স্বরভঙ্গ হইল আমার! রে নিষ্ঠুর!
রে ছলনাময়! বৃদ্ধের সাগ্রহবাক্য
তুলিলিনা কাণে!—এখন কুটীর হ'তে
বাহিরিলি আমার সাক্ষাতে—হতভাগা
তবুও বলিবি তুই আমারে খুঁজিলি!

ফরীদ। যাও বৃক্ষতলে, যাও তটিনীর তীরে,
উঠ গিরিশিরে, পশ পর্ব্বতকন্দরে,
সমগ্র সংসার এস ঘুরে—প্রকৃতির
গায়ে মাখা, এখনো শুনিতে পাবে গুরু,
তোমার নামের প্রতিধ্বনি।

মুস্তাফা। বাপধন!
কুটীরে বুঝেছ বুঝি প্রকাণ্ড সংসার,
দেখেছ বিশাল সিন্ধু ভৃঙ্গারের জলে!

বালুকণা গিরিচূড়া, মূষিকবিবর
বুঝি পর্ব্বতকন্দর, তৃণাঙ্কুর বুঝি
বাপ্‌, অভ্রভেদী শাল! চুপ্‌ কর্—
ফের যদি মিথ্যাকথা কবি, মুখ তোর
আর দেখিব না।—বল্‌, কোথা সর্ব্বনাশী,
কোথা তোর উন্মাদিনী, উন্মাদকারিণী
প্রণয়িনী। সর্ব্বনাশী নিশ্চয় পাগল।
না হলে, সে খুঁজে খুঁজে পাগলে বরণ
করে! বল্—শীঘ্র বল্—ফরীদ! ফরীদ!
মা আমার দেখিতে কেমন, দেখিবারে
অস্থিরপাগল আমি।

ফরীদ। দেখাইব বলে,
তাইত তোমারে গুরু খুঁজে আমি সারা।
তুমি না দেখিলে সব নিষ্ফল আমার,
তুমি না বলিলে ভাল অস্তিত্ব বৃথাই
তার। পিতা ঠিক্ ব'ল—যদি ভাল হয়
তবে রবে—বিন্দু যদি খুঁত থাকে রূপে,
পর্ব্বত হইতে তারে ভূমে নিক্ষেপিব।
ঠিক্ দেখো, ভাল ক'রে দেখো—দেখো যেন
আমার বলিয়া মিথ্যা কয়োনা মায়ায়।

মুস্তাফা। তবে আমি দেখিব না!

ফরীদ। দেখিতেই হবে।
না দেখিলে ছেড়ে দেবে কে তোমায়?

মুস্তাফা।　　　　　　　　　　　　বাপ্!

দেখেছ সুন্দর, তারে দেখহ সুন্দর।
হৃদিমাঝে কর অনুধ্যান। প্রেম যেথা
ধরিয়াছে নিজহাতে তুলি, মান রাখ—
মান রাখ তার।—পরচক্ষে প্রণয়িনী
করনা দর্শন।—সৌন্দর্য্যের অপূর্ণতা
যদ্যপি তোমার চক্ষে পড়েনি বালক,
সুখে দিতে চিরবিসর্জন, অন্বেষণ
কেন কর তার। খুঁত যদি দেখি রূপে
মর্ম্ম ভেঙে যাবেরে তোমার।

ফরীদ।　　　　　　　　　　　　যায় যাক্—
পছন্দে যদ্যপি রয় সন্দেহ আমার
মর্ম্ম রেখে কি করিব! একবার দেখ—
সুন্দরীর শ্রেষ্ঠ যদি নাহি হয় জ্ঞান,
ভাস্কর্য্য ছাড়িয়া দিব—সম্মুখে তোমার
সুন্দরীরে দিব বিসর্জন।

মুস্তাফা।　　　　　　　　　　　　তোর বড়
অহঙ্কার!

ফরীদ।　　　　　　　বিশ্বমাঝে শিল্পিশিরোমণি
মুস্তাফার হাতে হাত দিয়া, যেই জন
করে চিত্রাঙ্কন, বিনয়ের কথা তার
অহঙ্কার।

মুস্তাফা।　　বোকাছেলে! আমি আঁকিয়াছি
এক সুন্দরীর ছবি—তাহ'তে সৌন্দর্য্য
আর বিধাতা আঁকিতে নাহি পারে। সে যে

বিধাতার কল্পনার সীমা। ক্ষুদ্রশিশু!
তা হ'তে সৌন্দর্য্য তোর আঁকা কি সম্ভব!

ফরীদ। সেকি কল্পনার ছবি—অথবা জগতে
জীবন-অস্তিত্ব আছে তার?

মুস্তাফা। শিরী নাম,
তাতারের রাণী—অপূর্ব্বরমণী—শুধু
অপূর্ব্বত্ব রূপের বর্ণনা। নিরখিলে
মুখ তার, হাত হ'তে তুলি খসে যায়।
সৌন্দর্য্যে পতিত মাত্র মুদিত নয়ন,
মনে মনে রূপের অঙ্কন—কেন্দ্রীভূত
সর্ব্বজ্ঞান হৃদিমধ্যে আত্মনিবেশিয়া,
প্রকৃতির বাহ্যদৃশ্যে করে পরিহার।
ছায়া হেরে কত নর উন্মত্ত হইয়া
আজো ঘোরে তাতারের পথে! মনোদুঃখে
উজীর রুস্তম, প্রাসাদের সন্নিধানে
প্রতি স্থান রাখিয়াছে প্রহরিশাসনে।
শতশিল্পী হার মেনে গেছে। আমি শুধু
প্রাসাদের পুরোভাগে সরোবর-তীরে
হেঁটমুণ্ডে বসিয়া বসিয়া, একদিন
সরোজলে সুন্দরীর প্রতিবিম্ব হেরে
জল হ'তে ছবি নিছি তুলে।

ফরীদ। কোথা সেই
ছবি গুরু! বাধা কি দেখিতে আছে মোর।

মুস্তাফা। [illegible] নাই, সময়ে দেখাব।—চল্ এবে
দেখি কোথা তোর প্রণয়িনী।—(সব) মিথ্যা কব—
সুন্দরী না হেরি যদি ফরীদের নারী,
অপূর্ব্ব সুন্দরী ব'লে ফরীদে ভুলাব।—
দাঁড়াইয়া কিহেতু ফরীদ!

ফরীদ। সেকি গুরু!
আমিত চলেছি।

মুস্তাফা। বেশ চল—আরো চল।
গন্তব্য তোমার স্থান যদি অতি দূরে,
জীবনের মাপে মাপে কর পদক্ষেপ।
সন্নিকটে বায়ুগৃহে যদ্যপি তাহার
বুঝ সীমা—আপন আবাসে ব'স শিশু।
মিলে যাক্ গমনাগমন—মিশে যাক্
দুঃখের বিদায় আর সুখ-আবাহন।
কি বিচিত্র, বুঝ কি, ফরীদ? একদিকে,
কণ্টকিত বিচ্ছেদের প্রাচীর-বেষ্টনে,
আশঙ্কা-নাগিনীভরা, তীব্র মধুময়,
চিরপ্রিয় মিলনের কুসুম-উদ্যান—
অন্যদিকে, সুখের সমস্ত আশা নিয়ে
স্পন্দিত সমীর শিরে আন্দোলিত বেণী
মিলন কুসুমগুচ্ছ মরীচিমালিনী
বিচ্ছেদ-সিকতাবক্ষা তপ্তমরুভূমি।
তার মাঝে সূক্ষ্মপথ, আদি-অন্তহীন—
অথবা আরম্ভ যেথা সেখানেই শেষ—

চলিতে পথিক ব্যগ্র সীমান্তের তীরে,
অগ্র কি পশ্চাতে যায়, বুঝিতে না পারে।
বিশ্রামে অক্ষম কিন্তু চলিতে হতাশ—
যদি ভুলে পথভ্রষ্ট চরণ তাহার,
কোথা যাবে নিজে না বুঝিবে আর। সেই
বুঝি অভাগার শ্রম উপহার!

(ফরীদ কুটীরদ্বারসম্মুখে উপস্থিত হইয়া)

ফরীদ। এস
প্রভু! এই গৃহদ্বার।

মুস্তাফা। এই গৃহদ্বার!
রে অন্ধ বালক! কণ্টকিত লতাবৃত
মূষিকবিবরে যদ্যপি পশিতে মোর
থাকিত শকতি—অচল হৃদয় আমি
করি উদ্‌ঘাটন, সমস্ত রতন তার
আকাঙ্ক্ষিতা ধরণীরে দিতাম ঢালিয়া।
সে শক্তি আমার নাই—সে শক্তি যাহার
আছে, আমি শুধু তার কাছে মাথা করি
নত।

ফরীদ। তাইত তাইত গুরু, কোথা গেল
কুটীরের পথ! কেমনে পশিয়াছিনু,
কেমনে আসিনু তব কাছে—অপেক্ষায়
বসেছিল কে নিঠুর চোর—জীবনের
সাধনার পবিত্র সম্বল, আর যাতে
না মিলে সন্ধান, তাই পথ করে চুরি।

কি হবে কি হবে গুরুদেব ! সে যে আছে
প্রতীক্ষায় ! ভারে ভারে রূপরাশি লয়ে
মন্ত্রবাক্যে তবপদে পড়িতে অঞ্জলি
সে যে শুধু আছে প্রভু কথার ভিক্ষায় !
কোথা যাব গুরুদেব—কে দেখাবে পথ
কে মোরে লইবে সেথা, যেথা বিশ্ব মোর
হৃদয়ের, প্রাণোন্মুখী আছে দাঁড়াইয়া ?

মুস্তাফা। এস মূর্খ, আমি পথ করি অন্বেষণ।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কুটীরের অপর পার্শ্ব।

মুস্তাফা ও ফরীদ।

একটী কুঞ্জপথ নদীর তীর হইতে উঠিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া কুটীর-সংলগ্ন উদ্যানের একপার্শ্বে আসিয়া মিলিয়াছিল। মুস্তাফা গৃহনির্ম্মাণকালে এই প্রকৃতি-রচিত কুঞ্জপথের সাহায্যে কুটীর-প্রবেশের একটী নৈসর্গিক দ্বার রচিত করিয়াছিলেন। ফরীদকে তিনি সেইখানে লইয়া চলিলেন। একটী কুসুমিত অশোকে ভর দিয়া, একটী মাধবীলতা আপনাকে বিবিধ কৌশলে জড়াইয়া দ্বারের কার্য্য করিতেছিল। মুস্তাফার হস্তস্পর্শে মাধবী যেন আপনার জালের দেহটী গুটাইয়া লইল—দ্বার উন্মুক্ত হইল। ফরীদ দর্শনমাত্র ব্যাকুলভাবে প্রবিষ্ট হইতে ছুটিল। মুস্তাফা তার হস্ত ধরিয়া—

প্রেম গুরু—কিম্বা গুরু প্রেম !
প্রেম তোরে
এতদিন পথ দেখাইয়া, প্রয়োজনে
রোধি দ্বার দূরে দিল ফেলে—আর আমি

তোর চক্ষে নিতান্ত কঠোর,—হতভাগা!
প্রকৃতি ভেদিয়া তোর রচে দিনু দ্বার!

ফরীদ। তোমারি লীলার ভঙ্গ, রঙ্গ সে তোমার—
আবাহন-প্রত্যাখ্যান, আদর-পীড়ন
সব তব প্রীতির ঝঙ্কার—ভাগ্যবান
যে দেখেছে, সে বুঝেছে গুরু—গুরু-প্রেম
অভিন্ন আকার। আর কেন, চল যাই
নন্দিনী তোমার আছে পথ প্রতীক্ষায়।

মুস্তাফা। (প্রবেশমুখে) হৃৎকম্প কিহেতু আমার! সর্ব্বনাশে,
আদর সম্ভাষে করিনু কি নিমন্ত্রণ!
হায়! কেন তুলিলাম, সে নরঘাতিনী
নাম ফরীদের কাণে! দেখিতে যত্তপি
শিশু প্রতিবিম্ব চায়! যদি বলে দাও
তার ছবি, তুলনায় কেবা হারে, কেবা
জিনে দেখি মিলাইয়া।

ফরীদ। চলিতে চলিতে
মাঝে মাঝে চিন্তাভারে গতিরুদ্ধ তব।
ভীত আমি, এত চিন্তা কি কারণ গুরু?

মুস্তাফা। দেখাবোনা শিরী-মূর্ত্তি। দেখে কি পাগল
হবে! কেবা তার মূর্ত্তি দেখে রয় স্থির!
আমারিত প্রতিবিম্ব দেখামাত্র হাত
কেঁপেছিল। লোলঅঙ্গে রোমাঞ্চে রোমাঞ্চে
বার্দ্ধক্য ফিরিয়াছিল যৌবনসীমায়।
না না—কখন না—এ মূর্ত্তি দেখাতে নাই

সাহস আমায়! অভিশাপ নিদারুণ
রূপসঙ্গে মাখা বিধাতার, হায়, চিত্রসনে
ফুটিয়াছে। নিরথ কটাক্ষে—বেজে ওঠে
সহস্র উচ্ছ্বাস নিয়ে মরণের ভেরী।
সে যে পুত্র আমিগত প্রাণ! নরাধম!
কাহার ললিতভাষে সংক্ষুব্ধ হইয়া
অভিমানে কুঠার হানিতেছিলি পায়!
ফরীদেরে মূর্ত্তি দেখাবনা। যদি দেখে'
ফরীদ পাগল হয়, তাহ'লে কি হবে!

ফরীদ। কার চিন্তা করিতেছ গুরু?

মুস্তাফা। চিন্তা—চিন্তা!
না, না—চিন্তা কেন? না না চিন্তাইত বটে!
ভাবিতেছি ফরীদ আমার, এই বৃদ্ধ
কদাকার মুস্তাফায় দেখে, মা আমার
কি মনে করিবে! বাপ্—বুঝে দেখ—যাব
কি না যাব! রূপহীন—তবু তোরে কত
রূপ, দেবতাবাঞ্ছিত আমি করিয়াছি
দান। বাপ্! মা তো তার জানে না সন্ধান!
যদি বধূ মোরে দেখে মুখটী ফিরায়—
আমারোত আছে অভিমান।

ফরীদ। গুরুদেব!
ছলনা করনা মোরে—এই কি মনের
কথা? কিম্বা মনে তব জেগেছে বাসনা,
মূর্ত্তি হেরে যদি বুঝ নহে অতুলনা,

মিথ্যা ক'য়ে ভুলাবে আমারে। ভাল, দয়া
করে, দেখাও না মোরে, তোমার রচিত
প্রিয়ছবি—চিত্র দেখে পূর্ব্ব হ'তে বুঝে
লই গুরু, তোমারে ল'ব কি সাথে, কিম্বা
দ্বারদেশ হ'তে তোমা দিব হে বিদায়।

মুস্তাফা। আর তুমি ?

ফরীদ। জলদের কণায়-কণায়
অশনি করিয়া আবাহন, মাটী খুঁড়ি
ভূকম্প করিয়া উত্তোলন, গুঁড়াইয়া
পোড়াইয়া তীর্থসম কুটীরে আমার—
প্রলয়-প্লাবন যদি পাই,—তার স্মৃতি
ডুবাইয়া, অন্ধকারে করি আলিঙ্গন—
নাচি আমি গুরু, তার তরঙ্গের শিরে।
কোথা ছবি, আগে চল মোরে দেখাইবে।

মুস্তাফা। কোথা ছবি! মিথ্যা কথা! দেখা কোথা আছে
বধূমাতা।

ফরীদ। ভাল তাই দেখ। কিন্তু গুরু
শপথ করিয়া বল, তাতারের রাণী
যদি হয় এ হ'তে সুন্দর—মুক্তকণ্ঠে
বলিবে আমারে। শিরী! কি নাম বলিলে
গুরু তার ?

মুস্তাফা। শিরী।

ফরীদ। শিরী! রূপসৃষ্টিসনে
নামও কি বিধাতা দিয়েছে ?

মুস্তাফা।　　　　বোধ হয়।

ফরীদ।　তাই যদি হয় পিতা—তাহলে তোমার
ছবি আর দেখিবার নাহি প্রয়োজন—
আমিও তোমার ছবি দেখিতে না চাই।

মুস্তাফা।　কেন পুত্র ?

ফরীদ।　　　　বুঝেছি, সে বিধাতা তস্কর।
মম দত্ত নাম-রূপ করিয়া হরণ
নিয়ে গেছে সে কপটী নকল তাতারে।
চোরের পঙ্কিল হস্তে মলিন হয়েছে
প্রতিকৃতি। তাইত বিস্মিত আমি, ছবি
যার জলে পড়ে, সে কেমনে শ্রেষ্ঠরূপ-
গর্ব্বভারে হবে গরবিনী। কখন কি
শুনিয়াছ,—হে গর্ব্বী! হে চারু চিত্রকর!
আকাশকুসুম হ'তে নীরবে যখন
অমল অমিয়াবিন্দু ঝরে, চিত্র তার
পড়ে কভু পৃথিবীর সমল সলিলে ?

মুস্তাফা।　বৃথা তর্ক কেন মূর্খ! আমার যা জ্ঞান,
তাতে আমি এই বুঝি, তুলিকার মুখে
যে শিল্পী তুলিতে পারে সে শিরী সুন্দর,
সে যদি মানব হয়, মানব-বিধাতা।

ফরীদ।　বেশ তবে চল গুরু—আমারো সে শিরী।
দেখিয়াছ তাতারের সৌধবাতায়নে
সালঙ্কারা রাজ্যেশ্বরী ভুবনমোহিনী

এক শিরী। আজ আমি দেখাব তোমায়
অতি ক্ষুদ্র কুটীরের প্রান্তবিলাসিনী
আর এক শিরী। আভরণহীনা দীনা
মলিনবসনা—কিন্তু গর্ব্ব কত তার!
সে যে প্রভু, মুস্তাফার ফরীদের শিরী।
ছিন্নাঞ্চলে ঝরে তার শত কোহিনুর,
পদতলে বিশ্বব্যাপী তাতারের হৃদি।

মুস্তাফা। বাপধন! প্রণয়ের প্রথম প্রহারে
যদ্যপি জ্ঞানের ঘর এত টলমল—
তার পর? আছে পরে সহস্র প্রহার।
রে ফরীদ! সাবধান। আমি এতদিন

(ফরীদের বক্ষে হস্তদান)

এ সুন্দর প্রীতিপূর্ণ বিশাল প্রান্তরে
একমাত্র ছিনু অধিকারী। যাক্—যাক্—
সমস্ত চলিয়া যাক্—সমস্ত মায়ের
হোক্—এই ভিক্ষা, জীবনের শেষবেলা
এক প্রান্তে যেন তার একটু নিষ্কর
স্থান পাই।

ফরীদ। (পদতলে পড়িয়া) একি গুরু! পর্ব্বতশিখরে
পত্র-পুষ্প-ফল লয়ে আকাশ ভেদিয়া
যদি উঠে দেবতরু—সমস্ত সম্পত্তি-
গর্ব্ব লয়ে, সে যে প্রভু অচলেরি ধন
চিরদিন—

(পট পরিবর্ত্তন। কুটীরমধ্যস্থ একটী পাদপীঠে অবস্থিত
শিরীমূর্ত্তির আবির্ভাব।)

ফরীদ। এই দেখ গুরু।

মুস্তাফা। একি! একি!

ফরীদ। এই দেখ মোর প্রণয়িনী। পিতা, গুরু!
চেয়ে দেখ নন্দিনী তোমার। দেখে বুঝি
চিনেছে তোমারে। তাই বুঝি শ্রীঅধরে
ভারে-ভারে ভরিয়াছে পূর্ণিমার হাসি।
স্থিরহাসি স্নিগ্ধজ্যোতির্ম্ময়ী। হের গুরু,
অপাঙ্গে-অপাঙ্গে হাসি পূজিছে তোমায়।
দরিদ্রের ঘরে নারী করে অবস্থান—
ক্ষুদ্র ঘর, নহে উচ্চ অনন্ত আকাশ—
তাই প্রভু, না পাও শুনিতে অহঙ্কৃতা
দামিনীর নীরস বচন। আপনার
রূপে নারী আপনি তন্ময়—তাই সাধে
একদিন ফুটিয়া গগণে, নিজরূপ-
ভোগ-অভিলাষে, আবদ্ধ হয়েছে ধনী
আঁধার কুটীরে।

মুস্তাফা। কোথা পেলি! একে কোথা
পেলি! শিরী—শিরী! তাতার-ঈশ্বরী! কোথা
তুই! তোরে না হেরিতে, শত শত রাজা
রাজ্য দিয়ে ছারে-খারে, তোর সিংহদ্বারে
মৃত্তিকা করেছে সার! চরণ উদ্দেশে
তোর, কতনা মুকুট, কতনা ঐশ্বর্য্য-

মান, আমিরী-ফকিরী, কতই না আশা,
কতই না ভালবাসা, নিক্ষিপ্ত হয়েছে
সর্ব্বনাশী!—উন্মাদিনী! কোথায় তাতার
আর কোথা চীনদেশ—প্রকাণ্ড পর্ব্বত-
মালা, ধূ ধূ মরুভূমি, সিংহ-ব্যাঘ্র-ভরা
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বন—এসব ডিঙায়ে,
মান-যশ-প্রতিষ্ঠায় দিয়ে জলাঞ্জলি,
সর্ব্বনাশী! এতদূরে!—দরিদ্র ভাস্কর-
ঘরে!—দরিদ্রভাস্কর-ঘরে করেছিস্
অভিসার! ছিছি রাণী, লোকে কি বলিবে!

ফরীদ। একি বল! একি বল, গুরু!

মুস্তাফা। আরে ছিছি!
ফিরে যা—ফিরে যা নারী!—ফিরে যা ফিরে যা
শিরী! ক্ষুদ্রশিশু—মর্য্যাদা কি বুঝে তোর!
দীনবেশা, শতগ্রন্থী মলিনবসনা
পাগলিনী-ভিখারিণী ভেবে—মুখ দেখে
মায়ামুগ্ধ, এ ক্ষুদ্রকুটীরে দেছে স্থান।

ফরীদ। কি বল কি বল পিতা—এত তাতারের
রাণী শিরী নয়।

মুস্তাফা। থাম্—এ ক্ষুদ্রবালক
জানেনা-বোঝেনা মর্ম্ম, রাণী! ক্ষমা কর
মা, মা!—অধম সন্তান—সংসার জানে না,
কে রাজা, কে রাণী—কার মর্য্যাদা কেমন—
কেমনে রাখিতে হয়, কিছুই জানে না।
ক্ষমা কর ক্ষমা কর তাতার-ঈশ্বরী।

ফরীদ কুর্ণিস কর্, পবিত্র আমার
ঘর—রে ফরীদ! সার্থক জীবন তোর।

ফরীদ। কি বল কি বল পিতা, এ মূরতি হেরে
মস্তিষ্কবিকারে তব গেছে বাহ্যজ্ঞান।

মুস্তাফা। হতভাগা! ভুলায়ে রাখিতে চাস্ মোরে!
ভেবেছিস্ চিনে না মুস্তাফা। এই দেখ্—
(ফরীদের হস্তে চিত্রদান)
দেখ্ দেখি মেলে কি না মেলে।

ফরীদ। এই শিরী!

মুস্তাফা। কেন নিরুত্তর রাণী! পাগলে দাও না
বুঝাইয়া।

ফরীদ। মিথ্যাকথা—জীবন্ত প্রতিমা
মিথ্যা। মিথ্যা সে তাতার।—তাতার তাতার!—
ধরাতলে একমাত্র (হৃদয়ে হস্তদিয়া) এইত তাতার!
ছলনার সাদৃশ্য সুন্দর! শিরী—শিরা!
ঐশ্বর্য্যসম্ভোগসুধা নাম—শিরীমূর্ত্তি
চূড়ান্ত দৃশ্যের। আমি যে তাহারে গুরু,
কল্পনা-ভাণ্ডার উজাড়িয়া, রবি শশী
রামধনু, তারকার গলিত সুধায়
মৃণাল খঞ্জন ফুলে এ তুলি ভরিয়া,
এ ক্ষুদ্রকুটীর-রাজ্যে দিয়াছি গো স্থান।
এইত তাতার তার। শিরী—শিরী—তুই
তাতার-ঈশ্বরী! বল্—একবার বল্—
ওষ্ঠ কাঁপাইয়া বল্—অধরকুঞ্চনে

বল্—ঈষৎ অপাঙ্গভঙ্গে একবার
বল্—কোথাকার তুই—মোর কুটীরের
কিম্বা এর প্রতিচ্ছবি মিথ্যাভাতাবের ?
বল্ শিরী—পায়ে ধরি বল গুরুদেব !
শিরী যে কয়না কথা—শিরী যে পাগল
ভেবে হাসিয়া আকুল ! সব শিখায়েছ—
পায়ে ধরি—পায়ে ধরি বলে দাও গুরু—
কেমনে ও ওষ্ঠ হ'তে বচন ঝরাই।
কথা কহিলে না গুরু—কথা কহিলে না
শিরী ! তবে, চলিলাম, আর আসিব না।
প্রতিজ্ঞা আমার তবে শুনলো সুন্দরী !
ফরীদ ফরীদ ব'লে কাতর হইয়া—
তাতারে ত্যজিয়া বিশ্বে বিলায়ে আপন—
ফরীদ ফরীদ ব'লে কাতর হইয়া
এই ফরীদের যদি না কর সন্ধান,
প্রাণান্তে ফরীদ আর মুখ ফিরাবে না।

(প্রস্থান।)

মুস্তাফা। না না—একি ! রাণী ! জীবন্ত যদ্যপি রও
কথা কও—বল রাণী কেমনে পশিলে
এই দরিদ্রের ঘরে ? কেন উন্মাদিনী-
বেশ তাতার-ঈশ্বরী ! না না, একি শিরী !

(পদতলে হস্ত দিয়া পরীক্ষা)

পাষাণী ! পষাণ হলি ! সাধনা পুরালি !

(মূর্চ্ছা।) [ক্রমশঃ]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

অগ্নিহোত্রী।

অনেক দিন আগে "ভারতী"তে "আহিতাগ্নিকা" * শীর্ষক একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলম,—সেই সময় আহিতাগ্নি কি, তাহার বিশেষ বিবরণ জানিবার জন্য বড়ই ইচ্ছা হয়। অনুসন্ধানে যাহা জানিয়াছিলাম, তাহা নিম্নে লিখিতেছি।

আহিতাগ্নি একটা ব্রতবিশেষ, এ ব্রতের উপাস্ত অগ্নি। যাঁহারা এই ব্রত গ্রহণ করেন তাঁহাদিগকে আহিতাগ্নিক বলে। আহিতাগ্নিকদিগকে প্রতিদিন অগ্নিপূজা করিতে হয়; ব্রতগ্রহণ করিবার সময় যে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হয়, সে অগ্নিকে ব্রতধারী যাবজ্জীবন অতি সন্তর্পণে রক্ষা করেন, সে অগ্নি যেন কখন নির্ব্বাপিত না হয়। তাঁহার জীবনের তখন এক কাজ হয় সেই অগ্নিকে সঞ্জীবিত রাখা,—মহা মহা বিপদ, শত শত ঝঞ্ঝাবাত, সকল হইতেই এই অগ্নিকে রক্ষা করিতে হইবে, প্রাণ থাকিতে যেন তাহার নির্ব্বাণ না আসে। এ বড় চমৎকার ব্রত!

কোন একটা অভীষ্টসিদ্ধির জন্যই ব্রতাদি গ্রহণ করা হইয়া থাকে —ব্রত গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্য তাহাই। একাগ্রচিত্তে, পবিত্রদেহে, অটল-ভাবে, শারীরিক স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া অভীষ্টবস্তু লাভের জন্য শেষ পর্য্যন্ত স্থিরমনে কামনা করিয়া থাকাকে ব্রতপালন করা বলে। কিন্তু কি সেই অমূল্য দুর্লভ বস্তু, যাহা লাভ করিবার জন্য এমন যাবজ্জীবনব্যাপী ব্রতের অনুষ্ঠান হইয়াছে?

---

* ১৩০৬ আষাঢ় সংখ্যা। সম্প্রতি উত্তরপশ্চিমের বিখ্যাত মাসিকপত্র Hindustan Reviewএ—"Votaress of the Sacred ইতিশীর্ষে ইহার ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হইয়া ইহা সমস্ত ভারতবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। নানাস্থানে নানা পত্রে ইহা উদ্ধৃত হইয়াছে—লেখক।

অনেক অনুসন্ধান করিয়া আহিতাগ্নিকদিগের বিষয় কিছু জানিতে পারি নাই, কিন্তু এইরূপ আর একশ্রেণীর কথা জানিতে পারিয়াছি, তাহা অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ। আমার মনে হয়, আহিতাগ্নিক ও অগ্নি-হোত্রীর মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। আহিতাগ্নিক ও অগ্নিহোত্রী উভয়েই অগ্নিউপাসক—উভয়েই যাবজ্জীবন তাঁহাদের ব্রতাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখেন।

বঙ্গদেশে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায় না। উত্তরপশ্চিম ও মধ্যপ্রদেশে অতি অল্পসংখ্যক এই শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চগৌড়-ব্রাহ্মণদের মধ্যে অগ্নিহোত্রী প্রায়ই নাই, কিন্তু পঞ্চ-দ্রাবিড়ী ও দক্ষিণী ব্রাহ্মণদের ভিতর আছে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইহা একপ্রকার ব্রতবিশেষ; সেইজন্য এমন কোন নিয়ম নাই যে, অগ্নিহোত্রী বংশই কেবল অগ্নিহোত্রী হইবার অধিকারী। অগ্নীহোত্রী হইবার তিনপ্রকার নিয়ম আছে। প্রথম, উত্তরাধিকারসূত্রে অগ্নিহোত্রী হইতে পারা যায়; দ্বিতীয়, উপবীত-গ্রহণকালে এই ব্রত গ্রহণ করিতে পারা যায়। তৃতীয়, উপনীত হইবার পরও যখন ইচ্ছা হইতে পারা যায়।

যাঁহারা উপবীতগ্রহণানন্তর অগ্নিহোত্রী হইবার কামনা করেন, তাঁহাদিগকে "শুদ্ধ" হইতে হয়। "শুদ্ধ" হইতে হইলে অনেকগুলি আচারের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তন্মধ্যে প্রজাপত্যব্রত প্রধান। কোন ক্রমে দৈবাৎ যদি কোন অগ্নিহোত্রীর ব্রতাগ্নি নিবিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাকেও এই প্রজাপত্যব্রত গ্রহণ করিয়া "শুদ্ধ" হইতে হয়। এই প্রজাপত্যব্রতের কাল দ্বাদশদিন। এই সময়ের মধ্যে দিবারাত্রে এক-বার মাত্র আহারগ্রহণ করা বিধেয়। নিজে চেষ্টা করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য নহে। সম্মুখে যাহা পাওয়া যাইবে, তাহাই ভক্ষণ কবিতে হইবে। ব্রতের দ্বিতীয় দিন সমস্তদিন উপবাসের পর রাত্রে আহার করিতে হয়, এবং চতুর্থদিবসে উপবাস করিয়া থাকিতে হয়। যে অগ্নি-

হোত্রী এই প্রজাপত্যব্রত পালন করিতে না পারিবেন, তাঁহার অগ্নি-হোত্রী হইবার পর যত বৎসর অতীত হইয়াছে, তাঁহাকে ততগুলি গোদান করিতে হইবে ; ইহাতে অসমর্থ হইলে যত বৎসর অগ্নিহোত্রী হইয়াছেন, প্রত্যেক বৎসরের জন্য দশসহস্রবার গায়ত্রী জপ করিতে হইবে ; তাহাতেও অসমর্থ হইলে, যত বৎসর অগ্নিহোত্রী হইয়াছেন, প্রত্যেক বৎসরের জন্য তত সহস্র তিল অগ্নিকুণ্ডে আহুতি দিতে হইবে।

অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণকে অগ্নিকুণ্ডের জন্য একটি পৃথক ঘর রাখিতে হয় ; তথায় তিনটি প্রজ্বলিত কুণ্ড থাকে। প্রথম কুণ্ডটি অগ্নিপূজার, দ্বিতীয় কুণ্ডটি মৃতব্যক্তির সৎকারার্থ—অর্থাৎ অগ্নিহোত্রী স্বয়ং যখন মৃত্যুমুখে পতিত হন, বা তাঁহার পরিবারস্থ কেহ পরলোকগমন করেন, তখন এই কুণ্ড হইতে অগ্নি গ্রহণ করিয়া তাঁহাদিগের দাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। তৃতীয়টি, সংসারের ব্যবহারের জন্য—অর্থাৎ সংসারকর্ম্মে অগ্নির আবশ্যকতা হইলে এই কুণ্ড হইতে অগ্নি গ্রহণ করা হইয়া থাকে। এই তিনটি কুণ্ডই এক মাপের, একহাত পরিমাণ চওড়া। কুণ্ডের চতুষ্পার্শ্বে বিশিষ্ট মাটির অপরিসর বেদী প্রস্তুত করা থাকে ; বেদীকে সমান তিনভাগে বিভক্ত করিয়া, প্রথমভাগটি কৃষ্ণবর্ণে রঞ্জিত করা হয়—ইহা তমগুণের পরিচায়ক। দ্বিতীয়ভাগ রক্তবর্ণ—ইহা রজ-গুণের পরিচায়ক। তৃতীয় ভাগ শ্বেতবর্ণ,—ইহা সত্বগুণের পরিচায়ক। প্রতিদিন প্রাতঃকালে অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ এই কুণ্ডে গব্যঘৃতের আহুতি প্রদান করিয়া থাকেন, গব্যঘৃত দুষ্প্রাপ্য হইলে মহিষের ঘী কিম্বা ক্ষীর আহুতি দিবার নিয়ম আছে। ইহাঁদের পূজার ব্যাপার আমাদের দেশের শ্রাদ্ধ ইত্যাদির সময় যে হোম করা হয়, তাহার মত অনেকটা। তাহার বিবরণ প্রদান করা এখানে আবশ্যক বোধ করিতেছি না।

অগ্নিহোত্রীদিগকে অনেকগুলি কঠোর নিয়ম পালন করিতে হয়, এবং সংযমী পুরুষের মত থাকিতে হয়। একবার অগ্নিহোত্রী হইলে

তাঁহার আর অন্যত্র যাইবার ক্ষমতা থাকে না, অগ্নিকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে সেইখানেই থাকিতে হয়। যে সমস্ত দ্রব্য অগ্নিহোত্রী স্বয়ং বা তাঁহার পরিবারস্থ কেহ উৎপন্ন করেন, তাহা তাঁহাদিগকে বিক্রয় করিতে নাই। পার্থিববিষয়ে বেশী মনোনিবেশ করিতে পারিবেন না; রাত্রে আহার নিষিদ্ধ; শয্যাশয়ন নিষিদ্ধ—ভূমিতে শয়ন করিতে হইবে; রাত্রিজাগরণ করিয়া শাস্ত্রপাঠ করিতে হইবে, অধিক নিদ্রা যাইবে না। মধু, মাংস প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য এবং বেগুন, মসুরডাল প্রভৃতি খাওয়া নিষিদ্ধ; আপনার স্ত্রী ব্যতীত অন্য কোন স্ত্রীর চিন্তা মনে স্থান দিতে পারিবে না; সদাই শুদ্ধাচারী হইয়া থাকিতে হইবে।

অগ্নিহোত্রীদিগকে নিয়মমত, হোম, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়, এবং মধ্যে মধ্যে ব্রাহ্মণভোজনও করাইতে হয়।

আর-একশ্রেণীর অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ আছেন, তাঁহারা পর্ব্বতবাসী—নেপাল, কুমায়ুন অঞ্চলে এই প্রকার ব্রাহ্মণ আছেন। তাঁহাদের অগ্নিহোত্রী হইবার প্রণালী একটু ভিন্নপ্রকারের। তাঁহারা বিবাহের সময় অগ্নিহোত্রী হন। শ্বশুরগৃহ হইতে সেই অগ্নি আনিয়া আপনার গৃহে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহাদের মৃত্যু হইলে সেই পূজার অগ্নিকুণ্ড হইতে অগ্নি আনিয়া দাহ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে যে অগ্নিহোত্রীর বিবরণ দিয়াছি, তাহার সহিত ইহাদের আচার-অনুষ্ঠানের বড় বেশী কিছু পার্থক্য নাই। ইহাঁরা প্রতিদিন আহুতির সময় সামবেদ পাঠ করিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, ইহাঁরা পূর্ব্বে গুজরাটের অধিবাসী ছিলেন।

শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

সাময়িক কথা।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের প্রথম লাট অদ্বিতীয় সায়েস্তার্খা সার ব্যামফীল্ড ফুলার পদত্যাগ করিয়াছিল, এ কথা আর নুতন নহে। কিন্তু এই পদত্যাগসম্বন্ধে অনেক কথা জানিবার আছে। বৃটীশ ভারতের ইতিহাসে এরূপ পদত্যাগের ব্যাপার নুতন! কোটী কোটী প্রজার অভিশাপভাজন হইয়া লাটগিরি চাকরী করা কিরূপ বিড়ম্বনাজনক তাহা পক্বকেশ বুনো সিভিলিয়ান সার ব্যামফীল্ড ফুলার এতদিনে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন। অত্যাচারের প্রতিবিধানে অসমর্থ দুর্ব্বলপ্রজার ঐকান্তিক ইচ্ছা যে সফল হয়, ফুলারের পদত্যাগ তাহার উজ্জ্বল প্রমাণ। ফুলারের পদত্যাগ-রহস্যটি প্রহেলিকাপূর্ণ। তাঁহাকে যে পদত্যাগ করিতে হইবে, তাহা তিনি অল্পদিন পূর্ব্বেও জানিতেন না; অল্পদিন পূর্ব্বে তিনি ময়মনসিংহে পদার্পণ করিয়া কোন স্থানীয় জমীদারকে বলিয়াছিলেন, তিনি আগামী শীতকালে আবার ময়মনসিংহের ভূমি পবিত্র করিবেন। পদত্যাগের কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি রাজসাহীতে উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, মুসলমানছাত্রদিগের জন্ত তিনি খুব সমারোহে একটা বোর্ডিং খুলিবেন। কিন্তু সকল আশা বিফল হইল। চারিমাস পূর্ব্বে তিনি দুই একটি স্কুলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডী হইতে বিতাড়িত করিবার জন্ত আবদার করেন, ভারত-গবর্ণমেণ্ট তাঁহার সে আবদার পূর্ণ করেন নাই, অতএব তিনি চাকরী ত্যাগ করিলেন; এইরূপ একটা কৈফিয়ৎ দিয়া তিনি নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন। ইহাই যদি পদত্যাগের কারণ হয়, তাহা হইলে তিনি এতদিন চুপ করিয়া থাকিয়া হঠাৎ এখন ইস্তাফাপত্র দাখিল করিলেন কেন? মিঃ মরলীর নিকট তিনি প্রকাশ্যভাবে যে তিরস্কার লাভ করিয়াছেন, এ পর্য্যন্ত কোন সিভিলিয়ানকে সেরূপ তিরস্কারভাজন হইতে হয় নাই। এত তিরস্কার সহ্য করিয়া চাকরী করা বিড়ম্বনা—সার ব্যামফীল্ড যদি এরূপ কৈফিয়ৎ দিতেন, তাহা হইলে অন্ততঃ তাঁহার সত্যানুরাগ প্রকাশিত হইত।

সার ব্যামফীল্ড ফুলারের পদত্যাগ।

কিন্তু ফুলারকে আমরা যতই গালি দিই, তাঁহার দ্বারা আমাদের যে কোন হিত-সাধন হয় নাই, এ কথা চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া কিরূপে স্বীকার করি? নিদ্রিত জাতিকে জাগাইবার জন্ত অনেক সময় কশাঘাতের আবশ্যকতা হয়; আমাদের জাগিবার সকল পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। লর্ড রিপণের মত হৃদয়বান মহাশয় বড়লাটের স্নেহময় শাসনে কি আমাদের জাগিবার কোন সম্ভাবনা ছিল? আমরা ক্রমাগত আদর পাইয়া আবদার করিয়া ইংরাজের মাথায় চড়িতাম। আমাদের আত্মবিস্মৃতি ক্রমেই বাড়িয়া যাইত। ভগবান আমাদিগকে একেবারে পরিত্যাগ করেন নাই, তাহার প্রমাণ ফুলারের কঠোর শাসন। কিন্তু অত্যাচার সহিয়া সহিয়া ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে অবসাদ প্রবেশ করিতেছিল; সুখশয্যা পরিত্যাগ করিয়া মধ্যাহ্নের খরতাপে বাহির হওয়ায় যাহারা অনভ্যস্ত, তাহাদের চারিদিকে হঠাৎ দাবানল জ্বলিয়া উঠিলে, সে উত্তাপ তাহারা কতদিন সহ্য করিতে পারে? এখন শান্তিলাভের জন্ত আমরা আকুল হইয়া উঠিয়াছিলাম, পরমেশ্বর দয়া করিয়া তাহার উপায় করিয়া দিয়াছেন; কিন্তু এই অদূর-সম্ভব শান্তির দিনে যেন আমরা আমাদের কল্যাণময়ী, নদীমেখলা, শস্যশ্যামলা, ছায়াশীতলা, স্নেহবিহ্বলা, 'শ্যামা জন্মদে' মাতৃভূমিকে ভুলিয়া না থাকি; তাঁহার শিল্প, তাঁহার ধর্ম্ম, তাঁহার সমাজ, তাঁহার সকল স্নেহের দান যেন ধীরে ধীরে আমাদিগকে মানুষ করিয়া তুলিতে পারে।

ফুলারের বিদায়ে কাহারও কাহারও চক্ষু অশ্রুসজল হইয়া উঠিয়াছে; কেহ কেহ ফুলারের বিদায়াভিনন্দনের আয়োজন করিতেছেন, ঢাকার নবাব তাহার প্রধান।

ফুলারের অভিনন্দন! পূজারী— ঢাকার নবাব।

যখন লাটপদে অবস্থান করিয়াও তিনি মফস্বলের জেলা হইতে পাদ্যার্ঘ্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তখন অস্তমিত তপনের পদে ঢাকার নবাব কোন্ আশায় অর্ঘ্য দান করিতেছেন, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। মুসলমানসমাজে এমন দাস্যভাব ত আভিজাত্যের লক্ষণ নহে। মুসলমানদিগকে তেজস্বী ও আমীরের জাতি বলিয়া জানি, ফুলার

তাহাদের সম্মুখে দুইএকখণ্ড উচ্ছিষ্ট অস্থি নিক্ষেপ করিয়াই তাঁহাদের হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে অভিষিক্ত করিবেন, ইহা কখন স্বাভাবিক হইতে পারে না। তেজস্বী ও মনুষ্যত্ব-বিশিষ্ট মুসলমানেরা কখনই এরূপ আত্মাবমাননার সমর্থন করিবেন না। বিশেষতঃ এরূপ অভিনন্দনদানের রাজনীতিক ফল ভাল হয় না। প্রজারঞ্জন কেবল রাজার নহে, রাজার প্রতিনিধিস্থানীয় কর্ম্মচারিগণের অবশ্যকর্ত্তব্য। ফুলার সে কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন নাই, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত গভীর আত্মানুশোচনা। অভিনন্দনাদিদ্বারা তাঁহার সে ক্ষতে প্রলেপ না দেওয়াই সঙ্গত। বোধ হয়, ফুলারের এরূপ দুইচারিখানি অভিনন্দনপত্রের আবশ্যকতা হইয়াছে। তিনি স্বদেশে ফিরিবেন—তাঁহার স্বদেশীয় সদাশয় লোকে তাঁহার প্রতি অঙ্গুলিনির্দ্দেশ করিয়া দেখাইবে, ঐ সার ব্যামফীল্ড ফুলার —প্রজার প্রতি উৎপীড়ন করিয়া অন্যায় জুলুমে ভারত-গবর্ণমেণ্টের সহায়তা বা সহানুভূতি না পাইয়া, চাকরী ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছেন। তখন ফুলার এইরূপ দুইচারিখানি অভিনন্দন দেখাইতে পারিলে, তাহাদের মুখ বন্ধ করিবার একবার চেষ্টাও করিতে পারেন। অভিনন্দনে একটা কথা লিখিলে সত্যের একটু মর্য্যাদা রক্ষা হইতে পারে—সে কথাটি এই,—সার ব্যামফীল্ড ফুলারের পীড়নের কল্যাণে আমাদের মৃতপ্রায় দেহে শক্তির সঞ্চার হইয়াছে। এই লাটের শাসনৈপুণ্যে ভারতে জাতীয়-জীবন গঠিত হইতেছে। লাট ফুলারের অভিনন্দনের মধ্যে নূতনত্ব নাই। নিদারুণ অত্যাচার ও অন্যায়াচরণের অপরাধে ওয়ারেণ হেষ্টিংস যখন পার্লিয়ামেণ্টে অভিযুক্ত হন, সে সময় কোন কোন ন্যায়ানুরাগী মনস্বী ইংরাজ তাঁহার বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের সত্যানুসন্ধানে রত ছিলেন। আর যাহাদের স্বজাতির উপর ওয়ারেণ হেষ্টিংস অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহাদেরই কেহ কেহ সভা করিয়া পার্লিয়ামেণ্টে দরখাস্ত পাঠাইয়াছিল। ওয়ারেণ হেষ্টিংস বড় ভাল লাট ছিলেন, তাঁহার রাজত্বে আমরা যেন রাম-রাজত্বে ছিলাম, তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিবার কোন হেতু নাই! দেখিয়া-শুনিয়া পৃথিবীর লোক যদি আমাদিগকে 'গোলামের জাতি' বলিয়া সম্বোধন করে, তাহা হইলে সেই তীব্র তিরস্কার আমরা নতশিরে সহ্য করিতে বাধ্য।

মিঃ উইলিয়ম জেনিংস ব্রায়ান সামান্য ব্যক্তি নহেন, ইনি পৃথিবীর সভ্যতম ও উন্নতির শীর্ষস্থানে অবস্থিত মার্কিনসাম্রাজ্যের এখন অদ্বিতীয় ব্যক্তি না হউন, দ্বিতীয় ব্যক্তি সন্দেহ নাই। বর্ত্তমান প্রেসিডেণ্ট মিঃ রুস-ভেল্টের পর মিঃ ব্রায়ানের প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ণ সম্ভাবনা বর্ত্তমান। বর্ত্তমানকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রাজনীতিকদিগের মধ্যে মিঃ ব্রায়ানের আসন অতি উচ্চে। তাঁহার মত চিন্তাশীল, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ রাজনীতিক, ভিন্নদেশ অর্থাৎ ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে প্রায়ই এদেশে পদার্পণ করেন না। সুতরাং ইংরাজের ভারতশাসন-সম্বন্ধে তিনি তাঁহার যে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা যে অত্যন্ত কৌতূহল-জনক হইয়াছে, সন্দেহ কি ? মিঃ ব্রায়ানের অভিজ্ঞতার পরিচয়ে বিস্মিত হইতে হয়।

মিঃ উইলিয়ম জেনিংস ব্রায়ানের ভারত-শাসন-বিচার।

মিঃ ব্রায়ান ব্যবহারাজীব হইলেও সমাজে তাঁহার যেরূপ মান-সম্ভ্রম, প্রতিষ্ঠা-প্রতিপত্তি ও গৌরব, তাহাতে তিনি বিলাতি লর্ডদের সমকক্ষ ব্যক্তি। লর্ডমিণ্টো এই সম্মানিত অতিথিকে সম্মান ও যত্ন প্রদর্শনে ত্রুটী করেন নাই। ভারতের বহুস্থানে ঘুরিয়া, ভারতপ্রবাসী ইংরাজসমাজে মিশিয়া, তিনি ভারতসম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই,—

"দেখিয়া-শুনিয়া-পড়িয়া আমার সুস্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, ভারতে বৃটীশ-শাসন-প্রণালী ন্যায়পরতার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। আমি অভিজ্ঞতা-ফলে জানিতে পারিয়াছি, বৃটীশরাজত্বে ন্যায় বা সুবিচারের অস্তিত্ব বর্ত্তমান নাই। লর্ড মিণ্টো লর্ড ল্যামিংটন, সার এণ্ড্রু ফ্রেজার ও সার জেমস্ লাটুস প্রভৃতি শাসনকর্ত্তাদের সঙ্গে কথায়-বার্ত্তায় বুঝিয়াছি, ইহাঁরা লোক ভাল, ইহাঁরা ইহাঁদের মত ন্যায়ধর্ম্মে রাজ্যশাসন করেন। কিন্তু ইহাঁদের কল্পিত ন্যায়ধর্ম্ম প্রকৃতন্যায়ধর্ম্ম নহে। অপরাধী যদি বিচারক হয়, তাহা হইলে সে যতখানি ন্যায়ধর্ম্ম রক্ষা করে, ইংরাজও সেই পরিমাণ ন্যায়ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া ভারতে রাজ্য চালাইতেছেন। ভারতের কর্ত্তৃপুরুষেরা ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্টের অধীন, ইংলণ্ডের গবর্ণমেণ্ট ইংলণ্ডের জনসাধারণের অধীন, কিন্তু ভারতীয় রাজপুরুষ ভারতীয় প্রজার অধীন নহেন; তাঁহারা ইংলণ্ডের মন্ত্রিসমাজকে সন্তুষ্ট রাখিতে ব্যস্ত, সুতরাং ইংরাজের জাতীয় স্বার্থে দৃষ্টি রাখিয়া তাঁহারা ভারতশাসন করেন, এরূপ অবস্থায় ন্যায়ধর্ম্মের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না; ভারতে তাহার অস্তিত্ব নাই।"

মিঃ ব্রায়ান ইংরাজের প্রশংসাও করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন, "অনেক ইংরাজই, ইংরাজের এবংবিধ শাসননীতির উপর হাড়ে-চটা। তাঁহাদের মত তাঁহারা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করিতে পরাঙ্মুখ হন না, ইহা ইংরাজ-জাতির গৌরবের কথা। ইংরাজরাজপুরুষেরা ভারতশাসনে যে ত্রুটী করিতেছেন, ইংলণ্ডের ইংরাজ তীব্র ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করিতেছেন। ইংরাজই দেখাইয়াছেন—ভারতের কোটী কোটী টাকা ইংরাজজাতি নিত্য হস্তগত করিতেছে। দরিদ্র ভারত ইংরাজকর্ত্তৃক প্রতিদিন নানা উপায়ে অধিকতর দরিদ্র হইতেছে—ইংরাজ তাহা সকলকে চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন। ভারতের আদালতে ইংরাজের আইন প্রচলিত, ইংরাজবিচারকের সেখানে আধিপত্য, অনেক ইংরাজম্যাজিষ্ট্রেট স্বজাতিপক্ষপাতদুষ্ট। দেশী ও বিজাতীয় বিচারে পার্থক্য বর্ত্তমান। ইংরাজের কথা হইতেই জানিতে পারা যায়, ভারতে ইংরাজশাসন সত্য ও ন্যায়নিষ্ঠার উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।"

সমালোচক ইংরাজ।

ইংরাজ যে ইচ্ছা করিয়া ভারতবাসীকে উচ্চপদে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহা ষ্টেট্ সেক্রেটারীর নিকট প্রেরিত এক লিটনী-গুপ্তলিপি হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। এই গুপ্তলিপিতে লাটলিটন ভারত-সেক্রেটারীকে লিখিয়াছিলেন, "ভারতবাসীর দাবী-দাওয়া যে কখন পূর্ণ করা হইবে না, ইহা বলাই বাহুল্য। পূর্ণ না করিবার দুটি পথ বর্ত্তমান। প্রথমপথ অবলম্বন করিলে স্পষ্টাক্ষরে বলিতে হইত, ভারতের লোককে উচ্চপদ, উচ্চ অধিকার দান করা হইবে না; দ্বিতীয়পথ প্রবঞ্চনার পথ; সেই পথ অবলম্বন করিয়া ভারতের লোককে ঠকাইয়া-রাখিতে হইয়াছে। ভারতের লোককে স্পষ্টভাষায় বলিয়া অধিকারচ্যুত করা হয় নাই; কিন্তু ১৮৫৮ সালের মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা আমরা অবলীলাক্রমে ভঙ্গ করিতেছি।" বহুদর্শী সূক্ষ্মবুদ্ধি মিঃ ব্রায়ান এ সকলই জানিয়াছেন, বুঝিয়াছেন, তাই তিনি লিখিয়াছেন,—

লিটনের গুপ্তলিপি।

"রুশিয়ার মত ভারতেরও স্বেচ্ছাতন্ত্র-শাসনপ্রণালী বর্ত্তমান। উভয় সাম্রাজ্যেই রাজশক্তি প্রচণ্ড; কিন্তু এক বিষয়ে রুশিয়ার অবস্থা অনেক ভাল।

রুশিয়ায় ও ভারতে।

রুশিয়ায় বিদেশী রাজপুরুষের অত্যাচার নাই, কিন্তু ভারতে বিদেশী রাজপুরুষের কর্তৃত্ব অব্যাহত; রুশিয়ায় যে-কিছু অত্যাচার তা রুশরাই করেন, ভারতে অত্যাচার করে বিজাতি ইংরাজ। রুশিয়ার প্রজার অর্থ রুশিয়াতেই থাকে, ভারতের প্রজার অর্থ বিদেশে—শাসনকর্তাদের দেশে চলিয়া যায়। রুশিয়াতে সম্রাটকে প্রজাশক্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট দেখা যাইতেছে, ভারতে প্রজাশক্তির প্রতিষ্ঠার কোনই লক্ষণ দেখা যায় না। দরিদ্র ভারতের ত্রিশকোটী টাকা প্রতি বৎসর সৈন্যপোষণের ব্যয়! যদি প্রজাদিগকে শান্ত করিয়া রাখিবার জন্য এত ব্যয়বহুল পল্টন রাখিতে হয়, তাহা হইলে প্রজাকে সন্তুষ্ট রাখিবার চেষ্টা না করিয়া পল্টনপোষণ করা কেন? আর যদি রুশের ভয়ই পল্টনপোষণের উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে এ ব্যয়ভার ইংলণ্ড নিজস্কন্ধে গ্রহণ করিতে বাধ্য। দরিদ্র ভারতকে ত্রিশকোটী টাকা প্রতি বৎসর হোমচার্জ্জ দিতে হয়—কেন? ভারতের করভার ইংলণ্ডের করভারের দ্বিগুণ, অথচ প্রত্যেক ইংলণ্ডবাসীর আয় প্রত্যেক ভারতবাসীর বিশগুণ।"

মিঃ ব্রায়ান্‌ তাহারও সদুত্তর দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন,—"ভারতের জাতীয়-মহাসমিতি গত ২০ বৎসর ধরিয়া যে শাসনপ্রণালীর জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা এপর্য্যন্ত দেওয়া হয় নাই, ইহার কারণ খুব জটিল নহে।

আত্মশাসন দেওয়া হয় নাই কেন?

নির্ব্বাচনদ্বারা গঠিত কোন প্রতিনিধিসভা প্রতিষ্ঠিত হইলেই সে সভায় দেশীয় সভ্যের প্রভুত্বলাভ অনিবার্য্য, তাঁহারা রাজ্যের আয়-ব্যয়ে দৃষ্টি রাখিবেন, ব্যয়ে হস্তক্ষেপ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ইংরাজগণ এরূপ ব্যবহার অনুমোদন করিতে প্রস্তুত নহেন। আয়-ব্যয়ে ভারতবাসী কিঞ্চিৎ অধিকার পাইলেই ইংরাজ এমন অবাধে অর্থাকর্ষণ করিতে পারিবেন না। প্রত্যেক উচ্চরাজকর্ম্মেও

ইংরাজের একচেটে অধিকার থাকিবে না। এইজন্যই ভারতে প্রকৃত আত্মশাসন-প্রথার প্রবর্ত্তন হইতেছে না। ইহাই আত্মশাসনের প্রতিষ্ঠা না করিবার কারণ, কিন্তু ভারতের কর্ত্তৃপক্ষ এ কারণের উল্লেখ না করিয়া দুটিদুই অপ্রকৃত কারণ খাড়া করিয়াছেন, (১) ভারতবাসী আত্মশাসনের যোগ্যতা এখনও লাভ করে নাই; (২) ভারতে নানাধর্ম্ম, নানাজাতি, তাহারা এক হইয়া কাজ করিতে পারিবে না।

কিন্তু এ সকল আপত্তি সঙ্গত নহে। ভারতে জাতিভেদ-ধর্ম্মভেদ আছে বটে, কিন্তু ভারতে সুশিক্ষিত ও বিদ্বান্ লোকের অভাব নাই। ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রতিবৎসর ইহাঁদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতেছে; আত্মশাসনের ভার পাইলে তাঁহারা যোগ্যতার সহিত তাহা পরিচালন করিবেন, বিবাদ-বিসম্বাদে তাঁহারা পথভ্রষ্ট হইবেন না। ধর্ম্মঘটিত বিবাদ-বিসম্বাদের কোন সম্ভাবনা নাই, এবিষয়ে ইউরোপের ন্যায় ভারতেও উদারতা প্রত্যক্ষীভূত। কংগ্রেস ও কন্‌ফারেন্সে নানাজাতি, নানাধর্ম্মের লোক আছে, কিন্তু সেজন্য বিবাদ-বিসম্বাদ নাই। ভারতে ক্রমে জাতীয়তার স্রোত বহিতেছে; স্বজাতিপ্রেমে ভারত ইংলণ্ড ও আমেরিকার অনুসরণ করিতেছে; জাতিধর্ম্মঘটিত অকিঞ্চিৎকর মিথ্যা আপত্তিতে ভারতবাসীকে আর ভুলাইয়া রাখা সম্ভব হইবে না। বিদেশীরা চিরদিন ভারতের সকল স্বত্ব ভোগ করিবেন, সর্ব্বস্ব স্বদেশে লইয়া যাইবেন—ইহা চিরদিন অবাধে চলিবে না। স্বাধীনতা না পাইলে কেহ স্বাধীনতালাভের যোগ্য হয় না, ইংলণ্ডের মহামন্ত্রী পরলোকগত মিঃ গ্লাডষ্টোন্ এ কথা স্বীকার করিয়াছেন, ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত নীতি। ভারতের লোক আত্মশাসনক্ষমতালাভের যোগ্য হয় নাই, এ অতি ফাঁকা কথা; আগে তাহাদিগকে সে ক্ষমতা দান কর, তাহার পর যোগ্যতা-অযোগ্যতার তর্ক তুলিও। ভারতবাসীকে উপযুক্ত হইবার অবসর দিলে তাহারা ইংলণ্ডের লোকের মতই উপযুক্ত হইবে। বস্তুতঃ বিদেশী শাসনকর্ত্তারা ভারত-বাসীদের মাথা তুলিতে দিতেছেন না, কিন্তু এভাব দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না; দেখিতেছি, ভারতবাসীর মধ্যে জাতীয়ভাব ক্রমে বিকশিত হইতেছে—লর্ডকর্জ্জনের কঠোর শাসনের চাপে জাতীয়ভাব মাথা তুলিতে সমর্থ হইয়াছে।”

আমরা সংক্ষেপে মিঃ ব্রায়ানের মত লিপিবদ্ধ করিলাম ; মিঃ ব্রায়ান্ বড় রাজনৈতিক চিকিৎসক, তিনি ঠিক রোগ চিনিয়াছেন, ঔষধের ব্যবস্থাও ঠিক্ করিয়াছেন ;

আশার কথা।

কিন্তু আমরা বুঝিতেছি, ইংরাজ-হাতুড়েদের এ পরামর্শ গ্রহণীয় মনে হইবে না, তাঁহারা রোগনিবারণের জন্য ক্রমাগত হাতুড়ি ঠুকিবেন। কিন্তু মিঃ ব্রায়ানের মত রাজনীতিবিশারদ সর্ব্বজনপূজ্য মার্কিণমহোদয়ের এই অযাচিত উপদেশ উপেক্ষার বিষয় নহে। আর কিছুদিন পরে যিনি আমেরিকার যুক্তমহারাজ্যের প্রতিনিধি-সম্রাটপদে উপবেশন করিয়া—বিদ্যাবুদ্ধি ও বৈভবে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের শাসনদণ্ড পরিচালন করিবেন—তাঁহার মত লোকের মুখ হইতে ভারতশাসনসম্বন্ধে এমন স্পষ্টকথা আর কখনও শুনি নাই, সেইজন্যই কথাগুলি উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয়। বিলাতের লিবারেল-মন্ত্রি-সমাজ কথাগুলি কিভাবে গ্রহণ করেন, তাহা জানিতে আগ্রহ হয় ; কিন্তু এ কথা ঠিক্ যে, যতই সঙ্গত মনে হউক, কার্য্যে তাঁহারা স্বার্থের প্রতিকূলে একপদও অগ্রসর হইবেন না ; সুতরাং ভারতকেই সর্ব্ববিধ প্রতিকূলাচরণ, অবিচার ও পীড়ন সহ্য করিয়া দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইতে হইবে, আমরা শতবিঘ্নের ভিতর দিয়া যে, সেই পথে অগ্রসর হইতেছি, ইহাই আমাদের আশার কথা।

শুদ্ধিপত্র।

এই সংখ্যার "ভারত-প্রসঙ্গ" প্রবন্ধে অনেকগুলি প্রুফের ভুল রহিয়া গিয়াছে। তার মধ্যে কতকগুলি অতি প্রয়োজনীয় ভুলের সংশোধন নিম্নে দেওয়া যাইতেছে :—

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬০৬	১২	করিয়াছে	করিতেছে
৬০৮	১১	ধাঁধাপথ	বাঁধাপথ
৬১০	১২ (ফুটনোট)	অগ্নি	আমি
,,	১৭	written long a article.	written a long article.
৬১৪	৪	পোষণ করেন	পোষণ করেন না
৬১৮	৬,৭	পঞ্জাব-কংগ্রেসের কনষ্টি-টিউশনটার সে দাবী	পঞ্জাবের কংগ্রেসে কনষ্টিটিউশনের জন্য সে দাবীটা
৬১৯	৭	আদর	অবসর
,,	,,	হরনাথ	হরনাম
,,	৯	,,	,,
,,	১০	পঞ্চম	পঞ্চ
৬২২	৬	দি জেনারেল	ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল
,,	৯	(The General Reformer)	The General Reformer

প্রার্থনা।

দেবি,

জীবন তুচ্ছ করিতে শিখাও, জীবন করিব ধন্য।

সকলের আগে সেবিতে চরণ—

সকলের আগে লভিতে মরণ

সেবকবর্গ-মাঝারে আমারে করগো অগ্রগণ্য।

জয়-পরাজয় মান-অপমান

না গণিয়া মনে হব আগুয়ান ;

অরির প্রহারে বক্ষেতে ক্ষত লভিব তোমারি জন্য। (১)

শুনি, পুরাকালে হইল যখনি

বীরের শোণিতে সিক্ত অবনী,

—কে পারে গণিতে—সে শোণিতে কত জনমিল বীরসৈন্য।

আজিকে আমার রুধির-ধারায়—

তোমার চরণতলের ধরায়

দেখি জাগে কিনা, লভিয়া শক্তি নবীন ভক্ত অন্য। (২)

লভিতে শিখাও ভীষণ আঘাত,

বহিতে শিখাও অসীম বিষাদ,

সহিতে শিখাও ফুল্লবদনে যাতনা-দুঃখ-দৈন্য।

বুলায়ে চরণ-ধূলি এ মাথায়,

ভুলায়ে তোমার মহিমা-গাথায়,

জীবন তুচ্ছ করিতে শিখাও, জীবন করিব ধন্য। (৩)

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আকবরশাহের বৈষ্ণবপ্রীতি।

মুসলমান সম্রাটগণের মধ্যে আকবরশাহের আসন অতি উচ্চ। হিন্দুসমাজেও তাঁহার নামে যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে। মহান উদারচরিত্রের জন্যই তিনি সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে "দীল্লিশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা" নামে পূজিত। রাজচরিত্রে সমদর্শিতা আর প্রজারঞ্জন-শক্তি থাকিলেই রাজা প্রজামাত্রেরই প্রিয়পাত্র হইয়া থাকেন। মহামতি জেলাউদ্দিন আকবরশাহ উক্ত গুণেই ভারতীয় জাতিগণের নিকট সম্মানিত।

কোন কোন তীক্ষ্ণবুদ্ধি ঐতিহাসিক আকবরের চরিত্র আলোচনা করিয়া তাঁহাকে কূটনীতিপরায়ণ অতি সুকৌশলী সম্রাট বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কেহ কেহ তাঁহাকে বিলাসী এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ বলিতেও কুণ্ঠিত নহেন। "নয়রোজা এবং খুসরোজকে" এই বাক্যের সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। যাহা হউক, আমরা অদ্য তাঁহার অপর একটা মহা উদারতাগুণের পরিচয় দিতে "বৈষ্ণবপ্রীতি" প্রবন্ধের অবতারণা করিতেছি।

কোন এক সময় কলিপাবন শ্রীগৌরাঙ্গভক্ত শ্রীমৎ রূপ এবং শ্রীযুক্ত সনাতনগোস্বামী শ্রীবৃন্দাবনের পূর্ব্বমাহাত্ম্য অনুভব করিয়া তাহার লুপ্ততীর্থগুলি আবিষ্কার করিতেছিলেন। এই সময় শ্রীবৃন্দাবনের যোগপীঠে অবস্থিত শ্রীশ্রীগোবিন্দজীর প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে, সনাতনগোস্বামী মোগলসাম্রাজ্যের ভিত্তিসংস্থাপক মহারাজ মানসিংহ দ্বারা আকবরশাহের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন। এই পুণ্য-কার্য্যে আকবর উৎসাহিত হইয়া মানসিংহের তত্ত্বাবধানে তেরলক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এক অত্যুৎকৃষ্ট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

আবার তাঁহার বাদশাহী দরবার, একদিন সঙ্গীতাধ্যাপক তানশান-কর্ত্তৃক সুমধুর গীতঝঙ্কারে মুখরিত হইতেছে, দরবারস্থ জনমণ্ডলীর সকলেই সঙ্গীত-তরঙ্গে ভাসমান হইয়া এক অতুল্য সুখানুভব করিতেছেন, কাহারও কোনরূপ চঞ্চলতা বা অন্যমনস্কতা উপলব্ধি হইতেছে না, সকলেই যেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ তানশানের কণ্ঠনিঃসৃত সঙ্গীতসুধায় আত্মহারা হইয়া আছেন। এমন সময়, সম্রাট সেই মহাশান্তিতরঙ্গ উদ্বেলিত করিয়া গভীর তীব্র অথচ ললিত মিষ্টস্বরে কহিলেন "কিন্নর, আপনার সুকণ্ঠনিঃসৃত বহুপ্রকারের ঈশ্বরস্তোত্র, মহিমা, করুণা ও ভগবদ্ভক্তিমিশ্র সঙ্গীত শুনিলাম, কিন্তু বর্ত্তমানকালের গৌড়ের ঈশ্বর সঙ্গীতগুরু শ্রীগৌরাঙ্গের স্তুতিপাঠ শুনিনা কেন? তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীযুক্ত সনাতনগোস্বামী দেবভাষায় অর্থাৎ সংস্কৃতে যে একখানি ভক্তিগীতাবলি লিখিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, আমিও তাহা অতি সমাদরে অতি যত্নে অধ্যয়ন করিয়াছি, সেই অতি মধুর পরমার্থসঙ্গীত কি আপনার কিছু শিক্ষা নাই? সেই সঙ্গীত শুনিতে আমার অতিশয় কৌতূহল হইয়াছে, ইচ্ছা পূর্ণ হইবে কি? সম্রাটের বাক্য শুনিয়া সঙ্গীতগুরু তানশান শিষ্যগণসহ অতি উচ্চ অথচ মিষ্টস্বরে সঙ্গীত আরম্ভ করিলেন,—

কেদারা—ধামার।

অখিল কলিমলনাশক! পরদেব সেবকপালক।
নবভূমীশ! হে শ্রীগৌরাঙ্গ নিখিল যুগভয়হারক।
জয়তু মানব ব্যাসমুনিকৃত লুপ্তধর্ম্মবিকাশক।
গোষ্ঠীং বিভো! কুরু সদানন্দং জয় মনোরথপূরকঃ।
পাদপদ্মে স্বান্ত ভৃঙ্গ স্তব নিমজ্জতু শীতলে
দুষ্টসঙ্গ হে হরে জহি পাতু বর্ব্বরশোধকঃ॥
যাচমেয় ম্লেচ্ছ কৃন্তন ভাব যাচক শর্ম্মদঃ।
বিলসতু সদা মনমানসে কলি দূষিতে ভবনায়কঃ॥

গীত সমাপ্ত হইলে, বৈষ্ণবসঙ্গীতপ্রিয় আকবর, তানশানকে এক-ছড়া মূল্যবান মুক্তামালা পুরস্কার প্রদান করিয়া কহিলেন "যখন দরবারে গীত গান করিতে থাকিবে, তখন অধিকাংশ সময় গোস্বামীর গীতাবলি হইতে সঙ্গীত গান করিবে।

আকবরের এই বৈষ্ণবসঙ্গীতপ্রিয়তা তাঁহার মহান উদারচরিত্রের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত নয় কি? তাহার পর আরও কথা আছে, বাদশাহ যখন রাজকার্য্য হইতে জীবনের অন্যকার্য্যে ব্যাপৃত হইতেন, অর্থাৎ যে সময় পণ্ডিতগণসহ ধর্ম্মশাস্ত্রালোচনা করিতেন, তখন তাঁহার সর্ব্বসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে আস্থাযুক্ত মহান হৃদয় কোরাণ, বাইবেল, বেদ, এমন কি, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অধিক আকৃষ্ট হইত। এই সমস্ত সর্ব্বজনসম্মানিত ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতীত তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনি-বিষয়ক তত্ত্ব পর্য্যন্ত আলোচনা করিতেন। সাধুসন্ন্যাসী এবং ভগবদ্ভক্ত বৈষ্ণবগোস্বামিগণের সম্মান করিতে গিয়া কে কোথায় কিভাবে থাকিতেন, তাহার বিশেষ অনুসন্ধান রাখিতেন। "হিন্দি ভক্তমাল" গ্রন্থ ও "পদসমুদ্র" গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, সম্রাট তানশানের সঙ্গীতচাতুর্য্যে প্রমুগ্ধ হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, "কিন্নর, তোমার সঙ্গীতগুরু কে? কোথায় অবস্থান করেন? অধুনা কি কার্য্যে লিপ্ত আছেন?" সম্রাটের শ্রীমুখের বাক্য শুনিয়া সঙ্গীতশাস্ত্রবিদ্ তানশান কহিলেন "হে রাজেন্দ্র! আমার গুরু শ্রীশ্রীবঙ্কুবিহারী দেবের কৃপাপাত্র আজমীরনিবাসী স্বামী হরিদাস। তিনি অধুনা শ্রীবৃন্দাবনে পবিত্রসলিলা কালিন্দীতীরে পর্ণকুটীরে বাস করিতেছেন। শুনিয়াছি, গুরুদেব অধুনা মহাশক্তিসম্পন্ন অতি বদান্য শ্রীমৎ সনাতন এবং শ্রীমৎ রূপ ও শ্রীমৎ গোপালভট্ট প্রভু-পাদগণের অনুগত। তাঁহাদের সঙ্গলাভে গুরুদেব অধুনা কোথায়ও যাইতে বা কাহারও সহিত আলাপ করিতে ভালবাসেন না।

সম্রাট তানশানের কথা শুনিয়া মনে মনে স্থির করিলেন—

বৃন্দাবনে গিয়া এই সকল মহাশক্তিশালী গোস্বামিগণকে দর্শন করিবেন। অগ্রে মহারাজমানসিংহের নিকট সনাতন ও রূপের তত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন। এখন আবার তানশানের নিকট হরিদাসস্বামীর বৃত্তান্ত শুনিয়া তাঁহাদের দর্শনজন্য অস্থির হইয়া উঠিলেন। অমনি মূল্যবান্ মণিমাণিক্য গোপনে সঙ্গে রাখিয়া তানশানের সঙ্গে গুপ্তভাবে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। অমূল্য বাদশাহী পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়া দীনহীন বৈষ্ণববেশে আগ্রারাজধানী হইতে পদব্রজে বৃন্দাবন যাইতে যাত্রা করিলেন।

সম্রাট মাত্র গুপ্তভাবে সাধুসন্ন্যাসী ও বৈষ্ণবগণের প্রণামী দিবার জন্য মহামূল্য মণিমাণিক্য সঙ্গে রাখিলেন। ইচ্ছা—যে সনাতন যদি মানসিংহের দ্বারা যেরূপ গোবিন্দজীর মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, সেইরূপ কোন দেবালয় প্রস্তুত করিতে চাহেন, তবে এই সকল মণি-দ্বারা সে কার্য্য সম্পন্ন হইবে। এইরূপে আকবরশাহের বৈষ্ণবপ্রীতি আমরা ভক্তমালগ্রন্থে অধ্যয়ন করিয়া তাঁহার উদারনীতির যথেষ্ট পরিচয় পাইয়াছি। তিনি মুসলমান সম্রাট, তাঁহার এই সমস্ত বৈষ্ণব-প্রীতি কি মহত্ত্বের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত নহে?

শ্রীচৈতন্য অন্তর্ধান করিলে তাহার ৯ বর্ষ পরে আকবরের জন্ম হয়। অর্থাৎ গৌরাঙ্গদেব ১৪৫৫ শকে দেহপাত করিয়াছিলেন। ১৪৬৪ শকে আকবরের জন্ম হইয়াছিল। এই ৯ বর্ষ ব্যবধানে শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবর্ত্তিত প্রথায় সনাতনপ্রভৃতি গোস্বামিগণ আত্মার উৎকর্ষসাধন করিয়া ভারতে বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুশীলন করিতেছিলেন।

যে সময় দিল্লীর বাদশাহী তক্তে ষোড়শবর্ষীয় হুমায়ুনকুমার প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে ৬৩ বর্ষ ভারতশাসন করিয়াছিলেন, তখন চৈতন্যপার্শ্বদ সনাতন, রূপ, গোপালভট্ট প্রভৃতি বৈষ্ণব মহাত্মগণ বৃন্দাবনে আসিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের শীতলছায়ায় অনেকানেক

পাপিতাপীকে আশ্রয় দিয়া তাহাদের প্রাণ-মন শীতল করিতেন ; সেই মহাদিনে আকবরের বৈষ্ণবপ্রীতির উদয় অসঙ্গত নহে। তিনি উদার-হৃদয়, প্রজাবৎসল, ধর্ম্মপ্রাণ নৃপতি ; তাই তাঁহার বৈষ্ণবগণের উদার ধর্ম্মপ্রথায় প্রাণ-মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। ইহা অস্বাভাবিক নহে। বস্তুতঃ ভারতের যবনভূপতিগণের মধ্যে আকবরশাহই প্রকৃত সম্রাট-নামের একমাত্র যোগ্যব্যক্তি। তাই, কৃতজ্ঞহৃদয় হিন্দুজাতি তাঁহার দুই একটা সামান্য শরীরগত চরিত্রদোষ থাকিলেও তাঁহার সৎগুণের পক্ষপাতিত্ব চিন্তা করেন নাই ; প্রত্যুত তাঁহাকে গল্পচ্ছলে স্থানে স্থানে শ্রীভগবান ও ভক্তের অবতার বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন।

একটী সামান্য গল্প আছে যে, আকবর "বালমুকুন্দ"নামক কোন মুক্তপুরুষ মহাত্মার দ্বিতীয় আদর্শ। এই বিষয়ে একটী ক্ষুদ্র গল্প আছে, যথা—কোন এক সময় ঋষি বালমুকুন্দ শিষ্যগণকর্ত্তৃক আনীত দুগ্ধ পান করিতেছিলেন। দৈবযোগে সেই সময় একগাছি গো-লোম দুগ্ধসহ তাঁহার মুখে যায়, তাই তিনি শিষ্যগণকে তিরস্কার করিয়া যোগবলে দেহত্যাগ করেন। এবং সেই পাপে ম্লেচ্ছবংশে আকবর-রূপে জন্মগ্রহণ করেন। আবার আরও একটী গল্পে প্রকাশ যে, "একদিন একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ নারায়ণের ধ্যান করিয়া প্রত্যাদিষ্ট হন যে, 'ব্রাহ্মণ তুমি দিল্লী গিয়া আকবরশাহকে দেখিয়া আইস তাহা হইলে আমার দর্শনলাভকার্য্য হইবে।' এই আদেশে ব্রাহ্মণ দিল্লী গিয়া উপস্থিত। কিন্তু তাঁহার ন্যায় দরিদ্রের পক্ষে সম্রাটের দর্শনলাভ সহজ নহে, তাই ব্রাহ্মণ বাদশাহের স্নানাগারের দরজায় পড়িয়া কাঁদিতে-ছিলেন। এমন সময় অন্তর্য্যামী আকবর তাহা জানিয়া গোলাম খস্রুকে কহিলেন 'নিকটে এক ব্রাহ্মণ আছে তাহাকে পাঠাইয়া দাও।' খস্রু কার্য্যান্তরে যাইতে তাঁহাকে পাঠাইয়া দিল। তখন আকবর চতুর্ভুজ

অনুপস্থিতিতেই চতুর্ভুজমূর্ত্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। গোলাম সামান্যমাত্র কিছু দেখিয়াছিল বলিয়া তাহার বংশধরগণ নাকি রোহিলা ব্রাহ্মণরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হইল”—ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সকল গল্পের উপাদানে হিন্দুর কৃতজ্ঞতা এবং আকবরের প্রজা-বৎসলতাগুণের পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে। তাই আমরা তাঁহার মহৎ চরিত্রের অনুগত। বৈষ্ণবপ্রীতিকে অবিশ্বাস করিতে সম্মত নহি। রাজভক্ত প্রজা, রাজার নামে কতদূর ভক্তিযুক্ত হয়, এই সকল গল্প এবং “বৈষ্ণবপ্রীতি” প্রবন্ধই তাহার উদাহরণ। আমাদিগের বর্ত্তমান রাজপুরুষগণের ইহা কি একবার আলোচ্য নহে?

শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য।

আহিতাগ্নিকার প্রতি।

[অনেক দিন পূর্ব্বে ভারতীতে “আহিতাগ্নিকা” শীর্ষক একটী কবিতা প্রকাশিত হয়। যিনি লিখিয়াছিলেন, তিনিই এই কবিতার উদ্দিষ্ট]।

পূর্ণ হোক্ তব অগ্নিব্রত,
কল্যাণের আনন্দের ব্রত;
জীবনের মাহেন্দ্রনিমেষে যাহা তুমি লয়েছ যৌবনে,
এতদিন আহুতি-সমিধে প্রাণপণে অখণ্ডসাধনে
যাহাদের করেছ, দেবি! কান্ত উর্জ্জস্বল,
যাহার মঙ্গলশিখা ধ্রুব সুনির্ম্মল
বরেণ্যা করেছে তোমা উদ্ভাসিয়া উদার ললাট,
স্থাপিয়াছে বাঙ্গালায় শুভ চিরন্তন তব যজ্ঞপাট;

আজি তব মূর্ত্তি স্বয়ম্বরা,
হোমশিখা করে শিবতরা,
সেই পূত যজ্ঞাগ্নির শিখায় নিয়ত
পূর্ণ হোক্ তব অগ্নিব্রত,
পূর্ণ হোক্ কল্যাণের ব্রত !

হে কল্যাণি ! তুমি বাঙ্গালার
ধ্রুবশীলা মূর্ত্তি দুহিতার ;
যদি তব ব্রতরাশি অসমাপ্ত থাকে অর্দ্ধপথে,
যদি শত যজ্ঞদ্রোহী করে বিঘ্ন আসিয়া চকিতে,
ভুলিবে কি পুণ্যবতী বঙ্গজননীরে ?
জননীর পর্ণশালা মন্দাকিনী-তীরে ?
শৈশবে যৌবনে বাল্যে প্রাণগতি যেথায় তোমার,
রাখিয়াছে এত স্মৃতি এত চিহ্ন কান্ত সুকুমার,
তা'ই তব ইহজীবনের
পাইয়াছে পদবী তীর্থের !
সার্থক করিবে তা'ই জীবন তোমার—
দেবি ! তুমি এই বাঙ্গালার
ধ্রুবশীলা মূর্ত্তি দুহিতার !

ধৃতব্রত জীবন যৌবন
থাকুক অক্ষত অনুপম !
ভূমা যাহা, ধ্রুব যাহা সনাতন বিরজভাস্বর
তাহারি সংযম-শান্তি রচে' দি'ক্ তোমার বাসর !

যাহা সত্য, সনাতন যুগযুগান্তের,
যাহা তব জননীর সুখের হিতের,
যে অগ্নি বরণ করি লইয়াছ মাথিয়া আত্মায়,
মলিন করোনা তারে সংসারের সহস্র ধূলায়!
জীবনের স্বর্ণসন্ধ্যাকালে
হোমাশিষ লয়ে স্বর্ণথালে
ব্রতান্ত ভগিনীমূর্ত্তি তব অনুপম
উজলুক্ বঙ্গের অঙ্গন!
ব্রতমুক্ত নির্ম্মল জীবন!

অন্তর্হিতা সরস্বতী ছুটাইয়া পঞ্চনদ হ'তে
অমরবাঞ্ছিত ধন দাও ঢালি' সমগ্র ভারতে!
মাতৃঋণ এজনমে এজীবনে নহে শোধিবার,
কন্যারূপে বারবার চায় তোমা জননী তোমার!
আশা, কান্তিপুষ্টিরূপে জাগিবে গো তোমার মুরতি,
যদি—যদি নাহি ভোল গুরুব্রত জননীর প্রতি!

শ্রীগঙ্গাচরণ দাসগুপ্ত।

কঠোরতা ও মৃদুতা।

এই বিচিত্র ধরাধামের অধিকাংশ অবলাই মৃদুতা বা কোমলতার প্রতিকৃতি। যাঁহাতে এই ভাবের অভাব বা অল্পতা, তিনি মহিলাসমাজে নিন্দিত ও উপহাসের আস্পদ হইয়া থাকেন।

এই নম্রভাব কেবল স্ত্রীসমাজেরই ভূষণ নহে, পুরুষগণেরও প্রধান গুণ বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। এইজন্য নীতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "বিনয়াদ্ যাতি পাত্রতাং"। দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিনয়ী বিদ্যাহীন হইয়াও নরনারীসমাজের প্রিয় হইয়া থাকে। পরন্তু ইহারও মাত্রার সীমা আছে, ইহারও উন্নতির পরাকাষ্ঠা আছে। এস্থলে এক হস্তীর কিম্বদন্তী পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার করা যাইতেছে। কোন স্থানে এক বৃহৎকায় অতি বিনয়ী মাতঙ্গ ছিল। প্রতিদিন সে ভোজনার্থ ইক্ষুদণ্ড পাইত; কিন্তু কাহাকেও আক্রমণ করিত না বলিয়া দুষ্ট বালকগণ তাহার সকল আখ হস্তসাত করিয়া মধুর রসের আস্বাদনে সুদীক্ষিত হইত; এজন্য গজরাজ দৈনন্দিন জঠরানলের প্রকোপে ক্ষীণকায় ও দুর্ব্বল হইতে লাগিল। দৈবযোগে অন্য এক সুচতুর হস্তী তাহার সমীপে আসিল। সে উহার নিকট আপন দুঃখকাহিনী ব্যক্ত করিল। নবাগত হস্তী বলিল যে, তোমার বিনয় সীমা অতিক্রম করিয়াছে, সেই হেতুই তুমি এইরূপ শোচনীয় দশায় পড়িয়াছ। তুমি যদি জীবনের আশা রাখ তবে বালকদিগকে ফোঁস ফোঁস শব্দ ও শুণ্ড উত্তোলন দ্বারা কৃত্রিম ভয় দেখাও, অবশ্যই উহারা তোমার কাছে আসিবে না। সে তাহাই করিল, আর তাহার সকল দুঃখ দূর হইয়া গেল। যিনি কেবল সখিভাবের রসিক হইয়া বৃন্দাবনে স্ত্রীবেশে কালহরণ করিতে চাহেন না, প্রত্যুত কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছুক, তাঁহার পক্ষে সীমাতীত

নম্রতা সুফলপ্রসূ নহে। তাঁহার পক্ষে কোমলভাবের পুতুল হওয়া শুভভবিষ্যতের প্রতিকূল। অতি মৃদুভাবের ন্যায় অত্যন্ত কঠোরভাবও হিতজনক নহে। এভাব সীমা অতিক্রম করিলেই মানব দৈত্যসংজ্ঞার সংজ্ঞী হয়েন, এবং তাঁহার ভয়ে বসুন্ধরা কম্পায়মান হইয়া উঠে। এবম্বিধ নরাসুরের সমক্ষে শোণিত-তরঙ্গিণীও প্রীতিবর্দ্ধক হয়, এবং পরমপ্রেমাস্পদ স্ত্রীপুত্রাদির মূলারোহণ ও অশ্রুপাতের কারণ হয় না। যদ্যপি রণরঙ্গভূমিতে বীরকেশরিগণও স্বজনের অন্তিম সময় দেখিয়া ভীত ও ভগ্ন হয়েন না, তথাপি ঈদৃশ ঘটনাতে তাঁহাদের হৃদয়-প্রান্তরে শোক-ঝরণা বহিতে থাকে, তাঁহাদের বক্ষঃস্থল তপ্তাশ্রুদ্বারা সিক্ত হইয়া যায়। অভিমন্যুশোকগ্রস্ত জগজ্জেতা গাণ্ডীবধন্বাই ইহার নিদর্শন। এই বীরচূড়ামণিতে মৃদুতা ও কঠোরতা এই ভাবদ্বয়ের সঙ্গম হইয়াছিল। ইঁহার শ্রীমুখ হইতে এই উভয়ভাবই যেন ক্ষরিত হইত, উভয়ভাবই যেন পরস্পর পরস্পরের বৈর ভুলিয়া গিয়া পার্থে বন্ধুতাসূত্রে বাঁধা পড়িয়াছিল। নৃশংস গুরুপুত্রে তাঁহার দয়াই ইহার প্রমাণ। বীর হইলে যে শুদ্ধ কঠোরভাবের আধার হইতে হইবে, ইহা অতীব ভ্রান্তিপূর্ণ সংস্কার। যাঁহাতে একমাত্র কঠোরতাই বর্ত্তমান এবং কোমলতার অভাব, তিনি দৈত্য-আখ্যারই যোগ্য,—তাঁহার জন্য সর্ব্বমান্য বীরপদবী নহে। ইহা কেবল তাঁহারই নিমিত্ত যিনি তীব্র শূরতানলে প্রজ্জ্বলিত ও মৃদুতা-সলিলে স্নাত, যিনি একহস্তে অরাতিকুলের মুণ্ড ছেদন করেন ও অন্যকরে শরণাগতদিগকে আশ্রয় দিয়া থাকেন। এই লেখকও উক্ত ভাবদ্বয়ের আকর বীরকেশরী মহাপুরুষের বহুদিন সঙ্গ করিয়াছে, যিনি প্রত্যক্ষরূপে জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন যে, মহাবীরই কোমতলার সমুদ্র। কহিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয় যে, এই পাপসংসারে অল্পদিন তাঁহার স্থিতি হইয়াছিল। ভগবান্ রামচন্দ্র যে জীবনসর্ব্বস্ব প্রণয়িনী বৈদেহীর বিয়োগে শোকে বিহ্বল হইয়া অচেতন

তরুগুল্মদিগকেও তাঁহার গমনসমাচার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যাঁহার জন্য সুদুস্তর রাক্ষসসমরে দুর্ব্বিসহ যাতনা ভোগ করিয়াও পরাঙ্মুখ হন নাই, যাঁহার পুনরুদ্ধার-কামনায় কিছু সময়ের জন্য প্রাণাধিক প্রিয়তম ভ্রাতা লক্ষ্মণকেও হারাইয়াছিলেন, বীররসে সিক্ত হইয়া আজ তাঁহারই প্রত্যাখ্যানের প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। আজ কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইয়া উত্তমাঙ্গনিহিত কুসুমকেই পদদলিত করিতে প্রস্তুত।

ভগবানের প্রতিজ্ঞা।

স্নেহং সখ্যঞ্চ দয়াঞ্চ যদিবা জানকীমপি
আরাধনায় লোকানাং মুঞ্চতোনাস্তি সেব্যথা।

বীরাগ্রণী রঘুকুলাবতংসের এই প্রকৃতিবৎসলতা কি বর্ত্তমানযুগের সভ্যতাভিমানীদিগের বর্ণভেদাদি নীতির পরিবর্ত্তনান্দোলনে উপনীত করে না! এই কর্ত্তব্য-বীরের অলোকসামান্য বীরতা কি প্রজাবর্গের রুধিরশোষণী নীতির উপর ধিক্কার জন্মায় না!

ইহাই বীরতাপদের প্রকৃত অর্থ, ইহাই ভারতের প্রাচীন বীর-কেশরিগণের অনুষ্ঠেয় ব্রত; এই ব্রতে যিনি ব্রতী হইতে পারেন তাঁহাকে কখনও আত্মম্ভরিতা স্পর্শ করে না, তাঁহাকে কদাপি পুত্র-কলত্রাদির মমতারূপ ক্লৈব্য কলুষিত করিতে পারে না; অন্যকথা দূরে থাকুক, তিনি কর্ত্তব্যব্রতের উদ্যাপনমানসে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রিয় প্রাণকেও হরণ করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, নরশোণিতদ্বারা পৃথিবী লোহিতাক্ত করাই শূরতা। অবশ্যই ইহাও বীরতার অঙ্গ, ইহাও বীরেন্দ্রগণের শ্লাঘনীয়। কিন্তু কর্ত্তব্য-মূঢ়তা সহচরী হইলেই ইহা অসুরতারূপ ধারণ করে, ইহা জনসমাজে উচ্ছেদকারিণী হয়। যাঁহার বীরতা-প্রান্তর মৃদুতা-কুসুমে সুশোভিত, কর্ত্তব্য-বুদ্ধি-নির্ঝরিণীর কলধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত, এবং যুগপৎ বিবেক-রবি ও প্রেম-শশীর কিরণে সমুজ্জ্বল, সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলে

তিনিই বীরকেশরিগণের অগ্রণী, তিনিই অনন্তকাল পর্য্যন্ত দূরদর্শি-গণের হৃদয়দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকেন, তিনিই জগতের নরনারী-গণের পূজনীয় দেব, তাঁহারই পদস্পর্শে বসুন্ধরা পুণ্যবতী হয়, এবং তাঁহারই চরিতামৃত পান করিয়া ভক্তগণ স্বর্গসুখও তুচ্ছ মনে করেন।

বীরবৃন্দের কোমলতা কখনও মোহ এবং কর্ত্তব্যমূঢ়তায় উপনীত হয় না। এই মৃদুতার সহিত অবলা ও সখিভাবাশ্রিত অর্দ্ধাবলাগণের কোমলতার অনেক অন্তর রহিয়াছে। বিবেক-চক্ষু দ্বারা গূঢ় অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, এই উভয়শ্রেণীরই কোমলতার অন্তরালে স্বার্থ লুক্কায়িত রহিয়াছে, উহার বহির্দ্দেশ নির্ম্মলবৎ প্রতীয়মান হইলেও অভ্যন্তরে কালিমার রেখা অঙ্কিত; এজন্যই মহাকবি ভবভূতি মৃদুতা ও কঠিনতার সহ ভাবই মহাপুরুষের চিহ্ন নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কোহি বিজ্ঞাতুমর্হতি।

এই অপূর্ব্ব মহাশ্লোকের প্রকৃত আশয় যিনি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, তিনি কখনও স্ত্রীজনোচিত নম্রতার পক্ষপাতী হয়েন না; তিনি তস্যদাস তস্যদাস ও তস্য চৌড়কুটী তস্য চৌড়কুটী ইত্যাদি আজব কোমলতার পুতুল হয়েন না। তিনি রক্ষকুলান্তক ও গাণ্ডীবধন্বার ন্যায় উভয়ভাবের উৎস হয়েন, তাঁহার হৃদয়-শৈলে যুগপৎ কঠোরভাব-দিনমণির উদয় ও মৃদুতা-তটিনীর সুশীতল প্রবহন হইয়া থাকে। কোমলতার মাত্রা বাড়িলেই পুরুষও অবলাপ্রকৃতি হইয়া পড়ে। ইহা যদ্যপি নবরসিকসমাজে আদরের জিনিস বলিয়াই গৃহীত হইয়া থাকে, তথাপি দূরদর্শী ও বীরসমাজের উপেক্ষনীয়, কেননা ইহার দ্বারা লৌকিক ও আধ্যাত্মিক জগতের প্রভূত অপকার হয়। লৌকিক অনিষ্টের কথা ইতিহাসাভিজ্ঞমাত্রেই বিদিত আছেন। বিবেচ্য আধ্যাত্মিক অনিষ্ট লইয়া ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত সিদ্ধান্ত যে, মৃদুপ্রকৃতির লোক

মানসিক বা শারীরিক কোন কঠিন পরিশ্রম করিতে পারে না। আহা মরি মরি, কি আকর্ণবিস্তৃত নেত্র! কি তিলকুসুমসন্নিভ নাসিকা! কি শ্রীমুখের কান্তি! যেন কোটিচন্দ্রমার প্রভা কেন্দ্রীভূত হইয়াছে; ইত্যাদি অর্থবাদেই তাঁহাদের কুশলতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহা দ্বারাই কি কর্ত্তব্যপ্রাণ প্রভু সন্তুষ্ট হইতে পারেন! তাঁহার অসংখ্য সন্তান অন্নাভাবে জীবনলীলা সমাপন করিতেছে, মূর্খতাক্রান্ত হইয়া দৈনন্দিন পশুভাবে ডুবিতে অগ্রসর ও রাজনীতির কূটজালে জড়িত হইয়া দুর্ব্বিসহ যাতনা ভোগ করিতেছে, আর কোমলতার প্রতিমূর্ত্তি আমাদের নবরসিকবৃন্দ প্রভুর ভাবাবেশে বা উহার ব্যপদেশে নাচিতেছেন, ইহা কি বিষম দৃশ্য! এবম্বিধ ভাবের আধিক্যে যে, দেশ অলসগণের আবাসভূমি হইবে, ইহার উল্লেখ কেবল পুনরুল্লেখমাত্র। এজন্যই উপনিষদে চীড়কুটী ভক্তি—যাহা কর্ম্মসম্পর্কশূন্য—নিন্দিত হইয়াছে। "ততো ভূয় এব তে তমো য উ বিদ্যায়াং রতাঃ"। যে কেবল উপাসনাই করে প্রভুর প্রিয়কার্য্যসাধনে উদাসীন, সে উপাসনাহীন কর্ম্মী অপেক্ষাও ঘোরনরকে যায়। এই মহামন্ত্র অপৌরুষেয় বাণীর যিনি অবমাননা করেন অর্থাৎ ইহাকে আদর্শ করিয়া চলেন না, তিনি অবশ্যই অশুভ ভবিষ্যৎ ভোগ করিবেন, তাঁহাকে নিশ্চয়ই পশুভাবের কিঙ্কর হইতে হইবে।

মহান কার্য্য সম্পাদন করা পৌরুষসম্পন্ন পুরুষেরই ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। ইহাতে অবলাপ্রকৃতি অবলা ও পুরুষাকৃতিবিশিষ্টের অধিকার নাই, তাঁহাদের জন্য ভাবের অশ্রুমোচনই বিধাতা নিয়ত করিয়াছেন। মৃদুতা ও কঠোরতার সমন্বয়ই মানবসমাজকে বিবেকানন্দলাভের অধিকারী করিতে পারে। ইহার পরেই নির্ব্বাণশৈলের সুশীতল সমীরণের সংস্পর্শ ও ব্রহ্মজ্যোতির বিকাশ।

স্বামী অচ্যুতানন্দ সরস্বতী।

অজবিলাপ।

রঘুবংশ, ৮ম সর্গ।

স কদাচিদবেক্ষিতপ্রজঃ
সহ দেব্যা বিজহার সুপ্রজাঃ
নগরোপবনে সচীসখো
মরুতাং পালয়িতেব নন্দনে ॥ ৩২

প্রজা-সুরক্ষণ-ব্রতী, সুনন্দন-রতি,
পুর-উপবনে আজি অজ মহীপতি
বিহরেন প্রেমানন্দে ইন্দুমতী সনে,
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ যেমতি নন্দনে॥

অথ রোধসি দক্ষিণোদধেঃ
শ্রিত গোকর্ণনিকেতমীশ্বরম্
উপবীণয়িতুং যযৌ রবে-
রুদগাবৃত্তিপথেন নারদঃ ॥ ৩৩

হেন কালে চলিলা নারদ মুনিবর
বীণাবাদ্যে পূজিবারে দেব মহেশ্বর ;
দক্ষিণসাগর-তীরে, গোকর্ণ-ভবনে,
চলে যথা দিনমণি দক্ষিণ-অয়নে।

কুসুমৈর্গ্রথিতামপার্থিবৈঃ
স্রজমাতোদ্য শিরোনিবেশিতাম্
অহরৎ কিল তস্য বেগবান্
অধিবাসস্পৃহয়েব মারুতঃ ॥ ৩৪

স্বর্গীয় কুসুমে গাঁথা মন্দারের মালা
শোভিছে বীণার গলে নভ করি আলা।
পরিমল-লোভে যেন দুরন্ত পবন
সবলে আসিয়া তারে করিল হরণ ॥

অভিভূয় বিভূতিমার্ত্তবীম্
মধুগন্ধাতিশয়েন বীরুধাং
নৃপতেরমরস্রগাপ সা
দয়িতোরুস্তনকোটিসুস্থিতিম্ ॥ ৩৬

বসন্ত-কুসুম-বাস জিনিয়া সৌরভে,
উজলিয়া দশদিক্ বরণ-গৌরবে,
মরত দুর্লভ সেই মন্দারের দাম
ইন্দুমতী-স্তনোপরি লভিল বিশ্রাম ॥

ক্ষণমাত্র সখীং সুজাতয়োঃ
স্তনয়োস্তামবলোক্য বিহ্বলা।
নিমিমীল নরোত্তমপ্রিয়া
হৃতচন্দ্রা তমসেব কৌমুদী ॥ ৩৭

স্তনদ্বয় ক্ষণসখী নিরখি অবলা,
মোহেতে অবশতনু পড়িলা বিভলা,
জনমের মত হায়! আঁখিদুটি মুদি;
রাহু যেন শশিসহ গ্রাসিল কৌমুদী ॥

বপুষা করণোজ্ঝিতেন সা
নিপতন্তী পতিমপ্যপাতয়ৎ।
ননু তৈলনিষেকবিন্দুনা
সহ দীপার্চ্চিরুপৈতি মেদিনীম্ ॥ ৩৮

ঢলিয়া পতির দেহে পড়িল যেমনি,
পাড়িল আপনাসাথে তারেও তেমনি।
নিবে যবে দীপশিখা লুটিয়া ধরায়,
তারি সঙ্গে তৈলবিন্দু ভূতলে গড়ায় ॥

উভয়োরপি পার্শ্ববর্ত্তিনাং
তুমুলেনার্ত্তরবেণ বেজিতা।
বিহগাঃ কমলাকরালয়াঃ
সমদুঃখা ইব তত্র চুক্রুশুঃ ॥ ৩৯

উভয়ের অনুচর আছিল যে সবে,
পূরিল দিগন্ত তারা হাহাকার রবে।
শুনি ধ্বনি সরসীর বিহঙ্গমকুল
সম-বেদনায় যেন কাঁদিয়া আকুল ॥

নৃপতের্ব্যজনাদিভিস্তমো
নুনুদে সা তু তথৈব সংস্থিতা।
প্রতিকারবিধানমায়ুষঃ
সতি শেষে হি ফলায় কল্পতে ॥ ৪০

ব্যজন যতনে পরে জাগিলা নৃপতি,
না মেলিলা নেত্র আর রাণী ইন্দুমতী।
নাহি রহে অবশেষ পরমায়ু যার
হয় কি চিকিৎসাগুণে তার প্রতিকার ?

প্রতি যোজয়িতব্য বল্লকী-
সমবস্থামথ সত্ত্ববিপ্লবাৎ
স নিনায় নিতান্তবৎসলঃ
পরিগৃহ্যোচিতমঙ্কমঙ্গনাং ॥ ৪১

ছিন্নতার বীণাসম গতপ্রাণা সতী—
প্রিয়ার জীবন-আশা ধরি নরপতি,
প্রাণের পুতলিটিরে তুলি ক্রোড়'পরে
উপচার করিবারে লন প্রেমভরে ॥

পতিরঙ্কনিষণ্ণয়া তয়া
করণাপায় বিভিন্নবর্ণয়া,
সমলক্ষ্যত বিভ্রদাবিলাম্
মৃগলেখামুষসীব চন্দ্রমাঃ ॥ ৪২

এই সে পতির কোলে লভিয়া আসন—
শিথিল-ইন্দ্রিয় আহা! মলিনবরণ—
ধরে শোভা অপরূপ রাণী ইন্দুমতী
উষায় শশীর কোলে মৃগাঙ্ক যেমতি ॥

বিললাপ স বাষ্পগদ্গদং
সহজামপ্যপহায় ধীরতাম্।
অভিতপ্তময়োঽপি মার্দ্দবম্
ভজতে কৈব কথা শরীরিষু ॥ ৪৩

সহজ-ধীরতা ত্যজি রঘুর নন্দন
বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে করেন রোদন।
উত্তপ্ত লোহাও গলে অনলে যখন,
কেমনে ধরিবে ধৈর্য্য মানুষের মন?

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

সমসাময়িক ভারত।

রাষ্ট্রনীতি।

(৪)

ইংলণ্ডের ভারত-সচিব ও কোম্পানী-আমলের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী—এই দুইজনের মধ্যে কিরূপ কথাবার্ত্তা চলিয়াছিল, আমি কতকটা কল্পনা করিতে পারি:—"এ কথা তোমাকে স্মরণ করিয়া দেওয়া বাহুল্যমাত্র যে, সর্ব্বাগ্রে তুমি ইংরেজ। ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যবর্ত্তী সমুদ্র-খাড়ীই ন্যায়ধর্ম্মের শেষসীমা; আমাদের খ্যাতনামা দার্শনিকেরাও এ কথা সপ্রমাণ করিয়াছেন। আজকাল বিশ্বপ্রেমঘটিত যে সব অস্পষ্ট মতবাদের প্রচার দেখা যায়, সে সমস্ত তোমার মন হইতে একেবারে ঝাড়িয়া ফেলিলেই ভাল হয়। এ কথা মনে রাখিও, উদারনৈতিক মত, রপ্তানীর জিনিস নহে, উহা শুধু ঘরের ব্যবহারের জন্য ("home consumption")। কিন্তু এই সমস্ত উপদেশে কোন ফল হইল না। সেই উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, উদারনৈতিক ভাবে ভরপূর হইয়া ভারতযাত্রা করিলেন।

আমি এ কথা বলিতেছি না, ভারত-সচিবমাত্রেই এই উদারনীতির বিরোধী; আমি শুধু রক্ষণশীল সচিবদিগের কথাই বলিতেছি। কিন্তু তাঁহারা ইচ্ছা করিলেও, উদারনৈতিক মনোভাবকে সম্পূর্ণরূপে আট্‌কাইতে পারেন না; কেননা, ভাবগুলা ধরিবার-ছুঁইবার জিনিস্ নহে;—উহা বড়ই সূক্ষ্ম। রক্ষণশীলদিগের কোন জালেই উহা ধরা দেয় না। ত'ছাড়া ইংরেজ, ইংরেজের চাম্‌ড়া লইয়াই বিদেশে যাত্রা করে। ইংরেজ চাহে যথেচ্ছাচারী প্রভু হইতে; কিন্তু সে ভিতরে-ভিতরে অজ্ঞাতসারে উদারনৈতিক। সমস্ত শাসনতন্ত্রটা বিচলিত হইবে কি না

এবিষয়ে দৃঢ়নিশ্চয় হইতে হইলে, ভারতকে ভাল করিয়া জানা আবশ্যক। যে সংস্কারকার্য্যে কোন বিষ আছে বলিয়া বিজয়ীরা সন্দেহমাত্র করেন না, হয়ত তাহাতেই কেউটেসাপের মারাত্মক বিষ প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে... যাঁহারা সভ্যতার প্রসারক, যাঁহারা বিশ্ব-হিতৈষী—বেন্‌টিঙ্কপ্রভৃতির ন্যায়, ১৮৩০ সালের সেই সব উদারনৈতিক পুরুষেরাই, ভারতীয় উদার-শাসননীতির রাস্তা বাঁধিয়া গিয়াছেন। অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ছাড়া, মেকলের আর কোন দোষ আমি দেখিতে পাই না। তিনি জাতীয় পার্থক্যের মূল সবলে উৎপাটিত করিয়াছেন। এতদিনের পর অনুতাপ করা বৃথা ;—ইংলণ্ড নিজেই ভারতকে রাজনৈতিক শিক্ষা দিয়াছেন। উদারনৈতিক কার্য্যকলাপ, জাতীয় আন্দোলন—সমস্তই, তাঁহাদের শিক্ষার ফল শুধু নহে, পরন্তু তাঁহাদের দৃষ্টান্তের ফল, তাঁহাদের শাসন-পদ্ধতির ফল।

যাঁহারা ভারতের প্রকৃত বিজেতা তাঁহারা সকলেই প্রায় বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ। যাহারা শুধু 'ভাগ্যশিকারী' ও যোদ্ধৃ-পুরুষ তাহারা অসির বলে তাঁহাদের পথের কতকগুলা বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিয়াছিল এই মাত্র। তাহার পর, যখন জয়লব্ধ এই সব পৃথক্ ভূমিখণ্ড সংযোজিত হইল তখন,—সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতের সম্মুখে অভিজ্ঞতার বিস্তৃত ক্ষেত্র প্রসারিত হইয়া যেরূপ তাঁহাদের নিকট সমাজতত্ত্বঘটিত বিবিধ জটিল সমস্যা উপস্থিত করে,—সেইরূপ বিবিধ রাজনৈতিক সমস্যা ঐ সকল রাজনীতিবেত্তাদিগের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাঁহারা অতীব ধৈর্য্যসহকারে এই সকল সমস্যার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হইলেন। থিয়োডোর বেক্ বলেন ;—"হৃদয়ের যে ভাব, ভারত-বাসিগণকে এক করিবার দিকে উন্মুখ, তাহা কতকটা দেশ-ঘটিত, যেমন শিখ ও বাঙ্গালীদের মধ্যে ; কতকটা ধর্ম্ম-ঘটিত, যেমন মুসলমান-দিগের মধ্যে ; কতকটা বর্ণভেদ-ঘটিত যেমন মারাঠা ব্রাহ্মণদিগের

মধ্যে; কতকটা গোষ্ঠী ও বংশ-ঘটিত; কতকটা পঞ্চায়ৎ-শাসন-ঘটিত— যাহার দ্বারা গ্রামবাসীদের একতা সম্পাদিত হয়।" এমন কোন সামাজিক তন্ত্র কিম্বা রাজনৈতিক শাসনতন্ত্র কি দেখা যায়, যাহা কোন-না-কোন হৃদয়-তন্ত্রীকে আঘাত না করে?—না; কোন কোন গ্রন্থে এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, এদেশে সকলপ্রকার ভাবেরই নমুনা কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের বহুপূর্ব্বে এদেশে কতকগুলি গ্রাম-সভা ছিল যাহা আমাদের (assemble's) সাধারণ-সভার ক্ষুদ্র আকার বলিলেও হয়। আমি পূর্ব্ব পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে, সালিশ্ নিষ্পত্তির আদালৎ সেই পঞ্চায়েতের উল্লেখ করিয়াছি; যে কোন বর্ণ হইতে পাঁচজন নির্ব্বাচিত হইয়া এই পঞ্চায়ত্ত-সভা গঠিত হইত। ইহাকে একটা ছোটখাটো (democratic) সাধারণতন্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বলিলেও হয়। এসিয়ার মধ্যে ইহা একমাত্র দৃষ্টান্তস্থল নহে। অ্যানাম-দেশেও গ্রাম-সভার কার্য্য গ্রামস্থ প্রধানদিগের দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। অবশ্য, এই সকল গ্রাম্য পরামর্শ-সভা ও পার্লেমেণ্ট—ইহাদের মধ্যে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। যদি কেহ জিজ্ঞাসা করে, এই অঙ্কুর হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইল না কেন, এই সকল স্থানীয় সভা একত্র হইয়া জাতীয় মহাসভা স্থাপন করিল না কেন, তাহার কারণ, এই সকল স্বায়ত্ততন্ত্র গ্রাম্য-সমাজগুলি পর-প্রবেশরোধী, পর-সংসর্গদ্বেষী ও সর্ব্বতোভাবে গণ্ডিবদ্ধ।

ইংলণ্ডের অধিকারভুক্ত হইবার পরেই ভারতের আত্ম-চৈতন্য জাগ্রত হইল। ইংরাজের অধিকারে আসিয়াই সমস্ত দেশ এক হইবার দিকে উন্মুখ হইল। এই বিস্তৃতপ্রায় দ্বীপের উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম এক শাসন-কেন্দ্রের অধীনে আসিয়া, একই শাসন-শক্তির বেগে চালিত হইতে লাগিল। কেননা, এতদিন ভারত লুণ্ঠিত হইয়া আসিতেছিল— বিজিত হইয়া আসিতেছিল; এখন উহাকে এক কেন্দ্রের অধীনে

আনা আবশ্যক হইল। মোগল-আমলে, সুবাদারদিগের শাসন তাহাদের স্বাধীন সুবা-সীমার মধ্যেই বদ্ধ ছিল। একটা দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর, বিভিন্ন জাতিকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছিল;—বিভিন্নবর্ণকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে পরস্পরের মধ্যে একটা অতীব সূক্ষ্ম ধর্ম্মের বন্ধন ছিল, কিন্তু তাহাও খুব শিথিল। এই সব টুক্‌রা-টাক্‌রা ও গুঁড়াগাড়ার সমষ্টি লইয়াই ব্রিটানীয় রাজসরকার সংগঠিত। এখন এই কেন্দ্রহীন বিশৃঙ্খল আণবিক রজোরাশি একটা কেন্দ্রের অভিমুখে চলিয়াছে; শুধু তাহাই নহে; যে দূরত্ব এদেশের একটা মস্ত প্রতিবন্ধক—রেলগাড়ী, ডাক্‌ঘর, বিদ্যুৎ-তারের ব্যবস্থা—এই সমস্ত, সেই দূরত্বের বাধাকে অপসারিত করিল। এইরূপে সহসা, মাদ্রাজ বম্বের নিকটবর্ত্তী এবং কলিকাতা পেশোয়ারের নিকট-বর্ত্তী হইল। ইংরেজি, দেশের সাধারণ ভাষা হইয়া দোভাষীর কাজ করিতে লাগিল; এবং এইরূপে দক্ষিণের তামিলজাতি ও উত্তরের শিখজাতি—ইহারা পরস্পরের কথা পরস্পর বুঝিতে সমর্থ হইল। কিন্তু আমি কাহারো কাহারো মুখে এই কথা শুনিতে পাই:—এই একতা শুধু একটা স্বপ্নমাত্র; ভারতবর্ষ একটা ভৌগোলিক শব্দমাত্র। তাহা হইলে বলনা কেন,—এই দেড়শত বৎসরের কেন্দ্রগত শাসনতন্ত্র, একটা সাধারণ ভাষা, দ্রুত যাতায়াতের ব্যবস্থাদি—এই সমস্ত, দুর্লঙ্ঘ্য-গণ্ডি বিভিন্নজাতির উপর কোন প্রভাব প্রকটিত করিতে পারে নাই। ভারত এখনো সম্পূর্ণরূপে এক হয় নাই বটে, কিন্তু একতার দিকে যে অগ্রসর হইতেছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তাছাড়া, একদল আত্মম্ভরী বিজাতীয় বৈদেশিক, দেশের বুকের উপর বসিয়া, দেশীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে, দেশের ধন নিঃশেষে শোষণ করিতেছে—ইহা দেখিয়া দেশের স্বজাতি-সংরক্ষণী বুদ্ধি জাগিয়া উঠিয়াছে। এই বিদেশি-বিদ্বেষ হইতেই "জাতীয়" দলের উৎপত্তি।

তাহার উপর আবার, সাত-সমুদ্র-পার হইতে, এই দেশের মাটির উপর, কতকগুলা উদার-নীতির বীজ আসিয়া পড়িল। যে সময়ে ভাগ্যশিকারী দস্যুর দল, লুটের মাল লইয়া ইংলণ্ডে ফিরিয়া যায়, প্রায় ঠিক্ সেই সময়ে,—অনপেক্ষিত ঔদার্য্য-সম্পদ লইয়া উদারনীতিলক্ষ্মী ভারতের নাট্যমঞ্চে প্রবেশ করিলেন। ভারতের পরম সৌভাগ্য যে, বেণ্টিঙ্কের ন্যায় মহানুভব ব্যক্তি ও মেকলের ন্যায় দুঃসাহসী উদার-চেতা—সেই সময়ে ভারত যুগপৎ প্রাপ্ত হইল। যে মুহূর্ত্তে মেকলে অনেক বুঝাবুঝির পর, প্রাচ্য-শিক্ষা-দীক্ষার স্থলে, যুরোপীয় শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, সেই পরিণামগর্ভ মুহূর্ত্তটি নাটকীয় ঔৎসুক্যের চূড়ান্ত মুহূর্ত্ত বলিতে হইবে। ঐ রাজনীতিজ্ঞ পুরুষের প্রতি শুধু এই বলিয়া দোষারোপ করা যাইতে পারে যে, তিনি দেশসম্বন্ধে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন, এবং তিনি যে কাজে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার একটু বাড়াবাড়ি ছিল। কিন্তু যাহাই হউক, অবশেষে তাঁহারই জয় হইল। তিনি লিখিলেন:—"য়ুরোপীয় শিক্ষা পাইয়া বোধ হয় ভারত, ভাবিকালে য়ুরোপীয় প্রতিষ্ঠানাদির দাবী করিবে...যদি কখন সে দিন আইসে তাহা হইলে, আমাদের ইতিহাসে সে দিনটিকে আমি পরম গৌরবের দিন বলিয়া মনে করিব।" এবং যে দিন, মহাত্মা বেন্‌টিঙ্ক প্রজার স্বত্বাধিকারসমূহের পুনরাবৃত্তি করিয়া, সেই ১৮৩৩ সালের প্রসিদ্ধ রাজবিধির ঘোষণা করিলেন, সেই দিন আবার অসীম আশার পথ উন্মুক্ত হইল। "ভবিষ্যতে,—কি ধর্ম্মভেদ, কি দেশভেদ, কি জন্মভেদ, কি দৈহিক বর্ণভেদ—এইরূপ কোন হেতুবাদে, ইংলণ্ডেশ্বরীর ভারতনিবাসী কোন প্রজাই, সরকারী পদ কিংবা কর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হইবে না।"

মহানুভব মোগল-সম্রাট—যিনি রাজপুতদিগের মধ্য হইতে তাঁহার সেনাপতি এবং ব্রাহ্মণদিগের মধ্য হইতে তাঁহার পুরোহিত নির্ব্বাচন

করিতেন—সেই আকবরও স্বহস্তে এইরূপ প্রতিজ্ঞাপত্র পূর্ব্বে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন; এবং ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাণী, গুরুগম্ভীর-ভাবে এই প্রতিজ্ঞাপত্রই দৃঢ়ীকৃত করেন। তাহা সত্ত্বেও, এই প্রতিজ্ঞা-পত্র নির্জ্জীব অক্ষরমাত্রেই রহিয়া গেল। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞাপত্রের উদারকল্পনাটি সাম্রাটিক ক্রোড়ে লালিত হওয়ায়, ভারতের দুর্দ্দিনেও, ভাবী আশার সূচনা করিল।

পরে ইংলণ্ডের রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটিল—তাহার তরঙ্গ-প্রতিঘাত ভারতেও আসিয়া পৌঁছিল। ইংলণ্ডের মন্ত্রিত্ব, হুইগ্-দলের হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া, টোরি-দলের হস্তে আসিল। ১৮৬১ সালে, ব্যবস্থাপক-সভায় দেশীয় লোকেরা প্রথম প্রবেশলাভ করে। প্রথম প্রথম এই সব ব্যবস্থাপক-সভায় সদস্যরূপে এমন-সব দেশীয় লোককে বাছিয়া-বাছিয়া মনোনীত করা হইত, যাহারা আদৌ ইংরাজি জানে না; তাহারা এই সব সভায় শুধু মূক-নাট্যের অভিনয় করিত। ইহাদিগকে কোনক্রমেই ভারতের প্রতিনিধি বলা যাইতে পারে না; ইহারা আপনারাই আপনাদের প্রতিনিধি। ক্রমে এই প্রহসন-নাট্যটা এই মূকদিগের নিকট বড় বেশী গম্ভীর বলিয়া ঠেকিতে লাগিল;—তাহারা শীঘ্রই ক্লান্ত হইয়া পড়িল। কতকগুলি রাজা, চিরবিদায়গ্রহণের জন্য প্রার্থী হইলেন। কিন্তু যে সকল বাঙ্গালী সদস্য, ইংরাজ রাজপুরুষ-দিগেরই ন্যায় ইংরাজিভাষায় পারদর্শী, তাঁহারা স্বকীয় সাভিনিবেশ শ্রমশীলতার পরিচয় দিয়া সকলেরই প্রশংসাভাজন হইয়া উঠিলেন। ঐরূপ একজন মূক সদস্যকে, তাঁহার কোন বন্ধু জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "সভায় যে বাদানুবাদ হয়, তুমি যখন তাহা বুঝিতে পার না, তখন কোন বিশেষ পক্ষের অনুকূলে ভোট্ দেও কি করিয়া?" কিন্তু ভাষা না জানিলেও, ভারতবাসী ভদ্রতার কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বেশ বুঝে। তিনি

সদস্তরূপে মনোনীত করিয়াছেন; সুতরাং সকল সময়েই তাঁহার অনুকূলে ভোট্ দেওয়াই আমার কর্ত্তব্য।” তাঁহার বন্ধু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—“তাহা যেন হইল, কিন্তু লাট্‌সাহেবের মতামত তুমি কিরূপে জানিতে পার?”—“ওহে, তা জানা খুব সোজা; যখন তিনি হাত তোলেন, তার মানে হচ্চে—‘হাঁ’; আর যখন তিনি হাত নামাইয়া রাখেন, তার মানে হচ্চে—‘না’...”।

১৮৯২ সালে, বাস্তবিকই উদারনৈতিক ধরণে এই সব ব্যবস্থাপক সভার কতকটা সংস্কার সাধিত হয়। লর্ড রিপণ—যিনি একজন উদারনৈতিক রাজপ্রতিনিধি ও খুব খাঁটি লোক—যাঁহার বিদায়কালে ভারতের লোক অতীব মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় দুঃখ প্রকাশ করিয়াছিল,—তিনিই তাঁহার শাসনকার্য্যে খুব ব্যাপকভাবে এই উদার-নীতি প্রয়োগ করেন। রাজপ্রতিনিধির ন্যায় “নেটিভেরাও” ব্যবস্থাপক-সভার জন্য কতকগুলি প্রতিনিধিনির্ব্বাচনের অধিকার প্রাপ্ত হইল। লর্ড রিপণ,—গ্ল্যাড্‌ষ্টোনের একজন শিষ্য। ইংলণ্ডে তিনি উদারনৈতিক ছিলেন; ভারতশাসনের ভার গ্রহণ করিয়াও, তিনি সেই উদারনৈতিকই রহিয়া গেলেন। অনেক ভাইসরয়েরই নানাপ্রকার উদার সঙ্কল্প ছিল—সৎ অভিপ্রায় ছিল; কিন্তু তাঁহারা কিছুই করিতে পারিলেন না কেন? তাহার কারণ,—আমি বলিতে যাইতেছিলাম—দফ্‌তরখানার কর্ত্তৃপক্ষ—যাহারা ভিতরে ভিতরে প্রতিকূল—পাছে তাহাদের সহিত কোনপ্রকার সংঘট্ট উপস্থিত হয়। কিন্তু তাহা অপেক্ষাও বেশী—দফ্‌তরখানা-মহলের আকাশে একটা বিশেষ মতামতের হাওয়া চলে—সেই সব মতামত সকল কর্ম্মচারীরই মুখে—সেই সকল মতামত তাহাদের রিপোর্টেরও মধ্যে; সুতরাং এই সকল মতামতের বিরুদ্ধে কাজ করিতে পারেন, এরূপ দৃঢ়চেতা ভাইস্‌রয় অতীব বিরল: সৌভাগ্যক্রমে, লর্ড রিপণের উদারহৃদয় জ্বলন্ত আশার আলোকে

পূর্ণ ছিল। আমাদের সাধারণ-সভার অনুরূপ তিনি প্রত্যেক জেলায় এক একটি (District Board) জেলা-সমিতি স্থাপন করিলেন। আয়ব্যয়ের হিসাব মঞ্জুর করা এবং আয়ের টাকা যথাযথরূপে নিয়োগ করাই ঐ সমিতির কাজ। এই জেলা-সমিতিতে করদাতৃগণ আপনাদের প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিয়া পাঠাইতে পারেন। এবং এই প্রতিনিধিগণ আপনাদের সভাপতিও নির্ব্বাচন করিতে পারেন। এই জেলা-সমিতিতে প্রায়ই রাজকর্ম্মচারীরা থাকেন ;—তবে, কেবল রাজকর্ম্মচারী নহে,—রাজকর্ম্মচারী ছাড়া অন্য লোকও থাকে ; দেশীয় করদাতৃগণের প্রতিনিধিও থাকে। ইহা অতি উত্তম কল্প। এ-হেন বিশাল ভারতরাজ্যের শাসনকার্য্যনির্ব্বাহার্থে বিভিন্ন শাসন-কেন্দ্র সকল স্থাপন করা, দেশীয় লোকদিগের মধ্যে স্বায়ত্তশাসনের রুচি জন্মাইয়া দেওয়া, তাহাদিগকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দেওয়া—এই কার্য্যপদ্ধতিটি প্রভূত বিজ্ঞতার পরিচায়ক সন্দেহ নাই। বস্তুতঃ রিপণ যথাপাত্রেই তাঁহার বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রাম-পল্লীর কার্য্য এখন সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইতেছে। কিন্তু জেলা-সমিতির আয়ব্যয়ের বরাদ্দ নিতান্ত স্বল্প হওয়ায় এবং উহাতে সরকারী কর্ম্মচারীর সংখ্যাধিক্য থাকায়, লর্ড রিপণের উদারনৈতিক অভিপ্রায় অনেকটা ভণ্ডুল হইয়া গিয়াছে।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে, ন্যাশানাল-কংগ্রেসের আন্দোলন কতকটা সফল হইয়াছিল। এক্ষণে বড়লাটের ব্যবস্থাপক-সভা ও মান্দ্রাজ, বোম্বাই, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ব্যবস্থাপকসভারূপ দুর্গের কিয়দংশ প্রাচীর ভেদ করিয়া একটা প্রবেশপথ উন্মুক্ত হইয়াছে ; পথটি সংকীর্ণ হইলেও তাহার মধ্য দিয়া কতকগুলি দেশীয় প্রতিনিধি প্রবেশ-লাভ করিয়াছে। এদেশের প্রকৃত মুখপাত্রদিগের আগমনে, সেই সব "মূকেরা" তাহাদিগকে আসন ছাড়িয়া দিয়াছে। ১৮৬১ সালের আইন

অনুসারে, বড়লাটের ব্যবস্থাপকসভা ৫ জন সাধারণ সদস্য লইয়া গঠিত; শাসন-সংক্রান্ত কার্য্যভার তাহাদের উপর। ঊর্দ্ধসংখ্যা আরো ১২ জন অতিরিক্ত সদস্য উহাতে সংযোজিত হইয়া ঐ সভাই ব্যবস্থাপকসভায় পরিণত হইয়াছে। এই ১২ জনের মধ্যে অর্দ্ধেক সরকারী কর্ম্মচারী, এবং অপরার্দ্ধ অন্য লোক। এই ১২ জন সদস্য-নির্ব্বাচনের কর্ত্তা—স্বয়ং বড়লাট। সুতরাং অধিকাংশ প্রতিনিধি তাঁহারই আয়ত্তাধীন। ১৮৯২ সালের নূতনাবিধি-অনুসারে, ১২ জনের স্থলে অতিরিক্ত সদস্য ১৬ জন হইল। তন্মধ্যে ৬ জন সদস্য বড়লাট, সরকারী কর্ম্মচারীর মধ্য হইতে মনোনীত করেন; অবশিষ্ট দশজন বে-সরকারী সদস্য। এই দশজন বে-সরকারী সদস্যের মধ্যেও, বড়লাট ৫ জন নির্ব্বাচন করেন। অবশিষ্ট ৫ জনের মধ্যে, কলিকাতার Chamber of Commerce আপনাদের মধ্য হইতে একজন উমেদার খাড়া করেন। মাদ্রাজ, বোম্বাই, বঙ্গদেশ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল—ইহারাও প্রত্যেকে এক একজন উমেদার আনিয়া খাড়া করে। পরিশেষে, প্রাদেশিক-ব্যবস্থাপক-সভার বে-সরকারী সদস্যগণ-কর্ত্তৃক এই সকল উমেদার সদস্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। সভায় ইহারা শুধু প্রস্তাব করে মাত্র, কিন্তু শেষনিষ্পত্তি বড়লাটের হাতে। প্রতিনিধিদের শুধু আর্জ্জি—বড়লাটের মর্জ্জি। তাঁহার সম্মতি ব্যতীত কোন প্রস্তাবই গৃহীত হয় না। আসলে এই সকল প্রতিনিধি দেশের সাধারণ প্রজামণ্ডলীকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয় না। ইহারা সম্প্রদায়-বিশেষের—ব্যবসাদার-সমাজ-বিশেষেরই মুখপাত্র;—ইহারা ঐ সকল সম্প্রদায়ের বিশেষ বিশেষ স্বার্থই সমর্থন করিয়া থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বোম্বাই ব্যবস্থাপকসভাটি কিরূপ উপাদানে গঠিত দেখা যাউক। ১১জন বে-সরকারী সদস্যের মধ্যে, ৮ জন সদস্য ম্যুনিসিপালিটি, বিশ্ববিদ্যালয়, ও বিভিন্ন ব্যবসাদার-সমাজ হইতে প্রেরিত হয়। এই সকল সদস্যের সংখ্যাবিন্যাস এরূপ চাতুর্য্যসহকারে নিষ্পন্ন হয় যে, কি প্রাদেশিক ছোট-

লাটের সভা, কি বড়লাটের সভা—উভয় সভাতেই অধিকসংখ্যায় মতামত ঐ লাট্‌দিগেরই স্বপক্ষে হইবারই কথা। প্রতিনিধিগণের প্রশ্ন করিবার অধিকার আছে—কিন্তু তাহাও নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে। সরকার পূর্ব্ব হইতেই যে সকল প্রস্তাব স্থির করিয়াছেন, সেই সকল প্রস্তাব-সম্বন্ধে প্রতিনিধিগণ নিজ মতামত ব্যক্ত করিতে পারেন মাত্র ; তাঁহারা স্বতঃ কোন প্রস্তাব উপস্থিত করিতে পারেন না। বিধিব্যবস্থা-প্রণয়নের জন্যই তাঁহারা আহূত হইয়াছেন, শাসন-সংক্রান্ত কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহাদের ক্ষমতা নাই। মোট কথাঃ—দেশীয় আন্দোলনের ফলে, দেশীয় লোকেরা বড়লাটের ব্যবস্থাপকসভায় চারিটি আসন এবং প্রাদেশিকসভাগুলিতে তাহার দ্বিগুণ আসন প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাই ভাবী ইমারতের প্রথম পত্তন-প্রস্তর।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিহারে হিন্দু-পার্ব্বণ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

(১১) সুখ-রাতি।

সুখ-রাত্রি বা দিবালী (দীপাবলী) বিহারী হিন্দুদিগের একটি বিশেষ উৎসবের দিন। কলিকাতাসহরে পশ্চিমদেশীয় বহুবিধ লোকের বসবাস হওয়াতে, ইদানীং, দিবালীর দিন, তাহাদের বিপণী ও গৃহাদি বিবিধবর্ণের আলোকমালায় সজ্জিত হইতে এবং নানারূপ বাজী পোড়াইতে, সকলেই দেখিয়াছেন, কিন্তু ঐ সময় উহাদের যে পরব হইয়া থাকে, তাহা অনেকেই অবগত নহেন।

দিবালীর পূর্ব্বদিন 'যম-ডিরি' (ডিরি অর্থে ক্ষুদ্রপ্রদীপ) নামক ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। ইহাতে প্রত্যেক গৃহস্থ গোবরের একএকটী প্রদীপ নির্ম্মাণ করিয়া 'গোঁড়ী' (গোশালা) নামক স্থানে জ্বালাইয়া দেয়। 'গোঁড়ী' অর্থে প্রকৃত গোহাল নহে। এদেশে পশ্বাদি রাখিবার তিনপ্রকার স্থান আছে। গোহার, গোঁড়ী ও বাথান। বাথান সুদীর্ঘ শালকাষ্ঠদ্বারা বেষ্টিত অনাবৃত পশুশালা। 'গোহার' (গোহাল) বঙ্গদেশের অনুরূপ আবৃত। গোঁড়ী, গোহালের বহির্ভাগে একটী প্রশস্ত স্থানে একটী নাতিউচ্চ সুদীর্ঘ পাত্রে গো-মহিষাদিকে খাইতে ও জলপান করিতে দেওয়া হয়। ইহাতে একসঙ্গে এককালীন অনেক পশুর আহারের স্থান সংকুলান হইয়া থাকে। ইহাকেই গোঁড়া কহে। গবাদির মঙ্গলার্থে দিবালীর পূর্ব্বদিন ঐ স্থানে গোময়-প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়।

যম-ডিরির পরদিন, 'দেব-ডিরি' বা 'দিবালী'। প্রত্যেক বাঙ্গালী হিন্দুর গৃহ-প্রাঙ্গণে যেরূপ এক একটি তুলসীমঞ্চ থাকে এবং তাহাতে সন্ধ্যা-দেখান, হরির-লুট-দেওয়া প্রভৃতি অধিকাংশ সাংসারিক মাঙ্গলিক ও দৈবীকার্য্য সম্পন্ন করা হয়, তদ্রূপ বিহারী হিন্দুদিগের গৃহে 'তুলসী-পীণ্ডা' (তুলসী-মঞ্চ) ব্যতীত 'শিরা' নামক একটি নাতিউচ্চ ও নাতিপ্রশস্ত ক্ষুদ্র বেদিকা থাকে, ঠাকুরকে বাতাসা-চড়ান, ভোগ-লাগান প্রভৃতি বহুবিধ দেবীকার্য্য ঐ বেদিকায় সম্পন্ন করা হয়। উক্ত শিরাতে এবং তুলসী-পিণ্ডায় দেব-ডিরির দিন ঘৃত-প্রদীপ জ্বালিয়া দেওয়া হয়। ঘৃত-প্রদীপ দেওয়া হইলে, গৃহের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তৈল-প্রদীপ জ্বালিয়া দেয়। আর প্রাঙ্গণের মধ্যস্থানে "ঘড়কো" নামক একটি মৃৎবেদিকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে লাজাপূর্ণ মৃৎভাণ্ডসকল স্থাপন করিয়া ধূপ্-ধূনা ইত্যাদি জ্বালিয়া দেওয়া হয়। দিবালীর রাত্রিতে বালক ও যুবকেরা আসমানতারা, সন[illegible]তারা

(হাউই), মুররা (ছুঁচোবাজী) প্রভৃতি বাজী পোড়াইয়া আমোদ করিয়া থাকে।

মল্লিখিত "রাম-অনুগ্রহের বিদ্যারম্ভ"-নামক প্রস্তাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, 'চক্‌চন্দার' দিন, পাঠশালার গুরুজীরা গণেশের প্রতিমূর্ত্তি সহিত ছাত্রবৃন্দ সঙ্গে লইয়া তাহাদের বাড়ী-বাড়ী পুরস্কার আদায় করিয়া থাকে। তদ্রূপ দিবালীর সময় মকৃতবের (ফার্শী-পাঠশালার) মদর্‌রিস্ (মৌলুবী) তাল্‌বিলিম্‌দের (বিদ্যার্থীদের) গৃহ হইতে কিছু কিছু আদায় করিয়া থাকেন। তখন তিনি নিম্নলিখিত কহাবৎ (পদ্যটী) আবৃত্তি করেন। যথা—

থানেকা সুখরাতি,
বাজানেকা খরশূপ্।

অর্থাৎ খাইবার পক্ষে উৎকৃষ্ট দিন সুখরাত্রি (দিবালী) এবং বাজাইবার পক্ষে প্রশস্ত যন্ত্র খরশূপ্ (কুলো) !!! তখন ছাত্রগণও নিম্নলিখিত বয়েৎটী (পদ্য) আবৃত্তি করিতে করিতে স্বীয় পিতামাতার নিকট হইতে মৌলবীসাহেবের সাহায্যজন্য দুইচারি আনা, যাহার যেমন সাধ্য, প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যথা—

দিবালী আমদা শরশূদ্ মোজাইয়াম্।
দরো দিবার আনবরশূদ্ বগল্‌শান্॥
চেরাগো নবানো কুচাবো কুচা।
বাতাসা শীর্ণি হালুয়া পুয়া॥

অর্থাৎ দিবালী আয়া, হর জগহঃ রাৎকো খুশী হো রহা হ্যায়; ঘর, দরওয়াজা, গলি, কুচামে চিরাগ্ (প্রদীপ্) বারা যাতা হ্যায়; সব কোই বাতাসা, শীর্ণি (মিষ্টান্ন), হালুয়া, পূয়া (মাল্‌পো) খা রহা হ্যায়।

বস্তুত দিবালীর রাত্রিতে অধিকাংশ গৃহস্থের গৃহ ও বিবিধ দোকানদারের বিপণী লাল-নীল-পীতাদি বিবিধবর্ণের আলোক-মালায় সজ্জিত হইলেও, সর্ব্বাপেক্ষা হালুয়ায়ি-(ময়রা)-গণের দোকান উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত করা হয়। সুমার্জ্জিত উজ্জ্বল থালায় করিয়া লাড্ডু, পেড়া, এলাচিদানা প্রভৃতি হইতে সোয়ানপাপ্‌রী, ঘিয়োর পর্য্যন্ত, থরে থরে সাজাইয়া রাখিয়া, ঐ রাত্রিতে মিষ্টান্নবিক্রেতাগণ যথেষ্ট রোজগার করিয়া থাকে।

দিবালীর দিন এদেশে বহুকাল হইতে ধনবানদিগের মধ্যে গোপনে জুয়াখেলা চলিয়া আসিতেছে। ইদানীং জুয়াখেলাসম্বন্ধে পুলিসের কড়াকড়ি হওয়াতে, পাশ্চাত্যপ্রথায় স্ফূর্ত্তি-খেলার অনুকরণে ইহারাও "গোরক্ষণীসভার সাহায্যকল্পে" বা এইরূপ কোন একটা সাহায্যের ছুতা করিয়া দ্যূত-ক্রীড়া করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতেও সময়ে সময়ে পুলিসের শ্যেন-চক্ষু এড়াইতে না পারিয়া, মোকদ্দমা-মামলায় পড়িয়া, উকীল-মোক্তার ও ব্যারিষ্টারগণের উদরপূর্ত্তি করিতে বাধ্য হয়।

(১২) জেঠান্।

জেঠান্ একটি একাদশী বিশেষ। ইহার বিশেষত্ব এই যে, এই দিনে অন্য কিছু খাইতে নাই, কেবল 'সুৎনী'-নামক একপ্রকার কন্দ (মূল) দ্বারা ফলাহার করা হয়। তখন ব্রাহ্মণ আনাইয়া একটি শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি হিন্দোলায় ঝুলাইয়া, নিম্নলিখিত কবিতার্দ্ধ আবৃত্তি করা হয়। যথা—

জাগত্র জাগত্র ত্রিলোকনাথ !

তখন সমাগত বালকবালিকা ও দর্শকমণ্ডলী মধ্যে মিষ্টান্ন-প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

মাঘে—

(১৩) তিল-সংক্রান্ত্।

তিলসংক্রান্তি-পার্ব্বণ আমাদের দেশেও আছে; কিন্তু এদেশের ক্রিয়াকলাপের বিশেষ বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। নূতন ধানের ‘চুড়া বানাইয়া’, দুগ্ধ-কদলী-বাদাম-ছোহারা প্রভৃতি মিশ্রিত করিয়া, ব্রাহ্মণ দ্বারা হোম করান হয়। উক্ত মিশ্রিত দ্রব্যকে ‘সাকল্’ কহে। উক্ত হোমাবশিষ্ট দ্রব্যের দ্বারা ব্রাহ্মণ-ভোজন করান হয়। তৎপরে গৃহস্থেরা প্রথমে আতপতণ্ডুল, তিল, তিলবা (বীরখণ্ডী) খাইয়া পরে দহি-চুড়া খাইয়া থাকে।

(১৪) বসন্ত্-পঞ্চমী।

শ্রীপঞ্চমীর অপর নাম বসন্তপঞ্চমী; কারণ ঐ দিনে বসন্ত-কালের প্রারম্ভ হইয়া থাকে। প্রাচীন ব্যক্তিদিগের মুখে শুনা যায় যে, কলিকাতাসহরে পূর্ব্বেকার লোকেরা বসন্ত-পঞ্চমীর দিন হইতে শাল, দোশালা, রুমাল, বনাত প্রভৃতি শীতবস্ত্র ত্যাগ করিয়া, সাদা বা বাসন্তী রঙ্গের উড়ানী ইত্যাদি গ্রীষ্মকালীন ব্যবহারোপযোগী বস্ত্র ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিতেন—শীতবস্ত্রাদি এককালীন তুলিয়া রাখা হইত। কিন্তু (তাঁহারা বলেন) কালের কি বিচিত্র গতি! এখন ফাল্গুন চৈত্র মাসেও গরম কোট্, মোজা, কম্ফর্টার নহিলে চলেনা। ঋতুপরিবর্ত্তনের সময় বরং বড় বড় ইংরাজ ডাক্তারেরা অল্ষ্টার-মান্ষ্টার প্রভৃতি বড় বড় গরম কোট ব্যবহার করিতে উপদেশ দিয়া থাকেন!

বসন্ত-পঞ্চমীতে এদেশে কোন বিশেষ ক্রিয়াকলাপ লক্ষিত হয় না; কেবল শিবরাত্রির দিন যে শিবের বিবাহ হইবে, ঐ দিনে তাহার ‘তিলক’ (বৈবাহিক আশীর্ব্বাদ) করা হয়। শিবজীর মস্তকে আম্রের

মুকুল ও আবীর 'চড়ান' হয়। তৎপরে উৎসর্গীকৃত মিষ্টান্ন দ্বারা ব্রাহ্মণেরা প্রসাদ পাইয়া থাকেন।

আর একটি নূতন প্রথা এদেশে লক্ষিত হয়, ইহা বাঙ্গালাদেশে আছে কিনা জানি না। এদেশের নর্ত্তকীরা বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিতা হইয়া ঘোড়ার গাড়ী করিয়া বসন্ত-পঞ্চমীর দিনে আমীর-ওমরাহদিগের বাড়ী বাড়ী অযাচিতভাবে পুরস্কার (ভিক্ষা) আদায় করিয়া থাকে। শুনিয়াছি, তাহাদের বিশ্বাস এই যে, ঐ দিন বসন্তের প্রারম্ভ, ঐ দিন তাহারা যেরূপ পুরস্কার পাইবে তদনুযায়ী সম্বৎসর তদ্রূপ বায়না ও রোজগার হইবে।

ফাল্গুনে—

(১৫) শিউরাৎ।

শিবরাত্রির দিন শিবের বিবাহ হইয়া থাকে। ঐ দিন বেহারের যে যে স্থানে মহাদেবের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান আছে, অর্থাৎ দেওঘর (বৈদ্যনাথ), গৈবীনাথ (সুলতানগঞ্জ ষ্টেশনের নিকট গঙ্গাগর্ভস্থ শৈলখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি) প্রভৃতি স্থানসকলে ভারি মেলা হইয়া থাকে। শতশত দোকানী-পসারী নানাবিধ দ্রব্যসম্ভার লইয়া মেলাস্থলে ১০।১৫ দিন ধরিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করে। নানাবিধ দ্রব্য, খেলনা, তুলসীদাসের রামায়ণ, বিনয়-পত্রিকা, প্রেম-সাগর, সুখ-সাগর, বেতালপচিশী প্রভৃতি পুস্তকসকল সেখানে অজস্র বিক্রয় হইয়া থাকে। তথায় লক্ষাধিক নরনারীর সমাগম হয়। অধিকাংশ যাত্রী রেলপথে গমনাগমন করে; কিন্তু অনেকে রেলযোগে দেওঘর না গিয়া, মানত-অনুযায়ী শারীরিক কষ্ট স্বীকার করিয়া, ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদিসঙ্কুল জঙ্গল পার্ব্বত্যপথ পদব্রজে অতিক্রম করিয়া, দেওঘর গিয়া বৈদ্যনাথের মস্তকে গঙ্গাজল ঢালিয়া থাকে। একপ্রকার

বিচিত্র পাত্রে গঙ্গাজল লইয়া ভার স্কন্ধে করিয়া দলে-দলে 'বাবা-ধাম-যাত্রিগণ' দেওঘর গমন করে। উহাদিগকে দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে যে, উহারা গঙ্গাজল 'চড়াইবার' জন্ত বৈদ্যনাথ যাইতেছে।

শিবরাত্রির দিন রজনীযোগে মহাদেব ও পার্ব্বতীর বিবাহ হইয়া থাকে। মানুষের বিবাহের স্তায় বর (মহাদেব) পালকী করিয়া পার্ব্বতীকে বিবাহ করিতে গিয়া থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে ঢাক-ঢোল ইত্যাদি বাজিতে থাকে। এই বিবাহে ব্রাহ্মণ দ্বারা 'তিলক' (আশীর্ব্বাদ) হইতে আরম্ভ করিয়া বিবাহের সমস্ত কার্য্যই সম্পন্ন করা হয়। 'কলাবতীর বিবাহ' নামক প্রবন্ধে আমরা "ভারতী"তে বিহারী বৈবাহিক ক্রিয়াকলাপের বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, সুতরাং এখানে উহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। বিধি-অনুসারে হর-পার্ব্বতীর বিবাহ হইয়া গেলে, নৃত্যগীতাদি হইয়া থাকে।

আবার ঐ দিন অনেকে শিবরাত্রির 'বরৎ' (ব্রত) করিয়া থাকে। বাঙ্গালাদেশের স্তায় এখানেও দিবারাত্রি উপবাস থাকিয়া শিবপূজান্তে জল খাইতে পায়।

(১৬) ফাগুয়া।

ফাগুয়া বা হোলী (দোল) বিহারী হিন্দুদিগের একটি 'মস্তনা' (মস্ত আনন্দের) পরব। ইহা শ্রীপঞ্চমী হইতে আরম্ভ করিয়া দোল-পূর্ণিমায় শেষ হয়। শ্রীপঞ্চমী বা বসন্ত-পঞ্চমী হইতে পুরুষেরা পথে স্ত্রীলোক দেখিতে পাইলে নানাপ্রকার ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। সময়ে সময়ে স্ত্রীলোকদিগকে এরূপ অশ্লীল গালিগালাজ দেয় এবং কুৎসিৎ অঙ্গভঙ্গী করে যে, তাহা শুনিয়া কর্ণে অঙ্গুলি প্রদান করিতে হয়। কোন কোন দিন বালক ও যুবকেরা যুটিয়া সন্ধ্যার পর দল বাঁধিয়া গৃহস্থদের দ্বারে-দ্বারে অন্তঃপুরচারিণী রমণীগণের প্রত্যেকের নাম ধরিয়া এরূপ কটূক্তি করে যে, তখন মনে হয়, বিহারে ইংরাজ-

রাজের সভ্যশাসনপ্রণালী আজিও সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, এবং বেহারের অধিবাসিগণ অসভ্য পার্ব্বত্যজাতিগণের অপেক্ষাও বহু নিম্নস্তরে অবস্থিত। সুখের বিষয় এই যে, ইংরাজী-শিক্ষা-বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এই কুপ্রথা বাঙ্গালী ও ইংরাজবহুল নগরসমূহ হইতে কতক পরিমাণে অপসৃত হইয়াছে; কিন্তু বিহারের পল্লীগ্রাম ও যেখানে দুইচারিঘরমাত্র বাঙ্গালী বাস করেন, তথা হইতে এ কুপ্রথা একবারে লোপপ্রাপ্ত হয় নাই। তথাকার বালক ও যুবকেরা এরূপ বর্ব্বর; অহম্মুক ও অসমসাহসিক যে, সন্ধ্যার পর দল-বাঁধিয়া যখন লোকের দ্বারে-দ্বারে গালাগালি দিতে আরম্ভ করে, তখন এরূপ উন্মত্ত ও কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবিবর্জ্জিত হয় যে, অন্তঃপুরবর্ত্তিনী 'বাঙ্গালিন্'-দিগকেও ছাড়িয়া কথা কয় না।

হোলীর সময় আবীর ও কুম্‌কুম্ খেলা, পরস্পরের ও পথিক দিগের গাত্রে পিচকারী দেওয়া, নৃত্যগীত, ঝাল-(বড় করতাল)-মৃদঙ্গ-বাদ্য ঘরে-ঘরে হইয়া থাকে। পুয়া (মালপো), দুগ্ধ, দধি-বারা (কড়াইয়ের দাইল, লবণ ও মসলা দিয়া তৈলে ভাজা), দহিয়াড়ি (আটা-ময়দা-দধির সহিত মাখিয়া মিষ্ট মিশাইয়া ঘৃতে ভাজা), বড়া, ফুলৌড়ী, সকলে আপনাপন বাড়ীতে প্রস্তুত করিয়া খাইয়া থাকে।

সম্মৎ।

দোল-পূর্ণিমার রাত্রিতে প্রত্যেক গ্রামে 'সম্মৎ' জ্বালান হয়। ইহা কতকটা বাঙ্গালাদেশের চড়কপূজার ফুলখেলানর অগ্নিকুণ্ডের অনুরূপ। 'সম্মৎ' জ্বালাইবার জন্য শ্রীপঞ্চমীর দিন হইতে বালক ও যুবকেরা গ্রামের প্রত্যেক লোকের বাড়ী হইতে খড়, কাষ্ঠ প্রভৃতি আহরণ করিয়া পূর্ণিমার রজনীতে গ্রামের দক্ষিণদিকে জ্বালাইয়া থাকে। সম্মতের মধ্যস্থলে একটি খুঁটা পুতিয়া, তদুপরি একখানি

'ঠেকুয়া' (পীষ্টক) রাখা হয়। সম্বৎ জ্বলিতে আরম্ভ হইলে তাহার আহারের জন্য কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে বালক ও যুবকগণের আর কাণ্ডা-কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। বড় বড় শুষ্কবৃক্ষসকল বাগান হইতে কাটিয়া আনিয়া তাহাতে ফেলিয়া দেয়। পরে শোকের গৃহে অনধিকার প্রবেশপূর্ব্বক খাটিয়া-টাটিয়া, বেড়া, দরজা, জানালা, খুঁটি, বাঁশ, উথ্‌ড়ি সামাট (চাউল দাইল পরিষ্কার করিবার জন্য কাষ্টনির্ম্মিত যন্ত্র-বিশেষ) প্রভৃতি যাহা সম্মুখে পায় ধনি-নির্ধন-নির্ব্বিশেষে চুরি করিয়া আনিয়া সম্বতের জ্বলন্ত জিহ্বায় আহুতি প্রদান করে।

তখন সেই প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের চতুর্দ্দিকে গ্রামশুদ্ধ পুরুষ ঝাল-মৃদঙ্গ বাজাইয়া সাতবার প্রদক্ষিণ করে। আর ইতিপূর্ব্বে শিশুগণের গলায় যে তিসির ঢেঁড়ি ঝুলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাহা সম্বৎমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া জ্বালাইয়া দেওয়া হয়।

পূর্ব্বকথিত সম্বৎমধ্যে প্রোথিত খুঁটা বা বাঁশটি পুড়িয়া পড়িয়া যাইবার সময়, সকলেরই লক্ষ্য থাকে যে, উহার উপরিস্থিত অর্দ্ধদগ্ধ ঠেকুয়াখানি সংগ্রহ করিবে। যে সেখানি সংগ্রহ করিতে পারে, তাহাকে ভাগ্যবান বলিয়া গণ্য করা হয়। তৎপরে সেই ঠেকুয়াখানি খণ্ড খণ্ড করিয়া, সমাগত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিতরিত হইলে, তাহারা সেই ক্ষুদ্র খণ্ডগুলি একে একে পুনরায় অগ্নিমধ্যে নিক্ষেপ করে। ইহাদের বিশ্বাস এই যে, খুঁটিটী পূর্ব্ব বা উত্তরমুখী হইয়া পড়িলে, গ্রামের লোকের মঙ্গল হয়; অন্যথা যদি উহা পশ্চিম বা দক্ষিণদিকে পড়ে, তাহা হইলে গ্রামের অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা।

আর সম্বৎ জ্বালানর সম্বন্ধে এইরূপ সংস্কার আছে যে, যে ব্যক্তি উহা প্রথমে স্পর্শ করিয়া জ্বালাইবে, তাহাকে জ্বলন্তচিতাস্পর্শজনিত অপবিত্রতা আশ্রয় করিবে, সুতরাং তাহাকে পরদিন প্রাতে স্নাত হইয়া ব্রাহ্মণকে দানাদি করিয়া পবিত্র হইতে হইবে। এই অসুবিধা হইতে

নিষ্কৃতি পাইবার জন্য, কোন কোন গ্রামের লোক স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া, ইতরলোকের অল্পবয়স্ক অজ্ঞান বালকের দ্বারা 'সম্বৎ' জ্বালাইয়া লয়; কিন্তু উক্ত বালকের জনকজননী এই ব্যাপার জানিতে পারিলে মহা অনর্থ করিয়া থাকে।

তৎপর দিন প্রাতে 'সম্বৎ' জ্বালান শেষ হইলে, 'ধুর-খেল' (ধূলা-খেলা) হয়। তাহাতে সকলে পরস্পরের গাত্রে ধূলা দিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে। এইরূপ ধূলা-খেলা করিতে করিতে সকলে নদী বা পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যায়। পথে 'রাহি'-(পথিক)-দিগের গাত্রেও ধূলা দিয়া থাকে। সে দিন সাধারণ লোকদিগের পথচলা দুষ্কর। স্নান করিতে গিয়া পরস্পরের গাত্রে কাদা দিয়া থাকে।

আবীর খেলা, পরস্পরের গাত্রে পীচকারী দেওয়া, কাদা দেওয়া, প্রভৃতি ক্রিয়ায় মাড়বারিগণ চির-প্রসিদ্ধ। অনেকেই দেখিয়াছেন, ঐ দিনে কলিকাতার বড়বাজারের মাড়বারিগণ আবীর খেলিতে খেলিতে, ও রঙ্গ দিয়া পীচকারী খেলিতে খেলিতে ক্রমশ পরস্পরের গাত্রে জল কাদা দিতে আরম্ভ করে। তৎপরে উত্তেজিত হইয়া উঠিলে, নর্দ্দামা হইতে কাদা তুলিয়া ছুঁড়িতে আরম্ভ করে। ক্রমশঃ উন্মত্ত ক্রীড়কদল পৃথিবীতে যত প্রকারের মলিন ও দুর্গন্ধময় পদার্থ আছে, তাহার কোনটীই বাদ দেয় না।

বিহারপ্রবাসী মাড়বারিযুবকগণ ঐ দিন আর এক হাস্যোদ্দীপক ক্রীড়া করিয়া থাকে। তাহারা আপনাপন দোকানঘরে কাদা ও জলপূর্ণ কলসীর মুখে অল্পমাত্র গুড় বা অন্য কোন পদার্থ দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, নুতন মুটে দেখিলেই তাহাকে রেলওয়ে ষ্টেশন বা অন্য কোন স্থানের নাম করিয়া বলে, এই কলসীটা লইয়া চল। বেচারী মোট-বাহক যৎকিঞ্চিৎ পারিশ্রমিকের লোভে নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে যেমন কলসী মস্তকে করিয়া অগ্রসর হয়, অমনি একজন মাড়বারী যুবক নিঃশব্দ-

পদসঞ্চারে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গিয়া, বাহকের অজ্ঞাতসারে সেই কলসীতে সজোরে লগুড়াঘাত করে। তখন সেই ভগ্নকলসমধ্যস্থ মলিন পদার্থ-রাশি মোটবাহকের মস্তকে, মুখে ও সর্ব্বশরীরে শতধারায় বহিতে থাকে। তদ্দর্শনে উচ্চহাস্যকারী মাড়বারিযুবকগণের ও অন্যান্য পথচারিব্যক্তিদিগের মধ্যে সেই মুটিয়া ক্ষণেক হতভম্ব হইয়া দাড়ায়, ও পরক্ষণে বিনাপারিশ্রমিকে, তথা হইতে সরিয়া যায়।

পূর্ব্বকথিত সম্বৎ-প্রত্যাগত ব্যক্তিগণ ক্রমশ স্নান করিয়া আসিয়া বাড়ীতে আহারাদি করে; পরে দল বাঁধিয়া ঝাল-মৃদঙ্গ বাজাইয়া আবীর খেলিতে খেলিতে ও গীত গাহিতে গাহিতে আমীর-ওমরাহ ও ধনবান গৃহস্থদিগের বাড়ীতে গমন করে। পথে যাহাকে দেখিতে পায় "হোলী হায়! হোলী হায়!" শব্দে পল্লিপথ প্রতিধ্বনিত করিয়া তাহার গাত্রে, মুখে ও চক্ষে আবীর প্রক্ষেপ করিতে থাকে। তাহারা বাড়ীতে আগমন করিলে গৃহস্থেরা পান, সুপারি, আতর, গোলাপজল, ভাঙ্গ, গাঁজা প্রভৃতি দ্বারা উহাদিগের অভ্যর্থনা করিয়া থাকে।

চৈত্রে—

(১৭) রামনবমী।

রামনবমীর দিন শ্রীরামচন্দ্রের জন্মোৎসব হইয়া থাকে। শ্রাবণ মাসে কৃষ্ণাষ্টমীতে যেরূপ উৎসবাদি হইয়া থাকে, ইহারও অধিকাংশ তদনুরূপ বলিয়া, তাহার পুনরুক্তি নিষ্প্রয়োজন। জন্মাষ্টমীতে যেরূপ যশোদামায়ীর প্রসাদী 'ঝালমসেলা' দেওয়া হয়, তদ্রূপ রামনবমীতে কৌশল্যামাতার প্রসাদী 'ঝাল'-প্রসাদ বিতরিত হইয়া থাকে।

(১৮) হনুমানজীকা ধ্বজা।

শ্রীরামনবমীর দিন বিহারের অনেকানেক গৃহস্থ গৃহপ্রাঙ্গণে মহাবীর 'হনুমানজী'র ধ্বজা 'গাড়িয়া' (প্রোথিত করিয়া) থাকে। একটি

সুদীর্ঘ বংশের অগ্রভাগে একখণ্ড লোহিতবস্ত্র সংলগ্ন করিয়া, সেই লালবস্ত্রের মধ্যে শুভ্রবস্ত্রদ্বারা হনুমানের মূর্ত্তি সেলাই করা হয়। পরে ব্রাহ্মণ আনাইয়া পূজাদি করান হইলে, প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে গর্ত্ত কাটিয়া গৃহস্থসকলে ও প্রতিবাসী বালকগণ মিলিয়া বাঁশটি পুতিয়া দেওয়া হয়।

(১৯) সিন্দবাসকা ধ্বজা।

শ্রীরামনবমীর দিন হনুমানজীর ধ্বজা ব্যতীত এক শ্রেণীর উপাসক-সম্প্রদায়, বিশেষতঃ ধানুকজাতির মধ্যে, সিন্দবাসের নামে ধ্বজা গাড়িয়া থাকে। অনেক পল্লীগ্রামের মধ্যস্থলে মৃত্তিকাস্তূপনির্ম্মিত বেদিকায় সিন্দবাসের 'আস্থান' থাকে। সেই স্থানেই ধ্বজা প্রোথিত করা হয়। সিন্দবাসের উপাসকসম্প্রদায়ের উৎপত্তিসম্বন্ধে এতদ্দেশে নিম্নলিখিত আশ্চর্য্য কথা শ্রুত হওয়া যায়।

কোন গ্রামে এক ব্রাহ্মণের একটী ধানুকজাতীয় ভৃত্য ছিল। সে তাঁহার কৃষিকার্য্যের জন্য হলকর্ষণ করিত। একদিন ব্রাহ্মণ তাঁহার ভৃত্য ক্ষেত্রে কিরূপ কার্য্য করিতেছে দেখিবার জন্য অলক্ষিত-ভাবে তথায় উপস্থিত হইয়া দূর হইতে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিলেন, তাঁহার লাঙ্গলখানি দুইটি গরুর পরিবর্ত্তে একটি বয়েল ও একটি ব্যাঘ্রের দ্বারা আকর্ষিত হইতেছে; এবং ভৃত্যটি নিকটবর্ত্তী বৃক্ষতলে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছে। এবম্ভূত অত্যাশ্চর্য্য অনৈসর্গিক ব্যাপার অবলোকন করিয়া ব্রাহ্মণ স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, এবং তদবধি সেই ভৃত্যের দেব-অংশে জন্ম অনুমান করিয়া, তাহাকে আর ভূমিকর্ষণাদি নিকৃষ্টকার্য্য করিতে দিতেন না। ধানুক স্বীয় স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রবণতাগুণে পূজা, উপাসনা ও ভজনাদি করিয়া সময় ক্ষেপণ করিত। ক্রমশ তাহার শিষ্য-শাখার বিস্তৃতিলাভ করিয়া সে সিন্দবাস-উপাসক-সম্প্রদায়ের গুরু হইয়া দাঁড়াইল। তাহার দেহত্যাগের পর তদীয় শিষ্যেরা তাহাকে সমাধিস্থ

করিয়া 'সিন্দবাসের আস্থানের' সৃষ্টি করিল, এবং তাহাকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতে লাগিল। যে দেশে তেত্রিশকোটী দেবদেবীর পূজা হইয়া থাকে, তথায় সিন্দবাসকে দেবতাশ্রেণীভুক্ত করিতে অধিক আয়াস পাইতে হইল না। ক্রমশ বিহারী নিম্নশ্রেণীর হিন্দু, বিশেষতঃ ধানুকজাতিমধ্যে উক্ত উপাসকসম্প্রদায়ের বিস্তৃতিপ্রাপ্তি হইয়া, গ্রামে গ্রামে সিন্দবাসের আস্থানবেদিকা নির্ম্মিত হইল। কতদিন হইতে এই উপাসকসম্প্রদায়ের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ।

প্রত্যেক সিন্দবাসের আস্থানে একটি করিয়া প্রধান 'ভকৎ' (ভক্ত) বা পাণ্ডা অবস্থান করিয়া থাকে। তাহার একজন সহকারী ভকত আছে, তাহাকে 'ফুলঢেরিয়া' কহে। সিন্দবাসের প্রধান ভকত আবেশাপন্ন অবস্থায় ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-প্রভৃতি ভবিষ্যদ্বাণী করিতে পারে। তখন সমাগত অসংখ্য নরনারীর ভাগ্যগণনা করিয়া দেয়, এবং অনেক প্রকার ঔষধাদি বিতরণ করিয়া থাকে।

আবেশাবস্থায় সিন্দবাসের ভকতের 'গাৎমে' (শরীরে) কতিপয় গোঁসাই বা আত্মার আবির্ভাব হইয়া থাকে। যথা—

(১) সিন্দবাস গোঁসাই—উক্ত সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। (২ বেনী গোঁসাই—সম্ভবত সিন্দবাসের পরবর্ত্তী উক্ত সম্প্রদায়ের পরলোকগত কোন প্রধান ভকত (৩) একজন মোগল—বোধ হয় মুসলমান-ধর্ম্মাবলম্বী লোকদিগের দ্বারা কতক পরিমাণে সহানুভূতি পাইয়া উভয়সম্প্রদায়মধ্যে সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য এই মোগলগোঁসাইয়ের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে।

সিন্দবাসের আস্থানে কোন কোন মুসলমানেরাও পূজা দিয়া থাকে। আমাদের দেশের হিন্দুরাও পীরের আস্তানায় (আস্থানে), বদরসাহেবের দরগায় সিণী মিষ্টান্ন) মৃণ্ময় ঘোটক প্রভৃতি পূজা দিয়া থাকে। আবার এ দেশের মহরমের সময় 'তাজিয়া' বাহির হইলে, অনেক হিন্দুযুবক ও

বালক পূর্ব্বের মানৎক্রমে মুসলমানের ন্যায় পোষাক পরিধান করিয়া চামর লইয়া 'তাজিয়া'কে ব্যজন করিতে করিতে চালয়া থাকে। ইহাঁতে এইরূপ বুঝিতে হইবে—কোন কঠিন পীড়াদি হইলে তাহাদের পিতামাতা এইরূপ পূজা মানৎ করিয়াছিল। সেইরূপ সিন্দবাসের আস্থানে মোগল-গোঁসাইয়ের আবির্ভাব হওয়াতে বহুতর নিম্নশ্রেণীর মুসলমান ঐ আস্থানে পূজা দিয়া থাকে।

সিন্দবাসের ভকতের শরীরে বেনী-গোঁসাইয়ের আবির্ভাব হইলে, 'নীর-ঘুমানা'-(জল-ঘোরান)-নামক একটি আশ্চর্য্য দর্শন-ব্যাপার দেখাইয়া সমাগত দর্শকমণ্ডলীকে চমৎকৃত করা হয়। তাহা এইরূপ—

সিন্দবাসের আস্থানের বেদিকার নিম্নে অদূরে চারিপাঁচজন লোককে বসাইয়া রাখা হয়। প্রধান ভকতের শরীরে বেনী-গোঁসাইয়ের আবির্ভাব হইবামাত্র, তিনি, কিঞ্চিৎ জলপূর্ণ একটি লোটা লইয়া, তাঁহার সহকারী 'ফুলঢেরিয়ার' হস্তে দেন। ফুলঢেরিয়া সেই লোটা লইয়া, উক্ত পাঁচজনকে চক্রাকারে বসাইয়া, সকলকে এক সঙ্গে দুই হস্ত দ্বারা লোটা চাপিয়া ধরিয়া থাকিতে বলে। তাহারা লোটা ধরিয়া, একমনে চিন্তা করিতে করিতে, ক্ষণেক পরে, উহা উপরের দিকে উঠিতে থাকে। তখন ফুলঢেরিয়া তাহাদিগকে খুব বলপূর্ব্বক লোটা ধরিয়া রাখিতে বলে, এবং কহে, "যদি তোমরা উহা ধরিয়া রাখিতে না পার, তাহা হইলে উহা কোথায় চলিয়া যাইবে তাহার স্থিরতা নাই।" তখন ঐ লোটা ক্রমাগত ঘুরিতে থাকে। ইহাকেই 'নীর-ঘুমানা' বা জল-ঘোরান কহে। অবশেষে সিন্দবাসের গোঁসাইয়ের আজ্ঞা লইয়া আসিয়া ফুলঢেরিয়া লোটা স্পর্শ করিয়া কাড়িয়া লইলে, উহা স্থির হয়।

আমার একজন ইংরাজী-শিক্ষিত বিহারী বন্ধু, উক্ত ঘটনা স্বচক্ষে দেখিয়া-আসিয়া, আমাকে বর্ণনা করেন, এবং জিজ্ঞাসা করেন যে,

তিনি বিশেষ মনোযোগপূর্ব্বক দেখিয়াছেন যে, উক্ত পাঁচজনের বিনা চেষ্টায় ঐ জলপাত্র ঘুরিতে থাকে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে কিরূপে এই অস্বাভাবিক ঘটনা সংঘটিত হয়! ইহার কি কোন বৈজ্ঞানিক কারণ নাই? আমি তাঁহাকে বলিলাম, আজকাল যখন একাদশীর উপবাসের বৈজ্ঞানিক কারণ নির্ণীত হইয়াছে, তখন এই আশ্চর্য্য ব্যাপারের কোন বৈজ্ঞানিক কারণ আছে সন্দেহ নাই। আপনি ত্রিপাদবিশিষ্ট টেবিলে (tripoy) আত্মার আহ্বান (spirit invoke) দেখিয়াছেন? ঐ টেবিলের চতুর্দ্দিকে চেয়ার পাতিয়া বসিয়া কয়েকজন লোক হস্তদ্বয় পরস্পর স্পর্শ করিয়া, কিছুক্ষণ একমনে বসিয়া থাকিলে, পরস্পরের শরীরের তড়িৎশক্তি বা জীবনীশক্তি হস্তস্পর্শে একীভূত হইয়া যেমন এক অদ্ভুত নবশক্তি উৎপন্ন করিয়া ত্রিপাদ-টেবিলকে চালিত করে,—ঐ নিয়মে যাহারা দুইহস্তদ্বারা লোটা ধারণ করিয়া থাকে, তাহাদের সকলের শরীরের তড়িৎশক্তি একত্রীভূত হইয়া, ধাতুপাত্রের সংমিশ্রণে বা সংস্পর্শে এক নবশক্তির সৃষ্টি হয়, তখন সেই লোটার চলৎশক্তি উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যে, ত্রিপদ টেবিলে আত্মা-আবাহন এবং সিন্দবাস-গোঁসাইয়ের 'নীর-চালন' একই বৈজ্ঞানিক নিয়মের বশীভূত।

(২০) চৈতী-ছট্।

আমাদের দেশে যেমন আশ্বিনে দুর্গাপূজা এবং চৈত্রে বাসন্তী (অন্নপূর্ণা) পূজা একই বিষয় ও একই নিয়মে পরিচালিত, কেবল সময়ের বিভিন্নতামাত্র। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ভূভারহরণজন্য রাক্ষস-নিধনকল্পে, আদ্যাশক্তি মহামায়াকে অকালবোধন করিয়া আশ্বিনে আহ্বান করিয়াছিলেন, তদবধি দুর্গপূজা আশ্বিনমাসেই প্রধান পূজা হইয়া আসিতেছে; তদ্রূপ বিহারের অধিকাংশ লোক প্রধান ছটপরব কার্ত্তিকে সম্পন্ন করিলেও, চৈত্রমাসে 'চৈতী-ছট্'নামে একটি পরব আছে। উহাও ঠিক ছট-পরবেরই অনুরূপ, কেবল সময়ের বিভিন্নতা মাত্র, সুতরাং পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজনবোধে এস্থানে বর্ণিত হইল না।

শ্রীরাজেন্দ্র চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।

যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়, এ কথা চিরপ্রসিদ্ধ। ধর্ম্ম না থাকিলে, জয় হয় না। বীর, ধর্ম্মবলে বলীয়ান না হইলে বিজয়ী হইতে পারেন না। এক্ষণে প্রশ্ন হইবে, এ ধর্ম্ম কি? ধারিণী-শক্তিই ধর্ম্মনামে অভিহিত হইয়া থাকে। বাস্তবিকই হিন্দুধর্ম্ম-মুসলমানধর্ম্ম, খ্রীষ্টানধর্ম্ম, অগ্নির ধর্ম্ম, বায়ুর ধর্ম্ম প্রভৃতি যেখানেই ধর্ম্মশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সর্ব্বত্রই ধর্ম্মশব্দের অর্থ এই ধারিণীশক্তি। সেই জিনিস্ যাহা বাদ দিলে অস্তিত্ব থাকে না, যাহার অস্তিত্বে অস্তিত্ব, তাহার নাম ধর্ম্ম। অগ্নির দাহিকাকে বাদ দিলে অগ্নির অগ্নিত্ব থাকে না; শাস্ত্রানুশাসন প্রতিপালন করা বাদ দিলে মুসলমানের মুসলমানত্ব, খ্রীষ্টানের খ্রীষ্টানত্ব, হিন্দুর হিন্দুত্ব বিলুপ্ত হয়। সুতরাং অগ্নিসম্বন্ধে দাহিকা যেমন তাহার ধর্ম্ম, হিন্দুমুসলমানাদিসম্বন্ধে স্ব স্ব শাস্ত্রানু-শাসনপ্রতিপালনও সেইরূপ ধর্ম্মনামে অভিহিত হইয়া থাকে। দেশকালপাত্রভেদে এই সকল শাস্ত্রানুশাসন বিভিন্ন হওয়ায় অনেক স্থলে বিরোধী হইয়া পড়িয়াছে। সেই কারণেই সাম্প্রদায়িক বিবাদ-বিসম্বাদ লক্ষিত হয়। কিন্তু "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" এই মহাজনবাক্যে যে ধর্ম্মশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার কিছু বিশেষ অর্থ আছে। যেখানে ধর্ম্ম সেইখানেই জয়। সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইবে, যেখানে পরাজয় সেখানে ধর্ম্ম নাই। মুসলমান যখন জগৎবিখ্যাত বীরগণকে পরাজিত করিয়া ভারতে দুঃখস্রোত প্রবাহিত করিয়া বিজয়নিশান উড্ডীন করে, তখন তাহারা স্ফীতবক্ষে বলিতে পারে, যতোধর্ম্মস্ততো-জয়ঃ। বলিলে কি বুঝিতে হইবে,—মুসলমানের ধর্ম্ম আছে তাই তাহারা বিজয়ী হইল, আর হিন্দুর ধর্ম্ম নাই তাই তাহার পরাজয়

ঘটিল। কথাটা মিথ্যা নহে। সেদিন যে অবস্থায় হিন্দু বীরত্বের জন্য বিখ্যাত হইলেও মুসলমানকর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া লাঞ্ছিত ও অবমানিত হয়, সেদিন সে অবস্থায় বাস্তবিকই হিন্দুর ধর্ম্ম ছিল না, তাই তাহাদের পরাজয় হইয়াছিল। আর সেই যে ধর্ম্মের অভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রথম পাওয়া যায়, সেই ধর্ম্মবলহীনতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসীর দুর্গতিও বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইতিহাসের পত্র কি ভীষণচিত্রই অঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে! ধর্ম্মাভাব-দোষে দূষিত জাতিসকলের ভগবৎ-অভিসম্পাতে যে দুর্গতির বিষয় বাইবেলে বর্ণিত আছে, সেরূপ প্রতিকৃতিই যেন দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ইতিহাস রাজপুতক্ষত্রিয়বীরগণের, রাজপুতবীররমণীগণের লোকবিস্ময়কর বীরত্ব বর্ণনা করিয়াছে, সেই ইতিহাসই তাহাদের পরাভবের কথা বর্ণনা করিয়া এক অপূর্ব্ব ঐতিহাসিক শিক্ষা প্রদান করিয়াছে। যে ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইয়া পূর্ব্বপিতৃগণ শত্রুদমনপূর্ব্বক আপনাদের গৌরব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, কালক্রমে সেই ধর্ম্মবল দুর্ব্বল ও হীনপ্রভ হইয়া পড়ায়, জাতিও দুর্ব্বল ও হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছে। শারীরিক বল ও কৌশলের বল মানসিক বলের উপর নির্ভর করে। সেই মানসিক বল কেবল ধর্ম্মের উপর নির্ভর করে। নবাবিষ্কৃত বিবিধশস্ত্রে শস্ত্রবান্ লোকের যে বল হয়, এক ধর্ম্মবলে বলীয়ান নিরস্ত্র পুরুষের তদপেক্ষা শতসহস্রগুণ বল হইয়া থাকে।

ভগবানকে ভুলিয়া মানব যখন আপনার গর্ব্বে গর্ব্বিত হয়, মোহাচ্ছন্ন হইয়া শক্ত্যাধারকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া আপনাকে শক্তিমান মনে করে, তখনি তাহার ধর্ম্মবলের অভাব হয়, তখনি তাহার দুর্ব্বলতা উপস্থিত হয়, তখনি তাহার পরাজয় হয়। ভগবতী স্বহস্তস্থ খড়্গ গুহকে প্রদান করিয়াছিলেন। যতদিন মায়ের উপর দৃষ্টি রাখিয়া সেই খড়্গের পূজা ও ব্যবহার হইয়াছে, ততদিন রাজপুতগৌরবে

দিক্ সমুজ্জল হইয়াছে। যেদিন হইতে মা ক্ষত্রিয়বীরগণের দৃষ্টি-বহির্ভূত হইয়াছেন, যেদিন হইতে খড়্গ মহাশক্তির স্মারক না হইয়া কেবল বাহ্যিক পূজার বস্তুমাত্রে পরিণত হইয়াছে, সেই দিন হইতে রাজপুত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে, সেই দিন হইতে রাজপুতের তেজ-বিক্রম সকলি ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া আসিয়াছে, এবং পরিণামে বিষধর মহাসর্প বিষহীন ডুণ্ডুভসর্পে পরিণত হইয়াছে, সেই দিন হইতে উচ্চশীর অবনত হইয়াছে।

ধর্ম্মবল বহির্বল। মানব ইহসংসারে অনেক সময় আপন যত্নে ও চেষ্টায় কার্য্যবিশেষের কূলকিনারা করিতে পারে না, তখন সেই পরোক্ষ শক্তির আশ্রয় লয়, এবং সর্ব্বান্তঃকরণে নির্ভর করিয়া থাকিতে পারিলে কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিতে পারে। যখন এই পরোক্ষ-আশ্রয়সম্বন্ধে মতভেদ উপস্থিত হইয়া সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়, তখনি অবশ্যম্ভাবী সন্দেহাদিজনিত মানবহৃদয়ে ধর্ম্মবিশ্বাস দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, এবং তৎসহ জাতীয় দুর্ব্বলতা সাধিত হয়। সে দুর্ব্বলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইলে শেষে এই ধর্ম্ম অন্তঃসারশূন্য হইয়া কেবল বাহ্যিক আড়ম্বরে পরিণত হয়। ধর্ম্মের সহিত ইহপরকাল উভয়কালেরই সম্বন্ধ আছে। যখন ইহকালকে দূরে রাখিয়া কেবল পরকালের প্রাধান্য নিষ্পাদিত হয়, তখনও ধর্ম্ম দুর্ব্বল হইয়া আইসে। এই দুই কারণেই ভারতবর্ষ প্রায় ধর্ম্মবলহীন হইয়া পড়িয়াছে, এবং সেইজন্য ইহার যার-পর-নাই দুর্গতি ঘটিয়াছে।

আজ যে ভারতে নবজীবনের উন্মেষ দেখা যাইতেছে, তাহারও কারণ ধর্ম্মের বিজুলিপ্রকাশ। কিন্তু এই নবজীবন উত্তরোত্তর বলীয়ান করিতে হইলে ইহাকে ধর্ম্মভিত্তিতে স্থাপিত করিতে হইবে। ধর্ম্মভিত্তি না পাইলে বহ্বাড়ম্বরে লঘুক্রিয়ায় পরিণত হইবে।

কথাটা কিন্তু বড়ই গুরুতর। আজ ভারতবাসী বলিতে এক জাতি বুঝায় না। হিন্দুমুসলমানপ্রভৃতি বিবিধজাতি লইয়া ভারত-

বাসিনামে এক বিলক্ষণ জাতির অস্তিত্ব দেখা যায়। তাহাদের ধর্ম্ম বিভিন্ন, এবং অনেক স্থলে পরস্পরবিরোধী। সুতরাং এই নবজীবনকে কিরূপে ধর্ম্মভিত্তিতে স্থাপিত করা সম্ভব?

আজ বহুকাল পরে ভারতবাসীর আপনার মায়ের উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে, আজ বহুদিন পরে ভারতবাসী "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মহাবাক্যের কিঞ্চিৎ আভাস পাইয়াছে, তাই এ নব-জীবনের ক্ষণিক আলোক—তাই এই উল্লাস। আজ একজন মহা-পুরুষ যদি এই উন্মেষমুখে স্বীয় কর বিস্তৃত করিয়া এই জাতীয় জীবনের মূলে নবধর্ম্মবল সেচন করিতে পারেন, তাহা হইলে যে এক অপূর্ব্ব কল্পবৃক্ষের অবির্ভাব হয়, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

আজ যেমন ভারতবর্ষে এক নবযুগের সূত্রপাত দেখা যাইতেছে, সেই নবযুগের সঙ্গে সঙ্গে এক নবধর্ম্মেরও যেন বিশেষ প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সে নবধর্ম্ম মাতৃপূজা। মাতৃপূজা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা নূতন নহে। শ্রীচণ্ডীতে আছে "নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ যা দেবী সর্ব্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা" যিনি সর্ব্বভূতে মাতৃরূপে বর্ত্তমান সেই মহাশক্তিকে প্রণাম করি। সুতরাং মাতৃপূজাও যাহা, মহাশক্তির পূজাও তাহাই। গর্ভধারিণী জননীকে এবং তাঁহার পার্শ্বে জন্মভূমিকে বসাইয়া সমান ভক্তিতে সমান বিশ্বাসে পূজা ও সেবা করিতে পারিলে যে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে তাহাতে আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ভারতবাসিগণ একান্তচিত্তে স্ব স্ব ধর্ম্ম পালন করুন, যথাশাস্ত্র জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করুন, এবং স্ব স্ব ধর্ম্মসহ এই মাতৃপূজা-ধর্ম্মের সাধন করুন। এই মাতৃপূজা-ধর্ম্ম ভাগবান সাক্ষ্য করিয়া গ্রহণ করিলে ধর্ম্মজনিত বিদ্বেষভাব অন্তর্হিত হইবে; কারণ তখন সকলেই এক মায়ের সন্তান হইয়া ভাই ভাই হইবে, তখন সকলেই

একমত হইয়া কার্য্য করিতে পারিবে, তাহাতে বল, বিক্রম, সাহস ও অভ্যুদয় হইবে।

মহামতি বঙ্কিম এই মাতৃপূজার বীজমন্ত্র "বন্দে মাতরম্" উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন, কেবল সাধনপ্রণালী, আচার-ব্যবহার-প্রভৃতি সূত্র-বদ্ধ করিয়া ইঁহাকে সার্ব্বজনীন করিতে পারিলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। তাই বলিতেছিলাম, এক্ষণে একজন মহাপুরুষের প্রয়োজন, যিনি শ্রীনানক, শ্রীগোবিন্দ প্রভৃতির ন্যায় গুরু ও নেতা হইয়া সমগ্র ভারত-বাসীকে এক বন্ধনে বদ্ধ করিতে পারেন। ফ্রিঃমেসনগণের ন্যায় ভারতবাসীরা যদি এই মাতৃপূজা-অবলম্বনে একতা ও ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনে বদ্ধ হইতে পারেন, তাহা হইলে অচিরে এই উন্মেষোন্মুখ নবজীবন এক দিগন্তব্যাপী শাখাপ্রশাখাবিশিষ্ট মহাবৃক্ষে পরিণত হইবে। তখন লাঞ্ছিত মাতৃভূমিকে রাজসিংহাসনে বসাইয়া আমরা বীজমন্ত্রে তাঁহার পূজা করিয়া "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই স্তোত্র পাঠ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারিব। স্বদেশপ্রেমিকগণ ইহার জন্যই যত্নবান হউন।

এই মাতৃপূজা-ধর্ম্ম এভাবে প্রচলিত করিতে হইবে যে, কাহারও তাহাতে আপত্তি না থাকে। বঙ্কিমবাবুর গল্পপাঠে এই আভাস পাওয়া যায় যে, বাঙ্গালীর ৺দুর্গাপূজা, জগদ্ধাত্রীপূজা, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি জগদম্বার যে সকল মূর্ত্তিপূজা হয়, সেই সেই মূর্ত্তিগুলি জন্মভূমি বিভিন্নাবস্থার ভাব দ্যোতকমাত্র মনে করিয়া ঐ গুলিকেই এবং প্রচলিত বঙ্গের তান্ত্রিক ও পৌরাণিক পূজাই মাতৃপূজায় পরিণত করিলেই হয়। কিন্তু তাহা করিলে কি তাহা সর্ব্ববাদিসম্মত হইবে? যদি সবিশেষ উত্তেজনার জন্য প্রত্যক্ষ বস্তু বা মূর্ত্তির প্রয়োজন হয়, সাক্ষাৎ জন্মভূমিকে সেই বস্তু বা মূর্ত্তি করিয়া পূজা করা হউক। মায়ের পূজা, মায়ের মন্ত্রজপ, মায়ের কার্য্যসাধন এবং মাতৃসেবকের

কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য এরূপভাবে নির্দ্ধারিত করিতে হইবে যে, তাহা প্রচলিত কোন ধর্ম্মের কোন অংশের বা বিধিনির্ব্বিশেষের বিরোধী না হয়, তাহা হইলেই ইহা সার্ব্বজনীন হইয়া উঠিবে। ইহাও নিশ্চয়, এরূপ কোন ধর্ম্মভিত্তি না পাইলে এ নবজীবন দাঁড়াইতে পারিবে না। আর আধার না পাইলে অকালে ইহার বিনাশেরই বিশেষ সম্ভাবনা। কর্ত্তব্যবুদ্ধি, প্রত্যবায়ভীতি না থাকিলে কোন ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে বল হয় না। সখের কার্য্য হইলে, আমোদের কার্য্য হইলে, তাহা নিরর্থক। প্রত্যবায়ের ভয় রাখিয়া কর্ত্তব্যজ্ঞানে কার্য্য না করিলে কোন্ মহৎকার্য্য সিদ্ধ হয়? আর সেই কর্ত্তব্যবুদ্ধি ও প্রত্যবায়ভীতি উৎপন্ন করিতে হইলে ধর্ম্মের প্রয়োজন।

আমরা এই বিষয়ে চিন্তা করিয়া যেটুকু বুঝিয়াছি, তাহাই এস্থলে প্রকাশ করিলাম। আশা, পরিণতমস্তিষ্ক কোন মহাপুরুষ যদি কালের ধর্ম্মে উত্থিত হইয়া মায়ের কার্য্যসাধনার্থ এই মাতৃপূজা প্রবর্ত্তিত করেন, যে মাতৃপূজা-ধর্ম্মের বলে হিন্দু-মুসলমান, শাক্ত-বৈষ্ণব সকলে একমত হইয়া, একপ্রাণ হইয়া, একলক্ষ্য হইয়া, মায়ের কার্য্য সাধন করিবার জন্য কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া, অচিরে "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" বলিতে পারেন। তবেই ভারতের সুদিন, তবেই ভারতের সুখ-সূর্য্য পুনরুদিত হইবে, অন্যথা "উত্থায় হৃদিলীয়ন্তে দরিদ্রানাং মনোরথা"র ন্যায় এই নবজীবন পোষণাভাবে, আধারাভাবে অকালে শুকাইয়া যাইবে। দে'খ—মা! তা' যেন না হয়।

শ্রীভূতনাথ ভাদুড়ী।

তোতার গল্প।

"একটা গল্প বল না ভাই?—তুমি যখন বিলাতে ছিলে তখনকার একটা গল্প বল—কার সঙ্গে লভে পড়েছিলে —কি রকম?—সব শোনা যাক্।"

বল্‌ছেন আমার better half. বারাণ্ডায় বসে, চাঁদের আলোয় তাঁর সেন্টিমেণ্টালিটি কিছু বোধ হয় বেশি হয়েছে। তা আমি কি সাহস করে' বল্‌তে পারি যে, তিনি ছাড়া আর কেহ আমার হৃদয় অধিকার করেছিল—বল্‌লে ত curtain lectures কপালে আছেই—তার পর কতদিন যে আধসিদ্ধ ভাত খে'তে হবে তা কে জানে!—তা-ছাড়া আমি বল্‌লেই যে তিনি বড় একটা বিশ্বাস করবেন তা মনে হয় না।—আমিও কিঞ্চিৎ চটে' আছি—জিজ্ঞাসা করা হ'ল—আমি কার কার সঙ্গে লভে পড়েছিলেম—আমার সঙ্গে কে লভে পড়েছিল, তা জিজ্ঞাসা কত্তে মনেও এল না। দাঁড়াও ত দেখাচ্ছি একবার! বল্‌লেম—"আমি কার সঙ্গে কখন্ লভে পড়েছি ত বল্‌তে ত বেশি সময় লাগ্‌বে না—কখনো কারও সঙ্গে না। লভে পড়া কাকে বলে, তা আজও আমি জানি না—আর আমার সঙ্গে কে কে লভে পড়েছিল, তা বল্‌তে এত সময় লাগ্‌বে যে, আমি বলে উঠ্‌তে পারব না।"

"ঈস—তা ব'ই কি—তোমার সঙ্গে আবার—"

"তুমি ত বড়ই জান!" আমি একটু চটে' আরম্ভ করলেম্ "কেন, মেরী—" বলেই সাম্‌লে নিলেম্; কাজ্ কি বাপু—কি ক'ত্তে কি হয়, এইখানেই থেমে যাওয়া ভাল—"কেন তুমি,—তুমি কি আমার সঙ্গে—" কথাটা শেষ কত্তে পাওয়া গেল না। আমার মুখ বন্ধ করে'

দেওয়া হ'ল। কি উপায়ে আমার মুখ বন্ধ হ'ল, তা আর পৃথিবীকে জানাইয়া কাজ কি?

"তা নিজের বিষয় বল্‌বে না ত ব'লে কাজ নাই—তোমার সেই কলেজের বন্ধুদের বিষয় বল—সুইটী আর টেড্‌—তাদের বিষয় বল।"

সুইটী আর টেড—কতদিনের কথা! তাদের নাম শুন্‌লে স্মৃতি দশবৎসরের বাঁধ ভেঙ্গে, কত সমুদ্র, কত নদী পার হয়ে—কোথায় চ'লে যায়। দশ বৎসর—কত দিন আগে; আমি তখন কলেজে পড়ি—কলেজের ছেলেদের সঙ্গে কতই বন্ধুত্ব—চিরকাল এ বন্ধুত্ব থাক্‌বে—বরাবর চিঠি লেখালেখি চল্‌বে—তারাও আমাকে ভুল্‌বে না—আমিও তাদের ভুল্‌ব না, এই বিশ্বাস।—দশবৎসর আগে,—তখন মেরীর সঙ্গে কত——দূর হোক্ গে ছাই, ও সব আর মনে করে' কি হ'বে? তাদের কি এখন এই গরিব বেচারাকে মনে পড়ে! আর মেরীকে আমি তখন ভালবাস্‌তাম—কি পাগলই ছিলেম্!

ভেবেই, একবার পাশে চাঁদের চেয়ে উজ্জ্বল মুখখানির দিকে চেয়ে-দেখ্‌লুম্—কি পাগলই ছিলেম!

"অত ভাবছ কি?—গল্প আরম্ভ কর।"

"সুইটীর বিষয় গল্প শুন্‌তে এতই ইচ্ছা! আমি jealous হইনে যে, এই আশ্চর্য্য—"

ফের্ আমার মুখ বন্ধ।

"তা নিতান্তই শুন্‌বে ত মনোযোগ দাও আর ভাল করে' ব'স।"

ভাল করে' বসাও হ'ল সুবিধা মত—আর আমার গল্পও আরম্ভ হ'ল।

একদিন আমার কলেজে নিজের ঘরে বসে' আছি—ভয়ানক গরম;—ইংলণ্ডে এত গরম প্রায়ই দেখা যায় না,—মধ্যে মধ্যে দেশের কথা

মনে প'ড়ছে,—আর ধুতি-চাদরের সুখ মনে ক'রে—য়ুরোপীয় সভ্যতার কাপড়-চোপড়ের উপর কেমন একটা তাচ্ছিল্য ভাব হচ্ছে। যা হোক, কোনরকমে ফ্লানেলের কাপড় পরে' সোফাটার উপর শুয়ে অনেক কষ্টে চোখ খুলে রেখে, একটা বই হাতে ক'রে মনকে প্রবোধ দিচ্ছি যে, খুব পড়া হচ্ছে ; আর ক্রমাগত ভাবছি যে, রোদটা একটু পড়লে বাঁচা যায়—খানিকটে বেড়িয়ে আসি। কিন্তু রোদ পড়তে এখনও অনেক দেরি—আর পড়তেও ভাল লাগছে না—তাই বইখানা ফেলে দিয়ে চোখ বুঁজে ভাবতে লাগলেম্। না, ঘুমচ্ছিলেম্ না—দিনের বেলা আমার ঘুম হয় না। কতক্ষণ এই রকম চোখ বুঁজে শুয়ে রইলেম, তা ঠিক্ জানি না। আমার বিশ্বাস দশ মিনিট। হঠাৎ চোখ্ খুলে দেখি যে, সামনে সুইটী একটা ইজি-চেয়ার দখল করে' বসে' আমার সিগারেট্গুলির শ্রাদ্ধ কর্‌ছে—আর আমার দিকে চেয়ে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাস্‌ছে। "Well old chappie—ঘুম্ ভাঙ্গল ?"

মহাতর্ক উপস্থিত—দশমিনিটের জন্য চোখ বুঁজে ভাবছিলেম্—আর বলে কি না যে, ঘুমচ্ছিলেম্।

"আচ্ছা, ঘুমচ্ছিলেম না ত, কটা বেজেছে বল দেখি ?"

"কেন, সাড়ে তিনটা।"—আমার উত্তরে খালি চীৎকার করে' হাস্য।

বাহিরে চেয়ে দেখি যে, রোদ প্রায় পড়ে' এসেছে—প্রায় সাড়ে পাঁচটা হবে।

"তা তর্ক থাক, এখন কি করা যায় বল।"

"চা তৈয়ার কর—আমার কিছু বল্‌বার আছে—তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ কত্তে এসেছি।"

সুইটীর পরামর্শের দরকার হ'লেই আমার কাছে আসে। সে

আমার চেয়ে যদিও একবছরের বড়—তবু মনের ভাবে তার সঙ্গে তুলনা কত্তে গেলে মনে হয়, যেন আমি কতই বৃদ্ধ—আর সে কতই ছেলেমানুষ। সুইটার ফটোগ্রাফ্ দেখেছ—দেখতে কেমন একটি কোমল ছেলেমানুষি ভাব আছে—মুখে প্রায়ই একটু হাসি আছে—ঠোঁটের মধ্যে কোথায় লুকিয়ে আছে, তা ঠিক্ করা যায় না। কিন্তু তার স্বভাব passionate—যখন রাগে তখন ভয়ানক রাগে—আর যখন ভালবাসে—তখন যেন তার ভালবাসার চোটে চন্দ্র-সূর্য্য সব নিবে যাবার উদ্যোগ করে। আর, সুইটী প্রায়ই মাসের মধ্যে তিনবার করে' নূতন নূতন দেবীর কাছে তার হৃদয় বলিদান দেয়। যখন এত গম্ভীরভাবে আরম্ভ করেছে, তখনই বুঝেছি যে তার হৃদয়-মন্দিরে নূতন দেবতার অধিষ্ঠান হয়েছে।

আমি তখনই আমার সব চেয়ে সহানুভূতির ভাব ধারণ করে' বল্লেম্ "কে এবার ?—কত দিন থেকে !"

"যাও, তোমার সব তাতেই ঠাট্টা—Oh she is an angel—she is—you smiling Devil."

"Merci pour le compliment Monsieur le prince—তোমার সুন্দরী যে পরিমাণে এঞ্জেল্, সেই পরিমাণে যদি আমি ডেভিল্ হই, তা হ'লে বড় একটা ক্ষতি নাই—এখন বলে যাও, আমি চা খেতে খেতে, একটা সিগারেট্ ধরিয়ে, খুব মনোযোগ দিয়ে শুন্ছি।"

সুইটী তখন অনেকবার করে' বুঝিয়ে দিলে যে, এবার সত্যসত্যই সে ভয়ানক hard hit—

"প্রতিবার যেমন হয়ে থাকে—"

"—না—এবার সত্য—অন্যবারে কি ? সে কি এর সঙ্গে তুলনায় আইসে ? তোমার যেমন কঠিন হৃদয়—তুমি নিজে কখন ভালবাসনি—খালি অন্যের কষ্ট দেখে হাসতে পার।"

সুইটীর বিশ্বাস যে, আমি প্রেমসম্বন্ধে ভয়ানক নাস্তিক। অন্য কাহারও এই পীড়া হ'লে গম্ভীরভাবে পরামর্শ দিই—আর মধ্যে মধ্যে হেসে থাকি।

আমি অল্প হেসে বল্লেম "সুইটী আমার হৃদয় যে রকমই হোক্ না কেন—তোমার কি বিশ্বাস যে, তোমার কষ্ট দেখে আমার আমোদ হয়?"

"No dear boy—তা বল্‌ছি না, তবে তুমি ঠাট্টা কর কেন?"

আমি সুইটীর কাঁধে হাত দিয়ে বল্লেম্—"সুইটী সত্যসত্যই দেখ্‌ছি যে তামাসার কথা নয়, কি হয়েছে বল দেখি?"

"Well dear friend—দিনকতক হ'ল আমি ববি-মর্টনের সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছিলুম্—বেড়াতে বেড়াতে বটানিক্যাল গার্ডেনে দুটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'ল—দুজনেই বেশ দেখতে, কিন্তু তাদের মধ্যে একজন—ও, টোটা!—একজন তার বিষয় আর কি বলব—সে যে দেখতে—প্রবালের মত ঠোঁট—আর তার চোখ—তার চোখে ডুবে মরা যায়,—আর তার চুল—একেবারে যেন সোণা—আর অল্প অল্প বাতাসে দুএকটী গুচ্ছ উড়ছে—আর তার কম্‌প্লেক্‌শন—"

কতদিন কতদূর যে এই বর্ণনা চল্‌ত তা ভগবানই জানেন—আমি ত আর সহ্য কর্‌তে পার্‌লাম না—সুইটী, তোমার sapphodies রেখে দাও, আমি ত তার লভে পড়িনি—এখন আমি ভেবে নিলেম যে, ভিনাস্ (Venus) তার তুলনায় কিচেন-মেডের (Kitchen maid) চেয়ে অধম—ওসব ধরে নিলেম, এখন ব্যাপারটা কি, বলে যাও।

"You unpoetic Heathen—তোমার মত অ-কবিতে সৌন্দর্য্যের মহিমা বুঝ্‌বে কি? তা এখন বক্তৃতা না করে শুনে যাও। ববি (Bobby) ত তাদের সঙ্গে আমার আলাপ করে' দিলে—দিয়ে সে

বড়টির সঙ্গে বেড়াতে লাগল—আর আমি সেই পরমাসুন্দরী—না, আমি Esstatic হচ্ছিনি—আমি ছোটটির. সঙ্গে বেড়াতে থাকলেম। ছোটটির নাম এমি—এমির বয়স প্রায় উনিশ-কুড়ি হবে—"

"তার মানে পঁচিশ—কিম্বা বেশি"—

"—না—উনিশ কুড়ি—শুনবে, না ক্রমাগত বাধা দেবে—তবে শুনে যাও। এমির যদি কথা শুনতে ত বুঝতে পারতে—যে, স্ত্রীলোকের স্বর কতদূর মধুর হ'তে পারে—আর তা-ছাড়া তার কথার ধরণ কত সুন্দর—বোধ হয়, সে এমন কবিতা নাই যে পড়েনি।"

"—কি কথা কইলে তাই বল।"

"—কথা? ও—হ্যাঁ—এই weatherএর বিষয় খানিকক্ষণ—"তার পর নানাবিষয়ে কথা হল, তা কি সব মনে থাকে?—সে কিন্তু প্রায়ই বিকালবেলা পাঁচটার সময় বটানিক্যাল্ গার্ডেনে বেড়াতে আসে—"

"—হুঁ—আছ ভাল দেখছি যে—ইতিমধ্যে বন্দোবস্ত করে' নিয়েছ—"

"—না, না, বন্দোবস্ত নয়—কথায় কথায় আমাকে বল্লে—তোতা—সে এই ফুলটা দিয়েছে!—"

শেষভাগটা বলবার সময় তার উচ্ছ্বাস দেখে কে?

কিছুদিন গেল—সুইটীর কাছে প্রায় রোজই তার জীবনের একমাত্র তারার বিষয়ে আমার সঙ্গে গল্প হয়। গল্প মানে—সে বলে যায় আর আমি শুনে যাই। সুইটীর কথায় আমার দিন দিন সন্দেহ হ'তে লাগল যে, তার এঞ্জেলটি বড় এঞ্জেলিক্ নয়—কোনরকমে সুইটী তাকে যাতে বিয়ে করে সেই চেষ্টা। আগে সুইটীকে বলা বৃথা—কিছু এখন বলতে গেলে মন্দ বই ভাল হবে না। কিছু ত একটা কর্তে হবে—ববি-মর্টন—সে ত

বড়বোনকে দেখে জীবনধারণ করছে—সে কি ছোটবোনের বিষয় কিছু বলবে ?—না, তা হবে না। ঠিক হয়েছে, টেড্—সে ওদের চেনে —আর তার মাথায় কিছু-না-কিছু একটা ফন্দি আসবেই আসবে।

টেডের কথা মনে পড়লে আজও আমার হাসি পায়। তার খর্ব্বাকৃতি চেহারা যেন দুষ্টামিতে পরিপূর্ণ—নিজেকে একটা গোলে ফেলা—আর পরে গোলে পড়লে তাকে কোনরকমে বাঁচিয়ে দেওয়া, টেডের যেন জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। আর এমন কথা নাই যাতে সকলকে সে হাসাতে না পারে। টেড হচ্ছে ঠিক লোক।

এই সিদ্ধান্ত করে' টেডের ঘরে গিয়ে দেখি—সে বসে বসে সোডা-ওয়াটার খাচ্ছে।

"হ্যাল্লো তোতা ওল্ড বয়—সোডা খাবে ? না—তুমি ত আর কাল রাত্রে supperএ বেশি করে—"

"বেশি করে কি ?"

"বেশি করে চিংড়িমাছ খাওনি—আবার কি ? খেয়েছিলে কি ?"

"তর্কে হার মানতে হল।"

"সে যা হোক—তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে" বলে' সুইটীর কথা সব বল্লেম। তার উত্তরে এক লম্বা সিস্।

"কথায় উত্তর দিলে না যে ?"

আমার কথা অগ্রাহ্য করে' টেড্ গাহিতে লাগিল :—

Three little maids who all unweary
Come from a ladies' semenary
Feed from its genius tertelary
Three little maids from school.

টেড্ যখন কোন বিষয়ে ভাবতে থাকে তখন তার অবস্থা এই রকম। আমি চুপ করে বসে রহিলাম।

একটু বাদে টেড্ আনন্দে চীৎকার করে উঠ্‌ল। "পেয়েছি—হয়েছে—সব ঠিক হবে; দু হপ্তার কাজ।"

"ব্যাপারটা কি—শোনাই যাক।"

টেড্ তখন তার মৎলব আমাকে খুলে বল্লে।

টেডের সঙ্গে পরামর্শ করে, দুএকদিন বাদে টেড্ এই দুই মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে' দিলে। তারা অক্সব্রিজে দিনকতকের জন্য খালি বেড়াতে এসেছে—তাদের মাসীর সঙ্গে থাকে। মাসীর বয়স প্রায় চল্লিশ হবে—কিন্তু তাঁর মনে মনে বিশ্বাস যে, তাঁকে কেউ দেখে' পঁচিশের বেশি ভাবে না। তিনি বিধবা—সেজন্য অল্পপরিমাণে (তাঁর মতে, অল্প) ফ্লির্ট কর্ত্তে তাঁর বিশেষ কোন আপত্তি নাই। তাঁর সুইটীর উপর কৃপাদৃষ্টি পড়েছে—আর তাঁর মনে মনে দৃঢ়বিশ্বাস যে, সুইটী তাঁর সঙ্গে দেখা কর্ত্তেই তাঁর বাড়িতে এত বেশি যায়। আমি এসব টেডের মুখ থেকেই আগে শুনেছি। আণ্টির নাম মিসেস্ ওয়াকার—আর মেয়েদের নাম লুসি আর এমি মোরকোম্ব। আলাপ হবার দু একদিন পরে মিসেস্ ওয়াকার আমাকে একদিন চা খেতে নিমন্ত্রণ করে পাঠান। যাবার আগে টেড্‌কে জিজ্ঞাসা করে নিলেম—"সব ঠিক হয়েছে ত।"

টেড্ বল্লে "হাঁ—আরম্ভ কর্ত্তে পার।"

আমার স্ত্রীর আর সহ্য হ'ল না।

"তোমার যেমন গল্প বলবার শ্রী—টেডের সঙ্গে কি মৎলব ঠিক করলে?—কি সব ঠিক হয়েছে?—কিছুই ত বলছ না।"

"শুনে যাও—সব ক্রমশঃ প্রকাশ্য। মেয়েদের কি ভয়ানক কৌতূহল!"

"কৌতূহল বই কি? গল্প বলতে জান না ত, তাই আমাদের দোষ দিচ্ছ—তা বলে যাও, সময় নষ্ট করো না।"

আমি গল্প আরম্ভ করলেম :—

"মিসেস্ ওয়াকারের বাড়ি গিয়ে, কিছুক্ষণ পরে কথা কহার পর হঠাৎ দেখি যে, এমি আর আমি ঘরে একদিকে কাছাকাছি—আর টেড্, লুসি ও মিসেস্ ওয়াকার ঘরের আর একদিকে এক ছবি নিয়ে ভয়ানক তর্ক করছে। এ বন্দোবস্ত সমস্তই টেডের নিপুণতা।

এমি আর আমি ঘরের এক কোণে—অতি অল্পসময়ের ভিতর তার সঙ্গে বিশেষ বন্ধুত্ব হয়ে গেল—সেও যে বিশেষ নারাজ তা নয়।

"তার পর Amy—I beg your pardon—Miss Amy—"

"তুমি যে মাপ চাইতে বিশেষ উৎসুক—আর আমি যদি মাপ না করি" ?

"যদি মাপ না কর তা হলে সাজা দাও।"

"আর যদি সাজা না দিই ?"

"তা হলে যতক্ষণ মাপ না কর ততক্ষণ আমিও দোষ কর্ত্তে থাকব—এখন বুঝে কাজ কর।"

"যদি তাই হয় তাহলে মাপও করব না, সাজাও দেব না—দেখি, তুমি কি কর।"

"এমি—দেখ তুমি আমাকে তোমার নাম ধরে' ডাকবার অধিকার দিচ্ছ—আর তার সঙ্গে সঙ্গে কি তোমার বন্ধুত্ব আর ভালবাসার উপর কোন অধিকার দিচ্ছ' হয় ত—দুদিন বাদে চলে যাবে—তার পর আর কি আমাকে মনে থাকবে ? হয় ত আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত ভুলে যাবে।"

"ভুলে যাব ?—ভোলা কি সব সময়েই এত সহজ ?"

এমি কি মধুরস্বরেই মধ্যে মধ্যে কথা কহিতে জানে !

"সকলের পক্ষে সহজ নয়। তবে যে সব বিষয়ে আমরা ইন্‌ডিফারেন্ট্, সে সব জিনিস্ ভুলে যাবারই ত কথা।

এমি আস্তে আস্তে গম্ভীরভাবে বল্লে "না—আমি তোমাকে ভুলব না।"

আমি দেখলুম বেগতিক—এখন টেড্ যদি আমার সাহায্যে এসে আমাদের গল্প না থামায় তা হলেই ত মুস্কিল।

সৌভাগ্যক্রমে টেড্ও দূর থেকে বুঝতে পেরেছে যে, হয়ত একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। সে তখনই চীৎকার করে আমাকে ঘরের ওপাস থেকে বল্লে "I say Tota—তুমি একদিন তোমার দেশের বাড়ির ছবিটা এনে এদের দেখিও না। মিস্ এমি, তুমি জান ত যে, এই সব ইণ্ডিয়ান্ বাদশা, নবাব, রাজাদের এক একটা বাড়ির মধ্যে আমাদের গরিব ইংরাজি দুএকটা সহর অনায়াসে লুকিয়ে রেখে দেওয়া যায়। এই ইণ্ডিয়ানদের এত টাকা যে, তোতা প্রথমে কলেজে এসে ওর নিজের ঘরের জন্য সোণার চৌকি করবার হুকুম দিয়েছিল, আমরা সকলে মিলে অনেক করে' বলবার পর তবে আমাদের মত সাদাসিদে চৌকিতে বস্তে রাজি হ'ল। তোতার দেশে এই সব চৌকি খালি জুতা রাখার জন্য ব্যবহার করে।"

আমি একটু হেসে বল্লুম—"মিস্ এমি, তুমি টেডের পাগলামি শুন না, তুমি যদি কখন ইণ্ডিয়াতে আস ত নিজেই দেখতে পাবে আমরা কি রকম থাকি। তোমার কি ইণ্ডিয়া বেড়াতে ইচ্ছা করে?"

"আমার ইণ্ডিয়াতে যেতে বড়ই ইচ্ছা হয়—তবে তোমরা পুরুষ মানুষ যেখানে ইচ্ছা যেতে পার, আমরা স্ত্রীলোক একলা দেশবিদেশে ঘুরে বেড়াতে পারি না ত!"

আমি কিছু বল্লুম না, খালি এমনি ভাবে তার মুখের দিকে দেখলুম যে, তাতে বোঝায় "আমি কি তোমাকে একলা যাবার কথা বলছি?"

টেড্ এমন সময় বল্লে—"তোতা, আমাদের পালাতে হচ্ছে, কত দেরি হয়ে গেছে জান? তোমার বোধ হয় সময়ের জ্ঞান ছিল না।

"এমি, আমিও শীঘ্র অক্সব্রিজ ছেড়ে যাচ্ছি। আর এক মাসের মধ্যে দেশে ফিরে যাব। ভরসা করি যে, ইংলণ্ড ছেড়ে যাবার আগে তোমার সঙ্গে আর-একবার দেখা হবে"।

"ফিরে যাবে? কেন?"

"বাড়ি থেকে চিঠি পেয়েছি।"

আমি এমনি ভাবে বল্লুম যেন কারণটা বলতে আমার ইচ্ছা নাই।

সেদিন রাত্রে, আমি সুইটীর ঘরে গেলুম। সুইটী তার ঘরে একলা বিষণ্ণমুখে বসে আছে, সামনে একটা বই খোলা বটে, কিন্তু তার দৃষ্টি বইয়ের উপর নয়, যেন তার মন কত দূরে চলে গেছে। আমাকে দেখে চম্‌কে উঠে দাঁড়াল। যেন মনের একটা উচ্ছ্বাস দমন করে আমাকে বলিল, "বোস,"। সুইটীর ভাব যেন কোন অপরিচিত লোকের সঙ্গে কথা হচ্ছে; তার গলার স্বরে যেন সে পুরাণ মাধুর্য্য নাই। সুইটীকে দেখে আমার ভয়ানক দুঃখ হ'ল। আমি খুব গম্ভীরভাবে আরম্ভ করলুম—

"সুইটী, তোমাকে আমার কয়েকটি কথা বল্‌বার আছে, তোমাকে আমি খালি এই অনুরোধ করছি যে, আমার যা বল্‌বার আছে তা তুমি সব চুপ করে শোন।"

"বল।"

"তোমার প্রথম যখন এমি মোরকোম্বের সঙ্গে আলাপ হয়, তুমি প্রত্যহই তার সঙ্গে কি কথা হয়, কি হয় সমস্ত আমাকে এসে বল্‌তে। তোমার কাছে থেকে আমি যা যা হয় সমস্ত জেনে, আমার মনে সন্দেহ হয় যে, এমি, খালি তুমি বড়মানুষের ছেলে বলে' তোমাকে কোনরকমে হাত করবার চেষ্টা করছে—"

"তুমি বুঝি সেই জন্য নিজে—"

"তোমাকে ফের্ অনুরোধ কর্‌ছি, চুপ করে শোন। আমার এই

সন্দেহ হওয়াতে, আমি টেডের সঙ্গে পরামর্শ করলুম। পরামর্শ করে' ঠিক করলুম যে, টেড্, এমির সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেবে, আর তাদের কাছে আমার বিষয় এই রকম কথা কহিবে যেন আমি একজন ইণ্ডিয়ান রাজা, আর আমার অগাধ ধন। তাদের এই বোঝাতে টেডের বিশেষ কোন কষ্ট হয় নাই, তোমাদের মধ্যে যারা আমাদের দেশে যায় নাই, তাদের মধ্যে প্রায়ই ত সংস্কার আছে যে, ভারতবর্ষীয়মাত্রেই ধনী। আমিও এদের ভ্রম দূর করবার কোন চেষ্টা করিনি। তুমি ত জানই, আমার সঙ্গে এমির কত শীঘ্র খুব বিশেষরকম ভাব হয়ে গেল, আর আজকে ত তুমি আমাদের কথা-বার্ত্তা সব শুন্‌লে,—আমি জানতুম তুমি সেখানে ছিলে, সেই জন্যই আমি ঐ গাছের তলায় গিয়ে বস্‌লুম। এমি জানত না—আমার ইচ্ছা ছিল যে, তুমি আমাদের কথা সমস্ত শোন। তুমি নিজেই সব শুনেছ—সে বিষয়ে আর বেশি কিছু বলব না। আমি এমিকে অক্সব্রিজ্ থেকে চলে যাবার কথা যা বল্‌লুম তা'ত তুমি শুনেছ। কেন ওকথা বল্‌লুম তা জান কি? টেড্ আজ তাদের বাড়ি গেছে, আমি টেড্‌কে শিখিয়ে দিয়েছি তাদের বল্‌তে যে, 'আমার হঠাৎ সমস্ত বিষয় হারাবার দরুণ, আমি আর অক্সব্রিজে থাকতে পারছি না। এমি আজ রাত্রে জানবে যে আমি গরিব, সে ভাববে যে আমি হঠাৎ গরিব হয়ে-গেছি। এতদিন এমি, তোমাকে ছেড়ে আমার সঙ্গে ভাব করবার চেষ্টায় ছিল। কাল দেখবে এমি তোমার কাছে ফিরে এসেছে। সুইটী, আজ আমি আর কিছু বলছি না, তুমিও কিছু বলো না। আর একঘণ্টার মধ্যে টেড্ তোমার ঘরে আসবে, তার কাছ থেকে আজকে তাদের বাড়িতে কি কি হয়েছে, সব শুনতে পাবে। চারদিন পরে আমার ঘরে এস; তখন তোমার নিজের মুখ থেকে আমি শুনব যে, আমি তোমার বন্ধুর মত কাজ করেছি কি না।"

"তোতা—তুমি হয়ত ভালর জন্যই সব করেছ; কিন্তু হয়ত তুমি ভুল বুঝেছ। হতে পারে যে এমি—তোমাকে ভালবাসে বলে, আমাকে অমন করে বিদায় দিল।"

আমরা বিদায় নিয়ে কলেজে ফিরে এলুম। টেড্ সমস্ত পথ, দেখি আশ্চর্য্যরকম গম্ভীর। টেডের এই রকম অসাধারণ অবস্থা দেখে আমি কারণ জিজ্ঞাসা করলুম। টেড্ হেসেই উড়িয়ে দিলে। আমিও আর কিছু বিশেষ পিড়াপিড়ি করলুম না।

এই রকম কিছু দিন যায়, এমির সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। আমাদের বন্ধুত্বও খুব গাড়তর হয়ে এসেছে। একদিন আমরা দুজনে একটা বাগানে বেড়াচ্ছি, এমন সময় দেখলুম যে, একটা গাছের আড়ালে সুইটী, একলা বসে আছে। এমি তাকে দেখতে পায় নাই। আমি এমিকে বললুম, "এমি, এই গাছের তলায় একটু বসবে?" এমি সম্মত হ'ল, আর আমরা দুজনে গাছতলায় একটা বেঞ্চির উপর বসে, অনেকরকম গল্প করতে থাকলুম। এমি তার মিষ্টস্বরে আমাকে তিরস্কার করতে লাগল "তোতা, তুমি আমাদের বাড়ি এত অল্প এস কেন? তোমার কি এত কাজ?"

"তোমার অনেক বন্ধুবান্ধব তাদের মধ্যে আমি হারিয়ে যাব। আমি গিয়ে আর কি করব, কেন সুইটী ত তোমাদের বাড়ি প্রত্যহই যায়।"

"সুইটীর কথা কে বল্‌ছে?" (একটু বিরক্ত হয়ে) "তুমি এস না কেন? জান আমি তিনচারদিনের মধ্যেই চলে যাচ্ছি।"

"এত শীঘ্র চলে যাবে! আর এমি, তোমার সঙ্গে এই দুদিনের দেখা, তুমিত দুদিন বাদেই ভুলে যাবে; আর, আমি,—আমি—আমার কথা বলে' আর কি লাভ?"

"ভুলে যাব? আমি শীঘ্র ভুলি না। আমার অক্সব্রিজ ছেড়ে

যেতে যে কি দুঃখ হচ্ছে, তা বোধ হয় তুমি জান না। বন্ধুবান্ধবদের ছেড়ে যেতে সব সময়েই ত কষ্ট হয়, তাতে—যাক্। তা, চিঠি লেখা প্রায় দেখা হওয়ার সমান।"

"সুইটী বোধ হয় তোমাকে চিঠি লিখবে।"

"সুইটী লিখবে কি না লিখবে, তা আমি জানি না,—আর তার জন্য আমি বড় ব্যস্তও নই। আমি ত আর তাকে লিখতে বলিনি।"

এই সময় টেড্ আসিয়া উপস্থিত। আসিয়াই—হ্যাল্লো—ওল্ড চ্যাপ, কবে যাওয়া স্থির করলে? Awefully sad! আমার তার উপর অত্যন্ত রাগ হ'তে লাগল তার কি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান নাই। যদি এতদিনই এ কথা এমিকে বলে নাই তবে আজ এখন বলা কেন? পরে বল্লেইত হ'ত!

"তা বটে ত! এমি শুনে কি বল্লে!" আমার উত্তমার্দ্ধ এইরূপ টিপ্পনী কর্লেন। আমি বলিলাম—"এমি আর কি বল্বে! সে অবাক হ'য়ে রইল। টেড্ তার কাছে এসে বল্লে, "মিস্ এমি, তুমি অবশ্য শুনেছ?"

"না কিছুই না।"

"তোতা—Poor fellow—একেবারে গরীব হ'য়ে পড়েছে, তাদের সর্ব্বস্ব গিয়েছে।"

আমার অসহ্য বোধ হ'ল, আমার বল্‌তে ইচ্ছা হ'ল সব মিথ্যা—এমন সময়, সুইটী এসে উপস্থিত হল। তার দিকে মধুর দৃষ্টি করে মধুরস্বরে এমি বল্লে "কি ভয়ানক শোচনীয় ঘটনা!"

আমার স্ত্রী বল্লেন—"আর তুমি বোধ হয় তখন এমির মধুর দৃষ্টির জন্য ছট্‌ফট্ করছিলে?

কথাটা অস্বীকার কর্‌তে পারলাম না—বল্লাম "গল্পটা দেখছি আর শেষ করতে দেবে না!"

"বোঝা গেছে—বোঝা গেছে—তাকে লভে ফেলতে গিয়ে নিজেই লভে পড়ে গেলে। এদিকে বলা হয়, আমাছাড়া—"

চক্ষুদুটি জলপূর্ণ হ'য়ে উঠ্‌ল। আমি বিপাকে পড়্‌লাম। বলিলাম, "লভ্‌ নয় গো লভ্‌ নয়—"

"তবে কি?"

"একটু খেলার সাধ!"

"আমাকে নিয়েও সেই খেলান চলছে বুঝি!"

মহাবিপদে পড়লাম—গল্প ঐখানেই শেষ হ'ল, চাঁদের আলো উপভোগের আর অবসর হ'ল না; তাঁহার প্রতি আমার ভালবাসা যে যথার্থ প্রেম—আর পূর্ব্বের সবই মিথ্যা খেলা, তাহা বুঝাতেই সে রাত্রির অবসান হ'ল। সে দায় হ'তে নিষ্কৃতি পেয়ে প্রতিজ্ঞা করলাম আর কখনও পত্নীর নিকট বিলাতের জীবনের গল্প ক'রব না।

শিরী-ফরীদ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তৃতীয় দৃশ্য।

উদ্যানে শিলাতলে উপবিষ্টা শিরী, পার্শ্বে দণ্ডায়মানা আমিনা।

আমিনা। কি গো রাণি, বিষণ্ণা যে হেরি! এবারে কি
জাগরণে ভিখারি-দর্শন?

শিরী। অন্ধ, তার
কিবা স্বপ্ন, কিবা জাগরণ। সুধাইলে
যদি, তবে বলি—চক্ষের নিমেষে যদি
সৃষ্টির সকল দৃশ্য আঁধারে মিলায়,
আবার, ঘুমের ঘোরে, মুদ্রিত পলক
মাঝে, সৃষ্টির সকল দৃশ্য, জেগে যদি
উঠে গো আমিনা, সেথা কাজ কি নয়নে
জ্যোতি, কাজ কি আলোক? জাগরণে যেথা
মনুষ্যত্ব সর্ব্বদা শঙ্কিত, অস্তিত্বে সন্দেহ—
সেথা কাজ কি এ জাগরণ-জ্ঞান! জাগরণে
আমি স্বপ্নময়ী—আপনার আকাঙ্ক্ষার
মাঝে, তৈলের মক্ষিকামত, শক্তিহীনা
কার্য্যহীনা, শুধু পূর্ণ অবিশ্বাসে সদা
ম্রিয়মাণ।

আমিনা। এ আবার কি রকম কথা!

শিরী। এই কি আমার রাজ্য, এই কি ঐশ্বর্য্য!
রাণী আমি ভিখারীর দৃষ্টি-ভিক্ষারিণী?
ভিখারিণীমত তার সঙ্গে সঙ্গে যাব?
উন্মাদিনী মত, শুধু কাতরতা দিয়ে
একটী একটী বাক্য করিয়া গঠন,
তার পাদমূলে আমি উপহার দিব?
তবে সে কহিবে কথা, তবে সে ফিরিবে!

আমিনা। এসব কি কথা রাণি!

শিরী। এসব কি কথা!
জ্ঞান-স্বপ্নে তুই অভিমানী—তোর সাধ্য
বুঝিবি কি এসব কি কথা! এত বড়
পণ—যে পণ-প্রহার-জ্বালা সহিতে না
পেরে, পারস্যসম্রাট আজি অগণ্য পাগল
সঙ্গে লয়ে তাতারের প্রান্তদেশে করে
বিচরণ,—এত বড় পণ, এত তেজ-
গর্ব্ব সনে কোন্ প্রাণে দিব বিসর্জন!
তা হবে না—যদি দিই, পাগলে বরিব,
পারস্যের দাম্ভিক রাজার বাঁদী হব।
সেও ভাল, তবু তার মুখ চাহিব না।

আমিনা। হে ঈশ্বর! করিলে কি! এত রূপরাশি,
এত মধুরতা, এত প্রেম, মধুভরা
এ পূর্ণহৃদয়, শেষকালে মত্ততায়
করিল আশ্রয়!

শিরী। শীঘ্র সখি, ডেকে আন
রস্তমে তোমার। হে সুখী দম্পতী! দোঁহে
লও ভার তাতারের। সে হোক্ তোমার
রাজা, তুমি হও তার রাণী—রাষ্ট্র কর
সমস্ত তাতারে, বিভল্যা তাতারেশ্বরী
বাঁদী হ'তে পারস্তে চলিল। সন্ধি কর
সুল্‌তানের সনে। বল, রাণী পণ দেছে
বিসর্জন।

আমিনা। কেহ কি করেছে অপমান?

শিরী। অপমান! সখীরে শুধু কি অপমান!
কণ্ঠ রুদ্ধ কহিতে সে কথা! অহঙ্কারী
নিষ্ঠুর ভিখারী! কাচখণ্ড একমাত্র
সম্পত্তি যাহার—খণ্ডে খণ্ডে গলে ধরে
ফকীরের মালা—হাতে পেয়ে কোহিনুর
কাচসঙ্গে ধুলাতে বিলা'তে চায় তারে।
এ হ'তে আর কি সখি, আছে অপমান!

আমিনা। এ বুঝি সে ভিক্ষুচিত্রকর!

শিরী। আয় স্বপ্ন!
স্বপ্নসনে ফিরে আয় রাণী তেজস্বিনী!
স্বপ্ন, তুই রেখেছিলি মর্য্যাদা আমার—
জাগ্রতি ডুবাতে চায়। আমিনা আমিনা!
জাগিতে বাসনা গেছে—পার কি বলিতে,
কি পলকে, বিপুল নিদ্রার বক্ষে, চির-
জীবনের স্তূপীকৃত সাধরাশি লয়ে
নিস্তরঙ্গ ডুবে যায় জাগ্রতি আমার।

আমিনা। তা জানিনা রাণী!

শিরী। দেখ সখি, স্বপ্নে আমি
ওষ্ঠদ্বয় পাষাণে রচিয়াছিনু, পাছে টলে
পণ শত সাধ্য-সাধনায়, আমি তাই
কহি নাই একটী বচন। নির্নিমেষ
নয়নে চাহিল, নির্নিমেষ আঁখিযুগে
উত্তর লুকায়ে তারে করিনু হতাশ।
অভিমানে চলে' গেল, তবু আমি স্থির।
আবার ধরণীপ্রান্তে অঙ্গ লুঁকাইল,
তবু আমি স্থির। পাছে শুনে, মনে মনে
কই নাই কথা। এ হ'তে কঠিন প্রাণ
দেখেছ কি রমণীর? কাতরা হইয়া
যদি আমি না ডাকি তাহায়, আর মুখ
ফিরাবে না ভয় দেখাইল, আমি তবু
অচল অটল। তার পর!—তার পর
স্বপ্নসঙ্গে মহত্ত্ব-মর্য্যাদা-মান, তেজ-
অহঙ্কার, সমস্ত করিয়া আকর্ষণ
লুকাল রজনী। মন্ত্রবলে রুদ্ধবীর্য্যা
নাগিনীর মত, আপনি হতেছি দগ্ধ
আপনার নিশ্বাস-অনলে। কোনমতে
নিবারিতে নারি সখি, নয়নের জল,
সহস্র চেষ্টায় সুস্থির করিতে নারি
হৃদয় চঞ্চল। যেই মনে মনে করি
স্বপ্ন ত অলীক চিন্তা—অমনি নয়ন
হ'তে দৃশ্য সমুদায় দেখিতে দেখিতে

যেন যায় মিলাইয়া, শ্রবণ বধির
হয়, স্পর্শে কিছু খুঁজিয়া না পাই।
ফরীদ ফরীদ! না, না, কেবা সে ফরীদ!
সে যে অতি দীন সখি, কোথা রত্ন পাবে
কোথা অর্থ লোকবল—কেমনে রচিবে
সে উদ্যান, ভিখারীর লোভে ছেড়ে দিব
পণ! আমিনা আমিনা, বল কি করিব?
স্বপ্ন-কথা ভেবে ভেবে শেষে কি পাগল
হব?

আমিনা। স্বপ্নের রাজত্ব যেথা, বিচিত্রতা
বিভূতি যেথায়, সে সংসারে কিবা সাধ্য
কি অসাধ্য, বুঝিব কেমনে? তবে এই
ভিক্ষা তাতার-ঈশ্বরি, স্বপ্নের ফরীদে
তুমি যেইমত করিয়াছ প্রত্যাখ্যান,
জাগ্রত ফরীদে যদি কখন দেখিতে
পাও, আত্মহারা, কর' না মর্য্যাদা নাশ।
তার পর আছেন ঈশ্বর।

শিরী। কত দূরে
পারস্যের রাজা?

আমিনা। যক্ষর্ত্তিসনদীপারে
রচিত অগণ্য সৈন্য ব্যূহের ভিতরে
আছে উত্তরের প্রতীক্ষায়।

শিরী। ভিখারীর
অহঙ্কার দেখে' মনে মনে এত রাগ
হয়, ইচ্ছা—চলে' যাই পারস্যের দেশে।

আমিনা। আবার সে কথা কেন?

শিরী। আবার সে কথা!

কত রাজপুত্র যার প্রাসাদের দ্বারে
পলমাত্র সময়ের অপাঙ্গভিখারী,
পারস্যের শাহ যারে অমূল্যরতন
করে' স্থির, গুরুজ্ঞানে দুনিয়ার মত
হ্রদ-শৈল-মরুভূমি তীব্রবেগা নদী—
অগণ্য কণ্টক হয়ে পার, একলক্ষ
বাহক এনেছে, রুস্তম দেখিলে যারে
দূর হ'তে মাটীতে লুটায়, সে কি এত
লঘু, এত তুচ্ছ ভিখারীর কাছে, শুধু
বাক্যবলে উঠিবে-বসিবে; সখি সখি,
শুধু চিন্তা অসহ্য আমার।

আমিনা। আর কেন

ছলনা আমারে রাণি! সব বুঝিয়াছি।
স্বপ্ন মিথ্যা, ক্রোধ মিথ্যা, এযে গো জ্বলন্ত
অভিমান! লূতাসূত্রে আবদ্ধ মক্ষিকা
যথা, প্রতি দন্তে প্রতি আস্ফালনে, পাকে-
পাকে যায় জড়াইয়া, প্রতি দন্তে প্রতি
আস্ফালনে আনে হৃদয়ের অবসাদ,
তাতার-ঈশ্বরি, আজি তোমার সে দশা।
কথায় শৃঙ্খলা নাই, ধারাশূন্য ভাব—
কভু লজ্জা, কভু ক্রোধ, কভু প্রস্রবণ-
ধারাবাহী অন্তর্ভেদী যাতনায় ভরা,

চঞ্চলনয়নদ্বয়। কভু আত্মগ্লানি
কভু আত্মমর্য্যাদায়, দুঃখে-হর্ষে কভু
পতিত-উত্থিত-স্থির কম্পিতহৃদয়—
আর কেন ছলনা দাসীরে রাণি! সব
বুঝিয়াছি,—আহা, এ চক্ষু যে ভুলায়েছে
সে নাজানি কতই সুন্দর! পণে বাঁধা
অটল হৃদয় যেবা এমন আকুল
করে দেছে, সে নাজানি কতবড় বীর!
রাজৈশ্বর্য্যরূপরসে, শত নৃপতির
অবিচ্ছিন্ন চাটুগানে নিত্য সংবর্দ্ধিত,
আসমুদ্রক্ষিতিব্যাপ্ত মহা অহঙ্কারে
শতদিকে প্রক্ষিপ্ত চিন্তায় যেইজন
আয়ত্তে এনেছে, আহা রাণি, নাজানি সে
কেমন কৌশলী! কই রাজা—কোথা রাজা,
অগণ্যরাজন্যসেব্য বিজয়ী সম্রাট?
আমারে দেখাও রাণি!

শিরী। বেশ তবে রহ
অপেক্ষায়, কিন্তু সখি, যুগান্ত বহিয়া
যদি সময় চলিয়া যায়? যাক্, এবে
রস্তমে সংবাদ দাও, আমি সন্ধি দিব
পারস্যের সনে।

আমিনা। পারস্যের আচরণে
অতি ক্রোধে রাজপ্রতিনিধি করিয়াছে
সমরঘোষণা।

শিরী। সেকি? কাহার আদেশে?

আমিনা। আদেশ লইতে তার ছিল না সময়।

শিরী। তার পর?

আমিনা। তার পর তুমি জান, আর
জানে রাজপ্রতিনিধি।

শিরী।　　এ ক্ষুদ্র তাতার
পারস্যের সহ সংঘর্ষণে, একদণ্ডে
হবে ধূলিকণা, আদেশ দিবার কালে
এ জ্ঞান কি ছিল না তাহার? হই রাণী,
তবু তুচ্ছ নারী। শান্তিময় তাতারের
রাজভক্ত অগণ্য প্রজার হাহাকার-
বিনিময়ে আমার মঙ্গল ক্রয়? তুমি
ধরে' আন রন্তমে তোমার। তার যোগ্য
শিক্ষা তারে দিব, এ রাজ্যের রাণী আছে,—
হউক বালিকা, তবু তার প্রাণে-প্রাণে
শত উজীরের হিতাহিতজ্ঞানশক্তি
নিহিত রয়েছে, তারে এখনি বুঝাব।

আমিনা।　বুঝাইয়া দাও তাই তাতার-ঈশ্বরি!
ক্ষুদ্র বালিকার 'পরে অন্ধের বিশ্বাস
তার, আমারও অসহ্য হয়েছে।

[প্রস্থান।]

(নেপথ্যে।)　　ওগো!
কে আছ কোথায়, শীঘ্র এসো, শীঘ্র এসো!
ডাকাতের হাতে পড়েছে মোদের রাণী!
অতিশয় নির্দ্দয় ডাকাত; রাণী বুঝি
বাঁচেনাকো। যে যেথানে থাক, অস্ত্রশস্ত্র
লয়ে শীঘ্র এসো। রাণীর কোমল অঙ্গ
ঘেরিয়া কণ্টকবনে, নির্দ্দয়প্রহারে বুঝি
এতক্ষণ প্রাণশূন্য করিল রাণীরে।

[নেপথ্যে কোলাহল।]

শিরী।　কি আপদ, এ আবার কি রকম কথা!

[বেগে প্রস্থান।]

শ্রীক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ।

ভারত-প্রসঙ্গ।

ভ্রাতৃবিরোধ।

বঙ্গ।

বিপিন পাল ও স্বরেন্দ্র বাবুর বিরোধ।

রবীন্দ্রনাথের মহদ্দৃষ্টান্তে আমরা মনে করিয়াছিলাম, বাঙ্গালী-জাতি জাতীয়তার একটা ভারি উচ্চস্তরে উঠিয়াছে। এখন আমাদের নেতাদের মধ্যে যে বিরোধ, সে কেবল মতের বিরোধ, ব্যক্তিগত বিরোধ নয়। রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসকে নগণ্য করিয়া স্বরেন্দ্রনাথপ্রমুখ কংগ্রেস-নেতাদের পলিসিকে ধিক্কার দিয়া বহু সভায় বহু বক্তৃতা করিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের ভক্তের দল কিছু কম নয়। তিনি ভাবুক নব্য-বাঙ্গালার রাজা। সেই রবীন্দ্রনাথ যেদিন হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে, দেশের মঙ্গলের জন্ত স্বরেন্দ্রনাথকে দেশনায়কের পদে অধিষ্ঠিত করা প্রয়োজন, তিনি বিরাটসভায় স্বহস্তে তাঁহার কণ্ঠে গৌরব-মাল্য অর্পণ করিয়া প্রস্তাব করিলেন—"ইনি আমাদের দেশনায়ক হউন।" যে নিজে এত ক্ষমতাবান এত গৌরবশালী, সে-ই সর্ব্বস্ব অপরের পায়ে অর্পণ করিয়াছে, দেশৈকব্রতিতার এমন দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে? আমরা জানি, বিপিন-পালও বিনয়ী ও নিরভিমানী হইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্ব যখন পরিপক্ক হয় নাই, যখন নেতৃত্বাভিলাষীর আত্মাভিমান তীক্ষ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা, তাঁহার সেই দিনের একটী নিরহঙ্কারিতার সাক্ষ্য আমরা দিতে পারি। একদিন আমরা কতিপয় যুবক তাঁহাকে কোন সভার সভাপতিত্বে বরণ করিবার প্রস্তাব লইয়া গিয়াছিলাম। তিনি উত্তর করিয়াছিলেন "আমার

অপেক্ষা যোগ্যতর দেশবৃদ্ধেরা রহিয়াছেন—নরেন্দ্রনাথ সেন, সুরেন্দ্র বাবু প্রভৃতি। তাঁহাদের কাহাকেও যদি সে সময় না পাও তবে আমাকে আহ্বান করিও। প্রথমেই আমার কাছে আসা তোমাদের সমীচীন নয়।”

এরূপ কথা নেতৃত্বাভিমানী লোকের মুখে প্রায়ই দুর্লভ। বাঙ্গালীর একটা চিরকলঙ্ক ছিল যে, ইহাদের মধ্যে পরস্পরবিরোধ অস্থি-মজ্জাগত। ইহারা কখনও এক হইতে পারিবে না। কিন্তু এত দিন আমরা বড় গর্ব্বের সহিত যেখানে-সেখানে বলিতেছিলাম “দেখ, সম্বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালী কতদূর উন্নতি হইয়াছে। তাহাদের সেই পরস্পরবিরোধী ভাব এখন আর নাই। যদিবা কাহারও কাহারও মধ্যে ব্যক্তিগত ও ধর্ম্মগত বিদ্বেষ থাকিতে পারে, তথাপি দেশের কাজের বেলা তাহারা সেই সব ভুলিয়া ভাই ভাই হইয়া কাজ করিতেছে।” বাহিরের কার্য্যকলাপ দেখিয়া লোকেও তাহা বিশ্বাস করিত, এবং এই অল্পদিনের মধ্যে বাঙ্গালীর এরূপ উন্নতি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত। ইহা কি বাঙ্গালীর সামান্য গৌরবের কথা!

কিন্তু এবার মৃত্যুত্থিত “নিউ ইণ্ডিয়া” সুরেন্দ্রবাবুর প্রতি মারমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভারতের দ্বারে দ্বারে দুই পয়সার টিকিটযোগে ঘুরিতেছে। তাহাতে বিপিন পালের সুরের পরিবর্ত্তন দেখিতে পাইতেছি। শুধু সুরেন্দ্রবাবু নহেন, গোখ্‌লে-প্রভৃতি আরও অনেকের প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষের ঝাঁঝ ‘আনাচে-কানাচে’ হইতে উদ্বেল হইয়া পড়িয়াছে। শান্তিপুরের ছাত্রদের য়্যাপলজি-প্রসঙ্গে তিনি আর একটা য়্যাপলজির উল্লেখ করিয়া লিখিতেছেন—“In one other case only, under instructions from eminent counsel, was a similar apology tendered, and a somewhat similar attempt made to save one's own skin by pointing to another person-

as the real culprit." অতঃপর নিজেই বলিতেছেন—"But that case must not be raked up. Such things are best forgotten."

"যাহা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল" তাহার এমন ইঙ্গিতই বা কেন? দেশের কাজে কেহ যদি কোন দিন পতিত হইয়া থাকে, এমন কোন পতিতপাবনী কর্ম্মগঙ্গা কি 'নিউ ইণ্ডিয়ার' চক্ষে নাই, যাহাতে তাহাকে শুদ্ধ করে? 'নিউ ইণ্ডিয়া' কি খ্রীষ্টানের eternal damnationএ বিশ্বাসী?

নিউ ইণ্ডিয়াকে বুঝি বা এক্ষন দায়ে পড়িয়া এক ঘূর্ণাবর্ত্তের মধ্যে পড়িতে হইয়াছে। কিন্তু বিপিন পালের প্রতি আমাদের আশা অনেক। দশের ঠেলায় তিনি প্রজ্ঞার সঙ্কীর্ণ ধাঁধা-পথ হইতে বিচ্যুত হইতে হইতেও আপনাকে সামলাইয়া লইবেন, এই আমাদের বিশ্বাস।

উত্তর-পশ্চিম।

লক্ষৌবাসী ও এলাহাবাদীর বিরোধ।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হাইকোর্ট এলাহাবাদ হইতে লক্ষৌয়ে তুলিয়া আনার প্রস্তাবে, এই দুই জায়গার অধিবাসীদের মধ্যে মহাবিরোধ চলিতেছে। দুই সহরের মুখপত্র দুইখানি—লক্ষৌয়ে "লক্ষৌ য়্যাড্‌ভোকেট" (*Lucknow Advocate*) ও এলাহাবাদে "ইণ্ডিয়ান পীপ্‌ল্‌" (*Indian People*)। য়্যাড্‌ভোকেটের সম্পাদক ঋষিসম প্রকৃতি মুন্সী গঙ্গাপ্রসাদ বর্ম্মা, আর সম্প্রতি *Indian People*এর সম্পাদক বাঙ্গালীর সুপরিচিত ঘরের লোক—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। কিন্তু ঘরোয়া বিবাদ ছাড়িয়া দিয়া অন্য প্রসঙ্গ যখন আসে তখনও আমরা দেখিতে পাই, এই দুইখানি পত্রিকা সব বিষয়েই ঠিক বিরোধী দুই দিক গ্রহণ করেন। এবং লজ্জার সহিত লক্ষ্য করিতেছি যে, হিন্দুস্থানী

সম্পাদক প্রায়শই অপক্ষপাতী ও সমদর্শী, এবং বাঙ্গালী সম্পাদক প্রায়শই পক্ষপাতী ও একদেশদর্শী। একটী দৃষ্টান্ত বড় চোখে লাগিয়াছিল। দিনকতক পঞ্জাবের একটা ঘরোয়া বিবাদ বড় জ্বলিয়া উঠে। পঞ্জাবের সুবিখ্যাত ট্রিবিউনপত্রিকার সম্পাদক পরিবর্ত্তন হওয়ায় লালা লাজপতরায়ের দল স্বার্থহানির আশঙ্কায় মহা খাপ্পা হইয়া উঠেন। তাঁহারা বিধি ও অবিধিমতে নন্দিমহাশয়কে অপদস্থ করার সবরকম উপায় অবলম্বন করিতে থাকেন। লাজপত রায়ের কাগজ "দি পাঞ্জাবী"তে প্রতিদিন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ট্রিবিউনের বর্ত্তমান সম্পাদকের বিরুদ্ধে রাজ্যের লোকের ও কাগজের (উসকান) বিরুদ্ধমত প্রকাশ হইতে লাগিল। আজকালকার ভদ্রভাবে কাগজ-পরিচালনার দিনে এমন কেলেঙ্কারী ব্যাপার কল্পনাতীত। দায়ে পড়িয়া আত্মরক্ষার্থ ট্রিবিউন-সম্পাদককেও স্বপক্ষ বক্তাদের মত উদ্ধৃত করিতে হইল। এই যুদ্ধে ইণ্ডিয়ান পীপ্‌ল্ (*Indian People*) গায়ে পড়িয়া লিখিলেন "The columns of our spirited contemporary, the *Punjabee* bear ample witness to the growing unpopularity of the *Tribune* * * The Arya Samajists looked upon it as their organ.* What has happened to disturb those excellent relations? * * We have received the first number of a new daily paper started at Lahore, called *Light*. We are informed that the editorial staff consists practically of the entire editorial establishment of the *Tribune* as it was in the time of Babu Amrita Lal Ray. * * * * From the first number of *Light* we have no hesitation

---

* এ কথা সম্পূর্ণ সত্য। তবে এখানে আর্য্যসমাজ বুঝাইতে কেবল কলেজ পার্টিকেই বুঝায়। নূতন সম্পাদকের সঙ্গে সঙ্গে কাগজখানি তাঁহাদের হাত-ছাড়া হওয়াতেই তাঁহারা এত খাপ্পা।—লেখক।

in saying that it is much better written than the *Tribune.* * * * There can be no question that the *Tribune* is being run now as an *Anti-Arya Samaj* paper, and is trying to pay off the score between one of the trustees and certain members of the Arya Samaj, the trustee himself joining the fray in bad English and worst taste."* কিন্তু *Lucknow Advocate* সমতার উচ্চশিখর হইতে বলিলেন, †

---

* Light একটী নূতন প্রকাশিত দৈনিক পত্র। লালা লাজপত রায়দের "দি পাঞ্জাবীর" ন্যায় ইহাও কলেজপার্টির মুখপত্র। লাজপত রায়ের এককালীন গুরু লালা হংসরাজ স্বয়ং ইহার পৃষ্ঠপোষক। শুনিতেছি, গুরু-শিষ্যে কিছু মনোমালিন্য ঘটাতেই ইহার সৃষ্টি। "লাইটে"র অগ্নি সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী কিন্তু এখানে সত্যানুরোধে আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, নূতন সম্পাদকের সঙ্গে সঙ্গে ট্রিবিউনপত্রিকার অবনতি হওয়া দূরে থাকুক, আমরা ইহার সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি দেখিতে পাইতেছি।—লেখক।

† Arya Samaj and Politics under this heading Lala Lajpat Rai has written long a article in the Punjabee, the first portion of which deals with one aspect of the question, namely, why Arya Samaj is not popular with Christians, Mahommadans, Sikhs and a section of the Hindus. No body for a moment can doubt the earnestness and sincerity of the Arya Samaj ; to call it a political body is mischievous. The workers are mostly men devoted to the social and material advancement of India and they have nothing to do with politics so much. But when all is said that can be said, may we not ask Lala Lajpat Rai and other friends to more closely examine their own armour and see if there is anything wrong with them ? Besides the Punjab other provinces are more or less active, but why should there be greater acrimony in public discussions. We have the Hindu College, the Kayastha Patshala and a number of private schools teaching thousands of boys ; the sacrifice of men like Lala Bhagwan Das, Pundit Ikbal Narain is no less to be admired than that of any professor in the D.-A. V. College ; the spectacle presented by Pundit Aditya

কিছু দিন হইল লালা লাজপতরায় "পাঞ্জাবী"তে—"আর্য্যসমাজ এবং পলিটিক্স্" শীর্ষক একটী লম্বা প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাহার প্রথমাংশে "আর্য্যসমাজ কেন খ্রীষ্টান, মুসলমান, শিখ ও অন্যান্য হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বীদের নিকট প্রিয় নহে" এই প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছেন আর্য্যসমাজের আন্তরিকতায় কেহ মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দিহান হইতে পারেন না। ইহাকে রাজনৈতিক দল মনে করা ক্ষতিজনক। ইহার কর্ম্মকর্ত্তারা সকলেই ভারতের সামাজিক ও আর্থিক উন্নতির অভিলাষী। তাঁহারা রাজনীতির বড় ধার ধারেন না। কিন্তু যাহা বলিবার সব যখন বলা হইয়াছে, তখন আমরা লালা লাজপতরায় ও অন্যান্য বন্ধুবর্গকে তাঁহাদের নিজেদের কোন দোষ আছে কিনা, তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য কি অনুরোধ করিতে পারি না? পাঞ্জাব ছাড়া

Ram Bhattacharyya, Rai Pearayalal and Pundit Chedalal in spending their old age in the service of the mother-land is as pleasing as that of any honorary worker of the Arya Samaj in Lahore. But why should there be more zealousy in one and less in others? We have got surely Indian-managed banks here but no body dreams of accusing their Directors of selfishness, because they charge fees for their good work as they do in the Punjab, why all this bad feeling and acrimony there? Is it not due to the spirit of denunciation which is to be found in the writings and preachings of the Samaj, papers and speakers? Why should Mahommedans and Christians prove more aggressive in the Punjab than in the U. P.? Is there anything wrong in the local atmosphere? Just take the crusade against the *Tribune*. We have no desire to take sides. Is it not ridiculous to devote columns after columns of a newspaper in denouncing the new editor because he is more cautious and less enthusiastic and does not see eye to eye many questions with his opponents? If the *Tribune* does not represent the public opinion of Lahore in

অন্যান্য প্রদেশও অল্পস্বল্প কাজ করিতেছে, কিন্তু এখানে সাধারণ বিষয়ের আলোচনায় এত তীব্রতা—এত ব্যক্তিগত বিদ্বেষভাব কেন? আমাদের হিন্দুকলেজ, কায়েস্থপাঠশাল এবং বহুসংখ্যক বেসরকারী স্কুল আছে, এবং তাহাতে হাজার হাজার বালক শিক্ষালাভ করিতেছে। লালা ভগবান দাস ও পণ্ডিত ইক্‌বাল নারায়ণের স্বার্থত্যাগ, ডি-এ-ভি কলেজের কোন প্রফেসারের স্বার্থত্যাগ অপেক্ষা কম প্রশংসনীয় নহে। পণ্ডিত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য, রায় পেয়ারী লাল এবং পণ্ডিত চেদা লাল এই বৃদ্ধ বয়সে যেরূপভাবে মাতৃসেবায় নিযুক্ত তাহাতে তাঁহারা

---

certain matters, it can find expression in the columns of the *Punjabee* and the *Daily Times* both of which are ably edited and are in the hands of patriotic men known all over the province. But is that sufficient reason to insinuate that Mr. Nundy the Editor, and Mr. Harkishen Lal one of the trustees of the *Tribune*, have sold themselves off to the Punjab Government or that Sir Charles Rivaz's government has nothing better to do than to hatch a conspiracy? We appeal to Lala Lajpat Rai to use his influence in putting down the present outburst of feeling No body can injure the Lahore Arya Samaj, in its good work, much less a newspaper the promoters of which disown any ill will towards the body. It will indeed be a suicidal policy to injure the *Tribune* after the many sacrifices, pecuniary and otherwise, made by the late lamented Sardar Dayal Singh and his trustees to reach the present position of influence. We have got so few dailies conducted in the popular interest that unless the evidence is strong to prove that any such journal is no more conducted in the popular interest, the policy of running it down is no good policy. The field for work is large, the workers few. Instead of one falling foul of each other, let us, if we cannot work on one common platform, choose different lines, but let us by all means put down the spirit of acrimony which has ruined so many good intitutions of the country.

লাহোর-আর্য্য-সমাজের অবৈতনিক কর্ম্মকর্ত্তাদের অপেক্ষা পশ্চাৎপদ নহেন। কিন্তু একদলে এত বেশী ঈর্ষাভাব, এবং অন্যদলে এত কম কেন ? আমাদের এখানেও দেশীয় পরিচালিত অনেক ব্যাঙ্ক আছে। কিন্তু কেহই পাঞ্জাবের মত তাহাদের ডিরেক্টরকে তাঁহার কাজের জন্ত পারিশ্রমিক চান বলিয়াই স্বপ্নেও স্বার্থপর বলিয়া ভাবেন না। পাঞ্জাবে এত বিদ্বেষভাব কেন ? আর্য্যসমাজের লেখায়, বক্তৃতায় এবং কাগজে যে অন্যদের প্রতি একটী ভয়ঙ্কর দোষারোপ-প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—ইহাই কি এই বিদ্বেষভাবের মূল নহে ? মুসলমান এবং খ্রীষ্টানদের যুক্তপ্রদেশের অপেক্ষা পাঞ্জাবে আর্য্য সমাজের প্রতি এত আক্রোশ কেন ? ইহা সেখানকার জলবায়ুর দোষ নাকি ? ট্রিবিউনের বিরুদ্ধে তাহাদের মসীযুদ্ধের দৃষ্টান্তই ধর। এখানে আমাদের কোন পক্ষ অবলম্বন করিবার ইচ্ছা নাই। কোন একটী পত্রিকায় প্রতিদিন পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা—কোন একজন নূতন সম্পাদকের—তিনি তাঁহাদের অপেক্ষা বেশী সতর্ক এবং কম ঝাঁঝাল এবং সব বিষয়ে তাঁহাদের সঙ্গে সমান চক্ষে দেখেন না বলিয়াই—তাঁহার প্রতি দোষারোপে পূর্ণ থাকিলে ইহা কি উপহাসাস্পদ বলিয়া মনে হয় না ? যদি কোন বিষয় লাহোরী সাধারণের মত "ট্রিবিউনে" প্রকাশিত না হয়, তবে তাহা "পাঞ্জাবী" কিম্বা "ডেলি টাইম্‌সে" প্রকাশিত হইতে পারে (এই দুইটী কাগজও ত উপযুক্ত সম্পাদক-কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং স্বদেশভক্ত নেতাদের হস্তে ন্যস্ত আছে)। কিন্তু "ট্রিবিউনের" সম্পাদক মিঃ নন্দী এবং মিঃ হরকিষণ লাল (একজন ট্রাষ্টি) পাঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের নিকট আত্মবিক্রয় করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের উপর দোষারোপ করিবার ইহাই কি যথেষ্ট কারণ ? অথবা ইহাই কি বুঝিতে হইবে যে, সার চার্লস রিভাজের গবর্ণমেণ্টের আর কোন কাজ নাই, বসিয়া বসিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন ? আমরা লাজ-

পতরায়কে অনুরোধ করি, তিনি তাঁহার দেশ হইতে এই বিদ্বেষভাব দূর করিবার জন্য তাঁহার যথাশক্তি নিয়োগ করুন। কোন ব্যক্তি অথবা কোন পত্রিকা—যাহার উন্নতি-ইচ্ছুকেরা মনে মনে আর্য্য-সমাজের বিরুদ্ধমত পোষণ করেন—কিছুতেই লাহোর-আর্য্যসমাজের কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। "ট্রিবিউনের" প্রতিষ্ঠাতা পরলোকগত সর্দ্দার দয়াল সিংহ এবং ট্রাষ্টিবর্গ ইহাকে বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় উপনীত করিতে যে সব আর্থিক ও অন্যান্যপ্রকার ক্ষতি স্বীকার করিয়াছিলেন, তাহাতে এখন "ট্রিবিউনের" অনিষ্ট করিতে চেষ্টা করা নিজের পায় নিজে কুঠারাঘাত করার মত অনিষ্টকর হইবে। লোকপ্রিয় দৈনিক কাগজ আমাদের খুব কমই আছে। সুতরাং কোন একটী পত্রিকার লোকপ্রিয়তার বিরুদ্ধে যথেষ্ট প্রমাণ না থাকিলে তাহার অনিষ্টচিন্তা করা উচিত নয়। কার্য্যক্ষেত্র অতি প্রশস্ত, কিন্তু কাজের লোক বড়ই কম। পরস্পরে বিবাদ না করিয়া বরং যদি আমরা এক ক্ষেত্রে কাজ করিতে না পারি, তবে ভিন্ন ভিন্ন পথে কাজ করা উচিত। আর আমাদের মধ্যে যে বিদ্বেষভাব আছে—যে বিদ্বেষভাবের জন্য দেশের বহুসংখ্যক মহদনুষ্ঠান পণ্ড হইয়াছে—সেই বিদ্বেষভাব দূর করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত।"

তার পর হইতে "দি পাঞ্জাবী" লোকলজ্জায় প্রকাশ্যে "ট্রিবিউনকে" গাল-মন্দ করিতে নিরস্ত হইয়াছেন। এবং শুনিতে পাই "*Indian People*"কে তাঁহার কাঁচা কাজের জন্য অনুতাপ করিতে হইয়াছে।

পাঞ্জাব।

লালা হরকিষণলাল ও লালা লাজপতরায়ের বিরোধ।

"লক্ষ্ণৌ য়্যাড্ভোকেট" *(Lucknow Advocate)* হইতে পূর্ব্বে যে অংশটুকু উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহাতেই পঞ্জাবের ভ্রাতৃবিরোধের

কিঞ্চিৎ আভাস দেওয়া হইয়াছে। ইহাঁদের উভয়ের বিরোধটা ভাল করিয়া বুঝাইবার জন্য পঞ্জাবকংগ্রেসের ইতিহাস একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

১৮৯৩ খৃঃ অঃ পঞ্জাবে প্রথম কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। ৺বক্সী জয়সী রাম অভ্যর্থনা-কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। বলিতে গেলে তিনিই তখন সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। দয়ানন্দ-কলেজ-পার্টির তদানীন্তন নেতা মুলরাজ, কংগ্রেসের ভয়ানক বিরোধী ছিলেন। কাজেই লাজপতরায় তখন কংগ্রেসের কিছুতেই ছিলেন না। কলেজপার্টি তখন শুধু কংগ্রেসের বিরোধী ছিলেন তাহা নহে, হরকিষণলালের সহিত তাঁহাদের বিরোধ ও বিদ্বেষ তখন হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। যে লাইনেই হউক না কেন, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি অন্যের হাতে দেখিলে তাঁহারা যতক্ষণ তাহা নিজেদের করায়ত্ত করিতে না পারেন, ততক্ষণ নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যান না—এই দুর্নাম কলেজপার্টির চিরকাল। তাঁহাদের প্রথম নেতা মুলরাজের আমলেও সেই কথা, মুলরাজ হৃতগর্ব্ব হইলে হংসরাজের আমলেও সেই কথা, হংসরাজ ক্ষীণপ্রভ হইলে, লাজপতরায়ের আমলেও সেই কথা।

কংগ্রেস-তহবিলে সেবার দশহাজার টাকা উদ্বৃত্ত হয়। সুতরাং একটী স্থায়ী অভ্যর্থনা-কমিটি গঠিত হইল, বাবু কালীপ্রসন্ন রায় তাহার সভাপতি এবং বক্সী জয়সীরাম জেনারেল-সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জয়সীরামই প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা ছিলেন, এবং তিনিই প্রথম লালা হরকিষণলালকে তাঁহার সহায়তার জন্য আহ্বান করেন। লালা হরকিষণলাল অক্লান্ত পরিশ্রমগুণে শীঘ্রই জয়েণ্ট-সেক্রেটারী হইলেন। কংগ্রেসের সৃষ্টি হওয়া অবধি অম্বালার প্রসিদ্ধ উকীল রায় মুরলীধর * ইহার একজন প্রধান উৎসাহদাতা

* ইহাঁকে "The Grand Old Man of Panjab" বলা হয়। পঞ্জাব

ছিলেন, এবং মফস্বল হইতে যতদূর কাজ করিতে পারা যায় ততদূর করিতেছিলেন। রাওয়ালপিণ্ডির লালা হংসরাজ সাহনি এবং অমৃতসরের লালা কানাইয়া লাল * সেই সময় হইতে জাতীয় কাজের শক্তি-স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। ট্রিবিউনপত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ৺সর্দ্দার দয়াল সিং তখন পঞ্জাবের প্রকৃত নেতা ছিলেন, এবং সমস্ত ভারতের নেতা হইবার উপযুক্ত লোক ছিলেন। কিন্তু পঞ্জাবে দ্বিতীয়বার কংগ্রেস অধিবেশন হওয়ার পূর্ব্বেই তিনি মারা যান। ইতিমধ্যে বক্‌সী জয়সীরামেরও মৃত্যু হওয়াতে সমস্ত কাজের ভার লালা হরকিষণ লালের উপর পতিত হইল, এবং তিনি তখন অভ্যর্থনা-কমিটির জেনারেল-সেক্রেটারী নিযুক্ত হইলেন। ১৯০০ খৃঃ অঃ পঞ্জাবে দ্বিতীয়বার কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। কংগ্রেসের কার্য্য সুসম্পন্ন করিবার জন্য এবং ব্রেড্‌লা হল্ † (Bradlaugh Hall) নির্ম্মাণের

হইতে কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন করিতে হইলে ইঁহাকেই করা উচিত, ইহা প্রায় এখনকার সর্ব্ববাদিসম্মত অভিমত। ইনি বৃদ্ধবয়সে এখনও অম্বালা হইতে দিল্লী গিয়া স্বদেশী সভার নায়কত্ব করেন। যদিও গতবৎসর বেনারস কংগ্রেসে লালা হরকিষণলাল ও লালা লাজপতরায় পঞ্জাবে কংগ্রেস-কমিটির দুই সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, কিন্তু ইঁহারা কেহই ফিরিয়া আসিয়া এপর্য্যন্ত কংগ্রেসের জন্য একপয়সার কাজও করেন নাই। সমস্ত ভারতবর্ষে কংগ্রেসের প্রাদেশিকসমিতি হইয়া গিয়াছে—পঞ্জাবে ছাড়া। লালা হরকিষণলাল ও লালা লাজপতরায়ের নিরুদ্যোগই ইহার কারণ। এখন অবশেষে বৃদ্ধ মুরলীধরের প্রযত্নে ও উদ্যোগেই ইহা আগামী দেওয়ালীর ছুটীতে অম্বালায় আহূত হইয়াছে।—লেখক।

* ইনি অমৃতসরের একজন প্রসিদ্ধ উকীল। তাঁহার নিজস্ব একটী প্রকাণ্ড হল তিনি এই বৎসর সর্ব্বসাধারণকে দান করিয়াছেন এবং ইহাকে "বন্দে মাতরম্ হল" নামে অভিহিত করা হইয়াছে।—লেখক।

† ইহাকে Congress Hallও বলে। Bradlaugh সাহেবের উদারনীতির দরুণ তাঁহার নামানুসারেই এই হলের নাম দেওয়া হয়। ইহা দ্বিতীয়বার কংগ্রেস-মণ্ডপরূপে ব্যবহৃত হইবার জন্যই নির্ম্মিত হয়। এইটী সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। বঙ্গের নেতা পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এই হল নির্ম্মাণের উদ্যোগকর্ত্তাদের মধ্যে লাহোর-চিফ্‌কোর্টের জজ

জন্য চাঁদা সংগ্রহ করিতে তিনি তখন দিনরাত্রি পরিশ্রম করেন। লালা সঙ্গমলাল ও ধনপতরায় তখন জয়েণ্ট সেক্রেটারী ছিলেন এবং রায়সাহেব সুখদয়াল ও পণ্ডিত রামভজ দত্ত-চৌধুরী ফাইনান্‌শিয়াল সেক্রেটারী (Financial Secretary) ছিলেন।

তখন হইতেই লালা হরকিষণলাল কন্‌ষ্টিটিউশন এবং অরগ্যানিজেশনের (Constitution and Organisation) পক্ষপাতী ছিলেন, এবং তিনিই প্রথম ভারতের কৃষিশিল্পের উন্নতিবিষয়ক প্রশ্নকে কংগ্রেসের অঙ্গীভূত করিতে যত্নশীল হন। * সার ফেরোজশা মেটা এবং বঙ্গদেশের নেতারা কন্‌ষ্টিটিউশনের বিরোধী ছিলেন। সেইজন্যই পঞ্জাবের প্রতিনিধিগণ লালা হরকিষণলালের নেতৃত্বে কংগ্রেস হইতে সরিয়া পড়িবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। ১৯০১ খৃঃ অঃ কলিকাতায়

লালা লালচান্দ, ডাক্তার পরমানন্দ, পরলোকগত বাবু কালীপ্রসন্ন রায়, জে, সি, বসু এবং লালা হরকিষণ লালই প্রধান ছিলেন। কিন্তু এখন সেই হল্‌টির কেবল চতুষ্পার্শ্বস্থ দেওয়ালগুলি বর্ত্তমান আছে। একবার এক থিয়েটারের দল সেখানে অভিনয় করিতে আসেন এবং তখনই অগ্নিসংযোগে তাহা ভস্মীভূত হয়। দুঃখের বিষয় আজ পর্য্যন্তও তাহা আর পুনর্নির্ম্মিত হয় নাই। লালা হরকিষণলালের মত কার্য্যক্ষম লোক এই সব কাজ হইতে সরিয়া পড়াতেই অর্থসংগ্রহও হইতেছে না, এবং ইহা মেরামতও হইতেছে না। ইহা পাঞ্জাবীদের পক্ষে অত্যন্ত লজ্জাকর বিষয়। ইতিমধ্যে আবার শুনিতেছিলাম যে, এখানকার Central Training Collegeএর আয়তন বর্দ্ধিত করিবার জন্য ইহা তাহাদের নিকট বিক্রয় করিয়া ফেলা হইবে। সৌভাগ্যের বিষয় অনেক আর্থিক লাভের আশা সত্ত্বেও লাহোরের জনসাধারণ তাহাতে সম্মত হন নাই। তাহা না হইলে এখানকার রাজনৈতিক-ক্ষেত্রের শেষ চিহ্নটীও মুছিয়া যাইত। ইতি—লেখক।

* দেশের Industrial উন্নতিসাধনবিষয়ে লালা হরকিষণলাল পঞ্জাবের 'পাইওনিয়ার' এবং সমস্ত ভারতীয় হিন্দুদের আদর্শস্থানীয়। তিনি লাহোরে আসিয়া অবধি কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যারিষ্টারী পরিত্যাগ করিয়া কলকারখানা, দেশীয় পরিচালিত ব্যাঙ্ক, জীবন-বীমা-কোম্পানী প্রভৃতি স্থাপনে অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়াছেন, এবং অসাধারণ কৃতকার্য্যতাও লাভ করিয়াছেন।—লেখক।

যখন কংগ্রেস হয়, তখন তিনি এবং আরও কয়েকজন কন্‌ষ্টিটিউশনের জন্য ভয়ানক যোঝাবুঝি করিয়াছিলেন। এই সময়ে লালা লাজপত রায় কংগ্রেসে যোগ দেন। তার পর ১৯০৪ খৃঃ অঃ বম্বে-কংগ্রেসে লালা হরকিষণলাল উপস্থিত হইলেন না। কিন্তু লালা দ্বারকাদাস, পণ্ডিত রামভজ দত্ত-চৌধুরী, লালা ধরমদাস সুরী এবং লালা লাজপত-রায় প্রভৃতি কয়েকজন এই ভাবিয়া যোগ দিলেন যে, পঞ্জাব-কংগ্রেসে কন্‌ষ্টিটিউশনটার সে দাবী বারম্বার উত্থাপন করা দরকার। অভ্যর্থনা-কমিটির সভাপতি মেটা-সাহেবের বক্তৃতায় তাঁহাদের মতের কোন উল্লেখ নাই দেখিয়া তাঁহারা তাঁহাদের আপত্তি প্রকাশ করিয়া এক দরখাস্ত পেশ করেন; কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদয় হয় না। সভাভঙ্গের ঠিক পূর্ব্বক্ষণে পণ্ডিত রামভজ দত্ত-চৌধুরী, তাঁহাদের দরখাস্তের কোন জবাব কেন দেওয়া হইল না, এই বিষয় প্রশ্ন করেন। সভাপতি কটন্‌সাহেব পরদিন তাহা বিবেচনা করিবেন বলিয়া সেদিন সভা ভঙ্গ করেন।

লালা লাজপতরায় কলিকাতা-কংগ্রেসে উপস্থিত থাকায় একদিকে লালা হরকিষণলাল, এবং অন্যদিকে মেটা ও বাঙ্গালিনেতাদের মধ্যে কন্‌ষ্টিটিউশন্ লইয়া যে বিসম্বাদ হয়, তাহার সমুদয় তথ্য অবগত ছিলেন বলিয়া পঞ্জাবের প্রতিনিধিগণ পরদিন তাঁহাদের অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার জন্য লাজপতরায়কে তাঁহাদের বক্তা ঠিক করেন। পরদিন লাজপতরায় এমন সুন্দরভাবে তাঁহাদের মতামতগুলি প্রকাশ করিলেন যে, সভাস্থ সকলেই তাঁহাদের অভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিলেন। তখন সার ফেরোজশা মেটা দাঁড়াইয়া লালা লাজপত রায়ের যুক্তিগুলির এবং তাঁহার ব্যক্তিগত খুব প্রশংসাপূর্ব্বক পিঠ চাপ্‌ড়াইয়া এবং অনুপস্থিত লালা হরকিষণলালের নিন্দাবাদ করিয়া লালা লাজপতরায়কে তাঁহার দিকে বাগাইয়া লইলেন। তখন অন্যান্য

পঞ্জাবী প্রতিনিধিগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই পরবর্ত্তী বৎসরের জন্য এই প্রস্তাব স্থগিত রাখা হইল।

লাহোরে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পর যখন ইংলণ্ডে একজন প্রতিনিধি পাঠাইবার কথা উঠিল, তখন "ইণ্ডিয়ান য়্যাসোশিয়েশনে" একটী সভা আহ্বান করা হয়। তাহাতে পাঁচজন মেম্বার মাত্র উপস্থিত হইলেন—পঞ্চম ব্যক্তি স্বয়ং লালা লাজপতরায়। কে যাইবে? প্রশ্ন উঠায়—আর কাহারও যথেষ্ট আদর নাই ভাবিয়া, কুমার হরনাথ সিং অথবা তিনি অস্বীকার করিলে লালা লাজপতরায় যাইবেন, এইরূপ ঠিক হইল। কুমার হরনাথ সিং অস্বীকার করিলেন, কাজেই তখন লাজপতরায়ের পালা আসিল। "ইণ্ডিয়ান য়্যাসোশিয়েশনের" পঞ্চম সভ্যের মনোনীত পাত্রের নাম যখন দেশময় রাষ্ট হইল, তখন কিন্তু মহাগণ্ডগোল বাধিয়া গেল। অবশেষে অনেক বাকবিতণ্ডার পর লাজপতরায় তাঁহার কয়েকজন বন্ধুর আর্থিক সাহায্যে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ড হইতে তিনি যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন দেশে 'স্বদেশী'র প্রবল বন্যা। সকলেই ভাবিলেন—দেশের কাজের জন্য যখন পরিশ্রম করিয়াছেন, তখন তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান দেখান আমাদের উচিত। সেই অনুসারে তিনি লাহোরষ্টেশনে পৌঁছিলে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য সকলেই ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। ডি-এ-ভি কলেজের ছাত্রেরা তাঁহার গাড়ী টানিয়া তাঁহাকে সম্মান-প্রদর্শন করিল। সেই হইতে তিনি পঞ্জাবের নেতা বলিয়া খ্যাত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আবশ্যকবোধে তাঁহার মত নেতার পক্ষে খুব অনিষ্টকর কতকগুলি দোষ এখানে আমাকে উল্লেখ করিতে হইতেছে। লাহোরী জনসাধারণ তাঁহাকে যে সম্মান দেখাইয়াছিল, তিনি তাহা বজায় রাখিতে পারেন নাই। সকলেই ভাবিয়াছিলেন ইংলণ্ডে যাইয়া তাঁহার মন এবং পলিসি খুব প্রশস্ততা লাভ করিয়াছে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় আজও তিনি সেই কলেজপার্টি পলিটিক্‌সের ভিতর। দেশের কোন কাজে কোন কর্ত্তৃত্ব বা ক্ষমতা আর কাহাকেও দিতে রাজী নহেন। নিজেই "একমেবাদ্বিতীয়ম্‌" হইতে চান। তাঁহার এই সঙ্কীর্ণতাটুকু বড়ই দোষকর বলিয়া মনে হয়। আমার মত বাঙ্গালী যুবকের চক্ষে লাজপতরায়ের এই ভাবটা নিতান্তই বিসদৃশ ও অসমীচীন ঠেকে। আমরা দেখিতে পাই, আমাদের দেশে একা সুরেন্দ্রবাবুর উপর দেশের মহত্ত্ব ভর করিয়া নাই। লালমোহন ঘোষ, রাজা প্যারীমোহন, নরেন্দ্রনাথ, মতিলাল, রবীন্দ্রনাথ এ, চৌধুরী, গুরুদাসবাবু-প্রভৃতি কত অসংখ্যেয় বড়লোকে দেশকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন বলিয়াই দেশ বড় হইতে পারিয়াছে। লাজপত রায় যে কেমন করিয়া মনে করেন যে, নিজে একেশ্বর থাকিয়া আর-সকলের মহত্ত্ব ও কর্ত্তৃত্বের পথে বিঘ্ন ঘটাইয়া তাঁহার মাতৃভূমি পঞ্জাবকে বড় করিবেন, ইহা আমার বুদ্ধির অগোচর।

লালা হরকিষণলাল কংগ্রেসের কাজ পরিত্যাগ করিয়া দেশের কৃষিশিল্পবিষয়ক উন্নতির দিকে আরও অধিক মনোনিবেশ করিয়াছেন। পঞ্জাবে যত দেশীয় ব্যাঙ্ক, জীবন-বীমা-কোম্পানী এবং অন্যান্য শিল্পকারখানা আছে, প্রায় সকলেরই মূলে তিনি। শুনিতে পাই, তাঁহার এই সব কারবার ফেল্‌ করিবার জন্য কলেজপার্টি-কর্ত্তৃক সদসদ্‌ নানারকম উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল; কিন্তু সুখের বিষয় কিছুতেই কিছু হয় নাই। এখন সমস্ত পঞ্জাব দুইদলে বিভক্ত—'হরকিষণী ও লাজপতী।' দুই দলের নেতার মধ্যে এই প্রভেদ যে, হরকিষণ লাল নিজে নিশ্চেষ্ট এবং লাজপতরায় নিজে অতি সচেষ্ট। দলপতি-দের গুণ দলভুক্তদের মধ্যেও পরিস্ফুট। হরকিষণলালের ভক্তেরা হরকিষণলালকে বাড়াইবার জন্য কোনই চেষ্টা করেন না; লাজপত রায়ের ভক্তেরা লাজপতরায়কে বাড়াইবার জন্য তাঁহাদের কাগজ "দি

পাঞ্জাবী”তে প্রতিদিনই কোন-না-কোন সূত্রে, কারণে-অকারণে একবার লাজপতরায়ের জয়নাম উচ্চারণ করিয়া লন, এবং লাজপতরায় ভিন্ন আর কোন কীর্ত্তিমান্ পাঞ্জাবীর কীর্ত্তিকথার ঘুণাক্ষরে উল্লেখ করেন না, যদি না সে লাজপতরায়ের স্বকার্য্য-উদ্ধারের সহায় হয়। বিজ্ঞাপন-স্তম্ভে মাঝারি অক্ষরে গোখ্‌লে, তিলক এবং শিবাজী ও রাণাপ্রতাপের নামের সঙ্গে অতি বড় অক্ষরে লালা লাজপতরায়ের নাম ছাপাইয়া তাঁহার ফটোর বিজ্ঞাপন দেন। * তিলকসুহৃদ্ খাপার্দ্দেমহাশয় আগামী কলিকাতা-কংগ্রেসে লাজপতরায়ের নাম সভাপতিরূপে প্রস্তাব করার পর হইতে ‘দি পাঞ্জাবী’তে ইহার সাপক্ষে প্রায়ই প্রবন্ধ ও প্যারা প্রকাশিত হইতেছে। এবং শান্তরামনামক কলেজপার্টির কোন উপদেশক মহারাষ্ট্রপ্রদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া লাজপতরায়ের অনুকূলে মহারাষ্ট্রীয়দিগের দ্বারা কলিকাতা-কংগ্রেস-কমিটির নিকট দরখাস্ত পেশ করাইতেছেন।

“উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীঃ।”

বঙ্গলক্ষ্মী যদি উদ্যোগী লাজপতরায়ের কণ্ঠে এবার জয়মাল্য অর্পণ করেন, তবে পঞ্জাবের সাড়ে-পোনর-আনা শিক্ষিতলোক—শিখ্, হিন্দু, মুসলমান, এমন কি, কলেজপার্টির বহু আর্য্যসমাজী পর্য্যন্তও অসন্তুষ্ট হইবেন বটে, কিন্তু আমরা বলি, তাহাতে ক্ষতি কি? আমাদের পক্ষে ভিন্নপ্রদেশের যিনি সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইবেন, তাঁহাকেই আমরা দেখিতে পাইব। নিজেকে দৃষ্টির আড়ালে রাখিলে যদি আমরা দেখিতে না পাই, তবে সে দোষ আমাদের হইবে না।

---

* পাঞ্জাবীরা অতি গম্ভীরপ্রকৃতির লোক। বোধ হয়, ইহাঁদের ধাতে বিধাতা একফোঁটাও হাস্যরসের সমাবেশ করেন নাই। নতুবা রাণাপ্রতাপ ও শিবাজীর সঙ্গে একপর্য্যায়ে এবং তাঁহাদেরও উর্দ্ধে লাজপতরায়ের আসন নির্দ্দিষ্ট করার ভিতর যে কতদূর হাস্যকরতা আছে—ইহাতে লাজপতরায়কে কতদূর হাস্যাস্পদ করা হয়, তাঁহারা বুঝিতেন। “বেঙ্গলী”-আফিসে বিক্রেয় ফটোর তালিকা, ও ‘পাঞ্জাবী’-আফিসে বিক্রেয় ফটোর তালিকা—দুই দেশের লোকেদের Common-senseএর প্রকৃত পরিমাপক।—লেখক।

বম্বে।

তিলকের সহিত মেটা ও সমাজসংস্কারকদলের বিরোধ।

বম্বেতে মহামতি তিলকের দুইটী বিরোধী দল আছে—এক "পলিটিক্যাল," ফেরোজশামেটার দল, দ্বিতীয় "সোশ্যাল," সমাজ-সংস্কারকের দল।

বাঙ্গালাদেশে সম্প্রতি ষোড়শোপচারে পূজা ও সৎকার পাইয়া দেশের ছেলে দেশে ফিরিয়া মহা কৈফিয়তের দায়ে পড়িলেন। সমাজ-সংস্কারকদের একখানি মুখপত্র আছে—"দি জেনারেল্ রিফর্ম্মার" (The Indian Social Reformer.) ইহাকে কিন্তু 'সোশ্যাল রিফর্ম্মার' না বলিয়া—('The General Reformer') বলিলে অত্যুক্তি হইত না। দেশে এমন কোন পলিটিক্যাল ঘটনা ঘটে না, যাহাতে এই পত্রে পক্ষ না লওয়া হইয়া থাকে, এবং সে পক্ষ প্রায়ই ঘটনা-নির্ব্বিশেষে মহারাষ্ট্রীয় তিলকের এবং বঙ্গীয় বিপিন পালের বিপক্ষপক্ষ। সুরেন্দ্রবাবুপ্রভৃতি যে ইঁহার আক্রোশ হইতে বাদ যান তাহা নহে—তবে তিলক ও বিপিন পালের ন্যায় আর কেহ ইঁহার 'pet aversion' নহে। প্রায় সব বিষয়েই অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান "টাইমস্ অব্ ইণ্ডিয়া"র ('Times of India') মতই ইঁহার মত—এক কথায় ইহাই বলিলে ইঁহার পলিটিক্যাল 'views' বর্ণনা করা হয়। কিন্তু উল্লিখিত দোষগুলিসত্ত্বেও ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই পত্রিকাখানি দেশের একটী বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিতেছে। এমন কি, তিলকপ্রভৃতিদের বিরুদ্ধে যে সকল মন্তব্য ইহাতে প্রকাশিত হয়, তাহার ভিতরও অনেক সময় বিচার্য্য ও শিক্ষাপ্রদ অনেক কথা থাকে। কলিকাতার শিবাজী-উৎসবে বিপিনপালের ৺ভবানীপূজার আয়োজন ও তিলকের তাহাতে অনুমোদনে "সোশ্যাল রিফর্ম্মার' যে

মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমার নিকট সম্পূর্ণ সমীচীন মনে হয়। ভাবিয়া দেখা যাউক, আমরা বাঙ্গালীরা শিবাজী-উৎসব কেন করি? আমরা দেখাইতে চাই, ভারতবর্ষের যে অংশেই কোন মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করুন, কি পঞ্জাব, কি বম্বে, কি মান্দ্রাজ, কি মধ্যদেশ—অন্যান্য অংশের লোকেরাও তাঁহার সৎকার করিতে প্রস্তুত। এই সৎকার ও সম্মানপ্রদর্শন আমাদের সাম্রাজ্যনীতির অঙ্গ। কিন্তু এই সাম্রাজ্যনীতির আর একটা বিশিষ্ট অংশ ইহাই নহে কি যে, দেশের সকল ধর্ম্ম ও সকল সম্প্রদায়ের লোককে একীভূত করিয়া এক মহাজাতিত্বের ভাব গঠন করিয়া তোলা? তাই সরলা দেবী গাহিয়াছিলেন,—

"মহাজাতিসংগঠনি মম বাণি!
গাও আজি হিন্দুস্থান।"

কিন্তু মহাপুরুষপূজায় যদি আমরা এমন কিছু সংস্কারের প্রবর্ত্তন করি, যাহাতে সকল ধর্ম্মের লোকের যোগ দিতে বাধা ঘটে, শুধু তাহাই নহে, তাহাদিগকে দশহাত দূরে ঠেলিয়া-ফেলা হয়, তবে কি তাহাতে ঐক্যসাধনের বা সাম্রাজ্যনীতিসাধনের উদ্দেশ্য সফল হয়? ইহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসর শিবাজী-উৎসবে আমরা সকলেই মিলিয়াছি, সকলেই মাতিয়াছি, সকলেই মিশিয়াছি। ব্রাহ্ম-হিন্দু-খ্রীষ্টান ভেদ কাহারও মনেও আসে নাই। এমন কি, মুসলমানেরাও ক্রমে ক্রমে জাতি-ক্রোধ ভুলিয়া তাঁহাকে সম্মান করিতে অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। এমন গড়া-জিনিসকে এবার ভাঙ্গিয়া চুরমার করিয়া কি লাভ হইল? তিলক যে বলিয়াছিলেন—"৺ভবানীহীন শিবাজী কল্পনার অতীত" এই কথার মানে কি? আমি—এই প্রবন্ধের লেখক—গোঁড়াহিন্দুঘরের সন্তান এবং নিজে প্রতিদিন ৺কালীমূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকি।

কিন্তু আমিও এই কথা বুঝিতে পারি যে, শিবাজীর পক্ষে ৺ভবানী যাহা, আমার পক্ষে ৺কালী যাহা, ব্রাহ্মের পক্ষে তাহাই ভগবান, মুসলমানের পক্ষে তাহাই আল্লা, এবং পঞ্জাবের আর্য্যসমাজীর পক্ষে তাহাই পরমাত্মা। আমাদের সকলেরই আত্মার নিভৃতে যে প্রবুদ্ধকারী ঐশীশক্তি কার্য্য করাইতেছে, তাহাই ৺ভবানী। যদি কোন সম্প্রদায় এই শক্তিকে মাটীর মূর্ত্তিতে দেখিতে ইচ্ছা না করে, তবে জোর করিয়া তাহাদিগকে দেখান কেন? "সোশ্যাল রিফর্ম্মার" (*Social Reformer*) ঠিকই বলিয়াছেন, "জাপানেও শিবাজী-উৎসব হইয়াছে; জাপানের মত বীরজাতিও সমূর্ত্ত-ভবানীবিহীন শিবাজীকে হৃদয়ঙ্গম ও সংকার করিতে সক্ষম হইয়াছে। শুধু আমাদের বেলায়ই কি তাহা অসম্ভব হইয়া উঠিল?"

আর একটা বিষয়ে "সোশ্যাল রিফর্ম্মার" (*Social Reformer*) বেশ একটী বিচারযোগ্য কথার অবতারণা করিয়াছেন। 'কালে'র সম্পাদক ভূপত্কার সিডিশনের জন্য জেল-খাটিয়া আসার পর তাঁহাকে তিলক-প্রভৃতি দেশহিতৈষী ব্যক্তিরা বিশেষভাবে পূজা ও সৎকার করিয়াছেন। রিফর্ম্মার বলেন—"এইরকম সৎকারপ্রদর্শনের অর্থ কি? তাহা হইলে কি আমরা আইনের ন্যায়পরতায় শ্রদ্ধাবান নহি? তাহাই যদি হয়, তবে সেই আইনের সূক্ষ্ম ন্যায়দৃষ্টিতে তিলক যেদিন অব্যাহতি পান, সেদিন 'তিলকের গৌরব আরও বাড়িল, আইনের সূক্ষ্মদৃষ্টিও তিলকের পক্ষ লইল' এই কথা বলিয়া তিলকভক্তেরা আকাশ ফাটাইয়াছিলেন কেন? 'যেদিন আইন আমার সপক্ষে সেদিন আইন ন্যায়-সঙ্গত, আর যেদিন আইন আমার বিপক্ষে সেদিন উহা ন্যায়বিরুদ্ধ' ইহাতে এই শিশুজনোচিত কথাই কি বলা হয় না?"

মেটা ও তাঁহার দলের সঙ্গে তিলকের এই যুদ্ধ যে, তাঁহারা বলেন,

"তিলকের স্বকীয় রাজনীতি যাহা আছে তাহা থাকুক। সম্প্রতি তিনি আমাদের কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপিবার চেষ্টা করিতেছেন কেন? পুনার "সার্ব্বজনিক সভা" ছিনাইয়া লইয়া তাহার শ্রাদ্ধ সমাপন করিয়াছেন; কংগ্রেসকেও কি তিনি এখন কবরে পাঠাইতে প্রয়াসী? সেইজন্যই কি নিজের লোকের (খাপার্দ্দে) দ্বারা কংগ্রেসের রিফর্মের জন্য চারিদিকে এই সব সার্কুলার জারী করিতেছেন? তিনি কি কংগ্রেসের সংস্কার করিতে চাহেন, না সৎকার করিতে চাহেন?"

এবার ভারতের রাজনৈতিক-আকাশ ভ্রাতৃবিরোধী কালমেঘাচ্ছন্ন। অদৃষ্টের গর্ভে কি নিহিত আছে, কে বলিতে পারে!

শ্রীশ্রীশচন্দ্র ধর।

গ্রন্থসমালোচনা।

১। সৈয়দ মর্ত্তুজা—শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যাল সম্পাদিত।

সৈয়দ মর্ত্তুজা একজন মুসলমান বৈষ্ণবকবি। আমরা ইতিপূর্ব্বে কয়েকজন সংগ্রহকারের কবিতার মধ্যে সৈয়দ মর্ত্তুজার দুই একটি কবিতা পাঠ করিয়াছিলাম। তাহার পর "সুধা"নামক মাসিকপত্রিকার চতুর্থসংখ্যায় সৈয়দ-মর্ত্তুজাসম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করি; উক্ত প্রবন্ধের লেখক শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায় বি, এল মহাশয় লিখিয়াছেন, "খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুর্শিদাবাদপ্রদেশে এক মুসলমান ফকির প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার নাম সৈয়দ মর্ত্তুজা। মর্ত্তুজার পূর্ব্বপুরুষগণ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশস্থ বরেলী জেলায় বাস করিতেন। মর্ত্তুজার পিতা সৈয়দ-হাসেন-কাদেরীও একজন আউলিয়া বা ফকির ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই প্রথমে বঙ্গদেশে আগমন করেন। মর্ত্তুজা উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে কি বাঙ্গলায় জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না; তবে এইরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, জঙ্গীপুরের নিকট বালিয়াঘাটায় তাঁহার জন্ম হয়। খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। মর্ত্তুজা হইতে এক্ষণে তাঁহার বংশধরগণের মধ্যে কেহ ৮ পুরুষ, এবং কেহ বা ৯ পুরুষ বলিয়া স্থির হইয়া থাকেন। তাহা হইলে, এখন হইতে ন্যূনাধিক ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে মর্ত্তুজার আবির্ভাব স্থির করা যাইতে পারে। মর্ত্তুজা দীর্ঘজীবী ছিলেন, ৮০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া শুনা গিয়া থাকে। জঙ্গীপুরের নিকট চড়কানামক স্থানের রাজাকসাহেবের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তিনি সুতীর নিকট ছাপঘাটিতে এক আস্তানা নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থিতি করিতেন। তথায় অদ্যাবধি তাঁহার সমাধি বিদ্যমান আছে। মর্ত্তুজা মুসলমান ফকির হইয়াও হিন্দুদিগের তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রতি আস্থাবান ছিলেন, এইজন্য মুসলমান গ্রন্থকারগণ তাঁহাকে মর্ত্তুজাহিন্দ বলিয়াছেন। আনন্দময়ী নাম্নী এক ব্রাহ্মণকন্যা ভৈরবীরূপে তাঁহার সহিত অবস্থান করিতেন বলিয়া উভয়কে মর্ত্তুজানন্দ বলিত। তাঁহার ভাষা এরূপ প্রাঞ্জল ও সুললিত যে, পদগুলিকে সহসা উত্তরপশ্চিমদেশবাসী মুসলমান ফকিরের রচিত বলিয়া বুঝা যায় না।"

শ্রীযুক্ত ব্রজসুন্দর সান্যালমহাশয় এই সংগ্রহ-পুস্তকে সৈয়দমর্ত্তুজার ২৩টী পদ প্রকাশ করিয়াছেন; আমাদের মনে হয়, অনুসন্ধান করিলে এই মুসলমান কবির আরও পদ পাওয়া যাইতে পারে। এতদিন আমরা যে কয়জন মুসলমান কবির পদ পাঠ করিয়াছি, তাহার মধ্যে সৈয়দমর্ত্তুজাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। তাঁহার পদগুলি ভাবে, শব্দলালিত্যে এবং মাধুর্য্যে প্রসিদ্ধ হিন্দু কবিগণের পদের সহিত অনায়াসেই তুলনা করা যাইতে পারে। পুরাতন কবিদিগের পদসংগ্রহকার শ্রীযুক্ত আবদুলকরিমমহাশয় সান্যালমহাশয়ের এই পদসংগ্রহে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছেন। আমরা সান্যালমহাশয়ের সংগ্রহে কয়েকটি নূতন পদ দেখিলাম; আড়াইশতবৎসর পূর্ব্বে একজন ভিন্নপ্রদেশবাসী মুসলমান কবি রাধাকৃষ্ণের প্রেমঘটিত এমন সুন্দর ও সুললিত পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে বড়ই আনন্দ হয়। শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেনমহাশয় তাঁহার 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' ১১ জন মুসলমান কবির নাম উল্লেখ করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত আবদুলকরিমমহাশয় আরও ১৩ জনের নাম পাইয়াছেন। তাহা হইলে এক্ষণে সর্ব্বশুদ্ধ ২৪ জন মুসলমান কবির নাম পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তাহার মধ্যে কেবলমাত্র তিনচারিজনেরই অল্প দুইচারিটী পদ পাওয়া যায়; শ্রীযুক্ত আবদুলকরিমমহাশয় এই ২৪ জন কবির পদাবলি সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিলে ভাল হয়।

কাসেমবধ কাব্য।

শ্রীযুক্ত আবুল্‌মাআলী মহাম্মদ হামিদ আলী প্রণীত।

প্রসিদ্ধ মহরমের ঘটনা লইয়া এই কাব্যখানি লিখিত। আমরা সংক্ষেপে মহরমের পূর্ব্বের ইতিহাস দিতেছি। দমস্কের রাজপুত্র এজিদ বাল্যকাল হইতেই নবীবংশের বিদ্বেষী ছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিলে ঘটনাক্রমে জয়নবনাম্নী কোন রূপবতী ললনার রূপলাবণ্য তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাজপুত্র কোন রাজপুত্রীর পাণিগ্রহণ করিবে, ইহাই রাজার অভিপ্রায়; সুতরাং রাজা জয়নবের সহিত পুত্রের বিবাহে অসম্মত হইলেন; ইত্যবসরে আবদুলজব্বারনামে একজন মুসলমানের সহিত জয়নবের বিবাহ হইয়া গেল। এজিদ জয়নবের বিচ্ছেদে অধীর হইয়া পড়িলেন, এবং ক্রমে শয্যাগত হইলেন। পুত্রের এই অবস্থাদর্শনে মহিষীর বিশেষ অনুরোধে মরওয়ান ইহার প্রতীকারের জন্য রাজাদেশ প্রাপ্ত হন। তিনি নানাপ্রকার কৌশল করিয়া আবদুলজব্বারকে রাজপুরীতে আনয়ন করেন; এবং নানাকৌশলে জয়নবের সহিত তাহার বিবাহবন্ধন ছিন্ন করেন। কিন্তু কিছুদিন পরে আবদুলজব্বার সমস্ত চক্র বুঝিতে পারিয়া সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

জব্বার ফকির হইয়া দেশত্যাগ করিলে এজিদকে পতিত্বে বরণ করিবার জন্য জয়নবকে অনুরোধ করা হয়। যে রাজদূত এই অনুরোধ লইয়া যান, তিনি মদিনার পথ অতিক্রম করিয়া যাইবার সময় ইমাম হাসেনও উক্ত দূতের দ্বারা নিজের বিবাহ প্রস্তাব জয়নবের নিকট প্রেরণ করেন। জয়নব স্বামিহত্যাকারীকে উপেক্ষা করিয়া ইমাম হাসেনকেই বিবাহ করিলেন। এই সংবাদ পাইয়া এজিদের ভয়ানক ক্রোধ হইল, তিনি চিরশত্রু ইমাম হাসেনের উপর প্রতিহিংসা লইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সুযোগও উপস্থিত হইল; তাঁহার পিতার মৃত্যু হইল। এজিদ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই মদিনা-রাজ হাসনকে স্বীয় অধীনতা স্বীকার করিতে বলিলেন, হাসেন অস্বীকার করিলেন। এজিদ যুদ্ধঘোষণা করিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্যগণ মদিনা পর্য্যন্ত পৌঁছিতেও পারিল না, পথ হইতেই বিতাড়িত হইল।

এজিদ তখন কৌশলে জয়নবকে লাভ করিবার জন্য কূটবুদ্ধি মরওয়ানের শরণাপন্ন হইলেন। মরওয়ান ছদ্মবেশে মদিনায় উপস্থিত হইয়া ময়মুনানাম্নী একটি দুষ্টা স্ত্রীলোকের সাহায্যে ইমামের অন্যতম পত্নী জায়দারদ্বারা বিষদানে হাসেনকে বধ করিলেন। অতঃপর বিনাবাধাবিঘ্নে জয়নবলাভাশায়, কুফাপতি আবদুল্লা জেয়াদকে প্রচুর অর্থদানে হস্তগত করেন। ইমাম হোসেনকে মদিনার বাহিরে আনয়নমানসে কুফাপতিদ্বারা তাঁহার নিকট এই মর্ম্মে পত্র প্রেরিত হইল—"সংসারে আমার বিরাগ জন্মিয়াছে। এ রাজ্য আপনারই পিতৃপ্রদত্ত; সুতরাং আপনি অবিলম্বে এখানে আসিয়া সিংহাসন গ্রহণ করুন।" এই পত্র পাইয়া মদিনাবাসিগণ ইমামহোসেনের সহিত অনেক পরামর্শ করেন। অবশেষে ইহাই স্থির হইল যে, জেয়াদের মনের ভাব জানিবার জন্য মহাবীর মোস্‌লেমকে প্রেরণ করা হউক। তদনুসারে মোসলেম কুফায় গেলেন এবং শত্রুগণের চাতুরীতে মোহিত হইয়া ইমাম হোসেনকে কুফায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। ষষ্টিসহস্র ভক্তসৈন্য সঙ্গে লইয়া ইমাম কুফাযাত্রা করিলেন। দৈবাদেশে ইমাম-বাহিনী কুফার পথ ভুলিয়া কারবালার নিকটবর্ত্তী হইলেন। তাহার পরেই সেই শোচনীয় মহরমপর্ব্বের আরম্ভ।

লেখক মহাম্মদ হামিদ আলী মহাশয় অমিত্রাক্ষরছন্দে এই শোচনীয় মহরম-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; কবি স্থানে স্থানে প্রকৃত ইতিহাসের অনুসরণ করেন নাই। আমাদের মতে ইহা কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হয় না। লেখক কবিতা লেখায় নূতন ব্রতী নহেন; পূর্ব্বেও দুইএকখানি কবিতাপুস্তক লিখিয়াছেন। আমরা এই কাসেমবধকাব্য পাঠ করিয়া আনন্দলাভ করিয়াছি। আজকাল শিক্ষিত মুসলমানগণ বাঙ্গলাভাষার চর্চ্চা করিতেছেন, ইহাতে সকলেই আনন্দিত হইবেন।